মার্কসীয় রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র

Lalsalamml.wordpress.com

এ লিয়নতিয়েভ

POLITICAL ECONOMY--
A Beginners Course

by A. LEONTIEV

অনু ঃ সেরাজুল আনোয়ার

প্রকাশক	ঃ	জাকারিয়া হাবিব ৭৫, নীচ তলা, আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট শাহাবাগ, ঢাকা-১০০০।
প্রকাশকাল	ঃ	প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৫
প্রাপ্তিস্থান	ঃ	আজিজ কো-অপারেটিভ মার্কেট শাহাবাগ-এর বিভিন্ন লাইব্রেরী
মুদ্রণে	ঃ	ব্যানার প্রিন্টার্স ৩১, যোগীনগর রোড ওয়ারী, ঢাকা।
মূল্য	ঃ	একশত পঁচিশ টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

এ. লিয়নথিয়েভের লেখা "মার্কসীয় রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র" বইটির প্রথম সংস্করণ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের কাছে মার্কসীয় অর্থনীতির অন্যতম এক প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক পুস্তক হিসেবে এই বইটি সমাদৃত। রাজনৈতিক কর্মীদের জন্যেও এর প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে বর্তমান। এমন পরিস্থিতিতে বইটির পুনর্মুদ্রণের দাবি জোরালো হয়ে উঠেছিল। পাঠক-শুভানুধ্যায়ীদের আগ্রহ ও অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল।

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

মার্কসীয় অর্থনৈতিক মতবাদ মার্কসবাদের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমরা জানি, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরই দাঁড়িয়ে আছে তার রাজনৈতিক উপরিকাঠামো। লেনিনের কথায়, অর্থনীতি হচ্ছে ভিত্তি, রাজনীতি তার ঘনীভূত প্রকাশ। সুতরাং মার্কসীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বাবলী সম্পর্কে একটা সম্যক জ্ঞান অর্জন ছাড়া মার্কসবাদ চর্চা ও সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে মার্কসবাদের প্রয়োগ একেবারেই অসম্ভব। মার্কসবাদের অর্থনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে মার্কসবাদী রাজনৈতিক কৌশল ব্যবহারের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বলা নিষ্প্রয়োজন, আমাদের দেশে মার্কসবাদের চর্চা বিশেষভাবেই নির্দিষ্ট গণ্ডী যে অতিক্রম করতে পারছে না তার অন্যতম মূল কারণ হলো মার্কসীয় অর্থনৈতিক মতবাদের সাথে একটা যথাযথ পরিচয় না থাকা।

মার্কসবাদ একটি বিজ্ঞান, জীবন্ত বিজ্ঞান, আর এই বিজ্ঞানের ব্যাপারে খণ্ডিত বা আংশিক জ্ঞান হাতুড়েপনার জন্ম দেয়। আর হাতুড়ে কাজ-কারবারের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তের অভাব আমাদের দেশে কোনক্রমেই বিরল নয়। মার্কসবাদ চর্চা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই অসঙ্গতিটা দূর না করলে এদেশে সাম্যবাদী আন্দোলন নির্দিষ্ট গতিবেগ যে অর্জন করতে পারে না তা খুবই স্পষ্ট। সুতরাং এক্ষেত্রে মার্কসীয় অর্থনৈতিক মতবাদের সাথে পরিচিত হওয়াটা আজ বিশেষ করেই বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছে। এ পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে লিখিত **এ. লিয়নতিয়েভের** অমর রচনা **"পলিটিক্যাল ইকনোমি – এ বিগিনার্স কোর্স"**-এর প্রথম বাংলাদেশী সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হলো। মার্কসীয় অর্থনীতি বিজ্ঞানকে নবীন পাঠকদের সামনে সাবলীল ও সহজ ভাষায় সামগ্রিকভাবে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এ বইয়ের জুড়ি নেই। মার্কসবাদের মৌলিক অর্থনৈতিক সূত্রাবলী এ বইতে যথার্থই চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে। মার্কসবাদী অর্থনীতির এক প্রয়োজনীয় প্রবেশিকা হিসাবে এ বই নবীন পাঠকদের চাহিদা নিঃসন্দেহে পূরণ করবে।

মার্কসবাদ আজ কেবল শ্রেণী-শত্রুদের আক্রমণেরই শিকার নয়, মার্কসবাদী আন্দোলনে দক্ষিণ ও "বাম" সুবিধাবাদীদের কর্মকাণ্ডও মার্কসবাদের যথার্থ অনুশীলন বিঘ্নিত ও বিপর্যস্ত করছে। বিশেষ করে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ-সংশোধনবাদ নবীন মার্কসবাদী ও সাধারণ সারির কর্মীদের মার্কসবাদের মৌলিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও সূত্রাবলীর সাথে পরিচিত ও আগ্রহান্বিত হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা চালায়। আমাদের দেশে সংশোধনবাদীদের এসব ক্রিয়াকর্ম বহু দিন ধরেই চলে আসছে এবং আমরা তার সাথে পরিচিত। অন্যদিকে বামপন্থী বুলিবাগীশরা মুখে মার্কসবাদ চর্চার কথা বললেও বাস্তবে নিজেদের ভ্রান্ত অনুশীলনের প্রয়োজনে এই মতবাদের খণ্ডিত বা আংশিক অধ্যয়ন ও চর্চার প্রতি জোর দেয়। বিশেষ করে মার্কসীয় অর্থনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে জ্ঞানের এখানেও রয়েছে নিদারুণ ঘাটতি ও অনীহা। এই গোটা পরিস্থিতিটি এদেশে মার্কসবাদের যথার্থ অনুশীলনকে বিঘ্নিত করছে এবং তা কাটিয়ে ওঠা একান্তই জরুরী।

অন্যদিকে ষাটের দশকে থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে বিতর্ক চলে আসছে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে বর্তমানে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে চলেছে তার অন্যতম বিষয় হলো অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী। যেকোন অগ্রসর পাঠকই বুঝতে পারবেন যে, মার্কসবাদী অর্থনীতি বিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রাবলীর সাথে পরিচয় না থাকলে এসব প্রশ্ন অনুধাবন এবং এসব বিষয়ে কথা বলার কোন সুযোগ নেই। সেদিক থেকেও মার্কসীয় অর্থনীতি সম্পর্কে অধ্যয়নের ব্যাপক প্রয়োজন রয়েছে।

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, বিংশতি কংগ্রেসে তৎকালীন সোভিয়েত নেতৃত্ব যেসব বিভিন্ন ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সুবিদিত কারণেই সেসবের প্রয়োজনে অন্যান্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সোভিয়েত প্রকাশনার মতো **এ. লিয়নতিয়েভের** এই প্রখ্যাত পুস্তকটির পুনর্মুদ্রণও বন্ধ হয়ে যায়।

সর্বশেষে, এ বইয়ের অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাব ও ভাষা যথার্থভাবেই মূল বইয়ের অনুরূপ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি অনবধানতা বশতঃ ভুল থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা বাদ দেয়া যায় না। ভাষাগত ক্ষেত্রেও ত্রুটি থাকতে পারে। সুতরাং পরবর্তী সংস্করণে পরিমার্জনের প্রয়োজন থেকে যাবে। এ ব্যাপারে পাঠকদের অভিমত ও সমালোচনা সাদরে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য, বর্তমান অনুবাদে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের উদ্ধৃতিগুলো সম্পর্কে সমসাময়িক প্রকাশিত রচনাবলীকে সূত্র হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মার্কসবাদ অধ্যয়ন ও অনুশীলনরত নবীন পাঠক ও কর্মীদের এই গ্রন্থখানি অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিৎ।

Lalsalamml.wordpress.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

রাজনৈতিক অর্থনীতি কি ও তা কি শিক্ষা দেয় ?

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ–সর্বহারাশ্রেণীর মতবাদ –১, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রেণী-পার্থক্য – ২, শ্রেণী কি ? – ৩, উৎপাদিকা-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক –৫, রাজনৈতিক অর্থনীতি অধ্যয়নের পরিধি – ৭, রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ – ৯, দুই বিশ্ব, দুই ব্যবস্থা – ১০, সমাজতন্ত্রের পথ সর্বহারা একনায়কত্বের মধ্যেই নিহিত – ১৩, রাজনৈতিক অর্থনীতি-এক জঙ্গী, শ্রেণী বিজ্ঞান – ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজ কিভাবে পুঁজিবাদে বিকাশ লাভ করলো ?

আমাদের লক্ষ্য শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ – ১৮, শ্রেণী কি সবসময় বিদ্যমান ছিল ? – ১৮, আদিম গ্রোত্র সাম্যবাদ – ১৯, আদিম সমাজের অবক্ষয় –২২, প্রাক্-ধনবাদী শোষণের রূপসমূহ – ২৩, বিনিময়-প্রথার উদ্ভব ও বিকাশ, – ২৬, পুঁজিবাদী উৎপাদনের উৎপত্তি – ২৯

তৃতীয় অধ্যায়

পণ্য-উৎপাদন

পণ্য কি ? – ৩১, পণ্যের দুটি গুণ – ৩২, শ্রমই মূল্য সৃষ্টি করে – ৩৩, বিমূর্ত ও মূর্ত শ্রম – ৩৫, সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রম – ৩৭, সরল শ্রম ও দক্ষ শ্রম – ৩৮, বাজার ও প্রতিযোগিতা – ৩৮, বিনিময়ের বিকাশ ও মূল্যের রূপ – ৪০, পণ্য-পূজা – ৪২, পণ্য-উৎপাদন পদ্ধতিতে মুদ্রার ভূমিকা –৪৪, মুদ্রার কাজ – ৪৫, মূল্য-সূত্র – পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদনের গতির নিয়ম – ৪৮

চতুর্থ অধ্যায়

পুঁজিবাদী শোষণের মর্মবস্তু

আদিম পুঞ্জীভবন – ৫৩, মুদ্রার পুঁজিতে রূপান্তর – ৫৪, শ্রম-শক্তির ক্রয়-বিক্রয় ও তার মূল্য – ৫৫, পুঁজিপতির মুনাফার উৎস কি ? – ৫৬, উদ্বৃত্ত-শ্রম ও উদ্বৃত্ত-মূল্য – ৫৭, পুঁজি কি ? – ৬০, স্থির ও পরিবর্তনশীল পুঁজি – ৬২, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার – ৬৪, উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধি করার দুই পদ্ধতি – ৬৪, অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য – ৬৬, শ্রমের তীব্রতা – ৬৭, পুঁজিবাদ ও প্রযুক্তিগত উন্নতি – ৬৮, মজুরী দাসত্ব – ৭৫, উপনিবেশ সমূহে দাসত্ব – ৭১

পঞ্চম অধ্যায়

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর মজুরী ও দারিদ্র

শ্রমশক্তির মূল্য ও দাম – ৭৩, মজুরী – পুঁজিবাদী শোষণের মুখোশ – ৭৩, মজুরী ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম – ৭৫, মজুরীর রূপ – ৭৬, সময়-রূপ কাজ – ৭৭, ফুরন কাজ – ৭৭, বোনাস ও মুনাফার অংশীদারত্ব – ৭৮, "রক্ত জল করা ব্যবস্থা" – ৭৮, বস্তুতে কিংবা মুদ্রায় মজুরী দান – ৭৯, নামমাত্র মজুরী ও প্রকৃত মজুরী – ৮০, দক্ষ শ্রমিকের মজুরী –৮১, বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে মজুরীর মান – ৮১, পুঁজিবাদী শোষণের বৃদ্ধি – ৮২, বেকারত্ব ও শ্রমের মজুত বাহিনী – ৮৪, পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবনের সাধারণ নিয়ম – ৮৫, শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্য – ৮৭, সংকটের অবস্থায় সর্বহারাশ্রেণীর দারিদ্র ও বেকারত্ব – ৮৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুঁজিপতিদের মধ্যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বণ্টন

নিম্ন মুনাফার হার অভিমুখী প্রবণতা – ৯৬, বণিক পুঁজি ও তার আয় – ৯৭, বাণিজ্যের বিভিন্ন রূপ, ফাটকাবাজী – ৯৮, ঋণ পুঁজি ও ঋণ – ৯৯, সুদের হার – ১০০

সপ্তম অধ্যায়

কৃষিতে পুঁজিবাদ

ভূমি খাজনা – ১০৩, ভূমি খাজনার উৎস – ১০৪, ভূমির ক্রয়-বিক্রয় – ১০৫, ভূমি-খাজনা ও কৃষির পশ্চাদ্‌পদতা – ১০৬, কৃষিতে বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন – ১০৭, পুঁজিবাদী দেশসমূহে ভূমির বন্টন ও কৃষকদের অবস্থা –১১০, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে কৃষকদের মধ্যে বৈষম্য – ১১১, পুঁজিবাদী দেশসমূহের কৃষকদের দারিদ্র – ১১২, বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণীর মিত্র কৃষক – ১১৩

অষ্টম অধ্যায়

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুনরুৎপাদন ও সংকট

উৎপাদন-যন্ত্র ও ভোগের উপকরণ – ১১৫, পুনরুৎপাদন কাকে বলে – ১১৬, সরল ও বর্ধিত পুনরুৎপাদন – ১১৬, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুনরুৎপাদন – ১১৭, পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবন – ১১৭, পুঁজির কেন্দ্রীভূতকরণ ও কেন্দ্রীয়করণ – ১১৮, পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবনের ঐতিহাসিক প্রবণতা – ১২০, পুনরুৎপাদন ও পণ্যের বিক্রয় – ১২২, সরল ও বর্ধিত পুনরুৎপাদনে নগদ দাম আদায়ের শর্তাবলী – ১২৩, পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের দ্বন্দ্বসমূহ – ১২৫, অতি-উৎপাদনের পুঁজিবাদী সংকট – ১২৮, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সংকট অবশ্যম্ভাবী কেন ? – ১২৯, সংকটের পর্যাবৃত্তি – ১৩১, সংকটের তাৎপর্য – ১৩৩

নবম অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদ – সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কাল

শিল্প-পুঁজিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ – ১৩৬, সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি বৈশিষ্ট – ১৩৭, একচেটেবাদের আধিপত্য – ১৩৮, কার্টেল, সিন্ডিকেট ও ট্রাস্ট – ১৪০, নিকট-শিল্পের জোট – ১৪১, কর্পোরেশন – ১৪১, একচেটেবাদ ও প্রতিযোগিতা – ১৪২, একচেটে পুঁজিবাদ হিসাবে সাম্রাজ্যবাদ – ১৪৩, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলিতে একচেটে জোটসমূহ – ১৪৪, লগ্নী পুঁজি – ১৪৬, পুঁজি রপ্তানী – ১৪৮, পুঁজিপতিদের জোটগুলির মধ্যে বিশ্বের ভাগ-বন্টন – ১৫০, উপনিবেশ দখল ও বিশ্বের ভাগ-বন্টন – ১৫১, ডাম্পিং – ১৫২, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় অসম বিকাশের নিয়ম – ১৫৩, অসম বিকাশের নিয়ম ও সর্বহারা বিপ্লব – ১৫৬, অতি-সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব – ১৫৭, সংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্ব – ১৬০, পরগাছাবৃত্তি ও পুঁজিবাদের অবক্ষয় – ১৬৩, সাম্রাজ্যবাদ – পুঁজিবাদের ধ্বংসের যুগ – ১৬৬

দশম অধ্যায়

যুদ্ধ ও পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট

সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের পতন – ১৬৯, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ – ১৭০, বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম ও পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট – ১৭২, পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের তিনটি আমল – ১৭৬, ফ্যাসিবাদ ও সোশ্যাল- ডেমোক্র্যাসি – ১৮৩

একাদশ অধ্যায়

পুঁজিবাদের সমসাময়িক বিশ্ব সংকট

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের মধ্যেই অর্থনৈতিক সংকট – ১৮৩, অতি-উৎপাদনের সংকট – ১৮৪, সকল সংকটের মধ্যে সবচেয়ে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী সংকট – ১৮৬, উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবনতি – ১৮৮, জাতীয় আয়ের অধোগতি ও জাতীয় সম্পদের হ্রাস – ১৯০, বেকারত্ব ও শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা – ১৯১, শিল্প ও কৃষি-সংকটের জট পাকানো অবস্থা – ১৯৫, সংকট ও একচেটেবাদ – ১৯৭, বৈদেশিক বাণিজ্যে অবনতি – ১৯৯, ঋণ-সংকট, মুদ্রাস্ফীতি ও বাজারের জন্য সংগ্রাম – ২০০, বর্তমান মন্দা ও তার বিশেষত্ব – ২০৪, এক নোতুন-দফা বিপ্লব ও যুদ্ধের প্রাক্কাল – ২০৫।

রাজনৈতিক অর্থনীতি কি ও তা কি শিক্ষা দেয় ?

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ – সর্বহারাশ্রেণীর মতবাদ

সর্বহারাশ্রেণী তার সংগ্রামে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের শিক্ষাবলী দ্বারা পরিচালিত হয়। সর্বহারাশ্রেণীর এসব মহান শিক্ষক ও নেতারা এক শক্তিশালী হাতিয়ার নির্মাণ করেছেন। তাঁরা সৃষ্টি করেছেন ও বিকশিত করেছেন সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী তত্ত্ব। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণীর সংগ্রামে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষাবলী তার পথ-নির্দেশক। পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত সকল দেশের শ্রেণী-সচেতন শ্রমিকের হাতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এক শক্তিশালী হাতিয়ার, আর সর্বহারা বিপ্লবের বিজয়ের পর সমাজতন্ত্রের সকল শত্রুর বিরুদ্ধে সফলভাবে আরো অধিক সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্যে তা শ্রমিকশ্রেণীকে পথ দেখায়, একটি পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলায় সুনিশ্চয়তা দানকারী সঠিক কর্মনীতি পালন করায় তা তাদের সক্ষম করে তোলে।

বলশেভিক পার্টির প্রথম খসড়া কর্মসূচীর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ত্রিশ বছরেরও পূর্বে লেনিন লিখেছিলেন যে, মার্কসীয় তত্ত্ব

"……প্রথমবারের মতো সমাজতন্ত্রকে কল্পলৌকিকতা থেকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করে, এই বিজ্ঞানের জন্যে এক দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে এবং যে পথ ধরে এই বিজ্ঞানকে তার সর্বদিক দিয়ে আরো অধিক বিকশিত ও উন্নত করার কাজে অগ্রসর হওয়া যায় সেই পথ নির্দেশ করে। মজুরী দিয়ে শ্রমিক খাটানো, শ্রম-শক্তির ক্রয়, কিভাবে জমি, কারখানা, খনি ইত্যাদির মালিক ক্ষুদ্র এক দল পুঁজিপতিদের দ্বারা লক্ষ-কোটি বিত্তহীন মানুষের দাসত্ব আড়াল করে রাখে, তার ব্যাখ্যা দান করে তা আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্তর্বস্তুকে উদ্‌ঘাটন করে দেয়। তা দেখিয়ে দেয় আধুনিক পুঁজিবাদের সামগ্রিক বিকাশ কিভাবে বড় বড় প্রতিষ্ঠান দ্বারা ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস সাধনের দিকে ঝোঁক প্রদর্শন করে, সৃষ্টি করে এমন এক অবস্থা যা সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির এক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব ও জরুরী করে তোলে। প্রচলিত আচার-পদ্ধতি, রাজনৈতিক কূট-কৌশল, ভণ্ডামিপূর্ণ আইন-কানুন ও বিভ্রান্তিময় শিক্ষা-দীক্ষার পর্দান্তরালে তা চিনতে শেখায় **শ্রেণী-সংগ্রামকে**, সকল ধরনের বিত্তবান শ্রেণীসমূহের সাথে বিত্তহীন জনগণের তথা **সর্বহারাশ্রেণীর** সংগ্রামকে, যে শ্রেণী সকল বিত্তহীন জনগণকে নেতৃত্ব দেয়। বিপ্লবী, সমাজতন্ত্রী পার্টিগুলোর প্রকৃত করণীয় তা সুস্পষ্ট করে দেয় ঃ সমাজের পুনর্গঠনের জন্যে পরিকল্পনার ফানুস তৈরী করা নয়, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্যে পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের অনুগত ভৃত্যদের ধর্মোপদেশ শোনানো নয়, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত আঁটা নয়, বরং সর্বহারাশ্রেণীর সংগ্রাম ও এই সংগ্রামের নেতৃত্ব সংগঠিত করা, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো – সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা।" [লেনিন, সঃ রঃ, ২য় খণ্ড, "আমাদের কর্মসূচী", পৃঃ ৪৯১, রুশ সংস্করণ]

মানব জাতির ইতিহাস অধ্যয়নের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী মার্কসবাদই সর্বপ্রথম তুলে ধরে। বুর্জোয়া বিজ্ঞানীরা সমাজ-বিকাশের নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। সমাজের ইতিহাসকে তাঁরা নিছক বিরামহীন দৈব-ঘটনা পরম্পরা হিঁসেবে তুলে ধরেন যেখানে সেগুলোকে সংযোগকারী কোন নির্দিষ্ট নিয়ম খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। মার্কসই প্রথম দেখিয়ে দেন যে, সমাজ-বিকাশ প্রাকৃতিক বিকাশের মতই নির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু,

প্রকৃতির নিয়মাবলীর বৈসাদৃশ্যে, মানব সমাজের বিকাশের নিয়মাবলী মানুষের ইচ্ছা ও কর্ম-নিরপেক্ষভাবে নয়, বরং, তার বিপরীতে, ব্যাপক জনসাধারণের কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়েই কার্যকর হয়। মার্কসবাদ আবিষ্কার করে যে, পুঁজিবাদের ধ্বংস আপনা-আপনি আসবে না, বরং তা কেবল আসতে পারে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণীর তিক্ত শ্রেণী সংগ্রামের ফলশ্রুতিতেই। যেহেতু সমাজ নির্দিষ্ট নিয়মাবলী অনুযায়ী বিকাশ লাভ করে বলে ধরে নেয়া যায়, সেহেতু শ্রমিকশ্রেণী হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে এবং এই নিয়মাবলী পুঁজিবাদের স্থলে যাতে সমাজতন্ত্র নিয়ে আসে তার জন্যে বসে থাকতে পারে – এই স্যোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক তত্ত্ব হচ্ছে মার্কসবাদের এক নির্জলা বিকৃতি। সমাজ বিকাশের নিয়মাবলী স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হয় না। সমাজে নিয়ত ঘটমান শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সেগুলো ধীরে ধীরে পথ করে নেয়।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষায় সজ্জিত সর্বহারাশ্রেণী নিশ্চয়তার সাথেই সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম পরিচালনা করে। সমাজ-বিকাশের নিয়মাবলী সে জানে ; তার সংগ্রাম, তার কাজ-কর্ম, তার কর্মতৎপরতায় সে এসব নিয়মাবলী মেনে চলে, যা পুঁজিবাদের অনিবার্য ধ্বংস আর সমাজতন্ত্রের বিজয়ের দিকে চালনা করে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নিপীড়কদের বিরুদ্ধে বঞ্চিতদের শ্রেণী-সংগ্রামকে উদ্‌ঘাটন করার শিক্ষা দেয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিক্ষা দেয় যে, বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতার উচ্ছেদ আর তার নিজের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে, সমাজতন্ত্র অভিমুখী একমাত্র পথটি চালিত হয় সর্বহারাশ্রেণীর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রেণী-পার্থক্য

যেকোন একটি পুঁজিবাদী দেশের কথা ধরা যাক। উন্নত বা পশ্চাদ্‌পদ – যেরূপ দেশই তা হোক না কেন, প্রথম যে জিনিসটি নজরে পড়ে তা হলো শ্রেণী-পার্থক্য। রাজপথের ধারে সারিবদ্ধ সবুজ প্রাঙ্গণ ও বৃক্ষরাজি শোভিত সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস করে মুষ্টিমেয় বিত্তবান লোক আর নিরানন্দ রাস্তার পাশে পুঁতিগন্ধময় ও ধূম্রাচ্ছন্ন গৃহে, নিকৃষ্ট বস্তিতে কিংবা নড়বড়ে কুঁড়েঘরে বাস করে মজুরের দল, বিত্তবানদের বিপুল বৈভবের সৃষ্টিকর্তা।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজ **দুটি** বিরাট শত্রু **শিবিরে, দুটি** বিরোধী **শ্রেণীতে** – বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীতে বিভক্ত। বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে রয়েছে সকল সম্পদ ও সর্বৈব ক্ষমতা, সকল শিল্প-কারখানা, ফ্যাক্টরী, খনি, জমি, ব্যাংক, রেলপথের মালিক তারা ; বুর্জোয়াশ্রেণী হলো **শাসকশ্রেণী**। সর্বহারাশ্রেণীর জন্যে রয়েছে সকল ধরনের নিপীড়ন ও দারিদ্র্য। **বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যেকার বৈসাদৃশ্য** – এটাই হলো যেকোন পুঁজিবাদী দেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ চিহ্ন। শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার সংগ্রাম – এটাই অন্য সবকিছুর ওপর প্রাধান্য লাভ করে। এই দুটি শ্রেণীর মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমাগত আরো গভীর, আরো ব্যাপক হতে থাকে। শ্রেণী-দ্বন্দ্বের বৃদ্ধি-প্রাপ্তির সাথে সাথে ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীর ঘৃণা-ভরা ক্রোধ বাড়তে থাকে, তাদের সংগ্রাম করার আকাংখাও বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে তাদের বিপ্লবী সচেতনতা, নিজেদের শক্তির ওপর আস্থা ও পুঁজিবাদের উপর তাদের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতি বিশ্বাস।

সংকট সর্বহারাশ্রেণীর জন্যে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ডেকে এনেছে। ব্যাপক আকারের বেকারত্ব, স্বল্প মজুরী, হতাশায় নিমজ্জিত হাজারো মানুষের আত্মহত্যা, অন্নাভাবে মৃত্যু, ক্রমবর্ধমান শিশু-মৃত্যু – এগুলোই হলো পুঁজিবাদ থেকে শ্রমিকদের পরম প্রাপ্তি। একই সাথে, বুর্জোয়াশ্রেণী আগের মতোই বিপুল সম্পদ অর্জন করতে থাকে।

এতদনুসারে, উদাহরণস্বরূপ, জার্মান সংবাদপত্রের বিবরণ অনুযায়ী, রং প্রস্তুতকারী ট্রাস্টের ৪৩ জন ডিরেক্টর বছরে প্রত্যেকে পায় – ১,৪৫,০০০ মার্ক ; শ্‌কুবার্ট ও সল্টজার প্রতিষ্ঠানের ৪ জন ডিরেক্টর প্রত্যেকে পায় – ১,৪৫,০০০ মার্ক ; ইলসে কর্পোরেশনের ২ জন ডিরেক্টর প্রত্যেকে পায় – ১,৩০,০০০ মার্ক ; ম্যানস্‌ম্যান কর্পোরেশনের ৭ জন ডিরেক্টর প্রত্যেকে পায় – ১,৩৫,০০০ মার্ক ; অ্যালায়েন্স ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর ২২ জন ডিরেক্টর প্রত্যেকে পায় – ৮০,০০০ মার্ক।

মুষ্টিমেয় পরজীবী প্রাণী যাতে ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করতে পারে তার জন্য লক্ষ-কোটি জনগণকে থাকতে হয় ক্ষুধার্ত। এই হলো পুঁজিবাদের তুলে ধরা চিত্র, এই হলো শ্রেণী-দ্বন্দ্বের চিত্র, যা নজিরবিহীন সংকট দ্বারা চূড়ান্ত মাত্রায় তীব্র হয়ে উঠেছে।

বুর্জোয়াশ্রেণী তার শাসন বজায় রাখতে চায় সকল ধরনের হিংসাত্মক কার্যক্রম ও প্রবঞ্চনা দ্বারা। নিজ শ্রেণী-চেতনা বৃদ্ধির মাত্রা অনুযায়ী, সর্বহারাশ্রেণী চায় পুঁজিবাদী দাসত্বের অবসান ঘটাতে এবং তদ্‌স্থলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে।

পুঁজিবাদী দেশসমূহে বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীই হলো মূল শ্রেণী। তাদের পরস্পর-সম্পর্ক, তাদের সংগ্রাম – এগুলোই পুঁজিবাদী সমাজের নিয়তি নির্ধারণ করে। কিন্তু, পুঁজিবাদী দেশসমূহে, বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীর সাথে সাথে অন্যান্য, মধ্যবর্তী, স্তর রয়েছে। বহু দেশেই এসব মধ্যবর্তী স্তর সংখ্যায় বেশ পরিমাণে বড়।

মধ্যবর্তী স্তরের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ছোট ও মাঝারী কৃষক (চাষী), হস্তশিল্প ও কারিকর। এসব স্তরকে আমরা বলি পেটি-বুর্জোয়া। বুর্জোয়াদের দিকে যা তাদের নৈকট্য সৃষ্টি করে তাহলো তারা জমি, যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারের মালিক। কিন্তু একই সাথে তারা হলো শ্রমজীবী, আর এটাই সর্বহারাশ্রেণীর দিকে তাদের নৈকট্য সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদ অবশ্যম্ভাবীরূপে এসব মধ্যবর্তী স্তরকে নিঃস্ব হওয়ার দিকে ঠেলে দেয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে এরা নিষ্পেষিত হয়। এদের নগণ্য সংখ্যকই শোষকশ্রেণীর সারিতে প্রবেশ করতে পারে, ব্যাপক জনসাধারণই নিঃস্ব হয়ে যায় এবং সর্বহারাশ্রেণীর সারিতে তলিয়ে যায়। সে কারণে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, ব্যাপক শ্রমজীবী কৃষক জনগণের মধ্যে সর্বহারাশ্রেণী মিত্র খুঁজে পায়।

শ্রেণী কি ?

বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণী – এরাই হলো প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশে দুই মূল শ্রেণী। বুর্জোয়াশ্রেণী শাসন করে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া বুর্জোয়াশ্রেণী টিকে থাকতে পারে না। যদি লক্ষ-কোটি শ্রমিক তাদের কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরীতে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী না খাটে ও মাথার ঘাম না ফেলে তাহলে পুঁজিপতির সমৃদ্ধি আসতে পারে না। বিত্তবানদের পকেট পুর্তির জন্যেই শ্রমিকের রক্ত ও ঘাম ঝন্‌ঝনে মুদ্রায় রূপান্তরিত হয়। বুর্জোয়া শাসনের বিকাশ ও শক্তিবৃদ্ধি অপরিহার্যরূপে ঘটায় শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশ, সংখ্যার দিক দিয়ে ও সংহতির দিক দিয়ে তার ক্রমবৃদ্ধি। এভাবে বুর্জোয়াশ্রেণী তৈরী করে তার নিজের কবর-রচনাকারী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যতই বিকাশ লাভ করতে থাকে, ততই তার অন্তঃস্থলে নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজের শক্তিসমূহ পরিপক্ক হতে থাকে। শ্রেণী, শ্রেণীসমূহের সংগ্রাম, শ্রেণী-স্বার্থের দ্বন্দ্ব – এটাই পুঁজিবাদী সমাজের জীবন গঠন করে।

কিন্তু শ্রেণী কি ? লেনিন নিম্নোক্তভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ঃ

" সাধারণভাবে শ্রেণী বলতে কি বোঝায় ? এটা হলো তা-ই যা সমাজের এক অংশকে অপর অংশের শ্রম আত্মসাৎ করার অনুমোদন দেয়। যদি সমাজের এক অংশ সমস্ত জমির অধিকারী হয়,

তাহলে আমরা পাই জমিদার ও কৃষকদের শ্রেণী। যদি সমাজের এক অংশ ফ্যাক্টরী, শেয়ার ও পুঁজির মালিক হয়, অন্যদিকে অপর অংশ এসব ফ্যাক্টরীতে খেটে মরে, তাহলে আমরা পাই পুঁজিপতি শ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণী।" ["যুব লীগের কর্তব্য"–রুশ যুব কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় নিখিল-রুশ কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতা, সঃ রঃ, ৩১শ খন্ড, ইং সং, মস্কো, ১৯৬৬, পৃঃ ২৯২]

কিন্তু সেই গূঢ় রহস্যটি কি যা সমাজের একাংশের পক্ষে ঐ সমাজের অপরাংশের শ্রম আত্মসাৎ করা সম্ভব করে তোলে ? আর "ফলায় না, অথচ ফল খায়"– এরূপ এক দল লোকের আবির্ভাব ঘটার কারণগুলোই-বা কি ?

এটা বুঝতে গেলে, খুঁজে দেখা দরকার সমাজে **উৎপাদন কিভাবে সংগঠিত হয়।** উৎপাদনের অর্থ কী তা প্রতিটি শ্রমিক, প্রতিটি শ্রমজীবী কৃষক খুব ভাল করেই জানে। বেঁচে থাকতে হলে মানুষের অবশ্যই থাকতে হবে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়। প্রত্যেক শ্রমজীবীই খুব ভালভাবে জানে ঘর-বাড়ী তৈরী করতে, জমি চাষ করতে, রুটি তৈরী করতে, মানুষের চাহিদা পূরণার্থে জিনিসপত্র তৈরী করার জন্য কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে কি পরিমাণ শ্রম দরকার – কারণ প্রত্যেক শ্রমিক, প্রত্যেক শ্রমজীবী চাষী নিজেই এই শ্রমে অংশ নেয়।

শ্রমের বদৌলতে, প্রকৃতি-জগতে প্রাপ্ত বস্তুসামগ্রীকে মানুষ পরিবর্তন করে, সেগুলোকে নিজেদের ব্যবহারের জন্যে ও নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্যে উপযোগী করে তোলে। মাটির গর্ভে মানুষ পায় কয়লা, আকরিক লৌহ, তেল। নিজেদের শ্রম দ্বারা তারা এসব প্রয়োজনীয় বস্তু আহরণ করে এবং সেগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠে নিয়ে আসে। এখানে এই আকরিক লৌহ গলিয়ে শোধিত করা হয় এবং লোহায় পরিণত করা হয়। পর্যায়ক্রমে এই লোহা ইঞ্জিন থেকে পকেট ছুরি বা সুঁই পর্যন্ত – সর্বাধিক বিভিন্নমুখী জিনিসে রূপান্তরিত করা হয়।

প্রত্যেকে জানেন, মানুষ একা কাজ করে না, বরং একত্রে মিলেই করে। একটি কয়লা খনি, কারখানা বা ফ্যাক্টরী নিয়ে একজন মানুষ নিজে থেকে একা কী-ই বা করতে পারে ? আর গোড়ার কথা হলো, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া এরূপ কর্মোদ্যোগ কি গৃহীত হতে পারে ? যাই হোক, কেবল বড় বড় কর্ম-পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অচিন্ত্যনীয় নয়। এমন-কি এক খণ্ড ক্ষুদ্র জমিতে কর্মরত একজন বিশেষ কৃষক তার বৃদ্ধ ঘোটকী নিয়ে চাষকার্য চালিয়ে যেতে পারে না যদি-না অন্য কিছু লোক তাকে বহু সংখ্যক প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগান দেয়। যে হস্তশিল্পী ও কারিকর নিজে নিজেই কাজ করে, তারাও হাতিয়ারপাতি ও কাঁচামাল ছাড়া এক কদম এগুতে পারে না, যেগুলো হলো অন্যান্য মানুষেরই শ্রমের ফসল।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সমাজেই উৎপাদন সাধিত হয়। উৎপাদন হলো সামাজিক, কিন্তু সংগঠিত হয় **বিভিন্ন পন্থায়।**

উৎপাদন করতে হলে, জমি, ফ্যাক্টরী-ঘর, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল দরকার। এসব কিছুকে বলা হয় উৎপাদন-যন্ত্র (means of production)। কিন্তু **মানবিক শ্রম** ছাড়া, জীবন্ত শ্রমশক্তি ছাড়া উৎপাদন-যন্ত্র হচ্ছে মৃত। উৎপাদন-যন্ত্রের ক্ষেত্রে যখন শ্রমশক্তি প্রযুক্ত হয়, একমাত্র তখনই উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। **মানব সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান ও তাৎপর্য নির্ধারিত হয় উৎপাদন-যন্ত্রের সাথে এসব প্রত্যেক শ্রেণীর সম্পর্কের দ্বারা।** উদাহরণস্বরূপ, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রধান উৎপাদন-যন্ত্র জমির মালিক হলো জমিদার। জমির উপর মালিকানার বদৌলতে জমিদার কৃষকদের শোষণ করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সকল প্রতিষ্ঠান, সকল উৎপাদন-যন্ত্র থাকে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে। শ্রমিকশ্রেণীর কোন উৎপাদন-যন্ত্র নেই। সর্বহারাশ্রেণীর উপর বুর্জোয়াশ্রেণীর শোষণের এটাই হচ্ছে ভিত্তি।

শ্রেণী ও শ্রেণী-বৈষম্যের স্রষ্টা পুঁজিবাদ নয়। পুঁজিবাদের পূর্বে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় আর এমন-কি তারও পূর্বে, শ্রেণী বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদ পুরাতন শ্রেণীর বদলে নতুন শ্রেণীসমূহকে অভিষিক্ত করে। পুঁজিবাদ নতুন পদ্ধতির শ্রেণী-নিপীড়ন ও শ্রেণী-সংগ্রাম প্রবর্তন করে।

"শ্রেণী হলো মানুষের বিরাট বিরাট দল, যারা সামাজিক উৎপাদনের ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত ব্যবস্থায় তাদের অবস্থান দ্বারা, উৎপাদন-যন্ত্রের সাথে তাদের সম্পর্ক (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আইন মোতাবেক নির্ধারিত ও সূত্রবদ্ধ) দ্বারা, সামাজিক শ্রম সংগঠনে তাদের ভূমিকা দ্বারা, এবং ফলতঃ, যে সামাজিক সম্পদের তারা বিলিবন্দেজ করে তার মাত্রা ও তা অর্জন করার পদ্ধতি দ্বারা পরস্পর থেকে ভিন্ন। শ্রেণী হলো মানুষের বিভিন্ন দল যাদের একাংশ – নির্দিষ্ট সামাজিক অর্থনীতিগত পদ্ধতিতে তারা যে বিভিন্ন অবস্থান দখল করে সেই কারণে – অপরাংশের শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে।" [লেনিন, "এক মহান সূচনা", ২৯শ খণ্ড, সঃ রঃ, মস্কো, ১৯৬৬, পৃঃ ৪২১]

উৎপাদিকা–শক্তি ও উৎপাদন–সম্পর্ক

মানব সমাজের বিকাশের নিয়মাবলী মার্কসবাদই সর্বপ্রথম উদ্‌ঘাটিত করে। মার্কস দেখিয়ে দেন যে, সমাজ বিকাশের ভিত্তিমূলে রয়েছে অর্থনীতি আর সমাজ বিকাশের উৎসমূল হলো শ্রেণী-সংগ্রাম। নিপীড়ক শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের সংগ্রাম – এটাই হলো ইতিহাসের মৌলিক চালিকাশক্তি।

আমরা পূর্বে দেখেছি, কোন নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তারা যে অবস্থান গ্রহণ করে সে অনুসারেই শ্রেণীসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমরা এটাও দেখেছি, কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী কর্তৃক অধিকৃত অবস্থান নির্ধারিত হয় উৎপাদন-যন্ত্রের সাথে উক্ত শ্রেণীর সম্পর্কের দ্বারা। উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়ই মানুষের সাথে মানুষের নির্দিষ্ট সম্পর্কসমূহ স্থাপিত হয়।

আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি যে, সামাজিক উৎপাদন বিভিন্নভাবে সংগঠিত হয়। পুঁজিবাদী দেশসমূহে রয়েছে এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থা, সোভিয়েত ইউনিয়নে রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী দেশসমূহে পুঁজিপতিদের জন্য কাজ করতে সর্বহারাশ্রেণী বাধ্য, বশ্যতা ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের তারা অধীন। সেখানে কল-কারখানা, ফ্যাক্টরী, রেলপথ, জমি, ব্যাংক – সমস্ত কিছুরই মালিক হলো বুর্জোয়াশ্রেণী। বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে রয়েছে সকল উৎপাদন-যন্ত্র। এই ঘটনা বুর্জোয়াদের পক্ষে সম্ভব করে তোলে শ্রমিকদের জীবনী রস শুষে নিতে, শ্রমিকশ্রেণীকে নিপীড়ন ও দাসত্বে আবদ্ধ করতে। বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যেকার, পুঁজিবাদী নিপীড়ক ও শোষিত শ্রমিকের মধ্যেকার সম্পর্ক যেকোন পুঁজিবাদী দেশের গোটা ব্যবস্থার উপর এক চূড়ান্ত ছাপ এঁকে দেয়। বিপরীত পক্ষে, সোভিয়েত ইউনিয়নে কল-কারখানা, ফ্যাক্টরী ও গোটা রাষ্ট্রে সর্বহারাশ্রেণী শাসকের অবস্থান দখল করে রয়েছে।

উৎপাদনের গতিধারায়, মানুষের সাথে মানুষের, সমগ্রভাবে শ্রেণীর সাথে শ্রেণীর নির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সম্পর্ককে আমরা **উৎপাদন-সম্পর্ক** বলে অভিহিত করি। শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যেকার সম্পর্ককে উৎপাদন-সম্পর্কের একটি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায়। প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থা, প্রতিটি সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতি বিশিষ্টতা লাভ করে তার মধ্যে আধিপত্যশীল উৎপাদন-সম্পর্ক দ্বারা। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদ্যমান উৎপাদন-সম্পর্ক পুঁজিবাদী দেশসমূহের উৎপাদন-সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন।

সমাজের উৎপাদন-সম্পর্ক কি দ্বারা নির্ধারিত হয়, কিসের উপর তা নির্ভর করে ? মার্কস দেখিয়ে দিয়েছেন যে, **সমাজের বস্তুগত উৎপাদিকা শক্তির** বিকাশের স্তরের উপর উৎপাদন

সম্পর্ক নির্ভর করে। বিকাশের বিভিন্ন স্তরে কোন নির্দিষ্ট সমাজে বিভিন্ন মাত্রার উৎপাদিকা-শক্তি পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে, জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিরাট বিরাট কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরীতেই প্রধানতঃ উৎপাদন-কর্ম সংঘটিত হয়। এমন-কি যে কৃষি ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে সুপ্রাচীন কাঠের লাঙ্গলের ছিল রাজত্ব, সেখানেও আরো বৃহত্তর পরিধিতে জটিল যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু অতীত কালে মানব-শ্রম ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সে সময়ে আধুনিক জটিল যন্ত্রপাতির কথা এমন-কি কল্পনাও করা যেত না। অতি প্রাচীন যুগে এক খণ্ড পাথর আর একটি লাঠিই ছিল মানুষের একমাত্র পরিচিত হাতিয়ার। তারপর বহু হাজার-লাখ বছর পার হয়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে মানুষ আবিষ্কার করেছে নতুন থেকে নতুনতর শ্রমের পদ্ধতি, শিখেছে নতুন নতুন হাতিয়ার তৈরী করতে। হাতিয়ার আর যন্ত্রপাতি মানুষের সেবা ও সহায়তা করে। এগুলোর সাহায্যে মানুষের শ্রমশক্তি বিপুল পরিমেয় জিনিসপত্র উৎপাদন করে, যা পূর্বে কল্পনাও করা যেতো না। অবশ্য, উৎপাদন-যন্ত্রের পরিবর্তনের সাথে সাথে, নতুন যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের সাথে সাথে মানুষের খোদ শ্রমেরই পরিবর্তন ঘটে। বিগত দেড় শতাব্দী ধরে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ছিল বিশেষভাবে দ্রুত।

প্রায় দেড়শত বছর আগেও বাষ্পীয় ইঞ্জিন সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানতো না ; প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বেই কেবল বিদ্যুতের ব্যবহার শুরু হয়। কেবল গত এক শত বছরেই রেলপথের বিকাশ সাধিত হয়েছে। মোটর গাড়ী মাত্র গত কয়েক দশকেই প্রচলিত হয়ে উঠেছে, ট্রাক্টর হয়েছে আরো সম্প্রতি। উড়োজাহাজের প্রথম আবির্ভাবের কথা মানুষ এখনও খুব ভাল করে স্মরণ করতে পারে – এটা হলো মহাযুদ্ধের (প্রথম মহাযুদ্ধ– অনুঃ) মাত্র কিছুদিন আগের কথা। রেডিওর অগ্রগতি ঘটেছে কেবল মহাযুদ্ধের সময় থেকে।

কিন্তু মানুষের হাতিয়ার-পাতি – তার নিষ্প্রাণ সাহায্যকারীই কেবল উন্নত ও বিকশিত হয়নি, একই সাথে সমাজের সজীব [living] উৎপাদিকা-শক্তিও বিকশিত হয়েছে। **সবচেয়ে বড় উৎপাদিকা-শক্তি** হলো খোদ শ্রমজীবী জনসাধারণ নিজেরাই, খোদ মানুষ নিজেই। যন্ত্রপাতির অগ্রগতি আর কলা-কৌশলের উন্নতির সাথে সাথে মানুষের ক্ষমতা, দক্ষতা ও জ্ঞানও বৃদ্ধি পায়। উড়োজাহাজ না থাকলে বিমান চালকও থাকতে পারে না, মোটর-যানের আবির্ভাবের পূর্বে কোন মোটর-চালকের থাকার কথা নয়। জটিল যন্ত্রপাতির সহায়তা নিয়ে মানুষ কেবল কাজ করতেই শিখে না, প্রথমতঃ সেগুলো সৃষ্টি করতে, সেগুলো নির্মাণ করতেও সে শিখে।

উৎপাদিকা-শক্তির বিকাশের সাথে সাথে উৎপাদন-সম্পর্কও বদলে যায়। মার্কস বলেছেন, বস্তুগত উৎপাদন-যন্ত্রের পরিবর্তন ও বিকাশের সাথে সাথে, উৎপাদিকা-শক্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্কেরও যুগপৎ পরিবর্তন ঘটে।

অধিকন্তু, এক বিশেষ রূপের শ্রেণী-আধিপত্য থেকে অন্য রূপের শ্রেণী-আধিপত্যে উত্তরণ অবিচ্ছেদ্যভাবে সমাজের উৎপাদিকা-শক্তিসমূহের বিকাশের সাথে গ্রথিত। উদাহরণস্বরূপ, পুঁজিবাদের বিকাশ বৃহদায়তন-উৎপাদনের বিস্তৃতি ও যন্ত্রের আবির্ভাবের সাথে যুক্ত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, আদিম যুগে উৎপাদিকা-শক্তির বিকাশের অবস্থা ছিল খুবই নিম্ন পর্যায়ে। শ্রমের হাতিয়ার-পত্র তখনও বিকশিত হয়ে ওঠেনি। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষ কেবল অপ্রতুলভাবেই লড়াই করতে পারতো। শিকারজাত বস্তুগুলোর উপর নির্ভর করেই আদিম গোত্রগুলি কেবলমাত্র কোন প্রকারে নিজেদের ক্ষুণ্নিবৃত্তি সাধন করতে পারতো। কোন ধরনের মজুদই থাকতো না। সে কারণে কোনরূপ শ্রেণীভেদ ব্যবস্থা সেখানে থাকতে পারতো না, যেখানে একজন অন্যের শ্রমের বদৌলতে জীবন ধারণ করে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমাজের বিভক্তি দেখা দেয় উৎপাদিকা-শক্তির বিকাশের এক উচ্চতর স্তরে।

কোন এক নির্দিষ্ট মুহূর্ত পর্যন্ত উৎপাদন-সম্পর্ক বস্তুগত উৎপাদিকা-শক্তির প্রাণ সঞ্চার করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুঁজিবাদ মৌলিকভাবেই পুরাতন শ্রম-পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটায়, বৃহদায়তন-উৎপাদনের আবির্ভাব ও বিকাশ সাধন করে। কিন্তু তাদের বিকাশের এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে যে উৎপাদন-সম্পর্কের অভ্যন্তরে উৎপাদিকা-শক্তিসমূহ বিকাশ লাভ করছিল সেই উৎপাদন-সম্পর্ককে সেগুলো অস্বীকার করতে শুরু করে।

"উৎপাদিকা-শক্তিগুলোর বিকাশের উপযুক্ত রূপ থেকে এই সম্পর্কগুলো তাদের শৃংখলে পরিণত হয়। তখনই আসে সমাজ-বিপ্লবের আমল।" [মার্কস, "ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি"-র ভূমিকা, পৃঃ ১১, চার্লস এইচ্ কার এণ্ড কোং, শিকাগো, ১৯০৮]

বর্তমানকালে আমরা এরূপ এক **সমাজ-বিপ্লবের আমলেই** বাস করছি। পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন-সম্পর্কসমূহ উৎপাদিকা-শক্তিসমূহের আরো অধিক বিকাশে বাধাস্বরূপ হয়ে শৃংখলে পরিণত হয়েছে। পুঁজির ক্ষমতা উচ্ছেদ করে, সর্বহারাশ্রেণী এসব শৃংখল ভেঙ্গে ফেলে। সর্বহারা বিপ্লব পুঁজিবাদের শৃংখল থেকে উৎপাদিকা-শক্তিসমূহকে মুক্ত করে এবং তাদের বিকাশের জন্যে সীমাহীন সুযোগ সৃষ্টি করে।

রাজনৈতিক অর্থনীতি অধ্যয়নের পরিধি

শ্রমজীবী জনগণের নির্মম শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ইতিহাসের মঞ্চ থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নেবে না। উপনিবেশ সমূহের কৃষক ও শ্রমজীবী মৌলিক জনগণের সাথে মৈত্রীর উপর নির্ভর করে, শ্রমিকশ্রেণীর বীরত্বপূর্ণ **বিপ্লবী সংগ্রামই** কেবল **পুঁজিবাদের উচ্ছেদ** ও বিশ্বব্যাপী **সমাজতন্ত্রের বিজয়** নিয়ে আসতে পারে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কিভাবে গঠিত, কিভাবে সংগঠিত হয় পুঁজিবাদী যন্ত্রটি যার মাধ্যমে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ব্যাপক শ্রমজীবীদের দাসত্বে আবদ্ধ করে ? গোটা বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে যে সংগ্রাম চলছে তাতে সক্রিয় ও সচেতন অংশগ্রহণ করতে হলে তা জানা দরকার।

পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশ সর্বহারা বিপ্লবের বিজয়ের দিকে, নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিজয়ের দিকে চালিত হয়। বহু বছর পূর্বেই মার্কস এটা প্রতিষ্ঠিত করে যান। মার্কস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির এক সামগ্রিক অধ্যয়নের মাধ্যমে, পুঁজিবাদের বিকাশ ও অবক্ষয়ের নিয়মাবলী আবিষ্কার করার মাধ্যমে।

এ থেকে সুস্পষ্ট, রাজনৈতিক অর্থনীতি কী **বিপুল গুরুত্বই**-না বহন করে, যা লেনিনের ভাষায় হলো, "সামাজিক উৎপাদনের বিকাশমান ঐতিহাসিক পদ্ধতিসমূহের বিজ্ঞান"। মার্কস ও লেনিনের সমস্ত শিক্ষাবলীতে এ বিজ্ঞান অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

পুঁজি গ্রন্থের ভূমিকায়, মার্কস বলেছেন,

"এই রচনার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আধুনিক সমাজের (অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজের–লিয়নতিয়েভ) গতির অর্থনৈতিক নিয়ম উদ্ঘাটিত করা।"

সর্বহারাশ্রেণীকে তার মুক্তির সংগ্রামে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের নিয়মাবলী আবিষ্কার করার কাজে মার্কস নিজেকে নিয়োজিত করেন।

লেনিন বলেছেন,

"একটি নির্দিষ্ট, ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত সমাজের উৎপাদন-সম্পর্কসমূহকে তাদের উৎপত্তি, বিকাশ, এবং তাদের অবক্ষয়ের দিক থেকে অধ্যয়ন – এটাই হচ্ছে মার্কস-এর অর্থনৈতিক শিক্ষাবলীর মর্মবস্তু।"

বুর্জোয়াশ্রেণীর সেবাদাসরা "প্রমাণ করার" চেষ্টা করে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী সম্পর্কসমূহ হচ্ছে চিরন্তন আর অপরিবর্তনীয়। তাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তারা শ্রমিকদের প্রমাণ-প্রয়োগে এটাই বুঝাতে চায় যে, পুঁজিবাদের উচ্ছেদের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তারা বলতে চায়, পুঁজিবাদের পতন মানে মানব জাতির পতন। তাদের কথা অনুযায়ী, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তিতেই কেবল মানব জাতি টিকে থাকতে পারে। এ থেকে তারা পুঁজিবাদের সকল মৌলিক বিধি-বিধানকে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অতি গুরুত্বপূর্ণ সকল সামাজিক সম্পর্ককে শাশ্বত বিধি-বিধান হিসেবে, অপরিবর্তনীয় সম্পর্ক হিসেবে তুলে ধরতে চায়। চিরকাল এরূপই ছিল, চিরকাল এরূপই থাকবে – বুর্জোয়াশ্রেণীর মাইনে-খাটা ভৃত্যরা একথাই বলে।

মার্কস ও লেনিনের রাজনৈতিক অর্থনীতি প্রতিক্রিয়াশীলদের এই স্বপ্নসৌধ কোন উপায়েই দাঁড়িয়ে থাকতে দেয় না। মার্কসবাদী–লেনিনবাদী তত্ত্ব দেখিয়ে দেয় কিভাবে পূর্বতন সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ থেকে পুঁজিবাদী সম্পর্কসমূহ উদ্ভূত হয়, কিভাবে সেগুলো বিকাশ লাভ করে, আর কিভাবেই-বা পুঁজিবাদের নিয়ত তীব্র হয়ে-ওঠা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহ অবশ্যম্ভাবী রূপে ডেকে আনে তার ধ্বংস, চালিত করে বুর্জোয়াশ্রেণীর কবর রচনাকারী সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের দিকে ।

মানব জাতির ইতিহাস আমাদের একথা বলে যে, পুঁজিবাদ সম্পর্কে কিছু না জেনেই মানুষ এই পৃথিবীতে হাজার হাজার বছর বসবাস করে এসেছে। এর অর্থ হলো, রাজনৈতিক অর্থনীতি পুঁজিবাদী উৎপাদনের যে নিয়মাবলীকে উদ্ঘাটন করে দিয়েছে তা চিরন্তনও নয়, অপরিবর্তনীয় নয়। বিপরীত পক্ষে, এসব নিয়মাবলী পুঁজিবাদের আবির্ভাবের সাথে সাথে একত্রেই আবির্ভূত হয় এবং যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এগুলোর জন্ম দিয়েছিল সেই ব্যবস্থার ধ্বংসের সাথে সাথে সেগুলোও তিরোহিত হয়ে যায়।

তদ্সঙ্গে, এর আরও অর্থ হলো, রাজনৈতিক অর্থনীতি কেবলমাত্র পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা অধ্যয়নের মধ্যেই নিজেকে আটকে রাখতে পারে না, বরং সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যুগগুলো তাকে অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতি দমনমূলক ও শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার নিভৃততম কন্দরে গভীরভাবে প্রবেশ করে। তা শ্রেণী-সম্পর্কের সত্যিকার প্রকৃতিকে উদ্ঘাটিত করে দেয়, যা বুর্জোয়াশ্রেণীর মাইনে-খাটা বিজ্ঞ ভৃত্যরা কুয়াশাচ্ছন্ন করে রাখতে চায়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের উৎপাদন-সম্পর্ক সমূহকে তাদের বিকাশ, তাদের গতির দিক থেকেই অধ্যয়ন করে। আমরা ইতোপূর্বেই দেখেছি, মানব সমাজের উৎপাদিকা-শক্তিসমূহ সুনির্দিষ্ট উৎপাদন-সম্পর্কের রূপরেখার মধ্যেই বিকাশ লাভ করে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ এমন একটা বিন্দুতে পৌঁছায় যেখানে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে উৎপাদিকা-শক্তিসমূহ যে উৎপাদন-সম্পর্কের রূপরেখার মধ্যে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করছিল, সেই উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বারা আরোপিত সীমারেখাকে তা ছাড়িয়ে যায়। পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদিকা-শক্তিসমূহ ও তার উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তখন হয়ে ওঠে অধিক মাত্রায় তীব্র ও গভীর। এই দ্বন্দ্বসমূহ অভিব্যক্তি লাভ করে শোষণমূলক ব্যবস্থার রক্ষক বুর্জোয়াশ্রেণী আর মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর সকল শোষণের অবসানের জন্যে লড়াইরত সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যেকার শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে।

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে পুঁজিবাদের বিকাশমান দ্বন্দ্বসমূহের ওপর, যেগুলো তাকে তার ধ্বংসের দিকে আর সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের দিকে চালিত করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিকা-শক্তিসমূহ ও উৎপাদন-সম্পর্কসমূহের মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহ সামাজিক বিপ্লব রূপায়িত করে, যে দ্বন্দ্বগুলো শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যেই অভিব্যক্তি লাভ করে। পুঁজিবাদী সমাজ যতই বিকাশ লাভ করে ততই এসব দ্বন্দ্ব অনিবার্যরূপে আরো তীব্র হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ

পুঁজিবাদের স্থানেই আসে সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজের উৎপাদন-সম্পর্কসমূহ রূপ-কাঠামোগত দিক দিয়েই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উৎপাদন-সম্পর্কসমূহ থেকে সামগ্রিকভাবে ভিন্ন। এই নতুন সম্পর্কসমূহকে রাজনৈতিক অর্থনীতি কি অবশ্যই অধ্যয়ন করবে ? স্বভাবতই একে তা করতে হবে। লেনিন দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাজনৈতিক অর্থনীতি হলো "সামাজিক-উৎপাদনের বিকাশমান ঐতিহাসিক পদ্ধতিসমূহের বিজ্ঞান"।

মার্কস-এর ঘনিষ্ঠতম সহযোদ্ধা এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন ঃ

"ব্যাপকতম অর্থে, রাজনৈতিক অর্থনীতি হলো মানব সমাজের জীবন-ধারণার্থে প্রয়োজনীয় বস্তুগত সামগ্রীসমূহের উৎপাদন ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী বিধি-বিধানের বিজ্ঞান।" ["এইচ, ই, ডুরিং- এর বিজ্ঞানে বিপ্লব", পৃঃ ১৩৭, মস্কো, ১৯৩৪]

ফলতঃ, কেবলমাত্র পুঁজিবাদই নয়, বরং যেসব যুগ তার পূর্বে এসেছিল, এবং যে সমাজ-ব্যবস্থা পুঁজিবাদের স্থলাভিষিক্ত হতে আসছে, সেগুলোও রাজনৈতিক অর্থনীতিকে অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে।

এর অর্থ কি এই যে, সামাজিক-উৎপাদনের সকল ব্যবস্থায় একই নিয়মাবলী প্রচলিত থাকে ? না, তা মোটেই নয়। বিপরীতপক্ষে সামাজিক উৎপাদনের প্রত্যেক ব্যবস্থারই রয়েছে তার নিজস্ব বিশেষ নিয়মাবলী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যেসব নিয়ম প্রচলিত থাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেগুলো তাদের কার্যকারিতা ও তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে।

বর্তমানে যখন ভূমণ্ডলের এক-ষষ্ঠাংশে সাফল্যের সাথে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা হচ্ছে তখন সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক রূপ-কাঠামো এবং পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের আমলকে অধ্যয়ন করারও সুবিপুল বাস্তব গুরুত্ব সুস্পষ্ট।

আমাদের কাছে, তত্ত্ব এক অন্ধ মতবাদ নয় (অর্থাৎ, নিষ্প্রাণ এক ধর্মীয় মতবাদ নয়), বরং তা হলো কর্মের পথ-নির্দেশক। বিপ্লবী সংগ্রামে তত্ত্বের এক সুবিপুল গুরুত্ব রয়েছে। লেনিন অসংখ্যবার গুরুত্ব আরোপ করেছেন – বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া একটি নিপীড়িত শ্রেণীর, ইতিহাসের সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণীর বিশ্ব-ব্যাপ্ত সর্ববৃহৎ মুক্তি আন্দোলন অসম্ভব।

কমরেড স্তালিন বলেন,

"আপনারা জানেন যে, একটি তত্ত্ব যখন সাচ্চা তত্ত্ব হয়, তখন বাস্তব সংগ্রামরত শ্রমিকদের তা প্রদান করে দিশা নির্ণয়ের ক্ষমতা, উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা, তাদের কর্মের ক্ষেত্রে আস্থা, আমাদের লক্ষ্যের সাফল্য অর্জনে বিশ্বাস। আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণের লক্ষ্য সাধনের জন্যে এই সবকিছুরই রয়েছে অপরিমেয় গুরুত্ব এবং অবশ্যই তা থাকবে।" ["সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষি নীতির সমস্যা সম্পর্কে," রচনাবলী, ইং সং, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১৪৮]

রাজনৈতিক অর্থনীতি কেবল পুঁজিবাদের বিকাশ ও অবক্ষয়কে নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলী সম্পর্কেই নয়, বরং পুঁজিবাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে উত্থিত নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলী সম্পর্কেও এক স্পষ্ট ও যথাযথ উপলব্ধি দান করবে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক অর্থনীতি কেবল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী বিশ্বের প্রতিকৃতির উপরই নয়, বরং সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্মাণাধীন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের প্রতিকৃতির উপরও উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি নিক্ষেপ করছে।

এটা স্পষ্ট যে, কেবলমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অধ্যয়নের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে রাজনৈতিক অর্থনীতিকে কৃত্রিমভাবে সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টা সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণের শত্রুদের হাতকেই শক্তিশালী করে। এ ধরনের প্রচেষ্টা অর্থনৈতিক বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুবিশাল অভিজ্ঞতার তত্ত্বগত উপলব্ধিতে বাধা দান করছে, যে অভিজ্ঞতা হলো গোটা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর জন্যে অতীব গুরুত্বের বিষয়। এ ধরনের প্রচেষ্টা অনুশীলন থেকে পিছিয়ে থাকা তত্ত্বের দিকে, অনুশীলন থেকে তত্ত্বকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার দিকে চালিত করে, যা আমাদের শত্রুদের হাতই শক্তিশালী করে। মার্কসবাদের ভাববাদী সংশোধনের অপচেষ্টায় লিপ্ত, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসির অন্যতম তাত্ত্বিক হিল্‌ফারডিঙের নেতৃত্বে বহু অর্থনীতিবিদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিয়ে কেবল বিচার-বিবেচনা করে এমন এক বিজ্ঞান হিসেবেই রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা পোষণ করেন। লেনিন এসব ধারণার তীব্র বিরুদ্ধাচরণ করেন।

দুই বিশ্ব – পুঁজিবাদী বিশ্ব আর সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব – এটাই বর্তমানে রাজনৈতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুই বিশ্ব, দুই ব্যবস্থা

পুঁজিবাদী দেশসমূহে ঘটছে নজিরবিহীন ধ্বংস আর ভাঙন। ১৯২৯ সালের শরৎকাল থেকে অদৃষ্টপূর্ব গভীরতা ও প্রবলতা সম্পন্ন এক সংকট এসব দেশকে পর্যুদস্ত করছে। এই সংকট তার প্রচণ্ডতার দিক থেকে, দীর্ঘস্থায়িত্বপূর্ণ প্রকৃতির দিক থেকে আর শ্রমজীবী জনগণের জন্যে যে দুর্দশা তা বয়ে এনেছে সেদিক থেকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার নিকট জানা পূর্বের যেকোন সংকটকে ছাড়িয়ে গেছে।

শিল্প ও কৃষি – উভয়টির ক্ষেত্রেই সংকট প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে। বাজারের অভাবের কারণে, ক্রমবর্ধমান মাত্রায় উৎপাদন হ্রাস করে দেয়া হয়েছে, কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরী বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে কর্মচ্যুত করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে চাষাবাদের জায়গা হ্রাস করা হয়েছে, আর লক্ষ লক্ষ চাষীকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। বিপুল পরিমাণ উৎপাদিত সামগ্রী শুধু শুধুই বিনষ্ট করা হয়েছে ঃ ব্রাজিলে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয়েছে কফি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেল-ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে গম, নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে দুধ, সাগরে ফেলে দেয়া হয়েছে মাছ, মেরে ফেলা হয়েছে গৃহপালিত পশু, বিনষ্ট করা হয়েছে ক্ষেতের ফসল – এই সব কিছুই করা হয়েছে বাজারে সরবরাহকৃত খাদ্য-সামগ্রীর পরিমাণ কমিয়ে ফেলার জন্যে। বর্তমানে অতি গভীর সংকট যখন ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে, তখন শ্রমিকদের ওপর শোষণের মাত্রা তীব্রতর করে, চাষীদের ওপর দস্যুবৃত্তি বৃদ্ধি করে আর উপনিবেশগুলোর ওপর আরো অধিক লুঠপাট চালিয়ে, পুঁজিবাদ তার শিল্পের পরিস্থিতি স্বচ্ছন্দ করায় কিছু পরিমাণে সফল হয়েছে। তা সত্ত্বেও, যেহেতু পুঁজিবাদ অবক্ষয় ও ভাঙনের এক আমলে বাস করছে, সেহেতু পুঁজিবাদী দেশসমূহে কোন যথার্থ অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কথাবার্তা বলা যেতে পারে না। ব্যাপক শ্রমিকদের ওপর শোষণ বৃদ্ধি করে, এক নয়া সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আগ্রাসী হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত করে, বুর্জোয়াশ্রেণী সংকটের হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজছে। নিষ্ঠুর সন্ত্রাসের মাধ্যমে শ্রমিকদের দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টায় বুর্জোয়াশ্রেণী আরো অধিক মাত্রায় ফ্যাসিস্ট পদ্ধতির শাসনের দিকে ঝুঁকছে।

বিশ্ব পুঁজিবাদের এই সর্বাপেক্ষা গভীর সংকটের বছরগুলোতে, চার বছর সময়ের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তার প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে, সোভিয়েত ইউনিয়ন অধিকতর গুরুভার দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কর্তব্যকর্ম – শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কর্তব্যকর্ম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বছরগুলোতেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্ স্থাপন করেছে। সমাজতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি – সমাজতান্ত্রিক বৃহদায়তন শিল্প – বিপুলভাবে বৃদ্ধি লাভ করেছে। ডজন ডজন এমন সব নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেগুলোর অস্তিত্ব রাশিয়ায় এর পূর্বে আর কখনোই ছিল না। বিশেষতঃ ভারী শিল্প দ্রুত উন্নতি সাধন করেছে, যা হলো গোটা জাতীয় অর্থনীতির মেরুদন্ড।

প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আমলে, সমাজতান্ত্রিক নীতিমালার ওপর কৃষিকে পুনর্গঠিত করার সুবিশাল কর্তব্যকর্মও সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পন্ন করেছে। যে নয়া যৌথ-খামার ব্যবস্থা (Kolkhozes) লক্ষ-কোটি কৃষকের জন্যে সচ্ছল ও সংস্কৃতিবান জীবনের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে, সেই ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে বিজয়মণ্ডিত হয়েছে। মৌলিক কৃষক জনগণ তথা যৌথ-খামার চাষীরা পরিণত হয়েছে সোভিয়েত রাষ্ট্রশক্তির দৃঢ় সমর্থকে, আর পুঁজিবাদের সর্বশেষ দুর্গ – 'কুলাক'দের (ধনী তথা শোষক কৃষক) – চরমভাবে পরাজিত করা হয়েছে।

শ্রমিকশ্রেণী বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ করেছে। ব্যাপক শ্রমিক সাধারণের জীবন ধারণের মান উন্নত হয়েছে। এক অগ্রবর্তী সংস্কৃতির ভূমিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন রূপান্তরিত হয়েছে। সর্বজনীন শিক্ষা চালু করা হয়েছে আর লক্ষ-কোটি লোকের নিরক্ষরতার অবসান ঘটান হয়েছে। লক্ষ লক্ষ শিশু আর প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি নানা ধরনের স্কুলে পড়াশোনা করছে। সমাজতান্ত্রিক শ্রম-শৃংখলা জ্ঞান রপ্ত করার ক্ষেত্রে বিপুল সাফল্য অর্জিত হয়েছে। সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার লক্ষ লক্ষ কারিগরদের শক্তি ও কর্মতৎপরতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

"প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় শুভ ফলাফলের কারণে, মানব জাতির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা সমগ্র বিশ্বের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের সামনে প্রদর্শিত হয়েছে।" সোভিয়েত ইউনিয়নে "শ্রমিক আর যৌথ–খামার চাষীরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুরোপুরি আস্থাবান হয়ে উঠেছেন, এবং নিয়ত বৃদ্ধিমান বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারণের মান এককভাবেই নির্ভর করছে তাদের ব্যয়িত শ্রমের গুণ ও পরিমাণের ওপর। সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমজীবীদের জন্যে বেকারত্ব, দারিদ্র্য আর অনাহারের অভিশাপ চিরতরে দূর হয়েছে। প্রতিটি শ্রমিক আর যৌথ-খামার চাষী তাদের ভবিষ্যতের দিকে আস্থা ও আনন্দের সাথে তাকায়, আর জ্ঞান ও সংস্কৃতির জন্যে তাদের নিয়ত বৃদ্ধিমান দাবিকে তুলে ধরে।" [সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তাবলী, পৃঃ ৯, মস্কো, ১৯৩৪]

একই সময়ে, পুঁজি শাসিত দেশগুলোতে ব্যাপক শ্রমজীবী জনসাধারণ অবর্ণনীয় আর নজিরবিহীন দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। সংকটের প্রতি বছরেই বেকার মানুষের বাহিনী বাড়তেই থাকে যে-পর্যন্ত-না তা পাঁচ কোটি লোকের বিস্ময়কর সংখ্যায় পৌঁচেছে। এর অর্থ এই যে, বর্তমান সংকট এমন সংখ্যক শ্রমিককে বেকারী ও ক্ষুধার সর্বপ্রকার পীড়নের মধ্যে ফেলেছে যার সংখ্যা তাদের পরিবারগুলোর সদস্যদের সহ সর্ববৃহৎ পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোক সংখ্যাকেও অতিক্রম করে যায়। বর্তমানে, যখন সংকটের সর্বনিম্ন কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, তখন ব্যাপক শ্রমিকদের অবস্থার কোন উন্নতি তো হয়ই নি, বরং, তার বিপরীতে, তাদের অবস্থা অব্যাহতভাবেই মন্দতর হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে কর্মরত শ্রমিকদের বর্ধিত মাত্রায় শোষণ আর তাদের শ্রমের মাত্রাকে তীব্রতর করার বদৌলতে পুঁজিবাদী শিল্প-কারখানাগুলোতে উৎপাদনের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হচ্ছে।

"অর্থনৈতিক মন্দাঘাতের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ আর সামরিক-রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ-কর্ম ও শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার সংগ্রাম অব্যাহত রেখে পর্বতসম অটলতা নিয়ে একাই দাঁড়িয়ে আছে। যখন পুঁজিবাদী দেশসমূহে অর্থনৈতিক সংকট এখনও ফুলে ফুলে উঠছে, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে অব্যাহত রয়েছে শিল্প ও কৃষি – উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রগতি। যখন নয়া বিশ্বযুদ্ধের জন্যে, বিশ্বকে নতুন করে পুনর্বন্টনের ও প্রভাব-বলয় স্থাপনের জন্য পুঁজিবাদী দেশসমূহে অব্যাহত রয়েছে উন্মত্ত প্রস্তুতি, তখন যুদ্ধের ভীতির বিরুদ্ধে আর শান্তির সপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন চালিয়ে যাচ্ছে তার পদ্ধতিগত ও অনমনীয় সংগ্রাম ; আর এটা বলাই যেতে পারে না যে, এ ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচেষ্টা পুরোপুরি অসফল হয়েছে।" [জোসেফ স্তালিন, সিপিএসইউ'র সপ্তদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ-কর্মের উপর রিপোর্ট, পৃঃ ৮, মস্কো, ১৯৩৪]

রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের অবসানের পর, অর্থনৈতিক বিনির্মাণে উত্তরণের পর, লেনিন বলেছিলেন ঃ "এখন আন্তর্জাতিক বিপ্লবের উপর আমরা আমাদের মূল প্রভাব প্রয়োগ করছি আমাদের অর্থনৈতিক নীতি দ্বারা"। এ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের বিপুল **আন্তর্জাতিক** গুরুত্ব সুস্পষ্ট। সংকটের যাঁতাকলে পতিত, ফ্যাসিবাদীদের জোয়ালে আবদ্ধ যন্ত্রণাকাতর পুঁজিবাদী দেশসমূহের শ্রমিকরা বিশ্ব সর্বহারাশ্রেণীর পিতৃভূমি হিসেবেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেখে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্য পুঁজিবাদী দেশসমূহের শ্রমিকদের সংগ্রামের সাহস যোগায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ঐতিহাসিক বিজয় সমূহ **বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের** ক্ষেত্রে এক অসাধারণ উপাদান।

পুঁজিপতিশ্রেণী ও তার চেলাচামুণ্ডারা **পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিয়তি নিয়ে** উদ্বেগের সাথে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ আর পুঁজিবাদের অবক্ষয়ের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য তথা বিরাট ব্যবধান – এই সবকিছুই অত্যন্ত লক্ষণীয়। **ভবিষ্যৎ কার** – সমাজতন্ত্রের, না পুঁজিবাদের – এটাই হলো প্রশ্ন যা এখন সমাজতন্ত্রের শত্রুরা আরো বেশী করে নিজেদের জিজ্ঞেস করছে।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র – **দুই ব্যবস্থার** (অর্থাৎ, দুই সমাজ-পদ্ধতির) **মধ্যেকার সংগ্রাম** – এটাই হলো আমাদের সময়ের কেন্দ্রীয় বিষয়। বিপরীত মেরুর বিরোধীয় দুই বিশ্ব পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে ঃ একটি হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের বুকে – শ্রমের বিশ্ব, শ্রমিক রাজত্বের বিশ্ব, সমাজতন্ত্রের বিশ্ব ; আরেকটি হলো অন্যান্য সকল দেশে – বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশ্ব, মুনাফা শিকারীদের বিশ্ব, বেকারত্ব ও ক্ষুধার বিশ্ব। সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিকদের পতাকায় উৎকীর্ণ শ্লোগান হলো ঃ "যারা করবে না কাজ, তারা পাবে না খেতে"। বুর্জোয়াদের পতাকায় লেখা যেতে পারে ঃ "মজুররা পাবে না খেতে"। এটা সুস্পষ্ট গোটা বিশ্বের সচেতন শ্রমিকরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে তাদের সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি বলেই বিবেচনা করে।

কিন্তু হিংসা আর নিপীড়নের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আপনা থেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর সংগামের ফলশ্রুতিতেই তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। যে পুঁজিবাদ বিপুল-ব্যাপক শ্রমিকদের কাছে হয়ে ওঠেছে অসহনীয়, সেই পুঁজিবাদকে সচেতন সর্বহারাশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামই ঠেলে দিবে কবরে।

পুঁজিবাদ, না সমাজতন্ত্র ? সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে পূর্ণ গুরুত্ব নিয়েই দেখা দিয়েছিল এই প্রশ্ন – পুঁজিবাদ, না সমাজতন্ত্র ? সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান সাফল্য আর পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান ভাঙ্গনের সাথে সাথে এই প্রশ্ন আরো তীব্র হয়েই দেখা দিয়েছে।

সমাজতন্ত্রের পথ সর্বহারা একনায়কত্বের মধ্যেই নিহিত

সকল পুঁজিবাদী দেশেই শাসন-ক্ষমতা থাকে বুর্জোয়া শ্রেণীরই হাতে। সরকারের রূপ যাই থাক না কেন তা অপরিবর্তনীয় ভাবে **বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বকে** আড়াল করেই রাখে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অভীষ্ট হলো পুঁজিবাদী শোষণকে রক্ষা করা, কল-কারখানা-ফ্যাক্টরীর উপর বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যক্তি-মালিকানা, জমির ওপর জমিদার ও ধনী কৃষকদের ব্যক্তি-মালিকানা রক্ষা করা।

সমাজতন্ত্রকে বিজয় অর্জন করতে হলে, বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসন অবশ্যই উচ্ছেদ করতে হবে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে ও তার স্থলে অবশ্যই অধিষ্ঠিত করতে হবে **সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব**। পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণীর বিরামহীন শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে, **সর্বহারা বিপ্লব** ও **সর্বহারা রাষ্ট্র** প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই কেবল পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব। কেবল মাত্র নিজ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেই শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্র গড়ার পথে অগ্রসর হতে পারে এবং একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা (অর্থাৎ সংশোধনবাদীরা– অনুঃ) দাবি করে যে, বিপ্লব ছাড়াই, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ছাড়াই সমাজতন্ত্র লাভ করা যেতে পারে, পার্লামেন্টের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পন্থায়ই সমাজতন্ত্র "প্রবর্তন করা" যেতে পারে, শ্রমিকশ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আইন করেই সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারে। কিন্তু বলপ্রয়োগের সকল যন্ত্রগুলো (পুলিশ, সেনাবাহিনী ইত্যাদি) হাতে থাকায় বুর্জোয়াশ্রেণী কখনোই শ্রমিকদের প্রকৃত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা লাভের অনুমতি দিতে পারে না। স্যোশাল-ডেমোক্র্যাটদের সম্পর্কে বলতে গেলে, তারা ক্ষমতায় যেতে পারে – আর প্রকৃত পক্ষে বেশ কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশে তাদেরকে ক্ষমতা গ্রহণের যে অনুমোদন দেয়া হয়েছে – তা ঠিক এই কারণে যে সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থ তারা রক্ষা করেনি, বরং রক্ষা করেছে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ। ক্ষমতায় থাকা কালে "সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করে" কোন আইন তো তারা পাস করায়নি, এমন কি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধানের নিম্নতম কোন চেষ্টাও তারা করেনি। এর সম্পূর্ণ বিপরীতে, মজুরী কমিয়ে দেয়া, বেকার ভাতা হ্রাস করা ইত্যাদি প্রচেষ্টায় বুর্জোয়াশ্রেণীকে তারা সমর্থন করেছে।

সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের ভণ্ডামিপূর্ণ কথাবার্তা সত্ত্বেও, সমাজতন্ত্রের পথ পার্লামেন্টের মধ্য দিয়ে, কিংবা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্য দিয়েও এগিয়ে যায়নি। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে যাওয়ার পথ কেবল একটিই – আর তা হলো কমিউনিস্টদের নির্দেশিত পথ – সর্বহারা বিপ্লবের পথ, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংসের, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের পথ।

মার্কস বলেছেন,

"পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী সমাজের মধ্যে রয়েছে একটি থেকে আরেকটিতে বিপ্লবী উত্তরণের এক কাল। এর আনুষঙ্গিকও রয়েছে একটি রাজনৈতিক উত্তরণকাল, যে সময়কালে **সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী একনায়কত্ব** ছাড়া রাষ্ট্র আর অন্য কিছু হতে পারে না।" [মার্কস, "গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা", পৃঃ ৪৪, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউইয়র্ক, ১৯৩৩]

রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী এই পথই ১৯১৭ সালে গ্রহণ করে, যে পথ হলো সমাজতন্ত্রের দিকে একমাত্র সঠিক, একমাত্র সম্ভব পথ।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিকশ্রেণী তার নিজের জন্যেই রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় করে নেয়। অক্টোবর বিপ্লব কায়েম করে **সর্বহারাশ্রেণীর শাসন**, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। নিছক ক্ষমতার জন্যেই শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা নেয় না। সর্বহারাশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা হলো নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার এক উপায়।

"এর উদ্দেশ্য হলো সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমাজের বিভক্তির অবসান ঘটানো, সমাজের সকল সদস্যকে মজুরে পরিণত করা, মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর শোষণের ভিত্তি উপড়ে ফেলা। এই উদ্দেশ্য তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে না, এর জন্য প্রয়োজন পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে একটি বেশ দীর্ঘ উত্তরণকাল, কারণ উৎপাদনের পুনর্সংগঠন হচ্ছে একটি কঠিন ব্যাপার, কারণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল আমূল পরিবর্তনের জন্যে সময় দরকার, এবং কারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া অভ্যাসের বিপুল শক্তিকে কেবলমাত্র একটি দীর্ঘ, অধ্যবসায়পূর্ণ সংগ্রাম দ্বারাই পরাস্ত করা যায়। সেই কারণেই মার্কস সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের গোটা কালকে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকাল বলে বর্ণনা করেছেন।" [লেনিন, "ভিয়েনার শ্রমিকদের প্রতি শুভেচ্ছা"]

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সাধন তাৎক্ষণিকভাবেই সম্পন্ন করা যায় না। একটি বেশ পরিমাণ দীর্ঘ উত্তরণকাল এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এই সময়কালে রাষ্ট্র-ক্ষমতা শ্রমিকশ্রেণীরই হাতে থাকে, যারা সমাজতন্ত্র গড়ে তুলছে।

বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বের অর্থ হলো মুষ্টিমেয় পরজীবীর স্বার্থে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ওপর নিপীড়ন। সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের অর্থ হলো বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থে, সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে শোষকদের একটি ক্ষুদ্র দলের ওপর নিপীড়ন। মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর শোষণের সকল নিদর্শন ধ্বংস করার জন্য সর্বহারাশ্রেণী তার একনায়কত্ব ব্যবহার করে। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে সর্বহারাশ্রেণী শাসকশ্রেণীতে পরিণত হয় ঃ সে সকল সামাজিকীকৃত উৎপাদন পরিচালনা করে, শোষকশ্রেণীর প্রতিরোধ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, মধ্যবর্তী, দোদুল্যমান ব্যক্তি ও শ্রেণীগুলোকে নেতৃত্ব দেয়। শাসকশ্রেণীতে পরিণত হয়ে, সর্বহারাশ্রেণী শ্রেণীবিহীন – শাসক বা শাসিত শ্রেণীবিহীন – এক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ শুরু করে, কারণ সে সমাজে কোন ধরনের শ্রেণী বা শ্রেণী পার্থক্য থাকবে না।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, শ্রেণী দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী-সংগ্রামের বিলুপ্তি সাধন করে, শোষক ও শোষিতদের মধ্যেকার বিভক্তি নিশ্চিহ্ন করে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমাজের বিভক্তির অবসান ঘটানো হয়। কিন্তু শ্রেণীহীন, সমাজতান্ত্রিক সমাজের পথ **তিক্ততম শ্রেণী-সংগ্রামের** এক সময়কালের মধ্যেই নিহিত।

লেনিন প্রতিনিয়ত এই বাস্তব সত্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব হলো শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে, প্রাক্তন শাসক শ্রেণীর অবশেষের বিরুদ্ধে এক সুদীর্ঘ, নিরবচ্ছিন্ন শ্রেণী-সংগ্রামের সময়কাল। তিনি লিখেছেন ঃ

"সমাজতন্ত্র হলো শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তি। সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব এসব শ্রেণীকে বিলুপ্ত করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করেছে। কিন্তু সহসাই শ্রেণীসমূহের ধ্বংস সাধন অসম্ভব। সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের সময়কালে শ্রেণীসমূহ বিদ্যমান আছে ও বিদ্যমান থাকবে। যখন শ্রেণীসমূহ অন্তর্হিত হয়ে যাবে তখন একনায়কত্ব অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব ছাড়া তারা অন্তর্হিত হতে পারে না। শ্রেণীসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে তাদের প্রত্যেকেই তাদের চেহারার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বাধীনে শ্রেণী সংগ্রাম তিরোহিত হয়ে যায় না, তা কেবল অন্যান্য রূপ পরিগ্রহ করে।" [লেনিন ঃ "সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনীতি", সঃ রঃ, ৩০শ খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৬, পৃঃ ১১৪-১১৫]

অন্যান্য রূপ পরিগ্রহ করার মধ্য দিয়ে, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে শ্রেণী-সংগ্রাম আরো অধিক বিরামহীন হয়ে পড়ে। আর এটাই কেবল আশা করা যেতে পারে ঃ প্রাক্তন শাসকশ্রেণী তাদের হারানো অবস্থান ফিরে পাওয়ার জন্যে সব কিছুই করবে। শোষকশ্রেণী তাদের শাসনের পরিসমাপ্তি রোধ করার জন্য কোন কিছু করা থেকেই নিবৃত্ত হয় না, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ঘৃণ্যতম অপরাধ সাধন করতেও তারা প্রস্তুত।

"শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তি হচ্ছে একটা দীর্ঘ, কষ্টসাধ্য ও বিরামহীন শ্রেণী-সংগ্রামের ব্যাপার, যা পুঁজির শাসনের উচ্ছেদের পর, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধনের পর, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পর, তিরোহিত হয়ে যায় না, বরং কেবল মাত্র তার রূপ বদলায়, বহু দিক দিয়েই হয়ে দাঁড়ায় অধিকতর তিক্ত। ["লেনিন ঃ 'ভিয়েনার শ্রমিকদের প্রতি শুভেচ্ছা"]

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের গোটা ইতিহাস লেনিন কর্তৃক অভিব্যক্ত এই নীতির সত্যতা চমৎকারভাবে প্রদর্শন করছে। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কর্মের বিপুল বিজয়সমূহ পুরাতন শোষণ-ব্যবস্থার সকল অবশেষের বিরুদ্ধে বিরামহীন ও সবচেয়ে তিক্ত সংগ্রামের প্রক্রিয়ায়ই অর্জিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সকল বুর্জোয়া শক্তির উপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ধারক বিজয় অর্জন করেছে। কিন্তু তাদের প্রতিরোধ আরো জোরদার হয়ে উঠেছে। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের পদ্ধতি আরো হীন হয়ে উঠেছে। প্রকাশ্য সংগ্রামে সার্বিক পরাজয় বরণ করে, "কুলাক", ব্যবসায়ী তথা প্রাক্তন শাসকশ্রেণীর সকল অবশেষগুলো সোভিয়েত প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহে অনুপ্রবেশের চেষ্টা চালাচ্ছে এবং ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম, চৌর্যবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রয়াস নিচ্ছে। সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষ থেকে সবচেয়ে সদা জাগ্রত সতর্কতা, সর্বহারা একনায়কত্বের চূড়ান্ত জোরদারকরণ সেই কারণে অত্যাবশ্যক।

"সর্বহারাশ্রেণীর একটি বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী একনায়কত্ব – এটাই হলো তা, মুমূর্ষ শ্রেণীসমূহের সর্বশেষ অবশেষগুলোকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা এবং তাদের চৌর্যবৃত্তিমূলক অভিসন্ধিকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে, যা আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে।" [স্তালিন ঃ "পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল", "প্রথম থেকে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা" শীর্ষক সিম্পোজিয়াম, পৃঃ ৫৪, মস্কো, ১৯৩৩]

শ্রেণীহীন সমাজ নিজে থেকেই আসবে না। তা জয় করেই নিতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সমাজতন্ত্রের পথে বিরাজমান বিপুল বাধা-বিপত্তি সক্রিয়ভাবে অতিক্রম করা আবশ্যক। সকল পুরানো শোষণমূলক ব্যবস্থার প্রতিরোধ চূর্ণ-বিচূর্ণ করা আবশ্যক। সমাজতন্ত্রের কোটি কোটি নির্মাণকর্মীর শক্তি ও তৎপরতাকে সমাবেশ করা আবশ্যক। পার্টির সাধারণ লাইন থেকে যেকোন এবং সকল বিচ্যুতি প্রতিরোধ করা আবশ্যক। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষাবলী বিকৃত করার সকল প্রচেষ্টা সম্পর্কে অব্যর্থ সতর্কতা বজায় রাখা আবশ্যক।

সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব হলো সেই ক্ষমতা যা শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণকর্ম সম্পাদন করে। সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব হলো সমাজের মধ্যে সমাজতন্ত্র নির্মাণকারী পরিচালক শক্তি। সুতরাং, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণকে অধ্যয়ন করতে গেলে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা-কাঠামোকে অধ্যয়ন করতে গেলে, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বই হলো রাজনৈতিক অর্থনীতির মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু।

রাজনৈতিক অর্থনীতি—এক জঙ্গী, শ্রেণী বিজ্ঞান

পুঁজিবাদের অনিবার্য পতন আর সাম্যবাদের বিজয়ের নিয়মাবলী লুকিয়ে রাখতেই বুর্জোয়াশ্রেণী আগ্রহী। অর্থনীতির বুর্জোয়া অধ্যাপকবৃন্দ – লেনিন যেভাবে এর বর্ণনা করেছেন তেমনি, "পুঁজিপতিশ্রেণীর এসব সুশিক্ষিত বিশ্বস্থ অনুচরবৃন্দ" – নিপীড়ন ও দাসত্বের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রেখে ও তাকে সাজ-সজ্জা পরিয়ে, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্থতার সাথে পুঁজিবাদের সেবা করে।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা পুঁজিবাদী উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকারী প্রকৃত নিয়ম-বিধিগুলোকে আড়াল ও কুয়াশাচ্ছন্ন করে রাখে। তারা পুঁজিবাদকে চিরস্থায়ী করার চেষ্টা চালায়, তারা পুঁজিবাদকে সামাজিক জীবনের একমাত্র সম্ভাব্য ব্যবস্থা হিসেবে চিত্রিত করে। তাদের মত অনুসারে পুঁজিবাদের নিয়ম-বিধি হলো চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। এরূপ মিথ্যাচার দ্বারা তারা অনিবার্য ধ্বংস থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করার চেষ্টা চালায়।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্রভাগে অবস্থান করে **কমিউনিস্ট পার্টি**। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে একমাত্র দৃঢ় নেতৃত্বই সর্বহারাশ্রেণীর বিজয় সুনিশ্চিত করে। কমিউনিজমের সকল শত্রুই কমিউনিস্ট পার্টিকে বিষাক্ত-হৃদয়ে ঘৃণা করে। সম্ভাব্য সকল উপায়ে একে বিভক্ত করার, তার ঐক্য ধ্বংস করার প্রচেষ্টা তারা চালায়, এবং পার্টির সারির অভ্যন্তরে তার সাধারণ লাইন থেকে যেকোন বিচ্যূতিতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, **কমিউনিজমের** জন্যে সংগ্রামে রাজনৈতিক অর্থনীতি হলো সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার। সমস্ত বিজ্ঞানের মতোই, আর প্রাথমিকভাবে মানব সমাজ ও তার বিকাশের নিয়মাবলী যেসব বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত সেগুলোর মতোই, রাজনৈতিক অর্থনীতি হলো এক **শ্রেণী**-বিজ্ঞান।

সর্বহারাশ্রেণী বহুসংখ্যক শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। এক তিক্ত সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। এই সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ লাইনের উপর সকল আক্রমণ, তত্ত্বের ক্ষেত্রেই হোক আর অনুশীলনের ক্ষেত্রেই হোক তাকে ধ্বংস সাধনের সকল প্রচেষ্টা, শত্রুর লাভের কারণ হয়ে ওঠে। সে কারণে, পার্টির সাধারণ লাইন থেকে বিচ্যূতির বিরুদ্ধে সতর্ক ও বিরামহীন সংগ্রাম, প্রকাশ্য দক্ষিণ সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আর তার সাথে সাথে সকল ধরনের "বাম" বিচ্যূতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এক নয়া হস্তক্ষেপের জন্য প্রস্তুতির ক্ষেত্রে **প্রতিবিপ্লবী ট্রটস্কিবাদ** হলো বুর্জোয়াশ্রেণীর সপক্ষে এক বিশেষ সেবাকর্ম। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসির অন্যতম এক সংস্করণ হিসেবে, ট্রটস্কিবাদ সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের বিশেষ করে যোগান দেয় বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সকল ধরনের কুৎসামণ্ডিত কল্পকাহিনী। ট্রটস্কিবাদ হলো প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের এক অগ্রবর্তী খুঁটি।

রুশ সাময়িকপত্র "সর্বহারা বিপ্লব" [প্রোলেতারস্কায়া রিভোলিউৎসিয়া]-এর সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট ১৯৩১ সালের শরৎকালে লিখিত "বলশেভিক মতবাদের ইতিহাস সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী" শীর্ষক চিঠিতে স্তালিন কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে লেনিনবাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মতাদর্শের অনুপ্রবেশের সকল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার প্রতি, আর বিশেষ করে "আমাদের সাহিত্যে ছদ্মবেশী ট্রটস্কিবাদী জঞ্জাল চুপিসারে চালান দিয়ে দেয়ার" সকল ধরনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দৃঢ়বদ্ধ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির মনোযোগ আকর্ষণ করেন। সর্বহারাশ্রেণীর প্রতি বিরোধী ভাবানুগ প্রবণতাগুলোর প্রতিনিধিরা এখন তাদের মতামতগুলো ধূর্ততার সাথে, অলক্ষিতে চালান দিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ সমস্ত সকল প্রচেষ্টাই শক্তভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। এসব বিরোধী-ভাবানুগ মতামতের প্রতি কোন সহিষ্ণুতা প্রদর্শন, সেগুলো সম্পর্কে কোন হীন উদারতাবাদ, শ্রমিকশ্রেণী ও সমাজতন্ত্রের জন্যে তার সংগ্রামের বিরুদ্ধে এক প্রত্যক্ষ অপরাধ।

সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণী-শত্রুরা রাজনৈতিক অর্থনীতিকে বিকৃত করা ও তাদের নিজস্ব স্বার্থের সেবার উপযোগী করে তোলার জন্যে সর্বোতভাবে চেষ্টা চালায়। বুর্জোয়া ও সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট অর্থনীতিবিদরা পুঁজিবাদকে রক্ষা করার ... সাজানো প্রতারণামূলক কেচ্ছা-কাহিনী উদ্ভাবন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারা রাজনৈতিক অর্থনীতিকে ব্যবহার করার অপচেষ্টাও চালায়।

সুতরাং, রাজনৈতিক অর্থনীতি অধ্যয়নকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর অন্যতম হলো সকল অ-মার্কসীয় ও বিচ্যূতিময় প্রবণতার বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম পরিচালনা করা।

নিরীক্ষামূলক প্রশ্নাবলী

১। সর্বহারাশ্রেণীর সামনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কি লক্ষ্য তুলে ধরে ?

২। সমাজের উৎপাদিকা শক্তি কিভাবে পরিবর্তিত হয় ?

৩। সামাজিক উৎপাদনের বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলো কিভাবে পরস্পর থেকে ভিন্ন ?

৪। শ্রেণী কি ?

৫। শ্রেণীর বিলুপ্তি কিভাবে ঘটে ?

৬। রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যয়নের বিষয়বস্তু কি ?

৭। সর্বহারাশ্রেণীর নিকট বিপ্লবী তত্ত্ব অধ্যয়নের গুরুত্ব কি ?

৮। রাজনৈতিক অর্থনীতি কেন একটি শ্রেণী বিজ্ঞান ?

৯। রাজনৈতিক অর্থনীতির পার্টি-চরিত্র কি কি বিষয় নিয়ে গঠিত ?

সমাজ কিভাবে পুঁজিবাদে বিকাশ লাভ করলো?

আমাদের লক্ষ্য শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ

১৯১৭ সালের অক্টোবর (নভেম্বর)-এর রুশ বিপ্লব মানব জাতির ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের সূচনা করে। এই বিপ্লব তার লক্ষ্য হিসেবে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলাই নির্দিষ্ট করে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের অবসান ঘটানো হয়। ১৯৩৩ সালে যে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আমলে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রবেশ করেছে, তার করণীয় হলো শ্রেণী-হীন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা।

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে 'যৌথ-খামার শক ব্রিগেড' শ্রমিকদের কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে কমরেড স্তালিন বলেন ঃ

"জাতিসমূহের ইতিহাসে বহুসংখ্যক বিপ্লবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লব থেকে এসব বিপ্লবের পার্থক্য এখানেই যে সেগুলো ছিল একপেশে বিপ্লব। শ্রমজীবীদের ওপর শোষণের এক রূপ পথ তৈরী করে দেয় শোষণের আরেক রূপের জন্য, কিন্তু শোষণ নিজে থেকে বহালই থাকে। নির্দিষ্ট শোষক ও নিপীড়কেরা পথ তৈরী করে দেয় আরেক শোষক ও নিপীড়কদের জন্যে, কিন্তু শোষণ আর নিপীড়ন, নিজে থেকে বহালই থাকে। একমাত্র অক্টোবর বিপ্লবই তার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে – সকল শোষণের অবসান এবং সকল শোষক ও নিপীড়কদের বিলুপ্তি।" [যৌথ-খামার শক ব্রিগেড শ্রমিকদের প্রথম নিখিল-ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ", পৃঃ ৮, মস্কো, ১৯৩৩]

শ্রেণী-হীন, সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্যে সংগ্রামের পূর্ণ তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধির উদ্দেশ্যে, শ্রেণী-সমাজের মর্মবস্তু সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে কোন্ কোন্ শ্রেণী দ্বারা সমাজ গঠিত তা স্মরণ থাকা দরকার। শ্রেণী কি তা অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং শ্রেণী সব সময় বিরাজমান ছিল কিনা সেই প্রশ্নেও পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে। বুঝতে হবে ঠিক কিভাবে পুঁজিবাদী সমাজ অন্যান্য সকল রূপের শ্রেণী-সমাজ থেকে ভিন্ন। পরিশেষে, পুঁজিবাদী দাসত্ব ছিন্ন করার জন্যে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম কোন গতিপথ ধরে অগ্রসর হবে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ ও অবক্ষয়ের নিয়মাবলী কি কি – এসব প্রশ্ন সম্পর্কে আয়ত্ত করতে হবে পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি।

শ্রেণী কি সব সময় বিদ্যমান ছিল?

পুঁজিবাদের দাসানুদাসরা সর্বশক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমাজের বিভক্তি অবশ্যম্ভাবী। শোষক ও শোষিতের অস্তিত্ব যেন চিরন্তন এবং যেকোন সমাজের টিকে থাকার প্রয়োজনীয় শর্ত – এভাবেই বিষয়াবলীকে বর্ণনা করাটা টাকার থলির পূজারীদের পক্ষে জরুরী। সেই সুপ্রাচীন রোম নগরীতে, যখন শোষিতরা তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তখন শাসকশ্রেণীর জনৈক পূজারী রূপকথার এক গল্প ফেঁদেছিল, যেখানে সে সমাজকে একজন ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করে, যেমন, কোন ব্যক্তির মধ্যে, অনুমেয় রূপে, কাজ করার জন্যে রয়েছে হাত, আর খাদ্য গ্রহণের জন্যে পেট, ঠিক তেমনি সমাজের মধ্যেও এমন কিছু লোক থাকতে হবে, যারা সমস্ত কাজকর্ম করবে এবং অন্যান্য কিছু লোক থাকবে যারা মজুরের শ্রমের ফসল আত্মসাৎ করবে। প্রকৃতপক্ষে, শোষক শ্রেণীসমূহের শাসনের পরবর্তী সকল সমর্থকরাই, মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর শোষণমূলক ব্যবস্থার ধ্বংসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে, এই হীন রূপকথার চেয়ে অধিক কিছু বলেনি।

বাস্তবে এটা সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন প্রকার শ্রেণী-ভেদ, শ্রেণী-শাসন বা শোষণ ছাড়াই মানবজাতি বহু হাজার বছর ধরে বসবাস করেছে। এটা সুবিদিত যে, অগণনীয় কাল পূর্বে প্রাণী-জগৎ থেকে মানুষের বিবর্তন ঘটে। মানুষ কখনোই নিজে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করেনি, বরং সব সময় দলবদ্ধ হয়েই বসবাস করেছে। মানবজাতির ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরগুলোতে এইসব দল ছিল ছোট ছোট। এই দলগুলোর স্বতন্ত্র সদস্যরা কোন ঘটনার দ্বারা জোটবদ্ধ হয় ? এটা সুস্পষ্ট যে, যা তাদের জোটবদ্ধ করে তা হলো টিকে থাকার জন্য তাদের সাধারণ সংগ্রাম, খাদ্য সংগ্রহের জন্য তাদের সাধারণ শ্রম।

আদিম গোত্র–সাম্যবাদ

ক্রমবিকাশের প্রাথমিক স্তরগুলোতে অত্যন্ত কঠিন অবস্থাধীনে মানুষকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হয়। লাঠি আর পাথর – বহু হাজার বছর ধরে মানুষের সর্বসাকুল্য হাতিয়ার এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রতি পদে অসংখ্য বিপদ তাকে বেষ্টন করে রাখতো। প্রকৃতির ভয়ঙ্কর শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সে ছিল শক্তিহীন, প্রকৃতির নিয়ম-বিধি সম্পর্কে সে কিছুই জানতো না।

এই পরিস্থিতিতে ছোট ছোট সম্প্রদায়, ছোট ছোট গোত্রে আবদ্ধ হয়েই মানুষ বসবাস করতো। তারা এক সাথে সবাই মিলে কাজ করতো এবং তাদের যৌথ শ্রমের ফসলও সবাই মিলে এক সাথে ভোগ করতো। মানবজাতির ক্রমবিকাশের এই নিম্ন স্তরগুলোতে কোন অসমতাই থাকতে পারতো না, কারণ শিকার, পশুপালন বা অতি প্রাথমিক চাষাবাদের দ্বারা কেবলমাত্র কোন রকমে টিকে থাকার মতো যথেষ্ট দ্রব্যই তারা সংগ্রহ করতে পারতো।

ক্রমবিকাশের প্রথম আমলগুলোতে সকল মানুষই এই ধরনের আদিম গোত্রীয় কমিউন সমাজগুলোতে বসবাস করতো। পৃথিবীর যেসব দূরবর্তী স্থান অধিকতর উন্নত দেশগুলোর প্রভাবের বাইরে থাকতে পেরেছে সেসব স্থানে এমন কি অতি সম্প্রতি কাল পর্যন্ত এ ধরনের আদিম কমিউন সমাজের অস্তত্ব ছিল। যে ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণী পৃথিবীর এসব সকল স্থানই জোর করে দখল করেছে, তাদের চাপে এসব সমাজ-সংগঠনের অবশ্য সর্বব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অথচ, এক হাজার বা দেড় হাজার বছর পূর্বে এসব ইউরোপীয়দের কারো কারো পূর্ব-পুরুষও এ ধরনের আদিম গোত্র সমাজে বাস করতো।

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সমাজে শ্রেণী-বিভক্তির উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত আদিম গোত্র সাম্যবাদ [প্রিমিটিভ ক্ল্যান কমিউনিজম] প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন গোত্র ও জাতির মধ্যে এই ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ বিরাজ করতো। কিন্তু এসব বিভিন্নতা সত্ত্বেও, সমাজ-সংগঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলীর ক্ষেত্রে সকল জাতির ক্রমবিকাশের প্রাথমিক স্তর পরিপূর্ণ সাদৃশ্য প্রদর্শন করে।

সমাজ বিকাশের প্রাথমিক স্তরগুলো, যেখানে আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা বিরাজমান ছিল, অত্যন্ত ধীরগতির বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিল। শত শত, এমন কি হাজার হাজার বছর ধরে, জীবন ধারনের অবস্থা কার্যতঃ একরূপ বদলায়নি, কিংবা বদলালেও তা ছিল অত্যন্ত শ্লথগতি সম্পন্ন। মানুষ তার বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তি সহকারেই গ্রহণ করে। পুরুষের পর পুরুষানুক্রম অতিবাহিত হয়েছে, অথচ সামাজিক অবস্থার কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বাস্তবিক পক্ষে অত্যন্ত ধীর গতিতেই মানুষ তার হাতিয়ারগুলোকে ও কাজের পদ্ধতিকে উৎকর্ষতা দান করতে শিখেছে।

আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থায় সামাজিক সম্পর্ক কিরূপ ছিল ? আদিম সাম্যবাদী সম্প্রদায় বা গোত্র স্বভাবতঃ ছিল সংখ্যায় ক্ষুদ্র ঃ তৎকালে বিরাজমান কারিগরী অগ্রগতি দ্বারা একটি বিরাট মানবগোষ্ঠী তার সকল সদস্যের খাদ্যের সংস্থান করার আশা করতে পারতো না। এ ধরনের কোন সম্প্রদায়ের শ্রম সংগঠন করা হতো কম-বেশী একটি পরিকল্পনা অনুসারে। সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সদস্যেরই সুনির্দিষ্ট কাজ থাকতো। উদাহরণস্বরূপ, পুরুষরা শিকার করতো। নারীরা শিশু-সন্তানদের নিয়ে ঘরে থাকতো এবং ভূমি চাষাবাদও করতো। শিকার থেকে ফিরে আসার পর শিকার-লব্ধ পশু-পাখি ঐতিহ্যিক তথা প্রবীণদের প্রতি সম্মান-ভিত্তিক প্রথা অনুযায়ী ভাগাভাগি করা হতো।

"সংখ্যার দিক দিয়ে লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম। গোষ্ঠীর [ট্রাইব] নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে কেবল তারা একতাবদ্ধ থাকতো। এলাকার পাশেই এক বিরাট বৃত্তাকারে বেষ্টিত রয়েছে শিকারের ভূমি। অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে সীমানা-নির্দেশক রেখা গঠন করছে এক নিরপেক্ষ বনাঞ্চল। শ্রম-বিভাগ পুরোপুরি আদিম প্রকৃতির। কাজকর্ম নারী-পুরুষের মধ্যে সরলভাবে বিভক্ত। পুরুষ জাতি যুদ্ধ করতো, শিকারে যেতো, খাদ্যের জন্যে কাঁচামাল ও এসব কাজকর্মের হাতিয়ার-পাতি যোগান দিত। নারী সম্প্রদায় ঘর-বাড়ীর দেখাশোনা করত, আর খাদ্য বস্তু তৈরী করতো ; তারা রান্নাবান্না করতো, কাপড় বুনতো ও সেলাই করতো। নারী-পুরুষরা তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের প্রভু ছিল ; পুরুষরা বনের, আর নারীরা ঘরের। নারী-পুরুষ প্রত্যেকে যেসব হাতিয়ার তৈরী করতো সেসবের মালিক ছিল তারা নিজেরাই ; পুরুষরা ছিল যুদ্ধাস্ত্র, পশু শিকার ও মাছ ধরার হাতিয়ার-পাতির মালিক, গৃহস্থালী দ্রব্যসামগ্রী ও বাসন-পত্রের মালিক ছিল নারী।* গৃহস্থালী জীবন ছিল সাম্যবাদী, বেশ কয়েকটি, আর প্রায়শঃ বহু পরিবার নিয়ে তা গঠিত হতো। যৌথভাবে যাই উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হতো তাই বিবেচিত হতো সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে ঃ বাড়ীঘর, বাগান, লম্বা নৌকা।" [এঙ্গেলস্, "পরিবারের উৎস", চার্লস্, এইচ কার এণ্ড কোং, শিকাগো, ১৯০২, পৃঃ ১৯২-৯৩]

আদিম সাম্যবাদী অবস্থাধীনে বিনাশ্রমে লব্ধ আয়ের উপর জীবন ধারণকারী কোন সামাজিক লোক-গোষ্ঠীর স্থান থাকতে পারতো না। আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থার রূপ-কাঠামোতে মানব সম্প্রদায়ের এক অংশ কর্তৃক অপর অংশের উপর কোন রূপ শোষণই ছিল না। মানব জাতির ক্রম-বিকাশের সেই স্তরে শ্রমের হাতিয়ার ছিল খুবই সরল, ফলতঃ হাতিয়ার-পাতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার কোন প্রশ্নই উঠতে পারতো না ঃ খুব একটা পরিশ্রম ছাড়াই, প্রত্যেকে তার নিজের জন্যে একখানি বর্শা, একখানি প্রস্তর, একখানি তীর-ধনুক ইত্যাদি তৈরী করে নিতে সমর্থ ছিল। একই সাথে, জমির উপর কোন ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। জমি ছিল গোটা সম্প্রদায়ের, গোটা গোত্রের এজমালি (কমিউন্যাল) সম্পত্তি। এমনকি সমাজে শ্রেণীভেদ বিকাশের বহু যুগ পরেও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যথাযথভাবে জমির এজমালি মালিকানার এই অবশেষগুলোই সবচেয়ে বেশী স্থিতিশীল বলে প্রমাণিত হয়েছে। সমাজ বিকাশের পরবর্তী স্তরগুলোতে, কৃষকদের উপর শোষণ চালানো, কর সংগ্রহ করা ইত্যাদির সুবিধার্থে শোষকশ্রেণী ও শ্রেণী-রাষ্ট্র কৃষক কমিউনগুলোকে প্রায়শঃই কৃত্রিমভাবে বহাল রাখে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, তার বিপরীতে, পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশের পথ পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে শাসকশ্রেণী গ্রামাঞ্চলের এজমালি মালিকানা ভিত্তিক জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।

* বিশেষতঃ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম তীরভূমি। ব্যানক্রফট-এর রচনা পড়ুন। কুইন শারলেট দ্বীপপুঞ্জের 'হাইদাদের' মধ্যে কোন কোন গৃহস্থালিতে একই ঘরে প্রায় ৭০০-এর মতো সদস্য একত্রে থাকে। 'নোটকাদের' মধ্যে গোটা গোষ্ঠীই এক ঘরে থাকে – এঙ্গেলস্।

এমনকি কৃষিকর্ম প্রাধান্যপূর্ণ হয়ে ওঠার পর, শ্রমের প্রধান রূপ হয়ে ওঠার পরও জমির উপর এজমালি মালিকানা বজায় ছিল। স্বতন্ত্র কৃষক পরিবারগুলোকে চাষাবাদের জন্যে যে জমি দেয়া হতো তা সময়ে সময়ে পুনর্বন্টন করা হতো। এই জমি গ্রামের এজমালি সম্পত্তি হিসেবে থাকতো এবং লটারীর মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে প্রায়শঃই পুনর্বন্টন করা হতো। গো-চারণ ভূমির উপর এজমালি মালিকানা এমনকি আরো দীর্ঘ সময় বহাল ছিল। পুঁজির শাসন প্রতিষ্ঠার পরও গোটা গ্রামের জন্য এজমালি গো-চারণ ভূমি কোনক্রমেই দুর্লভ নয়।

এভাবে, সমাজে শ্রেণী–বৈষম্যের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত **আদিম গোত্র সাম্যবাদ** (প্রিমিটিভ ক্ল্যান কমিউনিজম) বিদ্যমান ছিল। এই সমাজ পদ্ধতিতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও গোত্র বিশেষে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, এসব বিশেষত্ব সত্ত্বেও, সমাজ-ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য রীতির ক্ষেত্রে সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার বিকাশের প্রাথমিক স্তর সর্বাধিক সাদৃশ্যই বহন করে।

সাম্যবাদ ও ব্যক্তি-মালিকানার বিলুপ্তির ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে, বুর্জোয়া বিজ্ঞানীরা বিষয়গুলোকে এমনভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করে, যেন ব্যক্তি-মালিকানা ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব আর এমনকি খোদ মানুষের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না। পুঁজিবাদের দাসানুদাসদের উদ্ভাবিত এই মিথ্যা গল্পকে মানব সমাজের প্রকৃত ইতিহাস সর্বাধিক নিঃসন্দেহেই খন্ডন করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমাজের বিভক্তির মতোই, ব্যক্তি-সম্পত্তিও তুলনামূলকভাবে সমাজ বিকাশের বেশ পরবর্তী স্তরেই উদ্ভূত হয়। ব্যক্তি-সম্পত্তি সম্পর্কে কোন নিম্নতম ধারণা ছাড়াই মানুষ হাজার হাজার বছর বাস করে এসেছে।

আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থায় কোন রাষ্ট্র ছিল না। ব্যক্তি–সম্পত্তির উদ্ভব ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমাজের বিভক্তির সাথে সাথে পরবর্তী সময়েই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। রাষ্ট্র সম্পর্কিত তাঁর বক্তৃতায় লেনিন নিম্নোক্ত কথাগুলি বলেছেন ঃ

"আদিম সমাজে মানুষ যখন ছোট ছোট পারিবারিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করতো এবং তখনও ছিল ক্রম-বিকাশের নিম্নতম স্তরে, এমন এক অবস্থায় যা বর্বরতার সমতুল্য – এমন এক কাল যার সাথে আধুনিক সভ্য মানব সমাজের রয়েছে হাজার হাজার বছরের ব্যবধান – তখন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কোন চিহ্নই ছিল না।.....

"কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যখন কোন রাষ্ট্র ছিল না, যখন সাধারণ বন্ধন, সমাজ নিজে, তার শৃংখলা ও কর্মবিন্যাস বজায় থাকতো রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য-প্রথার শক্তি দ্বারা ; কিংবা সেই কর্তৃত্ব ও মর্যাদা দ্বারা যা গোষ্ঠীর প্রধানরা কিংবা মেয়েরা ভোগ করতো – সেসব যুগে মেয়েরা যে প্রায়শঃই পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করতো তাই নয়, বরং অনেক সময় তারা এমনকি অধিকতর মর্যাদাও ভোগ করতো – এবং যখন ছিল না শাসন-কার্যে বিশেষজ্ঞ কোন বিশেষ ধরণের লোক। ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে, যখন ও যেখানেই সমাজে শ্রেণী-বিভাগ দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে এমন একটা বিভক্তি দেখা দিয়েছে, যেখানে তাদের কেউ কেউ অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করার মতো অবস্থান স্থায়ীভাবে লাভ করেছে, যেখানে কিছু লোক অন্যদের শোষণ করছে, সেখানেই মানুষের উপর দমন-পীড়নের এক বিশেষ যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে।" ["রাষ্ট্র", সঃ, রঃ, ২৯শ খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৫, পৃঃ ৪৭৪-৭৫]

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শাসক শ্রেণী ও শোষিত শ্রেণীতে সমাজের বিভক্তি কোনক্রমেই প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থার চিরন্তন ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য নয়। বিপরীত পক্ষে, আমরা দেখছি যে, শ্রেণী সম্পর্কে, বা শোষণ সম্পর্কে, কিংবা ব্যক্তি-সম্পত্তি সম্পর্কে কোন কিছু না জেনেই সমাজ অতি দীর্ঘ কাল পর্যন্ত টিকে ছিল।

আদিম সমাজের অবক্ষয়

আদিম যুগে ক্রম-বিকাশের পথ ধরে মানুষ অত্যন্ত ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছিলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও অগ্রগমন ঠিকই ঘটছিলো। মানব সমাজ কোন সময়ই স্থাণু অবস্থায় বসে থাকেনি। হাতিয়ার-পত্র ধীর গতিতে, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই উৎকর্ষতা লাভ করছিল। পূর্বতন সময়ে অ-বোধগম্য প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে মানুষ ব্যবহার করতে শিখলো। আগুনের আবিষ্কার এক বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করে। তারপর বর্বর যুগের মানুষেরা শিকারকার্যের জন্যে তীর ও ধনুক তৈরী করতে শিখলো। একটি পাথর, একটি লাঠি সহকারে যাত্রা শুরু করে, মানুষ ধীরে ধীরে লাঠিকে বর্শায় রূপান্তরিত করতে এবং পাথরকে শান দিতে শিখলো, যাতে তা শিকারকর্মের জন্যে আরো অধিক উপযোগী করে তোলা যায়। যখন মৃৎ-পাত্র তৈরীর কাজে সাফল্য অর্জিত হলো, যখন মানুষ কাদামাটি থেকে বাসন-পত্র তৈরী করতে শিখলো, তখন এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো। প্রথম গৃহপালিত পশু পোষ মানানো আর শস্য চাষাবাদ এক প্রচণ্ড ভূমিকা পালন করলো। এভাবেই পশুপালন ও কৃষিকর্ম শুরু হয়। আকরিক লৌহ কিভাবে গলাতে হয় তা আবিষ্কার করা, এবং লেখন-পদ্ধতি উদ্ভাবনের সাথে সাথে আদিম যুগের ঘটে পরিসমাপ্তি এবং শুরু হয় সভ্যতার যুগ। **কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে** মার্কস ও এঙ্গেলস্ লিখেছেন যে, এই স্থান থেকে শুরু করে মানব সমাজের গোটা ইতিহাস হলো শ্রেণী–সংগ্রামের ইতিহাস।

শ্রেণীর উদ্ভব কিভাবে ঘটেছিলো ? শ্রেণীর আবির্ভাব সমাজ বিকাশের গোটা প্রক্রিয়ার সাথে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। পশুকে পোষ মানানোর ঘটনা আদিম সমাজের গোত্র দলগুলোর অবশিষ্ট জনগণ থেকে পশু-পালক গোষ্ঠীগুলোকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দিকে চালিত করে। এটাই হলো প্রথম বৃহৎ সামাজিক শ্রম-বিভাগ (social division of labour)। এই সন্ধিক্ষণ থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদন করতে শুরু করে। পশু-পালক গোষ্ঠীগুলোর রয়েছে পশু-পালন জাত উৎপন্ন দ্রব্য ঃ পশু, পশম, মাংস, পশুর হাড় ইত্যাদি। গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়ের একটা ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রথম দিকে বিনিময়-কর্ম নির্বাহ হতো গোত্র সম্প্রদায়গুলোর প্রবীণদের দ্বারা ; বিনিময়ের প্রধান বস্তু হলো পশু। বিনিময় সর্বপ্রথম ঘটে এমন সমস্ত স্থানে যেখানে বিভিন্ন গোত্রের সাক্ষাৎ ঘটতো ; সম্প্রদায়গুলোর আলাদা আলাদা সদস্যদের মধ্যে নয়, বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রথমতঃ বিনিময় সংঘটিত হতো।

একই সময়ে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কাজকর্মের পুরাতন পদ্ধতি অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হলো। এসব পদ্ধতি দ্বারা ক্রমবর্ধমান সংখ্যক লোক নিজেদের খাদ্যের সংস্থান করতে পারতো না। কৃষি-কর্মের প্রথম পদক্ষেপ – চারা গাছ রোপণ – শুরু হয়। তৎকালীন পরিস্থিতিতে, জমি কর্ষণের ঘটনা, যার যার চাষাবাদযোগ্য জমির অংশ সহকারে, কয়েকটি পরিবারের মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

"পশুপালন, কৃষি, পারিবারিক হস্তশিল্প – সকল শাখায় উৎপাদনের বৃদ্ধি নিজের ভরণ পোষণের জন্যে যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী উৎপাদন করায় মানুষের শ্রমশক্তিকে সমর্থ করে তুলে। জনগোষ্ঠী, গৃহস্থ পরিবার বা একক পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের সকলের উপর দৈনন্দিন কাজের যে পরিমাণ দায়িত্ব পড়তো একই সময়ে তা সেটাও বাড়িয়ে দেয়। অধিক শ্রমশক্তি সংযোজন বাঞ্ছনীয় হয়ে ওঠে। যুদ্ধবিগ্রহ তার যোগান দেয়। বন্দী শত্রুদের দাসে রূপান্তরিত করা হয়। বিদ্যমান ঐতিহাসিক অবস্থায়, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, সম্পদ বৃদ্ধি করে, এবং উৎপাদনমূলক তৎপরতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে, প্রথম বৃহৎ সামাজিক শ্রম-বিভাগ অপরিহার্য রূপে তার পেছনে পেছনে বহন করে নিয়ে আসে ক্রীতদাস-প্রথা, প্রথম বৃহৎ সামাজিক শ্রমবিভাগ থেকে জন্ম নেয় দু'টি শ্রেণীতে সমাজের প্রথম বৃহৎ বিভক্তি – দাস-মালিক ও দাস, শোষক ও শোষিত।" [এঙ্গেলস্, "পরিবারের উৎস", পৃঃ ১৯৫]

যে পরিমাণে শ্রমের নতুন রূপ ও পদ্ধতি মানুষের আয়ত্বে আসতে লাগলো সে পরিমাণে শ্রম-বিভাগের আরো অধিক বিকাশ ঘটলো। মানুষ শিখলো আসবাব-পত্র তৈরী করতে, সব ধরণের হাতিয়ার-পত্র, বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র-পাতি ইত্যাদি প্রস্তুত করতে। এটা ক্রমান্বয়ে কৃষি থেকে হস্তশিল্পের বিচ্ছিন্নতা ঘটালো। এই সবকিছুই বিনিময়-প্রথার বিকাশের ভিত্তি বিপুলভাবে বিস্তৃত করলো।

আদিম সাম্যবাদের লয়প্রাপ্তির ফলশ্রুতিতে ঘটলো এজমালি মালিকানা থেকে গৃহপালিত পশুর ব্যক্তি-মালিকানায় রূপান্তর। জমি ও হাতিয়ার-পত্রও ব্যক্তি-সম্পত্তিতে পরিণত হলো। ব্যক্তি-মালিকানার সূচনার সাথে সাথে অসাম্যের উদ্ভব ও ভিত্তি স্থাপিত হলো।

"মুক্ত মানুষ ও ক্রীতদাসদের মধ্যেকার পার্থক্যের সাথে যুক্ত হলো ধনী ও গরীবের মধ্যেকার পার্থক্য। এই ঘটনা ও নতুন শ্রম-বিভাগ স্থাপন করলো শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমাজের নতুন বিভক্তি।" [ঐ, পৃঃ ১৯৮]

প্রাক্–ধনবাদী শোষণের রূপসমূহ

আদিম সাম্যবাদের অবক্ষয়ের সাথে সমাজে শোষক ও শোষিতের বিভক্তি দেখা দেয়। এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে যারা অন্যের শ্রমের ফল ভোগ করে বেঁচে থাকে। এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর উপর শোষণ – এটাই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের বিকাশের বিভিন্ন স্তরকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। কিন্তু, বিকাশের বিভিন্ন স্তরে, শোষণের রূপ-সমূহ, অর্থাৎ যে পদ্ধতির সাহায্যে এক শ্রেণীর শ্রমের ফল ভোগ করে অন্য শ্রেণী বেঁচে থাকে, তা বদলে যায়।

"ক্রীতদাস-প্রথা, যা সভ্যতার আমলে সর্বোচ্চ বিকাশ লাভ করে, প্রবর্তন করে সমাজের মধ্যে শোষক ও শোষিত শ্রেণীতে সমাজের প্রথম বড় বিভক্তি। সভ্যতার গোটা কালে এই বিভক্তি অব্যাহত থাকে। সুপ্রাচীন জগতের বৈশিষ্ট্যসূচক শোষণের প্রথম রূপ হলো ক্রীতদাস-প্রথা। তারপর মধ্যযুগে এর অনুগামী হয়ে আসে ভূমিদাস-প্রথা, আর সাম্প্রতিককালে মজুরী-দাসত্ব। এগুলোই হলো সভ্যতার তিনটি বড় বড় যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক দাসত্বের তিনটি বড় বড় রূপ। এই রূপগুলোর অপরিবর্তনীয় চিহ্ন হলো হয় নগ্ন, না-হয়, আধুনিক যুগের ছদ্মাবরণকৃত দাসত্ব।" [এঙ্গেলস, ঐ, পৃঃ ২১৪]

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, কোন নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায়, উৎপাদন-যন্ত্রের সাথে তাদের সম্পর্ক অনুসারেই শ্রেণীসমূহের অবস্থানের ভিন্নতা হয়। ক্রীতদাস-প্রথা, ভূমিদাস-প্রথা ও পুঁজিবাদী-প্রথা – শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের এই তিন মূল রূপের প্রত্যেকটিরই, এই দিক দিয়ে, তাদের নিজ নিজ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সামাজিক উৎপাদনের নিজস্ব গঠন-কাঠামো, উৎপাদন-সম্পর্কের নিজস্ব ধরণ দ্বারাই শোষণমূলক সমাজের এইসব রূপের প্রত্যেকটির পার্থক্য নির্ধারিত হয়।

মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বিভিন্নমুখী যুগেও ক্রীতদাস-প্রথার দেখা পাওয়া যায়। ক্রীতদাস-প্রথা হলো শোষণের সবচেয়ে প্রাচীন রূপ। মানব সমাজের লিখিত ইতিহাসের ঠিক সূচনাকালেই এর সাক্ষাৎ মেলে।

দাস-প্রথায় শোষিত শ্রেণী হলো শোষকের সম্পত্তি। ঘর-বাড়ী, জমিজমা, পশু-পাখির মতোই, ক্রীতদাসদের মালিক হলো দাসপ্রভু। যে প্রাচীন রোমে দাস-প্রথার সমৃদ্ধি ঘটেছিল, সেখানে 'নির্বাক যন্ত্র' ও 'আধা-নির্বাক যন্ত্র' (গবাদি পশু) থেকে পার্থক্য করার জন্য দাসদের বলা হতো 'সবাক যন্ত্র'। দাসদের মনে করা হতো তার প্রভুর মালিকানাধীন অস্থাবর সম্পত্তি, আর দাসকে হত্যা করার জন্য দাস-প্রভুকে কোন কৈফিয়ত দিতে হতো না। দাস-মালিক তার সম্পত্তির অংশ হিসেবেই দাসদের বিবেচনা করতো, আর তার মালিকানাধীন ক্রীতদাসদের

সংখ্যা দ্বারাই সম্পত্তির পরিমাপ করা হতো। দাস-মালিক তার ক্রীতদাসদের কাজ করতে বাধ্য করতো। জোর-জবরদস্তির অধীনে, দৈহিক শাস্তির ভয়-ভীতির অধীনে সম্পাদিত শ্রমই হলো দাস-শ্রম। নিম্ন উৎপাদনী-ক্ষমতা ছিল দাস-শ্রমের বৈশিষ্ট্য। দাস-প্রথার অবস্থাধীনে কারিগরি অগ্রগতি ছিল অত্যন্ত শ্লথগতি সম্পন্ন। দাস-শ্রম দ্বারা নির্মিত সুবিশাল সৌধগুলো ক্রীতদাসদের বিশাল বাহিনীর পেশী-শক্তির প্রচেষ্টার জোরেই নির্মাণ করা হয়েছিল, যারা সবচেয়ে মামুলি ধরনের হাতিয়ার-পাতি দিয়েই কাজ করতো। দাস-মালিকদের পক্ষে ক্রীতদাসদের শ্রমকে লঘু করার ব্যবস্থা নেয়ার কোন কারণ ছিল না।

দাস-প্রথায় শোষণের পরিসীমা কি ছিল ? দাস-প্রথায় হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতিই কেবল নয়, বরং খোদ দাস-শ্রমিকদের মালিকও ছিল দাসপ্রভু। ক্রীতদাসরা ছিল তাদের প্রভুর সম্পত্তি। দাস-মালিক তার ক্রীতদাসদের খাওয়াতো-পরাতো ও রক্ষণাবেক্ষণ করতো, কারণ একটি বিশেষ দাসের মৃত্যু ছিল তার জন্য ক্ষতির বিষয়, তার সম্পত্তির কমতি স্বরূপ। উৎপাদিত-দ্রব্যের বিনিময় যে পর্যন্ত অনগ্রসর ছিল, সে পর্যন্ত শুধু তার নিজ রাজ্যের অভ্যন্তরে যেসব জিনিসের চাহিদা রয়েছে সেসব জিনিস উৎপাদন করতেই দাস-মালিক তার ক্রীতদাসদের বাধ্য করতো। দাস-প্রথায় শাসকশ্রেণীর জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল অযৌক্তিক ভোগ-বিলাস ও অপব্যয়। কিন্তু ভোগ-বিলাস যত বেশীই হোক না কেন, দাস-শ্রমের একটা সীমা ছিল, কারণ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী বাড়তি উৎপন্ন-দ্রব্য ব্যবহার করার সুযোগ ছিল না। দাস-প্রথায় ধন-সম্পদের বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এটাই দাস-প্রথায় কারিগরী উন্নতির স্বল্পতার কারণ হিসেবে কাজ করে।

শ্রেণী-আধিপত্যের সাথে একত্রেই বলপ্রয়োগের যন্ত্র হিসেবে **রাষ্ট্রের** উদ্ভব ঘটে, শোষক সংখ্যালঘিষ্ঠের জন্যে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠদের খেটে মরতে তা বাধ্য করে। প্রাচীন যুগের দাস-মালিক সমাজে রাষ্ট্র ছিল বর্তমান কালের চেয়ে সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যোগাযোগ ব্যবস্থা তখনও ছিল অনগ্রসর, পাহাড়-পর্বত ও সাগর-মহাসাগর যে বাধা উপস্থিত করে তা অতিক্রম করা ছিল দুঃসাধ্য। রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি – রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপ পূর্ব থেকেই দাস-প্রথায় বিরাজমান ছিল। তথাপি, রাষ্ট্রের রূপ যাই থাক না কেন, দাস-মালিকদের প্রভুত্বের এক যন্ত্র হিসেবেই তা বিদ্যমান ছিল। সাধারণভাবে সমাজের সদস্য হিসেবে ক্রীতদাসদের বিবেচনা করা হতো না।

বিশেষ করে প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোমে, দাস-মালিক সমাজ বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক অগ্রগতির এক উচ্চ স্তরে আরোহণ করে। কিন্তু, তা ছিল এমন এক সংস্কৃতি যা অগণিত সংখ্যক দাসের কঙ্কাল-স্তূপের উপরই গড়ে উঠেছিল।

ঘন ঘন যুদ্ধ-বিগ্রহের আমলে দাসে পরিণত হওয়া লোকের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যায়। ক্রীতদাসদের জীবন ছিল অতি মাত্রায় সস্তা আর শোষকশ্রেণী তাদের জীবনের অবস্থাকে করে তুলেছিল পুরোপুরিভাবেই অসহনীয়। দাস-যুগের ইতিহাস হলো শোষক ও শোষিতের মধ্যেকার রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস। দাস-মালিকদের বিরুদ্ধে দাসদের অভ্যুত্থানগুলো নির্দয় নিষ্ঠুরতার সাথেই দমন করা হতো।

বিশেষ করে দাস-সমাজের টিকে থাকার শেষ যুগে দাস-বিদ্রোহসমূহ দাস-মালিক সমাজের খোদ ভিত্তিমূলই কাঁপিয়ে তোলে। যখন রোমানদের নিকট পরিচিত দুনিয়ার সবচেয়ে দূরবর্তী অঞ্চলে একের পর এক দেশ জয় করে রোমান সাম্রাজ্য বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে, তখন সে সময়ের সমাজের গোটা সৌধ-কাঠামোকে যেসব দ্বন্দ্ব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল তার আঘাতে তা আরো টলমল করে উঠে। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে রোমে যে দাস-বিদ্রোহ দেখা দেয় তা হলো বিশেষ ভাবে খ্যাতিসম্পন্ন,

যে স্পার্টাকাস দাস-মালিকদের শাসনের বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। দাসদের বিদ্রোহ শোষিতদের জয়ী করতে পারেনি, পারেনি সাধারণভাবে শোষণের অবসান ঘটাতে। সুস্পষ্ট উপলব্ধি সম্পন্ন লক্ষ্যে নিজেদের নিয়োজিত করার মতো অবস্থায় দাসেরা ছিল না। নিজেদের সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয়ার মতো একটা শক্তিশালী সংগঠন তারা গড়ে তুলতে পারেনি। প্রায়শঃই দাসেরা হয়ে পড়তো নিজেদের মধ্যে লড়াইরত শোষকশ্রেণীর বিভিন্ন দলের হাতের পুতুল। তা সত্ত্বেও, গৃহযুদ্ধ ও দাস-বিদ্রোহগুলো দাস-মালিক ব্যবস্থার সমাজকে কঠোর আঘাত হানে, এবং তার ধ্বংসের ভিত্তিভূমি তৈরী করে। কিন্তু, দাস-প্রথার স্থলে মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর শোষণের এক নতুন রূপ উদ্ভূত হয়। এই রূপ হলো **সামন্ততন্ত্র** যা সমগ্র মধ্যযুগ ধরে প্রচলিত ছিল আর যার বিকাশের সর্বশেষ স্তর ছিল **ভূমিদাস-প্রথা**। সামন্ততন্ত্র তুলনামূলকভাবে বিকাশের এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার অধীনস্থ ছিল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশাল কৃষক সাধারণ সামন্ত-ভূম্যধিকারীদের (barons) এক ক্ষুদ্র দল দ্বারা শোষিত হতো। কৃষকরা যে জমিতে চাষ করতো সেই জমির উপর সর্বোচ্চ ক্ষমতা সামন্ত 'ব্যারন'রা তাদের নিজেদের হাতে রেখেছিল। জমিতে চাষাবাদের অধিকার লাভের বদলে কৃষককে তাদের ভূস্বামীদের বহুসংখ্যক সামন্ত সেবা-কর্মের বশীভূত থাকতে হতো।

যে পর্যন্ত স্বাভাবিক-অর্থনীতি (natural economy), অর্থাৎ বিনিময়ের জন্যে নয়, সরাসরি ব্যবহারের জন্যে উৎপাদন বিরাজমান ছিল, সে পর্যন্ত সামন্ত শোষণ তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল সামন্ত-প্রভুরা তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্যে কৃষকদের কাছ থেকে কৃষিজাত উৎপন্ন-দ্রব্যের একটা নির্দিষ্ট অংশ কেড়ে নিত। এসব উৎপন্ন-দ্রব্যের বড় অংশই ভূস্বামী ও তার সৈন্য-সামন্তরা ভোগ করতো, আর একটা ক্ষুদ্র অংশই কেবল অস্ত্রশস্ত্র, কিছু ভিন্‌দেশীয় দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদির বিনিময়ার্থে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু বিনিময়-প্রথার বিকাশ সামন্ত-প্রভুদের লালসা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে তোলে। এখন ভূস্বামী ও চাকর-বাকরদের জন্যে যে কর আদায় করা হতো, কৃষকদের কাছ থেকে সেই কর নিংড়ে নিয়েই তারা ক্ষান্ত হলো না, বরং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ার্থে জোর করে আদায়কৃত করের পরিমাণও অব্যাহতভাবে বাড়তে লাগলো। বিনিময়-ব্যবস্থা যতই বিকশিত হলো, ততই সামন্ত-প্রভু কর্তৃক কৃষকদের উপর ক্রমবর্ধমান শোষণের সম্ভাবনা বাড়তে থাকলো। বিনিময়-প্রথার বিকাশ সামন্ত-প্রভু ও তার উপর নির্ভরশীল কৃষকদের মধ্যেকার প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক ভেঙ্গে দিল এবং ভূমিদাস-প্রথার উদ্ভবের দিকে চালিত করলো।

ভূমিদাস-প্রথা কৃষকদের উপর জমিদারদের নিষ্ঠুরতম ধরনের এক শোষণের রূপকেই তুলে ধরে। ভূমিদাস-প্রথায় মৌলিক উৎপাদন-যন্ত্র – জমি – ছিল জমিদারদের অধিকারে। পুরুষানুক্রমে কৃষকরা যে জমি চাষাবাদ করে আসছিল সে জমিকে জমিদাররা আত্মসাৎ করে নেয়। কিন্তু তাতেও তারা সন্তুষ্ট থাকলো না। যে রাষ্ট্র-ক্ষমতা আবার তাদেরই হাতে, সেই ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে তারা পূর্বে মুক্ত কৃষককে তাদের ভূমিদাসে রূপান্তরিত করে। কৃষকরা জমির সাথে থাকে বাঁধা এবং কার্যতঃ জমিদারদের সম্পত্তিতেই পরিণত হয়।

সর্ব উপায়ে নিজেদের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে জমিদাররা তাদের ভূমিদাসদের উপর শোষণ বাড়িয়ে দেয়। ভূমিদাস-প্রথার যুগে পূর্ব থেকেই বিনিময়-প্রথা বেশ পরিমাণে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিল। বণিকেরা সামন্ত ভূমিদাস-মালিকদের সকল ধরনের বিদেশী দ্রব্য-সামগ্রী সরবরাহ করতো। মুদ্রা অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আরো বেশী মুদ্রা হস্তগত করার উদ্দেশ্যে ভূমিদাস-মালিকরা কৃষকদের কাছ থেকে অধিক থেকে অধিকতর শ্রম নিংড়ে নিতে থাকে। কৃষকদের হাত থেকে তারা জমি কেড়ে নেয়, বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ করে

দেয় ; এবং এগুলোর স্থলে তাদের নিজেদের খামার স্থাপন করে, যে খামারে ঐ একই কৃষকদের কাজ করতে তারা বাধ্য করে। **বেগার খাটার প্রথা** (corvee service) চালু করা হয় ঃ প্রভুর খামারে সপ্তাহের তিন বা চার দিন কৃষককে কাজ করতে হবে, আর নিজের বরাদ্দকৃত জমিতে কেবলমাত্র অবশিষ্ট দিনগুলোতেই কাজ করতে পারবে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে, কৃষকদের "কাজের বদলে খাজনা" (quitrent) পরিশোধের ব্যবস্থা দ্বারা ভূমিদাস-মালিক জমিদাররা কৃষকের মাঠ থেকে ফসলের ক্রমবর্ধমান অংশ আত্মসাৎ করে নেয়। ভূমিদাসদের উপর শোষণ জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সবচেয়ে তিক্ত সংগ্রামের জন্ম দেয়। প্রত্যেক দেশের ইতিহাসেই বিপুল সংখ্যক কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা নজরে পড়ে। ভূমিদাস-প্রথার যুগে বহু দেশেই (যেমন, জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়াতে) কৃষক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এসব কোন কোন অভ্যুত্থান কয়েক দশক ধরে টিকে ছিল। এইসব দেশ দশকের পর দশক ধরে গৃহযুদ্ধের কবলে ছিল। জমিদারেরা ও তাদের সরকার এসব অভ্যুত্থানকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। ভূমিদাস-প্রথার পতন ত্বরান্বিত করা এবং ভূমিদাস শোষণের পরিবর্তে পুঁজিবাদী শোষণ প্রতিষ্ঠার জন্যে উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের এই সংগ্রামকে কাজে লাগায়।

এক সামাজিক-প্রথার রূপ দ্বারা অন্য সামাজিক-প্রথার রূপকে স্থলাভিষিক্ত করা প্রসঙ্গে স্তালিন বলেছেন ঃ

"দাসদের বিপ্লব দাস-প্রথার অবসান ঘটায় এবং শ্রমজীবী জনগণকে শোষণ করার দাসতান্ত্রিক প্রথাকে বিলুপ্ত করে। তদ্‌স্থলে তা প্রবর্তন করে সামন্ত শাসক ও শ্রমজীবী জনগণকে শোষণের ভূমিদাস-প্রথা। এক দল শোষকের স্থান দখল করে আরেক দল শোষক। দাস-প্রথার যুগে 'আইন' দাস-মালিককে দিয়েছিল দাসদের হত্যা করার অধিকার। ভূমিদাস-প্রথায় 'আইন' ভূমিদাস-মালিককে 'কেবলমাত্র' দিয়েছিল ভূমিদাসকে বিক্রী করার অধিকার।

"ভূমিদাস-কৃষকদের বিপ্লব ভূমিদাস-মালিকদের ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং শোষণের ভূমিদাস-প্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল। কিন্তু এগুলোর স্থলে তা প্রবর্তন করে পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের, শ্রমজীবী জনগণকে শোষণের পুঁজিবাদী ও ভূস্বামী-প্রথা। এক দল শোষকের স্থান দখল করে আরেক দল শোষক। ভূমিদাস ব্যবস্থায় 'আইন' দিয়েছিল ভূমিদাসদের বিক্রী করার অধিকার। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 'আইন' শ্রমজীবী জনগণকে কেবলমাত্র দিয়েছে বেকারত্ব ও দারিদ্রের শিকারে পরিণত হওয়ার, অনাহারে ধ্বংস ও মৃত্যুবরণ করার অধিকার।

"একমাত্র আমাদের সোভিয়েত বিপ্লব, একমাত্র আমাদের অক্টোবর বিপ্লবই প্রশ্নটিকে এভাবে উপস্থিত করেছে – এক দল শোষকের স্থলে আরেক দল শোষককে অভিষিক্ত করা নয়, এক রূপের শোষণের স্থলে আরেক রূপের শোষণকে প্রতিষ্ঠিত করা নয়, বরং সকল শোষণকে মুছে ফেলা, সকল ও প্রত্যেক ধরনের নতুন ও পুরাতন ধনিক ও নিপীড়কদের নিশ্চিহ্ন করা।" [যৌথ খামার 'শক ব্রিগেডে'র প্রথম নিখিল-রুশ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, পৃঃ ৮]

বিনিময়-প্রথার উদ্ভব ও বিকাশ

আমরা দেখেছি যে, মানুষের ইতিহাসের অতি প্রাচীনকালেই বিনিময়-প্রথার উদ্ভব ঘটে। সমাজে শ্রম-বিভাগের প্রথম পদক্ষেপগুলোর সাথে একত্রেই বিনিময়-প্রথার ভিত্তি রচিত হয়। প্রথম দিকে কেবলমাত্র প্রতিবেশী কমিউনগুলোর মধ্যেই বিনিময় সংঘটিত হতো, প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের বাড়তি উৎপন্ন-দ্রব্যের সাথে অন্যের বাড়তি উৎপন্ন-দ্রব্যের বিনিময় করতো। কিন্তু, কমিউনগুলোর সীমান্তে জন্ম নিলেও, এই বিনিময়-প্রথা অবিলম্বেই কমিউনের অভ্যন্তরস্থ পারস্পরিক সম্পর্ক সমূহের উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে। মুদ্রার আবির্ভাব ঘটে। প্রথম দিকে যেসব উৎপন্ন-দ্রব্য ছিল বিনিময়ের প্রধান প্রধান বস্তু, সেগুলোই মুদ্রা হিসেবে কাজ করে। এভাবে বহু ক্ষেত্রেই যখন পশুপালক গোত্র বা গোষ্ঠীর সাথে বিনিময় ঘটতো, তখন গবাদি পশুই মুদ্রা হিসেবে কাজ করতো। কোন গোত্রের সম্পত্তি – পরিমাপ করা হতো তাদের মালিকানাধীন পশুর সংখ্যা দ্বারা।

কিন্তু বিনিময়ের উদ্ভবের পরেও দীর্ঘকাল ধরে স্বাভাবিক-উৎপাদন প্রচলিত ছিল। যে দ্রব্য-উৎপাদন বিনিময়ের উদ্দেশ্যে করা হয় না তাকে বলে **স্বাভাবিক-উৎপাদন** [natural production]। বিপরীতপক্ষে বাজারে বিক্রয়ের জন্য, বিনিময়ের জন্যে, দ্রব্যের উৎপাদনকে বলা হয় **পণ্য-উৎপাদন** [commodity production]।

দাসতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের যুগে স্বাভাবিক-উৎপাদনই অধিকতর প্রভাবশালী ছিল। স্বাভাবিক-উৎপাদনের অধিক প্রভাবশীলতার ভিত্তিতেই প্রাক-ধনবাদী শোষণের রূপ সমূহ আবির্ভূত ও বিকশিত হয়। কেবল বিনিময়-প্রথার পর্যায়ক্রমিক বিকাশই এসব সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।

ক্রমবিকাশের এই স্তর সম্পর্কে এঙ্গেলস্ যা বলেছেন তা হলো ঃ

"আমরা সবাই জানি, সমাজের আদি স্তরগুলোতে উৎপাদিত-দ্রব্যগুলো উৎপাদকদের নিজেদের দ্বারাই ব্যবহৃত হতো আর এসব উৎপাদকরা কম বা বেশী সাম্যবাদী কমিউনগুলোতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠিত ছিল ; কমিউন বহির্ভূতদের সাথে উদ্বৃত্ত উৎপাদিত-দ্রব্যের বিনিময় হলো উৎপাদিত-দ্রব্যের পণ্যে রূপান্তরের ভূমিকা স্বরূপ, আর তা হলো পরবর্তী কালেরই ঘটনা, প্রথমতঃ তা সম্পাদিত হতো কেবলমাত্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ভিন্ন ভিন্ন কমিউনের মধ্যে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে কমিউনের অভ্যন্তরেও তা কার্যকর হতে থাকে এবং বড় বা ছোট পারিবারিক গ্রুপে ভেঙ্গে যেতে বস্তুগতভাবে সাহায্য করে। কিন্তু এই ভেঙ্গে যাওয়ার পরেও, বিনিময় পরিচালনাকারী পরিবারগুলোর প্রধানরা শ্রমজীবী কৃষকই থেকে যায়, যারা পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে তাদের সকল চাহিদা পূরণের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই উৎপাদন করতো এবং তাদের নিজস্ব উদ্বৃত্ত উৎপন্ন-দ্রব্যের বিনিময়ে বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রীর এক অতি সামান্য অংশই কেবল যোগাড় করতো। পরিবারের সভ্যরা কেবলমাত্র কৃষিকর্ম ও পশুপালনেই ব্যাপৃত থাকতো না, বরং এসব কিছু থেকে প্রাপ্ত উপকরণাদিকে ব্যবহারযোগ্য বস্তুসামগ্রীতেও রূপান্তরিত করতো, কোন কোন স্থানে এখনও পরিবারের লোকেরা হস্তচালিত যাঁতা দিয়ে আটা-ময়দা পেশাই করে, রুটি বানায়, লিনেন ও পশমের সূতা তৈরী করে, রঙ লাগায় ও বয়ন করে, চামড়া পাকা করে, কাঠের ঘর-দোয়ার তৈরী ও মেরামত করে, শ্রমের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি তৈরী করে, প্রায়শঃই কামার ও সুতারের কাজ করে, যাতে ঐ পরিবার বা পারিবারিক দল, মূলতঃ, স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকে।

"জার্মানীতে এমনকি ঊনবিংশ শতকের এই গোড়ার দিকেও, এই ধরণের একটি পরিবার বিনিময় বা ক্রয়ের মাধ্যমে অন্যদের কাছ থেকে যে মুষ্টিমেয় কিছু জিনিস যোগাড় করতো তার অন্তর্ভূক্ত ছিল প্রধানতঃ হস্তশিল্পীদের উৎপাদিত দ্রব্য, অর্থাৎ, এসব জিনিস কৃষকরা নিজেরা তৈরী করতে একেবারেই যে অসমর্থ ছিল তা নয়, বরং তারা নিজেরা যে সেগুলো উৎপাদন করতো না তা হয় একমাত্র এ কারণেই যে কাঁচামাল তাদের নিকট সহজলভ্য ছিল না, না-হয় কেনা সামগ্রী ছিল বেশ পরিমাণে উত্তম কিংবা অতিমাত্রায় সস্তা।" [এঙ্গেলস্ "পুঁজি" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ক্রোড়পত্র, জার্মান সংস্করণ, ১৮৯৫]

সুতরাং, দাসতন্ত্রে ও মধ্যযুগেই কেবল নয়, নতুন অবস্থায়ও স্বাভাবিক-উৎপাদন প্রচলিত ছিল। পুঁজিবাদের সূচনাতে পণ্য-উৎপাদন কোনক্রমেই অধিক প্রভাবশালী ছিল না। পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশই কেবল স্বাভাবিক-উৎপাদনের ওপর মরণ–আঘাত হানে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ই কেবল পণ্য-উৎপাদন, বাজারে বিক্রীর জন্য উৎপাদন হয়ে ওঠে উৎপাদনের নির্ধারক, প্রাধান্যপূর্ণ রূপ।

প্রাক্-ধনবাদী সমাজের অভ্যন্তরে, শ্রম-বিভাগের বৃদ্ধির সাথে একত্রেই পণ্য-উৎপাদন প্রথা আরো বেশী মাত্রায় বিকশিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যের ঘটনা হলো কৃষিকর্ম থেকে হস্তশিল্পের আলাদা হয়ে পড়া। যেখানে চাষী কৃষক মূলতঃ স্বাভাবিক-উৎপাদক হিসেবেই তার ক্ষেত-খামার চালায় সেখানে কারিকরদের সম্পর্কে একই কথা বলা চলে না। হস্তশিল্প খোদ সূচনা থেকেই সুস্পষ্টভাবে পণ্য-উৎপাদন মূলক চরিত্র-বিশিষ্ট। কারিকর যখন এক জোড়া জুতা কিংবা এক প্রস্থ ঘোড়ার জিন-সাজ, লাঙ্গল কিম্বা ঘোড়ার পায়ের নাল, মাটি বা কাঠের বাসন-পত্রাদি তৈরী করে, তখন গোড়া থেকেই সে সেগুলো তৈরী করে বাজারের জন্যে, বিক্রয়ের জন্যে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য-উৎপাদনের বিসদৃশে, কারিকর যে সমস্ত শ্রমের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতো সেগুলোর মালিক ছিল সে নিজে। সাধারণ নিয়মে সে কেবল তার নিজ শ্রমশক্তিই প্রয়োগ করতো। একমাত্র পরবর্তীকালেই, শহর-নগর গড়ে ওঠার সাথে সাথে, কারিকর মাইনা দিয়ে শিক্ষানবিস ও শিক্ষিত কারিকর নিয়োগ করতে শুরু করে। সব শেষে, কারিকর সাধারণতঃ স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে কাজ করতো এবং স্থানীয় বাজারেই তার পণ্য-সামগ্রী বিক্রী করতো। বাজারে বিক্রয়ের জন্যে, অথচ মজুরী-শ্রম ছাড়া যখন দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়, তখন আমরা তাকে বলি **সরল পণ্য-উৎপাদন** [simple commodity production], পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদন থেকে যা ভিন্ন।

এঙ্গেলস্ বলেছেন,

"পুঁজিবাদী উৎপাদনের পূর্বে, অর্থাৎ মধ্য যুগে উৎপাদন-যন্ত্রের উপর ঃ ক্ষুদে কৃষক, মুক্ত মানুষ বা ভূমিদাসদের কৃষি-ভিত্তিক শিল্প আর শহরের হস্তশিল্পের উপর – শ্রমিকের ব্যক্তি-মালিকানার ভিত্তিতে, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনই ছিল সাধারণভাবে প্রচলিত। জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি, ছোট কারখানা ও তার হাতিয়ারপত্র – এসব শ্রম প্রয়োগের হাতিয়ার ছিল স্বতন্ত্র ব্যক্তিদেরই শ্রমের হাতিয়ার, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যেই তা প্রস্তুতকৃত, আর সে কারণে স্বভাবতই নিকৃষ্ট, আকারে ছোট ও সীমিত।" ["এন্টি-ডুরিং", পৃঃ ৩০১]

সরল পণ্য-উৎপাদন ও পুঁজিবাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় নিহিত ? কারিকর, হস্তশিল্পী, ক্ষুদে কৃষক সকলেই নিজেদের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক। তারা নিজেরাই কাজ করে, এসব উৎপাদন-যন্ত্রের সহায়তায় তাদের জিনিসপত্র উৎপাদন করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিষয়টি অন্য রকমের। এখানে কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরীর মালিক পুঁজিপতি শ্রেণী আর সেখানে কাজ করে মজুরী-খাটা শ্রমিকরা, যাদের নিজস্ব কোন উৎপাদন-যন্ত্র নেই। সরল পণ্য-উৎপাদন সব সময়ই পুঁজিবাদের পূর্বানুগামী। সরল পণ্য-উৎপাদন ছাড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উদ্ভূত হতে পারতো না। প্রথমোক্তটি পুঁজিবাদের পথ প্রস্তুত করে দেয়।

বিপরীতক্রমে, সরল পণ্য-উৎপাদনের ক্রমবিকাশ অপরিহার্য রূপে পুঁজিবাদের দিকে পরিচালিত হয়। ক্ষুদ্রায়তন পণ্য-উৎপাদন পুঁজির জন্ম দেয়।

মার্কসবাদের অন্যতম একটি অপব্যাখ্যা হলো পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক পূর্বসূরী হিসেবে সরল পণ্য-উৎপাদনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার অপচেষ্টা। মার্কসবাদের এই বিকৃতির রাজনৈতিক তাৎপর্য অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, এমন-কি বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদের অধিকতর প্রতিপত্তির আমলেও পূর্ববর্তী ব্যবস্থার বহু নিদর্শন এখনও টিকে আছে, অর্থাৎ সরল পণ্য-উৎপাদনের বিপুল-সংখ্যক উপাদান লক্ষ-কোটি ক্ষুদে কৃষক, কারিকর ও হস্তশিল্পী এখনও টিকে আছে। আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন, কিন্তু পুঁজিবাদের অসহনীয় জোয়ালের অধীনে যন্ত্রণা-কাতর, এসব ব্যাপক সংখ্যক ক্ষুদে পণ্য-উৎপাদক এমন এক মজুদ বাহিনী গঠন করছে যা থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামে সর্বহারাশ্রেণী তাঁর মিত্র খুঁজে পায়। সরল পণ্য-উৎপাদনের ভূমিকা ও তাৎপর্যের বিকৃতি সাধন সর্বহারা বিপ্লবের মিত্র হিসেবে মৌলিক কৃষক জনগণের ভূমিকার প্রতি অস্বীকৃতির ভিত্তি রচনা করে। প্রতিবিপ্লবী ট্রটস্কিবাদী তত্ত্বের মূলেই রয়েছে এই বিকৃতি।

এক ধরনের চীনা দেয়াল দিয়ে পুঁজিবাদ থেকে সরল পণ্য-উৎপাদনকে আলাদা করার প্রচেষ্টাও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের কম স্থূল বিকৃতি নয়। লেনিন নিয়তই এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, ক্ষুদে পণ্য-উৎপাদন প্রতি দিন, প্রতি ঘন্টা, প্রতি মূহূর্তেই পুঁজিবাদের জন্ম দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থায় এই নীতির প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন সেইসব দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের তুলে ধরা মতামতের দিকেই ঠেলে দেয়, যারা গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন চিরস্থায়ী করে রাখার পক্ষে ওকালতি করে, এবং তা বৃহদায়তন সামাজিক উৎপাদনের নীতিমালার ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের আবশ্যকতা সম্পর্কে উপলব্ধি হীনতার দিকেই চালিত করে।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের উৎপত্তি

সামন্ত-ভূমিদাস প্রথার অভ্যন্তরেই পুঁজিবাদের উদ্ভব। পুঁজির সবচেয়ে প্রাচীন রূপ হলো ব্যবসায়ী ও মহাজনী পুঁজি [commercial and usurer capital]। পুরানো স্বাভাবিক অর্থনীতির মধ্যে যতই বিনিময়-প্রথার বিকাশ ঘটতে থাকে, ততই বণিকেরা আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। বণিক-পুঁজিপতিরা ভূমিদাস-মালিক সামন্ত-জমিদারদের সব ধরনের বিলাস-দ্রব্য সরবরাহ করতে থাকে এবং সেই সূত্রে বেশ মুনাফা কামাতে থাকে। ভূমিদাসদের শুষে-নিংড়ে জমিদাররা যে খাজনা আদায় করতো তার একটি অংশ এভাবে ব্যবসায়ী পুঁজির প্রতিনিধি বণিকদের পকেটে গিয়ে জমা হতো। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটার সাথে সাথে মহাজনী কারবারও বিকাশ লাভ করে। জমিদার, রাজা, শাসকবর্গ – এসব মহাপ্রভুদের ক্রমবর্ধমান হারে বেশী বেশী টাকার দরকার হয়ে পড়লো। উন্মত্ত ভোগ-বিলাস ও অপচয় আর বিরামহীন যুদ্ধ-বিবাদ বিপুল পরিমাণ টাকা গ্রাস করলো। এভাবে মহাজনদের তৎপরতার ভিত্তি তৈরী হলো। চড়া সুদে সামন্ত-প্রভুদের টাকা দিয়ে, কুসিদজীবী মহাজনেরা ভূমিদাসদের শ্রম নিংড়ে আদায়কৃত করের এক বিরাট অংশ গ্রাস করতে লাগলো।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ জীবনে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে ব্যবসায়ী ও মহাজনী পুঁজি অপ্রতিহতভাবে এই সমাজের অবক্ষয় ঘটায় এবং তার ভিত্তি দুর্বল করে দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে জমিদার শ্রেণী কর্তৃক ভূমিদাসদের উপর শোষণ অব্যাহতভাবে প্রবল হতে থাকে। মাত্রাতিরিক্ত শোষণ ভূমিদাস-প্রথার ভিত্তি কৃষক-অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেয়। কৃষক-অর্থনীতি হয়ে পড়ে শক্তিহীন, জমিদারদের বিপুল আয় যোগাতে অসমর্থ হয়ে কৃষককূলও হয়ে পড়ে নিঃস্ব, ক্ষুধার রাজ্যে নিপতিত। একই সাথে মহাজনী পুঁজি সামন্ত জমিদারীগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে গ্রাস করে, দলে-পিষে তার প্রাণবায়ু নির্গত করে দেয়। ভূমিদাস প্রথার অবক্ষয় পুঁজিবাদী উৎপাদনের উত্থানের পথ তৈরী করে দেয়।

ব্যবসায়ী-পুঁজি প্রথম দিকে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যেই নিয়োজিত ছিল। কারিকর ও ভূমিদাসদের দ্বারা যোগানকৃত উৎপন্ন-দ্রব্য এবং সাথে সাথে দূরের দেশগুলো থেকে আমদানীকৃত দ্রব্যাদি দিয়েই ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর এসব উৎস অপ্রতুল প্রতিপন্ন হয়। ক্ষুদ্রায়তন হস্তশিল্পজাত উৎপাদন কেবল সীমিত পণ্য-সামগ্রীই সরবরাহ করতে পারতো, স্থানীয় বাজারের জন্যেই যা নিছক যথেষ্ট। যখন অধিক দূরবর্তী বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন শুরু হলো তখন উৎপাদন সম্প্রসারণ করার আবশ্যকতা দেখা দিল।

কিন্তু কেবলমাত্র পুঁজিই উৎপাদনের সম্প্রসারণ করতে পারতো। ক্ষুদ্রায়তন পণ্য-উৎপাদন এক্ষেত্রে ছিল ক্ষমতাহীন ; এর সম্ভাবনাসমূহ ছিল নিতান্তই সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ। তখন ক্ষুদ্রায়তন-উৎপাদন থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদনে উত্তরণ ঘটলো, যা প্রাক-ধনবাদী শোষণ পদ্ধতিসমূহ ধ্বংস করে দিল কেবলমাত্র সেগুলোর স্থানে মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের সর্বশেষ রূপ পুঁজিবাদী শোষণকে অভিষিক্ত করার জন্যে।

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন থেকে পুঁজিবাদে এই উত্তরণ সম্পর্কে লেনিন নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"পুরানো অবস্থাধীনে দেশের সকল সম্পদই বাস্তবতঃ উৎপাদিত হতো ক্ষুদে-উৎপাদকদের দ্বারা, যারা ছিল জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। জনসাধারণ গ্রামাঞ্চলে স্থায়ী জীবন যাপন করতো, তাদের বেশীর ভাগ উৎপাদনই হতো হয় তাদের নিজেদের ভোগের জন্য, না হয় পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের ছোট ছোট হাটের জন্য, নিকটবর্তী অন্যান্য বাজারের সাথে যেগুলোর যোগাযোগ ছিল খুবই কম। খোদ এই ক্ষুদে-উৎপাদকরা আবার জমিদারদের জন্যও কাজ করতো, যারা মূলতঃ তাদের নিজেদের ভোগের জন্য জিনিসপত্র তৈরী করতে এদের বাধ্য করতো। গৃহে উৎপাদিত কাঁচামাল কারিকরদের নিকট দেয়া হতো নানা জিনিস তৈরী করার জন্য, যে কারিকররা গ্রামেই বাস করতো তবে কাজ পাওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত।

"তবে ভূমিদাস-কৃষকদের মুক্তি অর্জনের পর, ব্যাপক জনগণের জীবন ধারণের এইসব অবস্থার এক পরিপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় ঃ ক্ষুদে কারিকর প্রতিষ্ঠানের স্থলে আসতে শুরু করে বড় বড় কারখানা, যেগুলো অসাধারণ দ্রুততার সঙ্গে বাড়তে থাকে। ক্ষুদে-উৎপাদকদের এগুলো উচ্ছেদ করে দেয়, তাদের পরিণত করে মজুরী-শ্রমিকে, আর লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বাধ্য করে একত্রে কাজ করতে, উৎপাদন করে বিপুল পরিমাণ পণ্য-সামগ্রী যেগুলো সারা রাশিয়া জুড়ে বিক্রী করা হয়। ·····

"বৃহদায়তন উৎপাদন সর্বত্রই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের স্থলাভিষিক্ত হয়, আর এসব বৃহদায়তন উৎপাদনে ব্যাপক শ্রমিক সাধারণ পুঁজিপতিদের দ্বারা মজুরীর বদলে কর্মরত নিছক ভাড়াখাটা ব্যক্তিতে পরিণত হয়, যে পুঁজিপতিরা হলো বিরাট পুঁজির মালিক, যারা বিরাটাকারের কারখানা নির্মাণ করে, যারা বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করে, এবং একত্রীভূত মজুরদের বিপুলায়তন উৎপাদনের সমস্ত মুনাফাই নিজেদের পকেটস্থ করে। উৎপাদন হয়ে পড়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন, আর তা সকল ক্ষুদে-উৎপাদকদের উপর নির্দয় ও নির্মম চাপ প্রয়োগ করে, ভেঙে দেয় গ্রামদেশে তাদের স্থিতিশীল জীবন, বাধ্য করে তাদের সাধারণ অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে, পুঁজিপতিদের নিকট তাদের শ্রমশক্তি বিক্রী করতে। জনসংখ্যার এক ক্রমবর্ধমান অংশই চিরদিনের জন্যে গ্রামাঞ্চল থেকে, আর কৃষিকর্ম থেকে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং জড়ো হয় শহর, কারখানা এবং শিল্প এলাকা ও বসতিতে, সৃষ্টি হয় বিশেষ ধরনের বিত্তহীন শ্রেণীর মানুষ, মজুরী-খাটা সর্বহারা শ্রমিকের শ্রেণী, যারা বেঁচে থাকে কেবল তাদের শ্রমশক্তি বিক্রী করেই।" ["সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন্য কর্মসূচীর খসড়া ও ব্যাখ্যা", সঃ রঃ, ২য় খন্ড, ইং সং, মস্কো, ১৯৬৫, পৃঃ ৯৯-১০০]

নিরীক্ষামূলক প্রশ্নাবলী

১। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ কিভাবে বসবাস করতো ?
২। শ্রেণীর উৎপত্তি কিভাবে হয় ?
৩। শ্রেণী-শোষণের মৌলিক ঐতিহাসিক রূপগুলো কি কি ?
৪। দাস-প্রথায় শোষক ও শোষিতের মধ্যেকার সম্পর্ক কি ছিল ?
৫। ভূমিদাস-প্রথায় শোষক ও শোষিতের মধ্যেকার সম্পর্ক কি ছিল ?
৬। পুঁজিবাদী উৎপাদনের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য কি ?
৭। বিনিময়-প্রথার উদ্ভব ও বিকাশ কিভাবে ঘটলো ?
৮। কেন ক্ষুদ্রায়তন পণ্য-উৎপাদন পুঁজিবাদের জন্ম দেয় ?

তৃতীয় অধ্যায়

পণ্য-উৎপাদন

পুঁজিবাদী উৎপাদনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমতঃ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য-উৎপাদন প্রাধান্যপূর্ণ থাকে। দ্বিতীয়তঃ, মনুষ্য-শ্রমজাত উৎপন্ন- দ্রব্যই কেবল নয়, বরং খোদ শ্রমশক্তিই পণ্যে পরিণত হয়।

পণ্য-উৎপাদন ছাড়া পুঁজিবাদকে কল্পনাও করা যায় না। বিপরীত পক্ষে, পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশের বহু পূর্ব থেকেই পণ্য-উৎপাদনের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, কেবল পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ই পণ্য-উৎপাদন সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

সুতরাং, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি অধ্যয়ন করতে গেলে, প্রথমতঃ পণ্য-উৎপাদন, তার বৈশিষ্ট্যাবলী ও নিয়ম-বিধি অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

পুঁজিবাদী দেশসমূহে কোন পরিকল্পনা ছাড়াই উৎপাদন চালানো হয়। যাবতীয় ফ্যাক্টরী ও কল-কারখানার মালিক হলো পুঁজিপতি শ্রেণী। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটিই বাজারে বিক্রীর জন্য পণ্য উৎপাদন করে। কিন্তু পুঁজিপতিকে কেউ বলে দেয় না তার কারখানায় কোন্ পণ্য আর কি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করতে হবে। কারখানা ও ফ্যাক্টরীর মালিক উৎপাদন বাড়াতে বা কমাতে পারে, কিংবা, তার ইচ্ছা হলে, গোটা কারখানাই বন্ধ করে দিতে পারে। খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র, ইত্যাদি জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় জিনিস জনসাধারণের আছে কি-না তা নিয়ে পুঁজিপতির মাথাব্যথা নেই। প্রত্যেক কারখানা ও ফ্যাক্টরী মালিক একটি জিনিসই কেবল চিন্তা করে ঃ কিভাবে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়। যদি কোন একটি প্রতিষ্ঠান তার কাছে লাভজনক মনে হয় তাহলে বিপুল আগ্রহ নিয়েই সে তা বিবেচনা করে। যদি মুনাফার কোন আশা না থাকে, তাহলে তা নিয়ে সে আর মাথা ঘামায় না।

যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকার শ্রমিকশ্রেণীরই হাতে আর যেখানে রয়েছে পরিকল্পিত অর্থনীতি, সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া গোটা বিশ্বে এরূপ এক ব্যবস্থাই বিদ্যমান রয়েছে, যে ব্যবস্থায় উৎপাদন সামগ্রিকভাবেই রয়েছে পুঁজিপতিদের হাতে, যারা – শ্রমজীবী জনসাধারণকে শোষণ করে নিজেদের জন্যে যতদূর সম্ভব অধিক মুনাফা নিংড়ে নেয়ার একমাত্র স্বার্থেই – উৎপাদন-কর্ম পরিচালনা করে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের নৈরাজ্য [anarchy] বিরাজ করে ; সামাজিক উৎপাদনের কোন পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা সেখানে নেই এবং থাকতেও পারে না।

"শ্রমিকদের ওপর শোষণ বৃদ্ধির জন্যে এবং মুনাফা বৃদ্ধির জন্যে পুঁজি ফ্যাক্টরীর অভ্যন্তরে শ্রমিকদের সংগঠিত করে ও নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে, বিশৃংখলার রাজত্ব চলতে থাকে ও বাড়তে থাকে, চালিত করে সংকটের দিকে, যখন স্তূপীকৃত সম্পদের ক্রেতা খুঁজে পাওয়া যায় না, আর কোন কাজ খুঁজে না পাওয়ার কারণে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক থাকে উপোস।" [লেনিন, "টেলর পদ্ধতি – যন্ত্রের হাতে মানুষের দাসত্ব", সঃ রঃ, ২০শ খণ্ড, ইং সং, মস্কো, ১৯৬৬, পৃঃ ১৫৩]

পণ্য কি ?

যে সূক্ষ্ম ব্যবস্থা-কৌশল পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিরাজমান উৎপাদনের নৈরাজ্যকে পৃথক করে চিনতে শেখায় তা আমাদের এখন বোঝার চেষ্টা করতে হবে। পুঁজিবাদী সমাজে

পণ্য-উৎপাদন প্রাধান্যপূর্ণ। ধরা যাক, কোন পুঁজিপতির মালিকানাধীন কারখানায় রেড়ির তেল প্রস্তুত করা হয়। এর অর্থ কি এই যে, সমস্ত রেড়ির তেল মালিক নিজেই খেয়ে ফেলে? অথবা ধরা যাক, কোন পুঁজিবাদী কর্মশালায় ব্যাপক আকারে শবাধার (কফিন) তৈরী করা হয়; এটা স্পষ্ট, শবাধারগুলো মালিকের জন্য নয়। বিপুলায়তন কারখানায় তৈরী করা হয় প্রভূত পরিমাণ ইস্পাত ও লোহা; এটা স্পষ্ট, এসব ধাতুর প্রয়োজন মালিকের নিজের নেই। পুঁজিবাদী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রস্তুত বিভিন্ন ধরনের সকল উৎপাদিত দ্রব্যই বিক্রীর জন্য তথা বাজারের জন্য উৎপাদন করা হয়। নিজের ব্যবহারের জন্য নয়, বিক্রীর জন্য প্রস্তুত সকল শ্রমজাত উৎপন্ন-দ্রব্যকে বলা হয় পণ্য।

আমরা পূর্বেই দেখেছি, যে স্বাভাবিক-অর্থনীতির অধীনে প্রত্যেক পরিবার বা 'কমিউন' তাদের প্রয়োজনীয় সকল কিছু নিজেরাই উৎপাদন করতো, পণ্য-উৎপাদন সেই স্বাভাবিক অর্থনীতিকে ক্রমান্বয়ে কেবল ক্ষয় ও ধ্বংসই করে দেয়। স্বাভাবিক-অর্থনীতির ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে টিকে ছিল। অতীতের প্রাক্-ধনবাদী শোষণ-প্রণালী – দাসতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র – প্রচলিত স্বাভাবিক-অর্থনীতির পাশাপাশিই বিরাজমান ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। এই ব্যবস্থা সূচনাকাল থেকেই বিনিময়ের বিকাশ তথা পণ্য-উৎপাদনের বিকাশের সাথে যুক্ত।

"যেসব সমাজে পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথা প্রচলিত সেসব সমাজের সম্পদ পণ্যের প্রভূত পুঞ্জীভবন রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তার একক [unit] হলো পৃথক পৃথক প্রতিটি পণ্য।" [মার্কস, "পুঁজি", ১ম খন্ড, ইং সং, মস্কো, ১৯৬৫, পৃঃ ৩৪]

এই কথাগুলো দিয়েই মার্কস-এর প্রধান রচনা **"পুঁজি"** শুরু হয়েছে। এই রচনাতে মার্কস যেসব অর্থনৈতিক নিয়ম পুঁজিবাদী সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তা আবিষ্কার করায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। পণ্য সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ প্রদান পূর্বক, পণ্য-উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ম-বিধি উদ্ঘাটন করেই মার্কস তাঁর এই রচনা শুরু করেছেন।

পণ্যের দুটি গুণ

মনুষ্য শ্রমজাত উৎপন্ন-দ্রব্যকে কোন-না-কোন মানবিক চাহিদা পূরণ করতে হবে, অন্যথায় তার জন্য শ্রম ব্যয় করার কোন সার্থকতাই নেই। শ্রমজাত প্রত্যেক উৎপন্ন-দ্রব্যের এই গুণকে বলা হয় তার **ব্যবহারিক-মূল্য** [use value]। উদাহরণস্বরূপ, একটি ঘড়ির ব্যবহারিক-মূল্য হলো তা আমাদের সময় বলে দেয়। মোটেই মনুষ্য শ্রমজাত নয়, এমন বহু জিনিসেরই ব্যবহারিক-মূল্য আছে, যেমন, উৎসমুখের পানি কিংবা বনে-জঙ্গলে জন্মান ফল। স্বাভাবিক-উৎপাদন ও পণ্য-উৎপাদন – উভয় উৎপাদনেই ব্যবহারিক-মূল্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নিজের ব্যবহারের জন্য কৃষক যে ফসল ফলায় তা তার খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে। সুতরাং ফসলের ব্যবহারিক-মূল্য রয়েছে।

কিন্তু, পূর্বেই আমরা দেখেছি, কোন পুঁজিবাদী দেশে একজন কৃষক বিক্রীর জন্যে যে ফসল উৎপাদন করে সেই ফসল পণ্যে পরিণত হয়। এই ফসলেরও ব্যবহারিক-মূল্য রয়েছে, কারণ তা মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে; কিন্তু যদি কোন কারণবশতঃ উক্ত ফসল তার এই গুণ হারিয়ে ফেলে (উদাহরণস্বরূপ, যদি তা পচে যায় এবং ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে) তাহলে কেউই তা কিনবে না।

একই সাথে, এই ফসল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণও অর্জন করে। এই ফসল পণ্যে পরিণত হয়, অন্য যেকোন পণ্যের সাথে এর বিনিময় হতে পারে। এখানে প্রথমেই যা নজরে পড়ে, তা হলো, বিনিময়-যোগ্যতার গুণ, অর্থাৎ অন্যান্য বহু সংখ্যক পণ্যের সাথে এর বিনিময় হয়। পণ্যে পরিণত হয়ে, অর্থাৎ, বিনিময়ের জন্য উৎপাদিত হয়ে কোন উৎপন্ন-দ্রব্য যখন এই নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, তখন তা পণ্য-অর্থনীতিতে এক প্রচণ্ড ভূমিকা পালন করে।

"প্রথমতঃ, পণ্য হলো এমন এক জিনিস যা মানুষের চাহিদা মেটায়; আর দ্বিতীয়তঃ, তা হলো এমন জিনিস যা অন্য কোন জিনিসের সাথে বিনিময় করা যায়। কোন জিনিসের উপযোগিতাই তাকে **ব্যবহারিক-মূল্য** দান করে। **বিনিময়-মূল্য** (বা সহজ কথায়, মূল্য) হলো প্রথমতঃ যে অনুপাত তথা হারে এক প্রকার ব্যবহারিক-মূল্যের নির্দিষ্ট সংখ্যার সাথে অন্য প্রকার ব্যবহারিক-মূল্যের নির্দিষ্ট সংখ্যার বিনিময় হয়। প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এরূপ লক্ষ লক্ষ সংখ্যক বিনিময়ের ঘটনা প্রতিনিয়তই, এমন কি সবচেয়ে বিভিন্নমুখী ও তুলনার অযোগ্য, প্রত্যেক ধরনের ব্যবহারিক-মূল্য একে অপরের সাথে সমীকরণ করছে।" [লেনিন ঃ "কার্ল মার্কস", সঃ রঃ, ২১শ খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৫, পৃঃ ৫৯-৬০]

কোন পণ্যের ব্যবহারিক-মূল্য ও মূল্যের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব আছে। পণ্যের উৎপাদকের নিকট ঐ পণ্যের কোন ব্যবহারিক-মূল্য নেই, অন্যদের নিকটই তার ব্যবহারিক-মূল্য আছে। বিপরীত পক্ষে, ব্যবহারের নিমিত্ত পণ্যের কোন ক্রেতার নিকট ঐ পণ্যের শুধু ব্যবহারিক মূল্যই আছে, এবং তার নিকট ঐ পণ্যের কোন বিনিময়-মূল্য আর নেই। যখন কোন উৎপাদক তার পণ্য বিনিময় করে ফেলে তখন সে তার পরিবর্তে ঐ পণ্যের মূল্য ফেরৎ পায়, কিন্তু সে ঐ পণ্যের ব্যবহারিক-মূল্য আর কাজে লাগাতে পারে না, কারণ ইতোমধ্যেই তা অন্য কারো হাতে চলে গিয়েছে। পণ্য হলো এমন এক উৎপন্ন-দ্রব্য যা তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য নয়, বরং বাজারে বিক্রীর জন্যই উৎপাদিত হয়। এতদনুসারে, পণ্য হলো নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের প্রতিনিধি। পণ্যের উৎপাদক ও সমগ্রভাবে সমাজের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তারই প্রতিনিধি হলো পণ্য। কিন্তু এই সম্পর্কটি প্রত্যক্ষ নয়। সমাজ প্রত্যেক উৎপাদককে বলে দেয় না ঠিক কোন পণ্য আর তা কি পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে। পণ্য-উৎপাদন প্রথায় সমাজের গোটা উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিকল্পিত তথা সচেতনভাবে পরিচালিত হয় না এবং হতে পারেও না।

শ্রমই মূল্য সৃষ্টি করে

পণ্যের মূল্য কিসের উপর নির্ভর করে? কোন কোন পণ্য দুর্মূল্য, কোন কোন পণ্য সস্তা। মূল্যের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের কারণ কি? বিভিন্ন পণ্যের ব্যবহারিক-মূল্যের মধ্যে এত ব্যাপক পার্থক্য থাকে যে পরিমাণগত (সংখ্যামাত্রিক) দিক দিয়ে তাদের মধ্যে সমতুলনা চলে না। উদাহরণ স্বরূপ, অশোধিত লোহা ও গো-মাংসের কাবাবের ব্যবহারিক-মূল্যের মধ্যে কি কোন মিল আছে? অতএব, ব্যবহারিক-মূল্যের মধ্যে নয়, বরং অন্য কোন কিছুর মধ্যেই মূল্যের গূঢ় রহস্যকে আমাদের খুঁজতে হবে। মার্কস বলেছেন ঃ

"অতএব পণ্যের ব্যবহারিক মূল্যকে যদি আমরা বিবেচনার বাইরে রাখি, তাহলে তাদের একটিমাত্র সাধারণ গুণই অবশিষ্ট থাকে – তাহলো, সেগুলো শ্রমজাত উৎপন্ন-দ্রব্য।" [পুঁজি"- ১ম খণ্ড, ঐ, পৃঃ ৩৮]

কোন পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তা উৎপাদন করতে গিয়ে ব্যয়িত মনুষ্য-শ্রমের পরিমাণ দ্বারা।

যে পর্যন্ত বিনিময় ছিল বিরল, সে পর্যন্ত উৎপন্ন-দ্রব্যের বিনিময় হতো দৈবক্রমিক অনুপাত অনুসারে। যখন আদিম যুগের কৃষি-কর্মে নিয়োজিত গোষ্ঠী বা কমিউনের কোন সভ্যের সাথে কোন শিকারীর সাক্ষাৎ ঘটতো এবং শস্যের বদলে কিছু মাংসের বিনিময় হতো, তখন বিনিময়ের হার নির্ধারিত হতো দৈবক্রমিক পরিস্থিতি দ্বারা। কিন্তু বিনিময়-প্রথার বিকাশের সমান্তরালে ঘটনাবলীর আমূল পরিবর্তন হতে থাকে।

স্বাভাবিক অর্থনীতির ধ্বংসপ্রাপ্তির সাথে সাথে, বিনিময়ের অনুপাত ক্রমশঃই বিনিময়কৃত দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের অধিকতর কাছাকাছি আসতে থাকে। সরল পণ্য-উৎপাদন প্রথায় যখন একজন কৃষক কোন কারিকর কর্তৃক নির্মিত একখানি কুঠারের বদলে কিছু শস্য বিনিময় করতো, তখন কারিকরকে সেই পরিমাণ শস্যই তাকে দিতে হতো যে শস্য কুঠার তৈরী করতে গিয়ে ব্যয়িত শ্রমের প্রায় সম-পরিমাণেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

পুঁজিবাদের উদ্ভবের পূর্বে সরল পণ্য-উৎপাদনের পরিবেশে তাদের মূল্য অনুসারে বিভিন্ন পণ্যের বিনিময়কে এঙ্গেলস্ যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হলো নিম্নরূপ ঃ

"সুতরাং বিনিময়ের দ্বারা প্রাপ্ত পণ্য-সামগ্রী উৎপাদন করতে কি পরিমাণ শ্রম-সময় দরকার মধ্য যুগের কৃষক তা বেশ যথাযথ রূপেই জানতো। কামার ও গাড়োয়ানরা তার চোখের সামনেই কাজ করতো, যেমন করতো মুচি ও দর্জিরা, যারা আমার যৌবনকালে, আমাদের রাইন নদীর তীরের কৃষকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফিরতো, গৃহ-নির্মিত বস্তু ও চামড়া থেকে কাপড়-চোপড় ও জুতো তৈরী করতো। কৃষকেরা ও যাদের কাছ থেকে কৃষকেরা কেনা-কাটা করতো – তারা উভয়ই ছিল খোদ শ্রমজীবী ঃ বিনিময়কৃত সামগ্রীগুলো ছিল তাদের নিজেদের শ্রমেই উৎপাদিত। এসব জিনিস উৎপাদন করতে তারা কি ব্যয় করতো ? তারা ব্যয় করতো শ্রম এবং কেবলমাত্র শ্রম ; কারণ কাজের যন্ত্রপাতি পুনর্নির্মাণের জন্যে, কাঁচামাল উৎপাদনের জন্যে, আর সেগুলোকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় লাগাবার জন্যে, নিজস্ব শ্রম-শক্তি ছাড়া তারা আর কিছুই ব্যয় করতো না ; তাহলে এগুলোর উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের সম-অনুপাত ছাড়া অন্য কিভাবে তারা তাদের এসব উৎপাদিত দ্রব্য অন্য শ্রমিকের উৎপাদিত দ্রব্যের সাথে বিনিময় করতে পারতো ? বিনিময়ের ক্ষেত্রে কতগুলো জিনিসের সাথে কতগুলো জিনিসের বিনিময় হবে তার মান নির্ধারণের জন্যে এসব উৎপন্ন-দ্রব্যে ব্যয়িত শ্রম-সময়ই হলো একমাত্র যথার্থ মাপকাঠি, অন্য কোন মাপকাঠি বরং একেবারেই অচিন্ত্যনীয়। অথবা কেউ কি বিশ্বাস করেন, কৃষক ও কারিকররা এতই বোকা ছিল যে, যে জিনিস তৈরী করতে দশ ঘন্টার শ্রম লেগেছে সে জিনিস তারা বিনিময় করবে এমন জিনিসের সাথে যা তৈরী করতে ব্যয় হয়েছে মাত্র এক ঘন্টার শ্রম ? কৃষকদের স্বাভাবিক অর্থনীতির গোটা যুগ ধরে বিনিময়কৃত পণ্যের পরিমাণ সেইসব পণ্যের মধ্যে প্রযুক্ত শ্রম দ্বারা পরিমাপ করার ঝোঁক অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় প্রদর্শন করে, আর এ ছাড়া অন্য কোন বিনিময়-প্রথা সম্ভব ছিল না। .....

"নগরকেন্দ্রিক কারিকরদের উৎপন্ন-দ্রব্যের সাথে কৃষকদের উৎপন্ন-দ্রব্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। প্রথম দিকে, ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতা ছাড়াই, হাটের দিনে শহরে এই বিনিময় সরাসরি ঘটতো, যেখানে কৃষকেরা তাদের উৎপন্ন-দ্রব্য বিক্রী করতো এবং কেনা-কাটাও করতো। এক্ষেত্রেও, কারিকররা যে অবস্থায় কাজ করে সে সম্পর্কে কৃষকরাই কেবল অবহিত ছিল না, বরং কারিকররাও কৃষক-শ্রমের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল। কারণ, সে নিজেই তখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণে একজন কৃষকই বটে, তার নিজের শুধু একখানা সব্জিক্ষেত ও ফলের বাগানই যে ছিল, তাই নয়, বরং প্রায়শঃই এক টুকরা চাষাবাদযোগ্য জমি, দু-একটা গরু, শুকর, হাঁস-মুরগী ইত্যাদিও তার ছিল।" [এঙ্গেলস্, "পুঁজি" গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ক্রোড়পত্র]

বহুসংখ্যক স্বতঃপ্রমাণিত ঘটনা এ সত্যের সুনিশ্চয়তা দান করে যে, পণ্যের মধ্যে প্রযুক্ত শ্রম অনুসারেই পণ্যসমূহের বিনিময় হয়। এককালে যেসব বহু সংখ্যক পণ্য খুব দুর্মূল্য ছিল, বর্তমান সেগুলো বেশ সস্তা হয়ে উঠেছে, কারণ আধুনিক কারিগরী উন্নতির সাথে সাথে এগুলো তৈরী করতে এখন স্বল্প শ্রম লাগে। উদাহরণস্বরূপ, যে এলুমিনিয়াম থেকে বর্তমানে বাসনপত্র ও অন্যান্য বহু জিনিসপত্রাদি প্রস্তুত করা হয়, কয়েক দশক পূর্বেও তা ছিল রৌপ্যের চেয়ে আট বা দশ গুণ ব্যয়বহুল। তখন এর প্রতি কিলোগ্রামের দাম ছিল ২২৫ ডলার। কিন্তু বিদ্যুৎকৌশল বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এত স্বল্প শ্রমে এলুমিনিয়াম উৎপাদন সম্ভব হয়ে উঠলো যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই প্রতি কিলোগ্রাম এলুমিনিয়ামের দাম প্রায় ২৭ সেন্টে নেমে আসলো, হয়ে উঠলো হাজার গুণ সস্তা [১০০ সেন্টে ১ ডলার – অনুঃ]। তা এত সস্তা হয়ে ওঠার কারণ এই যে, বর্তমানে তা উৎপাদন করতে অতি স্বল্প শ্রম লাগে।

সুতরাং কোন পণ্যের মূল্য নির্ভর করে **তার উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণের** উপর। যদি একই পরিমাণ শ্রম দিয়ে আমরা অধিক সংখ্যক পণ্য উৎপাদন করি, তাহলে আমরা শ্রমের বর্ধিত উৎপাদন-ক্ষমতার কথাই উল্লেখ করি, বিপরীত পক্ষে কম-সংখ্যক পণ্য উৎপাদন করলে, আমরা উৎপাদন-ক্ষমতার হ্রাসের কথাই বলি। এটা স্বতঃপ্রতীয়মান যে, শ্রমের বর্ধিত উৎপাদন-ক্ষমতার অর্থ হলো একটি নির্দিষ্ট পণ্যের কেবলমাত্র একটি উৎপাদন করতে গিয়ে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয়িত হতো, শ্রমের সেই পরিমাণের ক্ষেত্রে হ্রাসপ্রাপ্তি। ফলতঃ মূল্যের ক্ষেত্রেও হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটবে, এই বিশেষ ধরনের প্রতিটি পণ্য সস্তা হয়ে পড়বে। বিপরীতপক্ষে, উৎপাদন-ক্ষমতার ক্ষেত্রে হ্রাসপ্রাপ্তি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটাবে। সুতরাং এটা বলা হয় যে, শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার আর একটি একক পণ্যের মূল্যের অনুপাত পরস্পর বিপরীত [in inverse ratio] (অর্থাৎ, একটি যখন বাড়ে অন্যটি তখন কমে, এবং তদ্বিপরীতে একটি যখন কমে, অন্যটি তখন বাড়ে)। সে কারণে মার্কস বলেছেন ঃ

"কোন পণ্যের মূল্য ..... ঐ পণ্যের মধ্যে প্রযুক্ত শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার বিপরীতক্রমেই ..... পরিবর্তিত হয়।" ["পুঁজি", ১ম খণ্ড, ঐ, পৃঃ ৪১]

কোন পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে যে শ্রম ব্যয় হয়, তা দ্বারাই ঐ পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। পণ্যের মূল্য ঐ পণ্যের মধ্যে প্রযুক্ত (জমাটবদ্ধ) নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-সময় ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যখন এক পণ্যের সাথে অন্য পণ্যের তুলনা করা হয়, কেবল তখনই মূল্য নিজেকে অভিব্যক্ত করে তোলে। ধরা যাক, এক টন লোহার আর এক কিলোগ্রাম রূপার মধ্যে একই পরিমাণ শ্রম প্রযুক্ত আছে। তাহলে এক টন লোহা মূল্যের দিক দিয়ে এক কিলোগ্রাম রূপার সমান হবে। কোন একটি পণ্যের মূল্য যখন অপর একটি পণ্যের মূল্যের সঙ্গে তুলনায় অভিব্যক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় তার বিনিময়-মূল্য। বিনিময়-মূল্যই হলো সেই রূপ [form] যার মধ্যে মূল্য নিজেকে প্রকাশ করে। একই সাথে এটা সুস্পষ্টভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এই রূপের মধ্যে আমরা কেবল পাচ্ছি পণ্যের মধ্যে প্রযুক্ত শ্রম-সময়ের প্রতিনিধিত্বকারী মূল্য।

উন্নত পণ্য-উৎপাদন প্রথায় যখন মুদ্রার মাধ্যমে পণ্যের বিনিময় হয়, তখন প্রতিটি পণ্যকেই নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার সাথে তুলনা করা হয়। পণ্যের মূল্য অভিব্যক্ত হয় মুদ্রার অঙ্কে। বিনিময়-মূল্যই হয়ে দাঁড়ায় পণ্যের দাম [price]। **মুদ্রার হিসাবে অভিব্যক্ত কোন নির্দিষ্ট পণ্যের মূল্যই হলো তার দাম।**

পণ্যের মধ্যে আন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে বুঝতে হলে, যে শ্রম দিয়ে পণ্য উৎপাদিত হয় সেই শ্রমের বিশেষত্বগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

বিমূর্ত ও মূর্ত শ্রম

পণ্য বিনিময় করতে গিয়ে মানুষ সর্বাধিক বিভিন্ন ধরনের শ্রমের তুলনা করে। একজন মুচির শ্রম একজন ঢালাইকরের শ্রম থেকে বহু দিক দিয়েই ভিন্ন। খনি-শ্রমিকের শ্রমের সাথে দর্জির শ্রমের মিল খুব কমই আছে। প্রত্যেকটি একক পণ্য কোন বিশেষ পেশার কিংবা শিল্পের কোন বিশেষ শাখার শ্রমিকের শ্রম ধারণ করে। সকল পণ্যের বেলায় যা সাধারণ তা হলো সাধারণভাবে মনুষ্য-শ্রম, কিংবা, কোন কোন সময় যাকে বলা হয়, বিমূর্ত মনুষ্য-শ্রম [abstract human labour], যা প্রত্যেকটি পৃথক উৎপাদন-শাখার মূর্ত (অর্থাৎ, বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট) শ্রম থেকে ভিন্ন।

"কোন নির্দিষ্ট সমাজের সমগ্র শ্রমশক্তি হলো এক ও অভিন্ন মনুষ্য-শ্রমশক্তি, সমস্ত পণ্যের সর্বমোট মূল্যের মধ্যে যা প্রতিমূর্ত। লক্ষ লক্ষ বিনিময়-কর্ম এটাই প্রমাণ করে।" [লেনিন, "কার্ল মার্কস", ঐ, পৃঃ ৬০]

প্রতিটি বিশেষ পণ্য এই সাধারণ মনুষ্য-শ্রমের কেবল এক নির্দিষ্ট অংশই প্রকাশ করে।

মূর্ত শ্রম সৃষ্টি করে ব্যবহারিক-মূল্য। মুচির মূর্ত শ্রম জুতা তৈরী করে, খনি-শ্রমিকের মূর্ত শ্রম উৎপাদন করে কয়লা। কিন্তু, পণ্য-উৎপাদন প্রথায়, এই সব পণ্যের মূল্যে অভিব্যক্ত হয় কেবল মনুষ্য-শ্রমের, সাধারণভাবে মনুষ্য-শ্রমের ব্যয়।

"শরীর বিজ্ঞানের দিক থেকে বলতে গেলে, সমস্ত শ্রমই একদিকে হলো মনুষ্য শ্রম-শক্তির ব্যয়, আর অভিন্ন বিমূর্ত মনুষ্য-শ্রমের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে, তা পণ্যের মূল্য সৃষ্টি ও গঠন করে। অপর দিকে সমস্ত শ্রমই হলো এক বিশেষ রূপে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে মনুষ্য শ্রম-শক্তির ব্যয়, আর এই দিক দিয়ে, অর্থাৎ তার মূর্ত তথা কার্যকর শ্রমের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে, তা সৃষ্টি করে ব্যবহারিক-মূল্য।" [মার্কস্, "পুঁজি", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮]

পণ্য-উৎপাদন প্রথায় একই শ্রম হলো মূর্ত ও বিমূর্ত উভয়ই ঃ যে-পর্যন্ত তা ব্যবহারিক মূল্য সৃষ্টি করে সে-পর্যন্ত তা হলো মূর্ত শ্রম। আর যে-পর্যন্ত তা মূল্য সৃষ্টি করে সে-পর্যন্ত তা হলো বিমূর্ত শ্রম। একদিকে, প্রত্যেক উৎপাদকই নির্দিষ্ট ব্যবহারিক-মূল্য সৃষ্টি করে, যেমন, জুতা, কয়লা, বস্ত্র ইত্যাদি। মুচি, খনি-শ্রমিক, তাঁতী ইত্যাদির মূর্ত শ্রমেরই তা প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু অন্যদিকে, মুচি, খনি-শ্রমিক, তাঁতী সৃষ্টি করে জুতা, কয়লা, বস্ত্রের মূল্যও। নিজেদের সরাসরি ব্যবহারের জন্য তারা এগুলো উৎপাদন করে না, বরং বাজারে বিনিময়ের জন্যই উৎপাদন করে। বিমূর্ত, সর্বজনীন, মনুষ্য-শ্রম দ্বারাই মূল্য সৃষ্টি হয়।

শুরু থেকেই পণ্য তার দ্বৈত-প্রকৃতি প্রকাশ করেছে ঃ ব্যবহারিক-মূল্য রূপে আর মূল্য রূপে। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি, শ্রম নিজেও, অর্থাৎ পণ্যের মূর্ত শ্রমও তথা পুঁজিবাদী উৎপাদনে বিনিয়োজিত শ্রমও দ্বৈত চরিত্র বিশিষ্ট।

মূর্ত ও বিমূর্ত শ্রমের মধ্যেকার পার্থক্য ব্যবহারিক-মূল্য ও মূল্যের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের মধ্যেই স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায়। ব্যবহারিক-মূল্য হলো মূর্ত শ্রমের ফল, অন্যদিকে মূল্য হলো বিমূর্ত শ্রমের ফল।

এটা পুরোপুরিভাবেই স্পষ্ট যে, মূর্ত ও বিমূর্ত শ্রম রূপে শ্রমের এই বিভক্তি কেবলমাত্র **পণ্য-উৎপাদন প্রথায়ই** বিদ্যমান থাকে। শ্রমের এই দ্বৈত প্রকৃতিই পণ্য-উৎপাদনের মৌলিক দ্বন্দ্বকে উদ্ঘাটন করে দেয়।

পণ্য-উৎপাদন প্রথায়, একদিকে, সমাজের একজন বিশেষ ব্যক্তির সকল কাজই সর্বমোট সামাজিক শ্রমের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ, অন্যদিকে তা হলো ভিন্ন ভিন্ন, আলাদা আলাদা শ্রমিকের সুনির্দিষ্ট কাজ, স্বতন্ত্র শ্রম ; সুতরাং এটা স্পষ্ট যে মূর্ত ও বিমূর্ত শ্রমের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব কেবলমাত্র পণ্য-উৎপাদন প্রথার সাথে সাথে উদ্ভূত হয়, আর যে মুহূর্তে পণ্য-উৎপাদন বিলুপ্ত হয়ে যায়, সে মুহূর্তেই তা তিরোধান লাভ করে।

"কোন লোক যখন নিজের আশু ব্যবহারের জন্য, নিজের ভোগের জন্য, একটি জিনিস উৎপাদন করে, তখন সে একটি **উৎপন্ন-দ্রব্যই** [product] তৈরী করে, পণ্য তৈরী করে না। আত্ম-জীবিকা নির্ভর একজন উৎপাদক হিসেবে সমাজ নিয়ে তার মাথা ঘামাবার কিছুই নেই। কিন্তু পণ্য-উৎপাদন করতে গেলে, কোন লোকের পক্ষে সামাজিক চাহিদা পূরণ করে এমন দ্রব্য উৎপাদন করলেই কেবল চলবে না, বরং খোদ তার শ্রমকেই সমাজ কর্তৃক ব্যয়িত সর্বমোট শ্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে। সমাজের অভ্যন্তরস্থ শ্রম-বিভাগের অধীনস্থ তাকে হতে হবে। অন্যান্য শ্রম-বিভাগ ব্যতিরেকে এটা কিছুই নয়, আর তার নিজের পক্ষে আবশ্যক হলো সেগুলোকে পূর্ণ রূপ দান করা [integrate]।" [মার্কস, "মূল্য, দাম ও মুনাফা", পৃঃ ৩৮, মস্কো, ১৯৩৩]

পণ্য-অর্থনীতিতে, প্রত্যেক আলাদা শ্রমিকের কাজ সামগ্রিকভাবে সামাজিক শ্রমের কেবল এক অতি ক্ষুদ্র অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করে। প্রত্যেক তাঁতী, খনি-শ্রমিক বা যন্ত্র-শ্রমিকের কাজ সামাজিক উৎপাদনের সাধারণ শৃঙ্খলের অংশে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক কাজ এই শৃঙ্খলের কেবলমাত্র এক-একেকটি আংটা মাত্র। কিন্তু একই সাথে, পণ্য-উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি পৃথক কাজ স্বতন্ত্রও বটে। প্রত্যেক উৎপাদক নিজের কাজের ক্ষেত্রে অন্যান্য হাজার উৎপাদকের সাথে সংযুক্ত – এই অর্থে প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির শ্রম সামাজিক হয়ে ওঠে। কিন্তু, বিভিন্ন ব্যক্তি-বিশেষের শ্রম সর্ব-সামাজিক পরিধিতে সমন্বিত হয় না। এর সম্পূর্ণ বিপরীতে, প্রত্যেক স্বতন্ত্র শ্রমিকের শ্রমই হলো আলাদা, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

"পণ্য-উৎপাদন হলো সামাজিক সম্পর্কের এক ব্যবস্থা যেখানে বিভিন্ন উৎপাদক উৎপাদন করে বিভিন্ন উৎপন্ন-দ্রব্য (সামাজিক শ্রম-বিভাগ), আর যেখানে এসব সকল উৎপন্ন-দ্রব্যই বিনিময়ের প্রক্রিয়ায় একে অপরের সাথে সমীকরণকৃত হয়।" [লেনিন, "কার্ল মার্কস", পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬০]

স্বাধীন উৎপাদকদের স্বতন্ত্র শ্রমের সামাজিক প্রকৃতির অভ্যন্তরে বিদ্যমান এই দ্বন্দ্ব পণ্য উৎপাদন প্রথার সাথে সাথেই উদ্ভূত হয়, এবং তার সাথে সাথেই তিরোহিত হয়।

স্বাভাবিক অর্থনীতিতে এই দ্বন্দ্ব বিরাজ করে না। পৃথিবীর কোন দূরবর্তী বিচ্ছিন্ন কোণে নিভৃত কোন কৃষক-অর্থনীতি সম্পন্ন সমাজের কথা কল্পনা করা যাক। এই অর্থনীতি অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিচ্ছিন্ন ; ঐ অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় সবকিছুই কৃষি ক্ষেতে উৎপাদন করা হয়। শ্রম এখানে সামগ্রিকভাবে সমাজের শ্রমের অংশ নয়, শ্রম এক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবেই পৃথক ও স্বতন্ত্র প্রকৃতি সম্পন্ন। সে কারণে, পণ্য-উৎপাদন প্রথার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দ্বন্দ্ব এখানে বিরাজ করে না। কিন্তু, যদি আমরা সমাজতান্ত্রিক সমাজের কথা ধরি, তাহলে দেখা যাবে, পুঁজিবাদের সাথে তুলনায় সমাজের প্রত্যেক স্বতন্ত্র সদস্যের শ্রমের পরস্পর নির্ভরশীলতা এখানে আরো বেশী, তথাপি এক্ষেত্রেও পণ্য-উৎপাদন প্রথার দ্বন্দ্ব বিরাজমান নয় ; এখানে প্রত্যেক শ্রমিকের শ্রম হয়ে উঠেছে সামাজিক, হয়ে উঠেছে সাধারণ শ্রমের সংগঠিত অংশ। প্রত্যেক শ্রমিকের শ্রমের বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত প্রকৃতিও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। সকলের শ্রমের ফসল স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের নয়, সামগ্রিকভাবে সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

যদি কোন পণ্যের মূল্য তা উৎপাদন করতে গিয়ে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাহলে এটা মনে হতে পারে যে, একজন মানুষ যতই বেশী অলস কিম্বা অদক্ষ হবে, তার পণ্যের মূল্য ততই বেশী হবে।

সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রম

ধরা যাক, দু'জন মুচি পাশাপাশি কাজ করছে। একজন হলো দ্রুতগতিসম্পন্ন, সুদক্ষ এবং একদিনে সে এক জোড়া জুতা তৈরী করে। অন্যজন হলো অলস মদ্যপায়ী, এক জোড়া জুতা তৈরী করতে তার এক সপ্তাহ লাগে। এর অর্থ কি এই যে, দ্বিতীয় মুচির জুতা প্রথম মুচির জুতা থেকে অধিক মূল্য বহন করে ? অবশ্যই নয়। যখন আমরা বলি যে, কোন পণ্যের মূল্য তা উৎপাদন করতে গিয়ে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ দ্বারা, কিম্বা তার মধ্যে পুঞ্জীভূত শ্রম দ্বারাই নির্ধারিত হয়, তখন আমাদের মনে সেই শ্রম-সময়ের কথাই উদীত হয়, মার্কসের কথায়, যে শ্রম-সময় ঃ

" ..... উৎপাদনের স্বাভাবিক অবস্থায় এবং ঐ সময়ে বিরাজমান দক্ষতা ও তীব্রতার গড়পড়তা মান সহকারে একটি জিনিস তৈরী করতে আবশ্যক হয়। ইংল্যাণ্ডে শক্তি-চালিত তাঁতের প্রবর্তন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সূতাকে বস্ত্রে বয়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমকে সম্ভবতঃ অর্ধেক হ্রাস করে দেয়।" [মার্কস, "পুঁজি", ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০]

হস্তচালিত তাঁতের তাঁতী পূর্বে যেখানে দৈনিক নয় থেকে দশ ঘন্টা কাজ করতো তদ্‌স্থলে এখন তাকে আঠার থেকে বিশ ঘন্টা কাজ করতে হয়। তা সত্ত্বেও, তার বিশ ঘন্টা শ্রমের উৎপন্ন-দ্রব্য এখন মাত্র দশ ঘন্টার সামাজিক শ্রমের প্রতিনিধিত্ব করে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ সূতাকে বস্ত্রে রূপান্তরিত করার জন্য সামাজিকভাবে আবশ্যক দশ ঘন্টা শ্রমের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং যে জিনিস তৈরী করতে সে বর্তমানে বিশ ঘন্টা সময় ব্যয় করেছে, সেই জিনিসের মূল্য পূর্বের দশ ঘন্টা সময় ব্যয়ে প্রস্তুত জিনিসের মূল্যের চেয়ে বেশী নয়।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, কোন পণ্যের মূল্য, প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে তা উৎপাদন করতে গিয়ে ব্যয়িত শ্রমের উপর নয়, বরং তার উৎপাদনের জন্য গড়পড়তা প্রয়োজনীয় শ্রমের উপর, কিংবা, যেভাবে বলা হয়ে থাকে, সামাজিক গড়পড়তা বা সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রমের [socially necessary labour] উপর নির্ভর করে।

সরল শ্রম ও দক্ষ শ্রম

সরল শ্রম ও দক্ষ শ্রমের মধ্যেও আমাদের পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। একজন রাজমিস্ত্রি ও একজন ঘড়ির কারিগরের কথাই ধরা যাক। রাজমিস্ত্রির এক ঘন্টার শ্রম ঘড়ির কারিগরের এক ঘন্টার শ্রমের সমান হতে পারে না। কেন ? রাজমিস্ত্রির কাজ শিখতে গেলে প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণে একজনকে খুব বেশী সময় ব্যয় করতে হয় না। তা হলো সরল [simple] শ্রম, সহজেই শেখা যায়। যে কেউ সহজেই রাজমিস্ত্রি (কিংবা, ধরা যাক, সাধারণ শ্রমিক) হতে পারে। কিন্তু ঘড়ির কারিগর (বা কেমিষ্টের)-এর ব্যাপার হলো ভিন্ন। ঘড়ির কারিগর হতে গেলে একজনকে ঐ কাজ শিখতে, ধরা যাক, তিন বছর ব্যয় করতে হয়। যদি এই ভবিষ্যতের ঘড়ির কারিগর এই বৃত্তি শিখতে গিয়ে আরো দীর্ঘ সময় ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে এ কারণেই সে তা করে যে পরবর্তী সময়ে সে তার শ্রমের অধিক মূল্য পাওয়ার আশা রাখে। তা এইভাবে যে, যে-ঘড়ি তৈরী করতে সে বিশ ঘন্টা ব্যয় করেছে, সেই ঘড়ির বিনিময়ে সে সরল বা অদক্ষ শ্রম দ্বারা ধরুন, ত্রিশ ঘন্টায় তৈরী পণ্য সামগ্রী বাজার থেকে পেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে দক্ষ (অথবা কোন কোন সময় বলা হয় জটিল) শ্রমের এক ঘন্টা কিন্তু বাজারে সরল শ্রমের দেড় ঘন্টার সমান।

সরল শ্রমের এক ঘন্টা ও দক্ষ শ্রমের এক ঘন্টার বিনিময়ের ক্ষেত্রে যদি কোন পার্থক্য করা না হয় তাহলে কি ঘটবে ? তাহলে দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ বেশ পরিমাণে হ্রাস পেয়ে যাবে। ঘড়ি-কারিগর, কেমিষ্ট এবং এ ধরনের অন্যান্য লোকের সংখ্যা স্বল্প থেকে স্বল্পতর হয়ে যাবে। সে কারণে, বাজারে ঘড়ি, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদির পরিমাণও অত্যন্ত কমে যাবে, আর এ ধরণের পণ্যের দামও বেড়ে যাবে। তখন, একজন ঘড়ি-কারিগরের শ্রমের এক ঘন্টা পুনরায় সরল শ্রমের দেড়টি কিংবা এমনকি দুইটি ঘন্টার সমান হয়ে উঠবে। তখন, কোন দক্ষ বৃত্তি শিখে নেয়া আবার লাভজনক হয়ে দাঁড়াবে।

বাজার ও প্রতিযোগিতা

আমরা দেখেছি, কোন পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তা উৎপাদন করতে গিয়ে ব্যয়িত সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রম দ্বারা। এর অর্থ কি এই যে, পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রত্যেক পণ্য তার পূর্ণ মূল্যেই সব সময় বিনিময় করা যায় ? অবশ্যই নয়।

এর জন্য প্রত্যেক উৎপাদিত পণ্যের অবিলম্বে ক্রেতা সংগ্রহ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। সরবরাহ ও চাহিদা সবসময় যাতে পরস্পর সমান হয় তা জরুরী হয়ে পড়ে। প্রকৃতই কি এটা ঘটে ?

পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থায় সমাজে এমন কোন সংস্থা নেই যা প্রত্যেক স্বতন্ত্র উৎপাদককে বলে দিতে পারে কোন্ পণ্য এবং তা কি পরিমাণে সে উৎপাদন করবে। যদ্দিন পর্যন্ত উৎপাদনের বড় অংশ আশু ব্যবহারের জন্য উৎপাদিত হয়, আর উদ্বৃত্তের কেবল এক ক্ষুদ্র অংশই বাজারে উপনীত হয় সে পর্যন্ত বাজারের ভূমিকা খুব একটা বড় নয়। কিন্তু পণ্য-উৎপাদন প্রথার বিস্তার লাভের সাথে সাথে বাজার হয়ে ওঠে অধিক থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যেক ভিন্ন পণ্য-উৎপাদকই নিজ নিজ দায়িত্বে কাজ করে। পণ্য উৎপাদিত হয়ে যাওয়ার পর এবং বাজারে নিয়ে যাওয়ার পরই কেবল সে দেখতে পায় তার পণ্যের কোন চাহিদা আছে কি নেই।

পণ্যের দাম হলো মুদ্রা-রূপে ব্যক্ত পণ্যের মূল্য। কিন্তু বাজারের অবস্থা অনুযায়ী দাম সর্বদাই উঠা-নামা করে। বাজারে বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে পণ্যের দাম নিয়ে ঘটে সংগ্রাম। একদিকে বিক্রেতাদের মধ্যে, অন্যদিকে ক্রেতাদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতাই কোন্ দামে পণ্য বিক্রী হবে সেই প্রশ্ন নির্ধারণ করে। সুতরাং, কোন পণ্যের দাম সব সময় তার মূল্যের সাথে সঙ্গতিশীল হয় না। পণ্যের মূল্যের চেয়ে কোন সময় তার দাম বেশী হয়, আবার কোন সময় কম হয়। সুতরাং মূল্য সবসময় কেন্দ্র বা অক্ষ হিসেবে বিরাজ করে যার উপর দাম উঠানামা করে।

কোন পণ্যের যা চাহিদা আছে তার চেয়ে যদি তা বেশী উৎপাদিত হয়, তাহলে সরবরাহ চাহিদাকে অতিক্রম করে যায়, এবং তার দাম মূল্যের নীচে পড়ে যায়। মূল্যের নীচে দাম পড়ে যাওয়ার অর্থ হলো, ঐ নির্দিষ্ট পণ্যের উৎপাদক তা উৎপাদন করতে যে শ্রম ব্যয় করেছে তার সবটুকুর মূল্য সে প্রতিদানে পায় না। সুতরাং অন্য যে পণ্যের অধিক চাহিদা রয়েছে তা উৎপাদন করাই তার পক্ষে অধিক লাভজনক হয়। কাজেই প্রথমোক্ত পণ্যের উৎপাদন হ্রাস করা হবে। এই পণ্যের জন্য তখন কিন্তু চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যেকার সম্পর্ক অধিক সুবিধাজনক হয়ে উঠবে এবং কিছুকাল পরেই তার দাম পুনরায় তার মূল্যের স্তরে, এমন কি তারও উপরে উঠতে পারে।

মূল্য-সূত্র [law of value] একমাত্র এভাবেই, বিরামহীন ওঠা-নামার মধ্য দিয়েই কার্যকরী হয়। সরবরাহ যখন যথাযথভাবে চাহিদার সমান থাকে একমাত্র তখনই পণ্য স্বীয় মূল্যে বিক্রী হয়। কিন্তু এটা ঘটে এক অসাধারণ ব্যতিক্রম হিসেবেই।

"মূল্য-তত্ত্ব [theory of value] ধরে নেয় এবং অবশ্যই ধরে নেবে যে চাহিদা ও সরবরাহ সমান, কিন্তু তা জোর দিয়ে বলে না যে, এ ধরনের সমতা সব সময়ই পরিলক্ষিত হবে কিংবা পুঁজিবাদী সমাজে পরিলক্ষিত হতে পারে।" [লেনিন, "বাজার তত্ত্বের প্রশ্ন সম্পর্কে নিবন্ধাবলী"]

মূল্য-সূত্র বাজারের অন্ধ শক্তি রূপে দেখা দেয়। প্রত্যেক স্বতন্ত্র উৎপাদককেই এই অন্ধ শক্তির বশ্যতা স্বীকার করতে হয়। মার্কস-এর বর্ণনা অনুযায়ী, এই শক্তির ক্রিয়া গৃহ-পতনের ন্যায় কাজ করে। এর অর্থ, স্বতন্ত্র উৎপাদক পূর্বাহ্নে কখনোই জানতে পারে না সর্বশক্তিমান বাজার তার কাছে কি দাবি করবে। মূল্য-সূত্র স্বতন্ত্র উৎপাদকদের অজ্ঞাতসারেই কাজ করে। আমরা দেখেছি, পণ্য-উৎপাদনের বৈশিষ্ট হলো নৈরাজ্য, অর্থাৎ সমগ্রভাবে সমাজের জন্য কোনরূপ শৃংখলার অভাব, কোন সচেতন পরিকল্পনার অনুপস্থিতি। যে-সমাজে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নৈরাজ্য বিরাজ করে, সে-সমাজে মূল্য-সূত্র এক নৈর্ব্যক্তিক, অচেতন শক্তি হিসেবে কাজ করে।

বিনিময়ের বিকাশ ও মূল্যের রূপ

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলো থেকে আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, পণ্য-উৎপাদন প্রথা তার বিকশিত রূপে হঠাৎ করেই আবির্ভূত হয়নি। বিপরীত পক্ষে বিনিময় কেবলমাত্র ধীরে ধীরেই পূর্বের স্বাভাবিক অর্থনীতির অবক্ষয় ঘটায় এবং তাকে ধ্বংস করে দেয়। স্বাভাবিক অর্থনীতি থেকে পণ্য-অর্থনীতিতে পরিবর্তন বহু শতাব্দী ধরেই ঘটে।

উন্নত পণ্য-অর্থনীতিতে এক পণ্য সরাসরি অন্য পণ্যের সাথে বিনিময় হয় না। পণ্য ক্রয় করা হয়, আবার বিক্রয় করা হয়, সেগুলোকে মুদ্রায় রূপান্তরিত করা হয়। যে রূপে পণ্যের মূল্য অভিব্যক্ত হয় তাই হলো মুদ্রা। কিন্তু, মূল্যের মুদ্রা-রূপ বুঝতে গেলে, পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের বিকাশের আদি স্তরগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যের কম-উন্নত রূপগুলোর সাথে আমাদের পরিচিত হতে হবে।

যে-যুগে উৎপাদন ছিল তখন পর্যন্ত মূলতঃ স্বাভাবিক চরিত্রের আর বিনিময় সংঘটিত হতো দৈবক্রমে, সে-যুগে আমরা দেখতে পাই মূল্যের প্রাথমিক, একক বা দৈবক্রমিক রূপ। এক পণ্যের সাথেই অন্য এক পণ্যের বিনিময় করা হতো ঃ যেমন, একটি পশুর চামড়া বিনিময় হতো দুটি বর্শার সাথে। যখন বিনিময় ও পণ্য-উৎপাদনের চরম বিকাশ ও সম্প্রসারণ সাধিত হয়, তখন যেসব পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, মূল্যের তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিকশিত এই রূপ ইতোমধ্যেই সেসব বৈশিষ্ট্য ভ্রূণাকারে ধারণ করছিল।

উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে, মূল্যের সরল রূপটি চামড়ার মূল্যের প্রকাশ হিসেবে কাজ করছে, দুটি বর্শার রূপেই তার প্রকাশ ঘটছে। এখানে আমরা দেখছি যে, চামড়ার মূল্য সরাসরি প্রকাশিত হচ্ছে না ; বরং প্রকাশিত হচ্ছে কেবলমাত্র **আপেক্ষিকভাবেই**, দুটি বর্শার মূল্যের সাথে সম্পর্ক অনুসারেই। দুটি বর্শা এখানে একটি চামড়ার সমতুল্য হিসেবে কাজ করছে। চামড়ার মূল্য অভিব্যক্ত হচ্ছে দুটি বর্শার ব্যবহারিক মূল্যের দ্বারাই।

সুতরাং, আমরা দেখছি যে, একটি পণ্যের (দুটি বর্শার) ব্যবহারিক-মূল্য অন্য একটি পণ্যের (চামড়ার) মূল্যের অভিব্যক্তি হিসেবে কাজ করছে। পূর্বের মতোই, মূল্য ও ব্যবহারিক-মূল্য **বিভক্ত**, ব্যবহারিক-মূল্য থেকে মূল্য আলাদা। এখানে চামড়া কেবলমাত্র মূল্য হিসেবে, আর দুটি বর্শা কেবলমাত্র ব্যবহারিক-মূল্য হিসেবে মূর্ত হয়েছে। বলতে গেলে, চামড়ার মূল্য তার ব্যবহারিক মূল্য থেকে পৃথক হয়ে পড়ছে, এবং অন্য একটি পণ্যের সাথে সমীকৃত হচ্ছে। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত টানা যায় যে, পণ্যের মূল্য এককভাবে তার নিজের প্রেক্ষিতেই অভিব্যক্ত হতে পারে না, এই মূল্যকে ব্যক্ত করতে গেলে অন্য একটি পণ্যের মূর্ত রূপ, সমতুল্য [equivalent] অবশ্যই থাকতে হবে।

এমন কি মূল্যের সরল রূপে 'পণ্য-সমতুল্যের' [commodity equivalent] পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই পণ্যের ব্যবহারিক মূল্য তার বিপরীতের তথা মূল্যের অভিব্যক্তি হিসেবে কাজ করে।

"পণ্যের মূর্ত দেহ, যা 'সমতুল্য' হিসেবে কাজ করে, বিমূর্ত মনুষ্য-শ্রমের বাস্তব পরিণতি হিসেবে মূর্ত হয় আর একই সময়ে তা কোন কোন বিশেষভাবে ব্যবহারোপযোগী মূর্ত শ্রমের ফল।" [মার্কস, "পুঁজি", ঐ, পৃঃ ৪৮]

সুতরাং, মূর্ত শ্রম এখানে বিমূর্ত শ্রমের প্রকাশ হিসেবে, ব্যক্তি-শ্রম সামাজিক শ্রমের প্রকাশ হিসেবে কাজ করছে।

যে-পর্যন্ত বিনিময়ের চূড়ান্তভাবে একক, দৈবক্রমিক চরিত্র থাকে, সে-পর্যন্তই কেবল মূল্যের সরল রূপ অস্তিত্বশীল থাকে। যে মুহূর্তে বিনিময় কিছুটা অধিক ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়, তখন মূল্যের এই রূপ মূল্যের সমগ্র বা বিস্তৃত রূপে [Total or expanded form] পরিবর্তিত হয়, যেখানে দুটি পণ্যই কেবল নয়, বরং আরো ব্যাপক শ্রেণীর পণ্যরাজি পরস্পরের সাথে সমীকৃত হয়। এই রূপে প্রত্যেক পণ্যকেই শুধু অন্য একটি পণ্যের সাথে নয়, বরং আরো ব্যাপক শ্রেণীর পণ্যরাজি পরস্পরের সাথে সমীকৃত হয়। এই রূপে প্রত্যেক পণ্যকেই শুধু অন্য একটি পণ্যের সাথে নয়, বরং পর্যায়ক্রমিক বহু পণ্যের সাথেই বিনিময় করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নির্দিষ্ট একখানি চামড়াকে কেবল দুটি বর্শার সাথেই নয়, বরং এক জোড়া জুতা, একটি বৈঠা, এক টুকরা কাপড়, কিংবা এক বস্তা শস্যের সাথেও বিনিময় করা যেতে পারে। সুতরাং, মূল্যের সমগ্র বা বিস্তৃত রূপ নিম্নোক্তভাবে দেখা দেবে ঃ

১টি চামড়া =
- ২টি বর্শা
- ১ জোড়া জুতা
- ১টি বৈঠা
- ১ টুকরা কাপড়
- ১ বস্তা শস্য ইত্যাদি

শ্রমজাত কোন উৎপন-দ্রব্য, উদাহরণস্বরূপ গবাদি-পশু, যখন অন্যান্য বিভিন্ন পণ্যের সাথে অভ্যাসগত রীতিতে বিনিময় করা হয় তখন আমরা মূল্যের এই রূপটি দেখতে পাই।

মূল্যের বিস্তৃত রূপ হলো মূল্যের রূপের বিকাশের ক্ষেত্রে এক উন্নততর স্তর। একই পণ্যের মূল্য অভিব্যক্ত হয় ভিন্ন ভিন্ন পণ্য মালিকদের ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের মধ্যে। মূল্য ও ব্যবহারিক-মূল্যের বিভক্তি এ ক্ষেত্রে আরো অধিক স্পষ্ট। চামড়ার মূল্য এখানে অন্যান্য পণ্যরাজির সাধারণ গুণ হিসেবে চামড়ার ব্যবহারিক-মূল্যের বিরোধী হয়ে ওঠে।

কিন্তু, বিনিময়-প্রথার বিকাশের সাথে সাথে চাহিদা বাড়তেই থাকে, আর মূল্যের এই বিস্তৃত রূপও সে চাহিদা পূরণ করতে পারে না।

বিনিময়-প্রথার বিকাশ বিনিময়ের এই পদ্ধতির ঘাটতিগুলোকে অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় ব্যক্ত করতে থাকে। মূল্যের পরবর্তী অধিক বিকশিত রূপ, অর্থাৎ, সাধারণ রূপ দ্বারাই এই ঘাটতিগুলোকে দূর করা হয়। মূল্যের সমগ্র বা বিস্তৃত রূপ থেকেই স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হয় মূল্যের সাধারণ রূপ। মূল্যের বিস্তৃত রূপের ক্ষেত্রে, একটি পণ্য সর্বাধিক ঘন ঘন বিনিময় হয়, আর তাই, এর মূল্য অভিব্যক্ত হয় পর্যায়ক্রমিক অন্যান্য বহু পণ্যের মধ্যে। ধরা যাক, এই পণ্যটি হলো গবাদি-পশু। ধরা যাক যে, একটি বলদ বিনিময় হয় একখানি নৌকার সঙ্গে, তিন জোড়া জুতার সঙ্গে, তিন বস্তা শস্যের সঙ্গে, বিশটি তীরের সঙ্গে, ইত্যাদি। এই পর্যায়ক্রমিক বিনিময় সম্পর্কগুলোকে আমাদের শুধু উল্টিয়ে দিতে হবে আর তাহলেই আমরা নিম্নোক্তভাবে লাভ করবো মূল্যের সাধারণ বা সর্বজনীন সমতুল্য রূপ [general or universal equivalent form of value] ঃ

১ খানি নৌকা
৩ জোড়া জুতা
৩ বস্তা শস্য
২০টি তীর
= ১টা বলদ

মূল্যের সর্বজনীন সমতুল্য রূপে, সমস্ত রকমের পণ্যের মূল্য অভিব্যক্তি লাভ করে একই পণ্যের মধ্যে। যে নির্দিষ্ট পণ্য অন্যান্য পণ্যের মূল্য অভিব্যক্ত করে সেই পণ্যই **সর্বজনীন** সমতুল্য [universal equivalent] হিসেবে কাজ করে। বিনিময়ের ক্ষেত্রে যেকোন পণ্যের পরিবর্তে এই পণ্যটি অবিলম্বে গ্রহণ করা হয়। এভাবে মূল্যের সমগ্র বা বিস্তৃত রূপের সাথে যে অসুবিধা সংবর্তমান থাকে তা দূর করা হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যবহারিক-মূল্য থেকে মূল্যের বিচ্ছেদ আরো ব্যাপক হয়ে ওঠে। একটি একক পণ্যের মধ্যেই সমুদয় পণ্য তাদের মূল্য অভিব্যক্ত করে। অপরাপর সকল পণ্যের মূল্যকে ব্যক্ত করাই একটি নির্দিষ্ট পণ্যের কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সমগ্র পণ্য-জগৎ দুটি বিপরীত বর্গে বিভক্ত হয়ে পড়ে ঃ 'সর্বজনীন সমতুল্য' খোদ নিজেই একটি বর্গ গঠন করে, আর অন্য বর্গ গঠন করে অন্যান্য সমুদয় পণ্যরাজি।

মূল্যের মুদ্রা-রূপ কেবল সামান্য মাত্রায় সর্বজনীন রূপ থেকে ভিন্ন। মূল্যবান ধাতু – স্বর্ণ ও রৌপ্য – যখন স্থায়ী 'সর্বজনীন সমতুল্যে' পরিণত হয়, তখন আমরা দেখতে পাই মূল্যের সর্বজনীন রূপ থেকে মুদ্রা-রূপে উত্তরণ। মূল্যের মুদ্রা-রূপের ক্ষেত্রে, সুনির্দিষ্ট সামাজিক কর্তব্য, অর্থাৎ, সমস্ত পণ্যের মূল্যের অভিব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পণ্যে প্রতিমূর্ত হয়। পণ্য-জগতে এই পণ্যই – স্বর্ণ বা রৌপ্য – হলো বিশিষ্টতম। মুদ্রায় পরিণত হওয়ার পূর্বে, স্বর্ণকে প্রথমতঃ অবশ্যই হতে হবে একটি পণ্য। কিন্তু, মুদ্রায় পরিণত হয়ে, মুদ্রা হিসেবে তার নির্দিষ্ট ভূমিকার সাথে যুক্ত বেশ কয়েকটি নতুন গুণাবলী স্বর্ণ অর্জন করে।

মূল্য হলো বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেকার এক নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক, যা বিভিন্ন জিনিসের মধ্যেকার এক সম্পর্ক হিসেবেই অভিব্যক্ত হয়। কোন পণ্যের মূল্য খোদ তার নিজের প্রেক্ষিতেই ব্যক্ত করা যায় না। কেবল অন্য একটি পণ্যের সাহায্যেই ব্যক্ত করা যায়। একটি পণ্য ও অন্য একটি পণ্যের মধ্যেকার বিনিময় সম্পর্ক, বা **তার বিনিময় মূল্য**, তার মূল্যের অভিব্যক্তি হিসেবে কাজ করে। সরল রূপ থেকে মুদ্রা-রূপ পর্যন্ত মূল্যের রূপের ক্রমবিকাশকে আমরা দেখেছি। পণ্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ক্রমবিকাশের সাথেই যুক্ত রয়েছে মূল্যের রূপের ক্রমবিকাশ। বিনিময়ের বিকাশ আর তার সাথে সঙ্গতিশীল মূল্যের রূপের বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যেই ব্যবহারিক-মূল্য ও মূল্যের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-বিরোধ অধিক থেকে অধিকতর স্পষ্টভাবে আবির্ভূত হয়। মুদ্রার ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয়, মুদ্রা হয়ে দাঁড়ায় মূল্যের অভিব্যক্তির একমাত্র ও সর্বজনীন মাধ্যম। অন্যান্য সমুদয় পণ্য ব্যবহারিক-মূল্য হিসেবে মুদ্রার ভারসাম্য রক্ষা করে।

পণ্য–পূজা

পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রত্যেক শ্রমিকের নিকটই এটা স্পষ্ট যে, সে হলো এক সংগঠিত সমাজ-দেহের অংশ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যেকার উৎপাদন সম্পর্কসমূহ সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য। প্রত্যেক স্বতন্ত্র শ্রমিক ও প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সকল শ্রমিক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যেকার সম্পর্কসমূহ হলো স্বতঃ-স্পষ্ট ও সহজেই বোধগম্য।

কিন্তু যে সমাজে পণ্য-উৎপাদন বিরাজমান সেখানে তা এরূপ নয়। পণ্য-উৎপাদন প্রথায় মানুষের মধ্যেকার উৎপাদন-সম্পর্ক বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেকার সম্পর্ক হিসেবেই প্রতিভাত হয়। একজন মুচি যখন তার তৈরী এক জোড়া জুতা বিক্রী করে এবং এভাবে প্রাপ্ত মুদ্রা দিয়ে তার নিজের ও নিজ পরিবারের জন্য রুটিওয়ালার কাছ থেকে রুটি কিনে, তখন, মানুষের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন-সম্পর্ক, অর্থাৎ উৎপাদন অনুসারে মানুষের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট যোগাযোগ দেখতে পাই। রুটিওয়ালা যে রুটি তৈরী করে তা মুচির চাহিদা পূরণ করে, আর মুচির তৈরী জুতা সম্ভাব্য ক্ষেত্রে রুটিওয়ালার কাছে যাবে। সুতরাং, এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে,

মুচির চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন রুটিওয়ালার কাজ, আবার রুটিওয়ালার জন্য দরকার মুচির শ্রম। অতএব, মুচি ও রুটিওয়ালার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট যোগাযোগ, উৎপাদন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু কিভাবে এই যোগাযোগ প্রকাশ পায় ? কিসের মধ্যে তা অভিব্যক্ত হয় ? আমরা ইতোমধ্যেই তা দেখেছি বিনিময়ের প্রক্রিয়ায়ই তা অভিব্যক্ত হয়। পণ্য হলো এমন এক বস্তু যা এক উৎপাদকের কাছ থেকে অন্য উৎপাদকের কাছে যায়। রুটিওয়ালার কাছ থেকে রুটি যায় মুচির কাছে। মুচির কাছ থেকে জুতা যায় ব্যবসায়ীর কাছে আর সেখান থেকে আবার যায় রুটিওয়ালার কাছে। কিন্তু, পণ্য শুধু শুধুই হস্তান্তরিত হয় না। প্রত্যেকেই জানেন যে, মুচি তার জুতা একমাত্র তখনই হাতছাড়া করে যখন সেগুলোর বদলে উপযুক্ত পরিমাণ মুদ্রা অর্থাৎ সেগুলোর দাম সে পায়। রুটিওয়ালাও ঠিক একই কাজ করে। এভাবে, পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থায়, মানুষের মধ্যেকার উৎপাদন-সম্পর্ক দ্রব্যের অর্থাৎ পণ্যের সঞ্চলন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

যে লোকেরা পণ্য উৎপাদন করে সেসব লোকের মধ্যেকার সম্পর্কই হলো মূল্য। কিন্তু এই সম্পর্ক নিজেকে প্রকাশ করে দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের, পণ্যের সঙ্গে পণ্যের সম্পর্ক হিসেবেই। এই উৎপাদন-সম্পর্ক এক বস্তুগত আবরণ দ্বারা আড়াল করা থাকে, দ্রব্যের সঞ্চলনের আড়ালে গোপন করা হয়। রং বা ওজনের মতোই, ধরুন, পণ্যের মূল্যও যেন পণ্যের স্বাভাবিক গুণ বলে মনে হয় ; দৃষ্টান্তস্বরূপ, বলা হয় যে ঃ এই রুটিখানির ওজন আধা পাউণ্ড আর তার দাম হলো পাঁচ সেন্ট। পণ্য একটি অতিশয় জটিল জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদকের ভাগ্য তার উৎপন্ন-দ্রব্যের ভাগ্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জুতা বিক্রয় করতে না পারলে আমাদের মুচি অন্নবিহীন অবস্থায় থাকে। যদি জুতার দাম পড়ে যায়, তাহলে সে কম পরিমাণ রুটিই কিনতে পারে। মুচি কেন জুতা বিক্রী করতে পারে না, কিংবা, কেনই-বা পূর্বে যে দাম পেয়ে থাকতো এখন তা সে কম পায়। এর কারণ নিহিত রয়েছে, পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে, মানুষের উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার মধ্যে, অর্থাৎ ধরা যাক, একটা সংকট দেখা দিয়েছে, কিংবা, মজুরী কমে যাওয়ার কারণে শ্রমিকরা এখন পূর্বের তুলনায় কম জুতাই কিনছে। প্রকৃত কারণটি কিন্তু দীর্ঘ দিন পর্যন্ত মুচির নিকট অজানাই থেকে যাবে, আর যখন সে তা জানতে পারবে তখন সাধারণতঃ বিকৃত রূপেই জানবে। কারণ মুচি আর অবশিষ্ট উৎপাদনশীল বিশ্বের মধ্যেকার যে সম্পর্ক তা কেন্দ্রীভূত হয় তার পণ্য – জুতার মধ্যে, বাজারে যে মূল্য এই পণ্য পেয়ে থাকে তার মধ্যে।

পণ্য-উৎপাদন প্রথায় উৎপাদন অনুসারে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কসমূহ দ্রব্যের সাথে দ্রব্যের তথা পণ্যের সাথে পণ্যের যে সম্পর্ক অর্জন করে আর সে কারণে পণ্য যে অদ্ভূত সামাজিক গুণাবলী অর্জন করে তাকে আমরা বলি পণ্য-পূজা [Commodity fetishism – সাধারণভাবে fetishism হলো কোন বস্তুর উপর আরোপিত কাল্পনিক, অলৌকিক গুণাবলীর পূজা-অর্চনা]। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজে মানুষের সাথে মানুষের সমস্ত উৎপাদন-সম্পর্কই দ্রব্যের আবরণে লুকানো থাকে ; পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের সাথে মানুষের সকল উৎপাদন-সম্পর্কই বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেকার সম্পর্ক হিসেবে, বিভিন্ন বস্তুর সাথে সম্বন্ধযুক্ত সম্পর্ক হিসেবেই পরিদৃষ্ট হয়। এটা পুঁজিবাদী সম্পর্ক সমূহের প্রকৃত তাৎপর্যকে আড়াল করে রাখে, আচ্ছাদিত করে রাখে, তাদের প্রকৃত চরিত্র গোপন করে রাখে, সেগুলিকে দান করে এক অলীক রূপ। সে কারণেই, পণ্য-পুজার যে ধাঁধাঁ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সকল সম্পর্ককে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে তার মুখোশ উদ্ঘাটন করা, তাকে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত জরুরী।

মার্কসই সর্বপ্রথম পণ্য-পূজার ধাঁধাঁ সমাধান করেন। মার্কসই সর্বপ্রথম মানুষের মধ্যেকার সামাজিক সম্পর্ক সমূহকে উদ্ঘাটন করেন, যেখানে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত কেবল দ্রব্যের রহস্যজনক গুণাবলীই দেখা হতো। তিনিই প্রথম দেখিয়ে দেন যে, মূল্য হলো পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষের সাথে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক।

"রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের সূচনা পণ্য নিয়েই. সূচনা সেই মুহূর্ত থেকে যখন এক উৎপন্ন-দ্রব্যের সাথে অন্য উৎপন্ন-দ্রব্যের বিনিময় শুরু হয় – তা সেটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের দ্বারা কিংবা আদিম সম্প্রদায়গুলো দ্বারাই হোক না কেন। বিনিময়ের ক্ষেত্রে যে উৎপন-দ্রব্যের দেখা পাওয়া যায় তাই হলো পণ্য। কিন্তু পণ্যের পণ্য হওয়ার একমাত্র কারণ হলো এই যে, দুই ব্যক্তি বা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার একটি সম্পর্ক ঐ বস্তুর সাথে, ঐ উৎপন্ন-দ্রব্যের সাথে যুক্ত আছে, যে সম্পর্ক হলো উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারীর মধ্যেকার সম্পর্ক, যারা এখানে আর একই ব্যক্তি নয়। এখানে আমরা এক বিশেষ বাস্তব ঘটনার উদাহরণ লাভ করি যা অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে জুড়ে আছে এবং যা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মনে দারুণ বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে ঃ অর্থনীতির কাজ-কারবার দ্রব্য নিয়ে নয় বরং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে আর সর্বশেষে শ্রেণীর সাথে শ্রেণীর সম্পর্ক নিয়ে ; কিন্তু এই সম্পর্ক সর্বদাই **বস্তুর সাথে** সম্পর্ক যুক্ত এবং **বস্তু হিসেবেই** দেখা দেয়। বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে এই আন্তঃ-সম্পর্ক কোন বিশেষ অর্থনীতিবিদের মনে উদীত হলেও, মার্কসই সর্বপ্রথম সমগ্র রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রে এই আন্তঃ-সম্পর্কের প্রযুক্ততা আবিষ্কার করেন, আর এভাবে সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নকে এত সহজ-সরল ও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরাও এখন তা বুঝে নিতে সক্ষম।" [এঙ্গেলস্, "লুদ্‌ভিগ ফয়ারবাখ"]

পণ্য–উৎপাদন পদ্ধতিতে মুদ্রার ভূমিকা

আজকাল এক পণ্যের সাথে অন্য পণ্যের সরাসরি বিনিময় কদাচিৎই ঘটে থাকে। উৎপাদক সাধারণতঃ তার তৈরী পণ্য মুদ্রার বদলে বিক্রী করে, আর প্রাপ্ত মুদ্রার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় পণ্য **ক্রয় করে**। তাহলে কেন আমরা পণ্যের সাথে পণ্যের বিনিময়ের কথা বলি ? প্রকৃত ঘটনা হলো, মুদ্রা এখানে বাস্তবতঃ বিভিন্ন পণ্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করে। পুঁজিপতি তার উৎপন্ন-দ্রব্য বিক্রী করে এবং তার বদলে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা পায়, কিন্তু যথাযথভাবে এই মুদ্রা হিসেবেই মুদ্রার ব্যাপারে সে কৌতূহলী নয়। নতুন কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা, মজুর ভাড়া করা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্যই এই মুদ্রা তার দরকার।

মুদ্রার মাধ্যম দ্বারা পণ্য-বিনিময় কিন্তু সরাসরি পণ্য-বিনিময় থেকে মৌলিকভাবেই ভিন্ন। মুদ্রার প্রবর্তন পণ্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের আরো অধিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটায়।

কোন প্রকার সম্মতি বা চুক্তির দ্বারা মুদ্রার প্রচলন হয়নি, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এর ব্যবহার শুরু হয়। পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সর্বোতমুখী সামাজিক সম্পর্ক বাস্তবায়িত হতে পারে একমাত্র মুদ্রার সাহায্যেই।

আমরা পূর্বে দেখেছি, মূর্ত শ্রম এবং বিমূর্ত শ্রমের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব অভিব্যক্ত হয় পণ্যের ব্যবহারিক মূল্য আর মূল্যের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই। মুদ্রা প্রচলনের সাথে সাথে এই বিরোধ আরোও বৃদ্ধি পায়। পণ্য অর্জন করে পণ্য ও মুদ্রার দ্বিবিধ চরিত্র। মুদ্রার সাহায্যে যখন বিনিময় সম্পন্ন হয়, পণ্যের উৎপাদক তখন পণ্যের বিনিময়ে পায় মুদ্রা, যা পণ্যের মূল্যকে মূর্ত রূপে ধারণ করে।

পণ্যের মূল্য এখন ব্যক্ত হয় তার দামে, অর্থাৎ, নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার মধ্যে। পণ্য উৎপাদন হওয়াই সব নয় – মুদ্রার বদলে তার বিনিময় হওয়া চাই। পণ্য অবশ্যই বিক্রী হওয়া চাই। পণ্য অবশ্যই বিক্রী করতে হবে, তার দাম আদায় করতে হবে। যদি তা বিক্রী না হয়, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় উৎপাদক নিষ্ফল পরিশ্রম করেছে।

মুদ্রা হলো সর্বজনীন পণ্য, সর্বজনীন সমতুল্য। মুদ্রা হলো মূল্যের মূর্ত রূপ, বিমূর্ত শ্রমের মূর্ত রূপ। মুদ্রা হলো সেই সীল-মোহর যার দ্বারা, ব্যক্তিগত শ্রমের উৎপন্ন-দ্রব্য থেকে পণ্যকে সামাজিক শ্রমের উৎপন্ন-দ্রব্যে রূপান্তরিত করেই, বাজার পণ্যের ওপর তার সামাজিক স্বীকৃতির ছাপ এঁকে দেয়।

কিন্তু এর মধ্যে ইতোমধ্যেই এই বিপদ থেকে যায় যে, এক-বা অন্য উৎপাদকের উৎপন্ন দ্রব্য মুদ্রায় রূপান্তরিত নাও করা যেতে পারে। যদি পণ্য-উৎপাদকের পক্ষে স্বীয় পণ্য মুদ্রায় রূপান্তরিত করা অসম্ভব প্রতিপন্ন হয়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে তার নিজের ব্যক্তিগত শ্রম, স্বতন্ত্র শ্রম সামাজিক শ্রমের অংশে পরিণত হলো না। এর অর্থ এই যে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে নৈরাজ্য বহাল থাকার কারণে, যে পণ্য বিক্রী করা যাবে না সেই পণ্যের উৎপাদনে সে নিরর্থক ব্যয় করেছে তার শ্রম, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি। এটা স্পষ্ট যে, মুদ্রার ক্ষেত্রে পণ্য-পূজা আরো অধিক তীক্ষ্ণভাবে প্রতীয়মান। মার্কস দেখিয়ে দিয়েছেন যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথায় সমস্ত সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্কই গিল্‌টি করা বা রূপালি করা। মুদ্রার উপর আরোপ করা হয় অতি-প্রাকৃত শক্তি। সমাজ বিকাশ থেকে জাত বস্তু হয়েও মুদ্রা এই সমাজেই অর্জন করে সামগ্রিকভাবে এক অনন্যসাধারণ শক্তি ও ক্ষমতা।

"বিনিময়ের ও পণ্য-উৎপাদনের বিকাশের সর্বোচ্চ সৃষ্ট বস্তু হিসেবে মুদ্রা ব্যক্তি-শ্রমের সামাজিক চরিত্র আড়াল করে ও লুকিয়ে রাখে, আড়াল করে ও লুকিয়ে রাখে বিভিন্ন উৎপাদকের মধ্যেকার সামাজিক বন্ধনকে, যে উৎপাদকদের বাজারই একত্রিত করে।" [লেনিন, "কার্ল মার্কস", পূর্বোক্ত]

ক্ষুদে পণ্য-উৎপাদন থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের ক্ষেত্রে মুদ্রা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেসব কর্তাব্যক্তি ছলে-বলে ও কৌশলে সম্পদ অর্জন করে বিত্তবান হয়েছে, তারা মুদ্রার আকারেই সম্পদ সঞ্চয় করে। মুদ্রার রূপেই প্রথম পুঁজির উৎপত্তি ঘটেছে।

মুদ্রার কাজ

পণ্য-অর্থনীতিতে মুদ্রার রয়েছে বহুবিধ কাজ। প্রত্যেক পণ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার বদলে বিক্রী হয়। মুদ্রার এই পরিমাণকে বলে **পণ্যের দাম**। সুতরাং, দাম হলো মুদ্রার অঙ্কে অভিব্যক্ত মূল্য। পণ্যের মূল্যের পরিমাপ করা হয় মুদ্রার দ্বারাই।

মুদ্রায় কোন পণ্যের মূল্যের পরিমাপ হচ্ছে ঐ পণ্যের বিনিময়ের, তার ক্রয় ও বিক্রয়ের ভিত্তি স্বরূপ। কোন পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করার পূর্বে তার দাম জানা আবশ্যক। সুতরাং, মুদ্রা **মূল্য-পরিমাপের** [measure of value] ভূমিকা পালন করে।

কোন পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তা উৎপাদন করতে গিয়ে ব্যয়িত শ্রম-সময় দ্বারা। কিন্তু, সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রম-সময় দ্বারা মূল্য ব্যক্ত করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, এক জোড়া জুতা ক্রয় বা বিক্রয় করার সময় এ কথা বলা হয় না যে, জুতার দাম বিশ শ্রম-ঘন্টা, বরং বলা হয় যে, জুতার দাম, ধরুন, ১০ ডলার। এটা আমরা পূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি। কোন পণ্যের মূল্য 'ক' একমাত্র অন্য একটি পণ্যের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হতে পারে। জুতা দুটি তৈরী করতে ব্যয়িত শ্রম-সময়কে প্রকৃতপক্ষে হিসেবের মধ্যে নেয়া হবে কিনা তা পূর্বাহ্নে জানা যায় না। যদি বাজারে জুতার প্রচুর আমদানী থাকে, তাহলে এক জোড়া জুতা সম্ভবতঃ ১০ ডলারে না হয়ে, ৫ ডলারেই বিক্রী হবে। এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে, ঐ এক জোড়া জুতা তৈরী করতে প্রকৃতপক্ষে ব্যয়িত বিশ শ্রম-ঘন্টাকে কেবলমাত্র দশ শ্রম-ঘন্টার উৎপন্ন-দ্রব্যের সাথে বিনিময় করতে হবে। পণ্যের দাম তার মূল্যকে কেন্দ্র করেই অবিরাম ওঠানামা করে। এই ওঠানামা নিজেদের এই ঘটনার মধ্যে অভিব্যক্ত করে যে, কোন পণ্যের দাম প্রথমতঃ তার মূল্যের উপরে, তারপর মূল্যের নীচে, কিংবা তদ্বিপরীত হতে পারে।

মূল্যের পরিমাপক হতে হলে, খোদ মুদ্রাকেই পণ্য হতে হবে এবং মূল্যের অধিকারী হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যে বস্তুর ওজন নাই, তেমন কোন বস্তু দিয়ে ওজন মাপা যায় না।

কিন্তু মূল্য যখন পরিমাপ করা হয়, তখন প্রকৃতই কি মুদ্রার উপস্থিতি প্রয়োজন ? স্পষ্টতঃই নয়। পকেটে কানা-কড়ি না থাকলেও আমরা রাশি রাশি পণ্যের মূল্য নিরূপণ করতে পারি। মূল্য-পরিমাপক হিসেবে মুদ্রা তার কাজ সম্পন্ন করে তত্ত্বগতভাবে, কাল্পনিক মুদ্রা হিসেবে। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই কাজে মুদ্রার পরিমাণের প্রশ্ন কোন ভূমিকাই পালন করে না।

মুদ্রার দাম নিরূপণের পরই কোন পণ্যের চূড়ান্ত মুহূর্ত আসে। পণ্যকে বিক্রীত হতে হবে, অর্থাৎ, মুদ্রার বদলে বিনিময় করতে হবে। মুদ্রার মাধ্যমে সাধিত দ্রব্যের বিনিময়কে বলা হয় পণ্যের সঞ্চলন। এটা স্পষ্ট যে, পণ্য-সঞ্চলন খোদ মুদ্রা-সঞ্চলনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। পণ্য যখন বিক্রেতার হাত থেকে ক্রেতার হাতে যায়, মুদ্রা তখন যায় ক্রেতার হাত থেকে বিক্রেতার হাতে। মুদ্রা এখানে সঞ্চলনের মাধ্যম, কিংবা পণ্য হস্তান্তরের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

সঞ্চলনের মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করতে গেলে, মুদ্রাকে প্রকৃতই সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে। এখানে মুদ্রা কাল্পনিক মুদ্রা (ideal money) হিসেবে নয় বরং প্রকৃত মুদ্রা (real money) হিসেবেই দেখা দেয়। সবাই জানেন যে, "কাল্পনিক মুদ্রা" দিয়ে এক টিপ নস্যিও ক্রয় করা যায় না। আপনি লক্ষ লক্ষ ডলার কল্পনা করতে পারেন, কিন্তু কল্পনার লক্ষ লক্ষ ডলার দিয়ে আপনি কোন কিছুই কিনতে পারেন না, পক্ষান্তরে বাস্তবে অস্তিত্ববান প্রত্যেকটি ডলার দিয়ে অনুরূপ মূল্যের যেকোন পণ্য ক্রয় করতে পারেন।

এক গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে, মুদ্রার সঞ্চলন-মাধ্যমের চাহিদা তার মূল্য-পরিমাপকের চাহিদা থেকে ভিন্ন। সঞ্চলনের মাধ্যম হতে হলে মুদ্রার নিজস্ব মূল্য যে থাকতেই হবে এমন কোন কথা নেই। খুব সম্ভবতঃ কোন পণ্যের বিক্রেতা পণ্যের বিনিময়ে এই কারণে মুদ্রা গ্রহণ করে না যে মুদ্রার নিজস্ব মূল্য আছে, বরং পালাক্রমে তা দিয়ে অন্য একটি পণ্য বিনিময় করার জন্যই, অর্থাৎ, অন্য একটি পণ্য ক্রয় করার জন্যই সে তা গ্রহণ করে। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করার জন্যই সে তা গ্রহণ করে। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করার সময় মুদ্রা কোন বিশেষ ব্যক্তির পকেটে পড়ে থাকে না, বরং বিরামহীন গতিতে চলতে থাকে পণ্যের গতির বিপরীত দিকে। ফলতঃ, মুদ্রা এখানে এক ক্ষণস্থায়ী ভূমিকাই পালন করে। যথার্থভাবে এই কারণেই পূর্ণ-মূল্যযুক্ত মুদ্রা –স্বর্ণ – এই কর্তব্য সম্পাদনে তার প্রতিকল্প দ্বারা, তার নিজের প্রতীক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে। স্বর্ণের এরূপ প্রতিকল্প হলো ব্যাংক নোট, কাগুজে মুদ্রা, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা ইত্যাদি, যারা পূর্ণ-মূল্যবিহীন। স্বর্ণের এসব প্রতিকল্পের (কিংবা মূল্যের প্রতীকগুলোর) হয় মোটেই কোন মূল্য নেই, না হয় যে মূল্যের সেগুলো প্রতিনিধিত্ব করে তার চেয়ে তাদের মূল্য কম। সূর্যের প্রতিফলিত আলো দ্বারা যেমন চন্দ্র উজ্জল হয়ে ওঠে, তেমনি এগুলোও প্রকৃত মুদ্রা – স্বর্ণের – মূল্যকে প্রতিফলিত করে।

সঞ্চলন-মাধ্যমের কাজ সম্পাদন করতে হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার প্রয়োজন। এক হাজার ডলার দামের কোন পণ্য বিক্রী করতে গেলে, প্রকৃতপক্ষে যে কোন পরিমাণ মুদ্রা থাকলেই চলবে না, বরং যথার্থভাবে এক হাজার ডলারই থাকতে হবে। বিপরীত পক্ষে, এই নির্দিষ্ট পণ্যের জন্যে যে এক হাজার ডলার পরিশোধ করা হলো পরবর্তীতে এই এক হাজার ডলারই ঠিক এই দামের অন্যান্য পণ্যের সঞ্চলন-মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। কিন্তু যুগপৎ বহু স্থানেই পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হয়। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে কি পরিমাণ মুদ্রার প্রয়োজন তা নির্ভর করে সঞ্চলনরত সমস্ত পণ্যের দামের সর্বমোট পরিমাণের উপর, পালাক্রমে, পণ্যের দামের সর্বমোট পরিমাণ নির্ভর করে সঞ্চলনশীল পণ্যের পরিমাণের উপর এবং প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র পণ্যের দামের উপর।

উদাহরণস্বরূপ, এক বৎসরে যে পরিমাণ মুদ্রার আবশ্যক হবে তা কেবলমাত্র এই দুই পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, বরং মুদ্রার সঞ্চলনের দ্রুততার উপর নির্ভর করে ঃ সঞ্চলনে যদি কম সময় লাগে, তাহলে সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার জন্য কম মুদ্রার দরকার হবে, আর সঞ্চলন যদি বেশী সময় নেয়, তাহলে সঞ্চলন-প্রক্রিয়ার জন্য বেশী মুদ্রার আবশ্যক হবে।

দ্রব্য হিসেবে ও মুদ্রা হিসেবে – পণ্যের দ্বিবিধ প্রকৃতি পণ্য-উৎপাদন প্রথার দ্বন্দ্বের আরো অধিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করে দেয়। যখন সরাসরি পণ্যের পারস্পরিক বিনিময় হয়, তখন ক্রয় একই সাথে বিক্রয়ও বটে। মুদ্রাই ক্রয় থেকে বিক্রয়কে পৃথক করা সম্ভব করে তুলেছে। পণ্য-উৎপাদক তার পণ্য-দ্রব্য বিক্রয় করতে পারে এবং কিছু সময়ের জন্যে মুদ্রাকে নগদাকারে ধরে রাখতে পারে। কিন্তু বহু সংখ্যক পণ্য-উৎপাদক যখন কোন প্রকার ক্রয় ছাড়া কেবল বিক্রয়ই করতে চায়, তখন তা বাজারে একটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এভাবে মুদ্রা ইতোমধ্যেই সংকটের পথ খুলে দেয়, অন্যদিকে পণ্য-উৎপাদন প্রথার আরো অধিক বিকাশ এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথায় তার রূপান্তর সংকটকে করে তোলে অবশ্যম্ভাবী।

পণ্যের মালিক যখন তার পণ্য বিক্রী করে, তখন যে মুদ্রা সে পেয়ে থাকে তা প্রায়শঃ এক পাশে পৃথক করে রাখে। মুদ্রা হলো "বস্তুগত সম্পদের সর্বজনীন প্রতিনিধি"। [মার্কস, "পুঁজি", ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪৩]। পুঁজিবাদী দেশসমূহে, মুদ্রাকে যেকোন মুহূর্তেই যেকোন পণ্যে রূপান্তরিত করা যায়। মুদ্রাকে পণ্যে রূপান্তরিত করা নয়, পণ্যকে মুদ্রায় রূপান্তরিত করাই দুষ্কর। সুতরাং মুদ্রা হলো পুঞ্জীভবনের (accumulation) শ্রেষ্ঠ উপায়, কিংবা বিপুল সম্পদ জমানোর উপায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, মুনাফার বাসনার ক্ষেত্রে কোন সীমা-পরিসীমা নেই। ধনবান হওয়ার আকাংখা যথাসম্ভব প্রভূত পরিমাণ মুদ্রা পুঞ্জীভূত করায় প্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

সম্পদ জমানোর উপায় হিসেবে নিজের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে, মুদ্রাকে অবশ্যই তার পূর্ণ অর্থে মুদ্রা হতে হবে। মূল্য-পরিমাপক হিসেবে কার্য সম্পাদনের জন্যে এর নিজস্ব মূল্য থাকা দরকার, ঠিক তেমনি এ ক্ষেত্রেও তার নিজস্ব মূল্য থাকা দরকার। একই সাথে মুদ্রাকে নিজের প্রকৃত অবয়ব নিয়ে উপস্থিত থাকতে হবে ঃ নিছক কল্পনার জগতের মুদ্রা সঞ্চয় করা যায় না, যে মুদ্রা বাস্তবে অস্তিত্ববান, সেই মুদ্রাই কেবল পুঞ্জীভবন করা যায়। সুতরাং সঞ্চলন-মাধ্যমের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে মুদ্রা যে গুণের অধিকারী এ ক্ষেত্রেও তাকে সেই গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে।

উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে, এরূপ লোকের দেখা কদাচিৎই পাওয়া যায়, যে নিছক পুঞ্জীবভনের বাসনা থেকে মুদ্রা পুঞ্জীভূত করে থাকে। যে লোক গোপনে মুদ্রা জমা করে রাখে, কিংবা মুদ্রা-রূপেই সম্পদ জমায়, সে হলো পুঁজিবাদের একেবারে প্রথম যুগেরই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। পুঁজিবাদী বিনিয়োগকারীর দৃষ্টি আর আজকাল মুদ্রার স্বর্ণাভ ছটায় ধাঁধিয়ে যায় না। সে জানে, স্বীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে তাকে অবশ্যই তার উৎপাদন বাড়াতে হবে, বাড়াতে হবে তার মুদ্রার সঞ্চলন, শ্রমিকদের কাছ থেকে নিঃশেষে নিংড়ে নিতে হবে আরো বেশী মজুরী-বিহীন শ্রম। কিন্তু, এমন কি আধুনিক পুঁজিবাদকেও (কিংবা যে ব্যাঙ্ক তার সেবা করে তাকেও) সময়ে সময়ে মুদ্রার পুঞ্জীভবনে ব্যাপৃত থাকতে হয়। উৎপাদন বাড়াতে গেলে তার থাকতে হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা, যা যেকোন মুহূর্তেই ব্যয় করতে হতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের গতিধারায় তা এই পরিমাণ মুদ্রা পুঞ্জীভূত করে।

অধিকন্তু, লেনদেনের উপায় হিসেবে মুদ্রা কাজ করে। ক্রয় ও বিক্রয় প্রায়ই ধারে সম্পন্ন হয়। ক্রেতা নির্দিষ্ট পণ্য খরিদ করে এবং নির্ধারিত সময় পরেই কেবল তার দাম পরিশোধ করে। মুদ্রার এই কাজটি বিনিময়ের আরো অধিক ব্যাপক অগ্রগতি প্রতিফলিত করে। স্বতন্ত্র পণ্য-উৎপাদকদের মধ্যেকার বন্ধন আরো দৃঢ় হয়। তাদের পরস্পর-নির্ভরশীলতাও বৃদ্ধি পায়। এখন ক্রেতা হয়ে দাঁড়ায় দেনাদার বা খাতক [debtor] আর বিক্রেতা রূপান্তরিত হয়

পাওনাদারে [creditor]। যখন দেনা পরিশোধের সময় নিকটবর্তী হয় তখন দেনাদারকে যেমন করেই হোক সবকিছু উপেক্ষা করে মুদ্রা সংগ্রহ করতে হয়। দেনা যাতে পরিশোধ করা যায় তার জন্যে তাকে তার পণ্য অবশ্যই বিক্রী করতে হবে। যদি সে ক্রেতা খুঁজে না পায় এবং নিজের দেনা শোধ না করতে পারে, তাহলে কি ঘটবে ? তাহলে, এটা কেবল যে তার নিজের উৎপাদনের উপরই আঘাত হানবে তাই নয়, বরং তার পাওনাদারের উৎপাদনের উপরও আঘাত হানবে, পাওনাদার ধারে তাকে যা দিয়েছিল তা ফেরৎ পাবে না। এভাবে সংকটের সম্ভাবনা আরো তীব্র হয়ে উঠবে, যে সংকট সঞ্চলন-মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার সম্পাদ্য কাজের মধ্যে পূর্ব থেকেই অন্তর্নিহিত রয়েছে।

সঞ্চলনের জন্যে প্রয়োজনীয় মুদ্রার পরিমাণ যে নিয়ম-বিধি দ্বারা নির্ধারিত হয়, লেন-দেনের উপায় হিসেবে মুদ্রার কাজ সেই নিয়ম-বিধির ক্ষেত্রে নতুন শর্ত আরোপ করে। সঞ্চলন মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার কাজ থেকে কিছু লক্ষণ দেখা দেয়, আবার লেন-দেনের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার কাজ থেকে কিছু নতুন লক্ষণও উদ্ভূত হয় ; এই নতুন লক্ষণগুলো পুরানো লক্ষণগুলোর সাথে যুক্ত হয়। পূর্বে, সঞ্চলনের জন্যে আবশ্যক মুদ্রার পরিমাণ নির্ভর করতো সঞ্চলনরত দ্রব্য-সামগ্রীর সর্বমোট দামের উপর এবং মুদ্রা-সঞ্চলনের দ্রুততার ওপর। এখন নিম্নোক্ত পরিস্থিতি তার সাথে যুক্ত হয়। সর্বপ্রথম, যেসব পণ্য ধারে বিক্রী করা হয়েছে সেগুলোর দামের সর্বমোট পরিমাণ সঞ্চলনরত পণ্য-সামগ্রীর দামের সর্বমোট পরিমাণ থেকে বিয়োগ করা দরকার। অন্যদিকে, যেসব পণ্য ধারে বিক্রী করা হয়েছিল, কিন্তু যেগুলোর দাম পরিশোধের সময় হয়েছে সেগুলোর দামের সর্বমোট পরিমাণ অবশ্যই যোগ করতে হবে। অধিকন্তু, যেসব লেন-দেন পরস্পরকে কাটাকাটি করে সেসবের সর্বমোট পরিমাণকে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে, কারণ বিভিন্ন পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত।

সর্বশেষে, মুদ্রা **সর্বজনীন মুদ্রার** [universal money] ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, স্বর্ণ হলো এমন একটি পণ্য যা অন্যান্য সকল পণ্য থেকে কেবল এখানেই ভিন্ন যে তা সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা হয় স্বর্ণের দ্বারা। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক, ইংল্যাণ্ড যে পরিমাণ মূল্যের পণ্য আমেরিকা থেকে আমদানী করেছে, তার চেয়ে বেশী পরিমাণ মূল্যের পণ্য আমেরিকায় রপ্তানী করেছে। তাহলে, আমেরিকাকে এই তারতম্যের জন্যে দেনা পরিশোধ করতে অবশ্যই কিছু পরিমাণ স্বর্ণ ইংল্যাণ্ডের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

স্বর্ণকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন কাগজের টুকরা দ্বারা স্বর্ণকে প্রতিস্থাপন করা প্রচলিত প্রথা। যদি এই কাগুজে মুদ্রা পণ্য-সঞ্চলনের জন্য যা প্রয়োজনীয় তার চেয়ে বেশী পরিমাণে ছাড়া না হয়, যদি অবাধে তা স্বর্ণের সাথে বিনিময় করা যায়, তাহলে এই কাগুজে মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতা স্থির থাকে। কিন্তু, পুঁজিবাদী সরকারগুলো তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে, বিশেষ করে যুদ্ধ-বিবাদের সময় ও অন্যান্য সব ধরণের বিপর্যয়ের কালে, অতিরিক্ত পরিমাণ কাগুজে মুদ্রা ছাড়ে; বর্তমান সময়ে (পুস্তকের রচনাকাল ত্রিশ-এর দশকের কথা বলা হয়েছে – অনুঃ) যখন পুঁজিবাদ চরমতম সংকটে পড়েছে, তখন কিছু সংখ্যক বুর্জোয়া সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সর্বপ্রথম, কিছু সংখ্যক দ্বিতীয় সারির পুঁজিবাদী দেশে মুদ্রা-স্ফীতি ঘটানো হয়, কিন্তু শীগ্‌গিরই ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মতো সর্ববৃহৎ পুঁজিবাদী সরকারও একই পথ অনুসরণ করে।

মূল্য-সূত্র – পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদনের গতির নিয়ম

পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদক সমাজের স্বতন্ত্র উৎপাদকদের মধ্যেকার সামাজিক সম্পর্কসমূহ পর্দাবৃত, অস্পষ্ট। এই সামাজিক সম্পর্ক অভিব্যক্ত হয় পণ্যের বিনিময়ে। পণ্য-উৎপাদন

প্রথায়, শ্রম পরিগ্রহ করে মূল্যের রূপ। পণ্যের বিনিময় হয় তাদের মূল্য অনুসারে, অর্থাৎ, পণ্যের মধ্যে মূর্ত (জমাটবদ্ধ) সামাজিকভাবে আবশ্যক বিমূর্ত শ্রমের পরিমাণ অনুসারে। **পুঁজিবাদী** পণ্য-উৎপাদন প্রথার মধ্যে অন্তর্নিহিত সকল দ্বন্দ্বই পণ্যের মধ্যে, তাদের মূল্যের মধ্যে, পণ্যের বিনিময়ের মধ্যে ভ্রূণাকারে পরিদৃষ্ট হয়।

"মার্কস, তাঁর পুঁজি গ্রন্থে, সর্বপ্রথম বিশ্লেষণ করেছেন সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে সাধারণ, মৌলিক ও গতানুগতিক বিষয় এমন সম্পর্ককে যার রয়েছে ব্যাপক উপস্থিতি আর যাকে বুর্জোয়া (পণ্য) সমাজে কোটি কোটি বার লক্ষ্য করা যায়। বিশ্লেষণে এটাই উদ্ঘাটিত হয় যে, এই সরল বিষয়টির মধ্যেই (বুর্জোয়া সমাজের এই 'কোষের' মধ্যেই) আধুনিক সমাজের **সকল** দ্বন্দ্ব (যথাক্রমে সকল দ্বন্দ্বের ভ্রূণ) বর্তমান। পরবর্তী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, এসব দ্বন্দ্বের এবং তার সমস্ত অংশের সমষ্টি হিসেবে এই সমাজের বিকাশ (বৃদ্ধি ও গতি উভয়টিই) প্রদর্শন করে।" [লেনিন, "দ্বন্দ্বতত্ত্ব সম্পর্কে"]

মূল্য-সূত্র [Law of value] হলো পুঁজিবাদী পণ্য উৎপাদনের **গতির নিয়ম** [Law of motion]। দ্বন্দ্বের আরোও অধিক বিকাশের রূপেই এই গতি দেখা দেয়, মূল্যের মধ্যেই যে দ্বন্দ্বের বীজ নিহিত। এই দ্বন্দ্বগুলো সংকটের সময়ই সবচেয়ে তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ পায়। পুঁজিবাদী পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উৎপাদনের নৈরাজ্য সবচেয়ে নগ্নভাবে দেখা দেয় সংকটের সময়। সমসাময়িক পুঁজিবাদী সংকট এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সংকটের সময় উৎপাদিকা-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহ সবচেয়ে তীক্ষ্ণভাবে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, যে দ্বন্দ্বসমূহ অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের দিকে পুঁজিবাদকে টেনে নিয়ে যায়।

পণ্য-উৎপাদনের ঐতিহাসিক বিকাশ ও পুঁজিবাদী উৎপাদনে এর রূপান্তরের সাথে সাথে পুঁজিবাদ যতই আরো অধিক বিকাশ লাভ করে, ততই পণ্য ও মূল্যের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বসমূহ বৃদ্ধি পেতে থাকে ও অধিকতর জটিল হয়ে ওঠে। পণ্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বসমূহের বৃদ্ধি প্রতিফলিত করে পুঁজিবাদী বিকাশের এক বিরাট ঐতিহাসিক পদবিক্ষেপ।

"ভ্রূণাকারের পণ্য-অর্থনীতি তথা সরল বিনিময় থেকে তার সর্বোচ্চ রূপ তথা বৃহদায়তন উৎপাদন পর্যন্ত পুঁজিবাদের বিকাশকে মার্কস খুঁজে বের করেছেন।" [লেনিন, "মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি উপাদান", সঃ রঃ, ১৯শ খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৮, পৃঃ ২৭]

বহু শতাব্দীব্যাপী বিস্তৃত, এই বিরাট ঐতিহাসিক বিকাশ-ধারাকে মার্কস কিভাবে খুঁজে বের করেছেন তা প্রদর্শন করে লেনিন দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ঘটে ঃ

"বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা যেখানে দেখেছিলেন দ্রব্যের সাথে দ্রব্যের সম্পর্ক (এক পণ্যের সাথে অন্য পণ্যের বিনিময়) সেখানে মার্কস উদ্ঘাটিত করলেন **মানুষে মানুষে সম্পর্ক**। পণ্যের বিনিময়ের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে বাজারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদকদের মধ্যেকার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে **মুদ্রা** হলো তার নিদর্শন, তা স্বতন্ত্র উৎপাদকদের গোটা অর্থনৈতিক জীবনকে একই সমগ্রের মধ্যে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত করেছে। পুঁজি সূচিত করছে এই সম্পর্কের আরো অধিক বিকাশ ঃ মানুষের শ্রম-শক্তিই পরিণত হয়েছে পণ্যে।.....

"শ্রমিকের শ্রমে গড়া পুঁজি শ্রমিকেরই করে সর্বনাশ, ক্ষুদে-উৎপাদকদের করে ধ্বংস আর সৃষ্টি করে বেকারদের বাহিনী। .....

"ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের ধ্বংস সাধন করে, পুঁজি শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধি এবং বৃহৎ পুঁজিপতিদের সংঘগুলোর জন্যে একচেটে অবস্থা সৃষ্টির দিকে চালিত করে। উৎপাদন নিজেই হতে থাকে উত্তরোত্তর সামাজিক – লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শ্রমিক সংযুক্ত হয়ে পড়ে এক সুব্যবস্থিত অর্থনৈতিক সংগঠনের মধ্যে – কিন্তু যৌথ শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি শ্রেণী। উৎপাদনের নৈরাজ্য, সংকট, বাজারের জন্যে হন্যে হয়ে ছোটা, আর জনসাধারণের ব্যাপক অংশের টিকে থাকার অনিশ্চয়তা বাড়তেই থাকে।" [লেনিন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬]

পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব সমূহের বিকাশ, একই সাথে, সর্বহারা শ্রেণীর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের ভিত্তি রচনা করে। লেনিন লিখেছেন ঃ

"পুঁজিবাদ সমগ্র বিশ্ব জুড়েই বিজয় লাভ করেছে, কিন্তু এই বিজয় হলো পুঁজির উপর শ্রমের বিজয়ের কেবল সূচনা মাত্র।" [পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭]

নিরীক্ষামূলক প্রশ্নাবলী

১। স্বাভাবিক উৎপাদন ও পণ্য-উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য কি ?

২। পণ্যের মূল্য কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয় ?

৩। সামাজিকভাবে-আবশ্যক শ্রম বলতে কোন্ শ্রমকে বোঝান হয় ?

৪। মূর্ত-শ্রম ও বিমূর্ত-শ্রমের মধ্যেকার পার্থক্য কি ?

৫। পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থায় বাজারের ভূমিকা কি ?

৬। মূল্য-সূত্র কিভাবে কাজ করে ?

৭। সরল পণ্য-উৎপাদন থেকে পুঁজিবাদের পার্থক্য কোথায় ?

৮। পণ্য-উৎপাদন কি মুদ্রা ছাড়া অস্তিত্বশীল হতে পারে ?

পুঁজিবাদী শোষণের মর্মবস্তু

সকল পুঁজিবাদী দেশেই শ্রমিকশ্রেণীর ওপর বুর্জোয়াশ্রেণীর শোষণ বিদ্যমান। শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণী – এরাই হলো প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশে পরস্পরের মুখোমুখী অবস্থানরত দুই শ্রেণী। যে পরিস্থিতিটি বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর মেহনতের ফল আত্মসাৎ করাটা সম্ভব করে তোলে সেই পরিস্থিতিকে আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে। সর্বহারাশ্রেণীর মহান শিক্ষক মার্কস পুঁজিবাদী শোষণের যে গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করে গিয়েছেন, তা আমাদের অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে।

পুঁজিবাদী শোষণের গোপন রহস্যটি কি ? কিভাবে তা ঘটছে ? পুঁজিপতিদের সম্পদশালী হওয়ার গূঢ় রহস্যটি কি ? কোন অদৃশ্য শৃংখল দ্বারা শ্রমিক তার শোষকের কাছে আবদ্ধ ? এক শ্রেণীর নিঃস্ব হওয়ার বিনিময়ে অপর শ্রেণী কেন বিত্তবান হয়ে ওঠে ?

মার্কসীয় তত্ত্ব এসব প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই এক স্পষ্ট ও যথাযথ উত্তর দেয়। মার্কসীয় শিক্ষাবলী পুঁজিবাদী জগতের অভ্যন্তরীণ কাঠামো আমাদের সামনে ব্যাখ্যা করে, তার বিকাশের ও তার অনিবার্য বিনাশের সকল অন্তঃস্থ ধারাকে উদ্ঘাটন করে দেয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা সরল পণ্য-উৎপাদন ও তার মৌলিক সূত্র – **মূল্য-সূত্র** সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি। সরল পণ্য-উৎপাদন অপরিহার্য রূপে নিজের মধ্যেই **পুঁজিবাদী উপাদানের** [Capitalist elements] জন্ম দিয়ে থাকে। সরল পণ্য-উৎপাদন পুঁজিবাদে বিকাশ লাভ করে, পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়। মূল্য-সূত্র হলো পণ্য-উৎপাদনের বিকাশের নিয়ম। এই বিকাশ পুঁজিবাদের দিকে এগিয়ে চলে। এই বিকাশের সাথে সাথে একত্রেই প্রাথমিক মূল্য-সূত্রের শক্তিও বৃদ্ধি পায়।

পুঁজিবাদ কি ? লেনিন নিম্নোক্তভাবেই এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ঃ

"পুঁজিবাদ হলো বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরের পণ্য-উৎপাদন যখন শ্রমশক্তি খোদ নিজেই পণ্যে পরিণত হয়।" [লেনিন, "সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়"]

পণ্য-উৎপাদন প্রথায়, আশু ব্যবহারের জন্যে নয়, বরং বিনিময়ের জন্যে, বাজারের জন্যে, বিক্রীর জন্যেই দ্রব্য উৎপাদিত হয়। মূল্য-সূত্রই পণ্যের উৎপাদন ও বিনিময়কে নিয়ন্ত্রণ করে। পণ্যের বিনিময় হয় তাদের মূল্য অনুসারে, অর্থাৎ, সেগুলো উৎপাদন করতে গিয়ে সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রমের পরিমাণ অনুসারে।

পুঁজিবাদ পণ্য-উৎপাদন ও তার নিয়মগুলোকে বিলুপ্ত করে দেয় না। বিপরীতপক্ষে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য-উৎপাদন তার বিকাশের **সর্বোচ্চ স্তরে** উপনীত হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য-উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলী এমনকি আরো অধিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে। সে কারণে, পুঁজিবাদী উৎপাদনের নিয়মাবলী পণ্য-উৎপাদনের নিয়মাবলীর ওপর, আর প্রাথমিকভাবে মূল্য-সূত্রের উপর স্থাপিত। মার্কস বলেছেন ঃ

"পুঁজিবাদী উৎপাদন সূচনাকাল থেকেই দুটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত। ১) তা পণ্যের আকারেই দ্রব্যের উৎপাদন করে। পুঁজিবাদ পণ্য উৎপাদন করে – এই বাস্তব ঘটনা দ্বারা অন্যান্য পণ্য-উৎপাদন পদ্ধতি থেকে তাকে আলাদা করা যায় না। তার বিশেষ নিদর্শন হলো এই যে, তার উৎপন-দ্রব্যের প্রাধান্যপূর্ণ ও নির্ধারক চরিত্র হলো – সেগুলো হচ্ছে পণ্য। প্রথমতঃ, তার অর্থ হলো

এই যে, শ্রমিক খোদ নিজেই পালন করে স্বাধীন মজুরী শ্রমিক হিসেবে পণ্য-বিক্রেতার ভূমিকা, ফলতঃ মজুরী-শ্রমই হয়ে দাঁড়ায় শ্রমের বৈশিষ্ট্যমূলক চরিত্র

"২) পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথার অন্য সুনির্দিষ্ট চিহ্ন হলো উৎপাদনের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ও নির্ধারক প্রেরণা হিসেবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন। পুঁজি অপরিহার্যরূপে পুঁজিই সৃষ্টি করে, আর সেই পরিমাণেই তা করে থাকে যে পরিমাণে তা উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে।" ["পুঁজি", ৩য় খণ্ড]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য-উৎপাদনের রূপ-কাঠামো প্রসার লাভ করে। দেখা দেয় এক নতুন পণ্য, শ্রমশক্তি, যা সরল পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থায় অস্তিত্বশীল ছিল না। এটা কোন ধরনের পণ্য ?

"শ্রমশক্তি বা শ্রম করবার ক্ষমতা দ্বারা মানুষের মধ্যে বর্তমান সেই সমস্ত মানসিক ও দৈহিক সামর্থ্যসমূহের সমষ্টিকেই বুঝতে হবে, যা যেকোন ধরনের ব্যবহারিক-মূল্য সৃষ্টি করার সময় সে প্রয়োগ করে থাকে।" [পূর্বোক্ত]

অন্য কথায় বলতে গেলে, শ্রমশক্তি হলো মানুষের শ্রম করার ক্ষমতা, উৎপাদনমূলক কর্ম-তৎপরতার সামর্থ্য।

মার্কস বলেছেন,

"পুঁজিপতি শ্রমশক্তি ক্রয় করে তা ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই ; আর ব্যবহারকার্যে নিয়োজিত শ্রম-শক্তিই হলো শ্রম।" [ঐ]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমশক্তি পণ্যে পরিণত হয়। কিন্তু শ্রমশক্তি কি সব সময়ই একটি পণ্য ? সব সময় অবশ্যই নয়। একজন ক্ষুদে উৎপাদকের কথাই ধরা যাক। সে তার নিজের এক টুকরা জমিতে কিংবা নিজের কারখানায় নিজেই কাজ করে। সে তার উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রী করে, কিন্তু তার শ্রমশক্তি বিক্রী করে না। সে তার শ্রমশক্তি নিজেই ব্যবহার করে। এটা স্পষ্ট যে, যে-পর্যন্ত নিজস্ব এক টুকরা জমি কিংবা কারখানার মালিক সে থাকে, সে-পর্যন্তই সে এটা করতে পারে। কারিকরের হাত থেকে তার বেঞ্চি বা হাতিয়ার-পত্র সরিয়ে নিলে, ক্ষুদে চাষীর কাছ থেকে ঐ জমিখানি কেড়ে নিলে তাদের শ্রমশক্তি আর তারা তাদের নিজস্ব কাজে নিয়োগ করতে পারবে না।

তখন তাদের কী আর করবার থাকে ? যাতে উপোস করতে না হয় সে উদ্দেশ্যে, কাজ পাওয়ার জন্যে সেই পুঁজিপতিদের কাছেই আবেদন জানাতে তারা বাধ্য হবে, যারা ফ্যাক্টরী, জমি, কারখানা বা রেলপথের মালিক। কিন্তু পুঁজিপতিদের কাছে ভাড়া খাটবার অর্থ কি ? এর অর্থ হলো – শ্রমশক্তি বিক্রী করা।

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পুঁজিবাদের উত্থানের জন্যে প্রয়োজন নির্দিষ্ট পরিবেশ বা পূর্বশর্ত। একদিকে, সমাজের কিছু লোকের হাতে সকল উৎপাদন-যন্ত্র (কিংবা এসব উৎপাদন-যন্ত্র ক্রয় করার জন্য যথেষ্ট অর্থ) থাকা আবশ্যক, অন্যদিকে, এমন এক শ্রেণীর লোকও থাকতে হবে, যারা তাদের শ্রমশক্তি বিক্রী করতে বাধ্য হয়।

"পুঁজির জন্মের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত হলো ঃ প্রথমতঃ সাধারণভাবে পণ্য-উৎপাদনের অপেক্ষাকৃত উন্নত বিকাশের অবস্থাধীনে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির হাতে যথেষ্ট পরিমাণ মুদ্রার পুঞ্জীভবন, আর, দ্বিতীয়তঃ এমন শ্রমিকদের অবস্থিতি, যারা দ্বিবিধ অর্থেই 'মুক্ত' ঃ নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রী করার ব্যাপারে যেকোন বাধ্যবাধকতা বা বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত, আর জমি থেকে কিংবা সাধারণভাবে উৎপাদন-যন্ত্র থেকে মুক্ত, অর্থাৎ, বিষয়-সম্পত্তিহীন শ্রমিক বা 'সর্বহারা', যারা নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করা ছাড়া নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না।" [লেনিন, "কার্ল মার্কস", পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩]

আদিম পুঞ্জীভবন

পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে পূর্ববর্তী সমাজ-ব্যবস্থা অর্থাৎ ভূম্যধিকারী (সামন্ত) অর্থনীতির ধ্বংসস্তূপের উপর। ক্ষুদে-উৎপাদন প্রথার কোলেই পুঁজিবাদের জন্ম। পূর্ব-প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের এক আমূল রূপান্তর সাধন করে পুঁজিবাদ।

পুঁজিপতিরা কিভাবে বিত্তশালী হয়ে ওঠে ? পুঁজিবাদী যুগের শুরুতে, তিন বা চার শত বছর পূর্বে, তৎকালীন সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ইউরোপীয় দেশসমূহ (স্পেন, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড) সমুদ্রপথে ব্যাপক বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা প্রাচ্যের দূরবর্তী ও সমৃদ্ধ দেশ – ভারতবর্ষ ও চীনে যাওয়ার পথ আবিষ্কার করে; আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়। বারুদের আবিষ্কার ইউরোপীয়দের পক্ষে এসব দেশের স্থানীয় জনসাধারণের প্রতিরোধকে পরাস্ত করা সহজ করে তোলে। সমগ্র আমেরিকাই একাধারে কতকগুলো উপনিবেশে রূপান্তরিত হয়। ইউরোপীয় পুঁজির, বিশেষ করে ইংরেজ পুঁজির আদিম পুঞ্জীভবনের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল সাগর-পারের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দেশগুলোর অন্যায় লুণ্ঠন। আরেকটি উৎস ছিল খোদ ইউরোপের দেশসমূহের নিজেদের মধ্যেকার যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বিজিত দেশসমূহের লুণ্ঠন। সর্বোপরি, সুদী-কারবারের মাধ্যমে নিজ দেশের জনসাধারণকে লুণ্ঠন, চড়া সুদের দামে বৈদেশিক বাণিজ্য, এবং আংশিকভাবে সরাসরি দস্যুবৃত্তি (বিশেষ করে জলদস্যুবৃত্তি) – পুঁজির জন্মের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি নয়।

কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদনের আবির্ভাবের জন্যে যে সমস্ত সমস্যার সমাধান প্রয়োজন, সম্পদের পুঞ্জীভবন হলো তার অর্ধেক মাত্র। বাকি অর্ধাংশ হলো যথেষ্ট সংখ্যক-স্বাধীন শ্রমিক পাওয়া।

যে-পর্যন্ত একজন লোকের স্বাধীনভাবে কাজ করার সম্ভাবনা থাকে, সে-পর্যন্ত কোন পুঁজিপতির জন্যে সে কাজ করতে যাবে না। ক্ষুদে-উৎপাদকদের কাছ থেকে উৎপাদন-যন্ত্র ছিনিয়ে নেয়া তাই আবশ্যক হয়ে পড়ে, যাতে এরপর তার যা থাকে তা নিয়ে – অর্থাৎ শ্রমশক্তি নিয়ে – বাজারে যেতে তাকে বাধ্য করা যায়। মজুরী-শ্রমিকের আরেকটি আবশ্যকীয় শর্ত হলো এই যে, ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে মুক্ত থাকতে হবে, যাতে তারা স্বাধীনভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে পারে, যাতে তারা স্বাধীনভাবে তাদের শ্রমশক্তি বিক্রী করতে পারে।

ভূমিদাস-সমাজে এসব শর্ত বিরাজ করতো না, যে-ব্যবস্থা ছিল ইউরোপের সর্বত্রই প্রচলিত। সে কারণেই পুঁজিবাদ পূর্ববর্তী ভূমিদাস ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করে।

কিন্তু পুঁজির স্বার্থে কৃষককে মুক্ত করাই যথেষ্ট নয় – তাকে এমন একটা অবস্থায় অবশ্যই নিক্ষেপ করতে হবে যেখানে সে পুঁজিপতির কারখানা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্ম-সন্ধান করতে বাধ্য হয়। এটা সত্য, পুঁজি যে কারিকর ও হস্তশিল্পীদের ধ্বংস করে দেয় তাদের মধ্য থেকে সে কিছু সংখ্যক মজুরী-শ্রমিক পেয়ে থাকে, কিন্তু এই সংখ্যা যথেষ্ট নয় – নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের দরকার পড়ে। অধিকন্তু, পুঁজির জন্যে সব সময়ই কিছু সংখ্যক শ্রমিকের মজুত বাহিনী থাকতে হবে, যে বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো।

সুতরাং, ভূমিদাস ব্যবস্থা থেকে কৃষকের 'মুক্তির' সাথে যুগপৎ আরেকটি 'মুক্তিও' সাধিত হয়, যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে জমিতে সে কাজ করে সে জমি থেকেও সে 'মুক্ত' হয়। কৃষকের নিকট জমির সেই অংশই থাকে [এবং সাধারণতঃ ঐ জমি তাকে কিনে নিতে

হতো] যার দ্বারা ভূম্যধিকারীর অধীনে সে তার খোরাকীর সমাধান করতো। জমির স্বল্পতা কৃষকদের ঠেলে দেয় পুঁজির থাবার মধ্যে। 'বাড়তি' শ্রমজীবীরা গ্রাম চেড়ে চলে যায় এবং পুঁজিবাদী শিল্পের খেদমতে হাজির মজুরী-শ্রমিকদের এক মজুত বাহিনী গঠন করে তোলে।

এভাবে, আদিম পুঞ্জীভবন পুঁজিবাদের উত্থানের **প্রয়োজনীয় পূর্ব-শর্তগুলো** সৃষ্টি করে। তা সৃষ্টি করে সেই প্রয়োজনীয় অবস্থা যা ছাড়া পুঁজিবাদ টিকে থাকতে পারে না। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি সেই শর্তগুলো কী। একদিকে, তা হলো, সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশের হাতে সম্পদের পুঞ্জীভবন, অন্যদিকে বিপুল ব্যাপক শ্রমিক সাধারণের সর্বহারায় রূপান্তর, যাদের নাই কোন উৎপাদন-যন্ত্র আর সে কারণে যারা শ্রমশক্তি বিক্রী করতে বাধ্য। আদিম পুঞ্জীভবন এভাবে **উৎপাদন-যন্ত্র থেকে উৎপাদকের বিচ্ছেদ** ঘটায়। এই বিচ্ছেদ ঘটানো হয় নিষ্ঠুরতম পদ্ধতির লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি, হত্যাকাণ্ড ও সন্ত্রাসের দ্বারা। পুঁজিবাদের উদ্ভবের এসব শর্ত সৃষ্টি হওয়ার পর, খোদ পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার দ্বারা সেগুলো আরো দৃঢ়ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। পুঁজিবাদী কারখানায় শ্রমিকেরা দেহের রক্ত পানি করে শোষকদের সম্পদ বহু গুণ বৃদ্ধিই করে। কিন্তু তারা নিজেরা সেই বঞ্চিত সর্বহারাই থেকে যায়, শ্রমশক্তি বিক্রী করতে যারা বাধ্য।

মুদ্রার পুঁজিতে রূপান্তর

পুঁজি সর্বপ্রথম মুদ্রার রূপেই উদ্ভূত হয়। সুতরাং ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের ক্ষেত্রে মুদ্রা একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

পণ্য-উৎপাদন প্রথার বিকাশের একটি স্তরে মুদ্রা পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়। পণ্য-সঞ্চলনের সূত্র সাধারণতঃ হলো ঃ প (পণ্য) – মু (মুদ্রা) – প (পণ্য), অর্থাৎ একটি পণ্য ক্রয়ের জন্য অন্য পণ্যের বিক্রয়। কিন্তু পুঁজির সাধারণ সূত্র হলো এর ঠিক বিপরীত ঃ মু – প – মু, অর্থাৎ (মুনাফা সহ) বিক্রয়ের জন্য ক্রয়।

এই দুইটি সূত্রের মধ্যে পার্থক্য কি ? প – মু – প সূত্রটি **সরল পণ্য-উৎপাদনের** বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ ক্ষেত্রে এক পণ্যের সাথেই অন্য পণ্যের বিনিময় হয়ে থাকে। মুদ্রা কেবল বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এখানে বিনিময়ের উদ্দেশ্য স্পষ্ট – ধরা যাক, মুচি তার জুতা বিনিময় করে রুটির সাথে। এক ব্যবহারিক-মূল্যের সাথে অন্য ব্যবহারিক-মূল্যের বিনিময় হয়। পণ্য-উৎপাদক তার পণ্য হস্তান্তর করে, যে পণ্যের প্রয়োজন তার নেই, আর বিনিময়ে অন্য একটি পণ্য গ্রহণ করে, যে পণ্যের প্রয়োজন তার রয়েছে।

পুঁজি-সঞ্চলনের সূত্রটি হচ্ছে পুরোপুরিভাবেই ভিন্ন চরিত্রের। পুঁজিপতি নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু মুদ্রা নিয়ে বাজারে যায়। এখানে সূচনাবিন্দু পণ্য নয়, বরং মুদ্রা। নিজের মুদ্রা নিয়ে পুঁজিপতি নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয়ে করে। কিন্তু পুঁজির বিচলন এতেই শেষ হয়ে যায় না। পুঁজিপতির পণ্য রূপান্তরিত হয় মুদ্রায়। এখানে পুঁজির বিচলনের সূচনা বিন্দু ও সমাপ্তি বিন্দু মিলে যায় ঃ শুরুতে পুঁজিপতির হাতে ছিল মুদ্রা আর সমাপ্তিতেও পুঁজিপতির হাতে থাকে মুদ্রাই। কিন্তু, এটা সুবিদিত যে, মুদ্রা সর্বদা মুদ্রাই, গুণগত দিক দিয়ে তার কোন ভিন্নতা হয় না, পার্থক্য হয় কেবল পরিমাণের দিক দিয়ে। মুদ্রা অন্যান্য পণ্য-সামগ্রীর মতো নয়, যেগুলোকে বিপুল গুণগত বিভিন্নমুখীনতা দ্বারাই পৃথক করা যায়। সুতরাং যদি পুঁজির বিচলনের শেষে পুঁজিপতির কাছে সেই পরিমাণ পুঁজিই থাকে যা তার কাছে সূচনাতে ছিল, তাহলে পুঁজির এই গোটা বিচলনটাই সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। পুঁজির অস্তিত্বের সামগ্রিক উদ্দেশ্য, তার বিচলনের গোটা অর্থ হলো এই যে, বিচলনের শুরুতে যে মুদ্রা ছাড়া হয়, বিচলনের শেষে তার চেয়ে অধিক মুদ্রা সঞ্চলন থেকে উঠিয়ে আনা হয়। পুঁজির লক্ষ্য হলো মুনাফা বের করে আনা। সরল পণ্য-উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেরূপ, তেমনি পুনরায় ক্রয় করার উদ্দেশ্যে বিক্রী করা এর সূত্র নয়, বরং এর সূত্র হলো বিক্রী করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা ও মুনাফা বের করে আনা।

কিন্তু কি উপায়ে এই মুনাফা লাভ করা হয় ? যদি পুঁজিপতি তার মুদ্রা দিয়ে যেকোন সাধারণ পণ্য ক্রয় করে এবং কেনা-দামের উর্ধ্বে বিক্রী করে, তাহলে সে নিজেকে সম্পদশালী করে। কিন্তু তা সে করতে পারে শুধুমাত্র অন্য পুঁজিপতির ক্ষয়-ক্ষতি ঘটিয়েই - হয় যাদের কাছ থেকে সে পণ্য ক্রয় করে ও তার প্রকৃত দাম পরিশোধ না করে তাদের ঠকায় তাদের ক্ষতি করে, আর না-হয় যাদের কাছে পণ্যের দামের চেয়ে বেশী মুদ্রায় তা বিক্রী করে তাদের সে ক্ষতি করে, অথবা উভয়েরই সে ক্ষতি করে সম্পদ বৃদ্ধি করে। কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেদের ঠকিয়ে, পারস্পরিকভাবে এক পুঁজিপতি আরেক পুঁজিপতিকে ঠকিয়ে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। তাহলে মুনাফা লাভ করে সে কিভাবে ? স্পষ্টতঃ, পুঁজিপতি যখন বাজারে যায়, তখন তাকে অবশ্যই এক বিশেষ ধরনের পণ্য খুঁজে বের করতে হবে। সে পণ্যকে এমন এক পণ্যই হতে হবে, যা ব্যবহৃত হওয়ার সময় মূল্য সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এমন একটি পণ্য আছে। এই পণ্য হলো শ্রমশক্তি।

শ্রমশক্তির ক্রয়-বিক্রয় ও তার মূল্য

পণ্য-অর্থনীতি প্রথায় প্রত্যেক পণ্যই স্বীয় মূল্যে বিক্রী হয়। একজন শ্রমিক কি বিক্রী করে ? শ্রমিক বিক্রী করে তার শ্রমশক্তি, যা পুঁজিপতির কাছে তার প্রতিষ্ঠান চালিয়ে যাওয়ার জন্যে অত্যাবশ্যক।

কিন্তু আমরা জানি যে, প্রত্যেক পণ্যেরই মূল্য আছে এবং এই মূল্য নির্ধারিত হয় এই পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে আবশ্যক শ্রম-সময় দ্বারা। শ্রমিক যে পণ্য বিক্রী করে সেই পণ্যের তথা শ্রমশক্তির মূল্য কি ?

এটা পুরোপুরিভাবে সুস্পষ্ট যে, একজন লোক একমাত্র তখনই কাজ করতে পারে যখন সে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ যখন সে নিজেকে খাওয়াতে-পরাতে পারে এবং তার মাথা গোঁজাবার ঠাঁই থাকে। এটা বোধগম্য যে, মানুষ একমাত্র তখনই কাজকর্ম করতে পারে যখন সে তার চাহিদা পূরণ করতে, অর্থাৎ, যেকোন ভাবে তার সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক চাহিদা মেটাতে পারে। ক্ষুধার্ত থাকলে, পরিধেয় বস্ত্র না থাকলে, শ্রমিক কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, সে তার শ্রমশক্তি হারিয়ে ফেলে। সুতরাং এটা প্রমাণ করা যেতে পারে যে, শ্রমশক্তির উৎপাদন নিহিত রয়েছে শ্রমিকের সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক চাহিদা পূরণের মধ্যে।

কিন্তু আমরা এটাও জানি যে, যে সমস্ত জিনিস মানুষের চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়) পূরণ করে সেসব সমস্তগুলোই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় হলো পণ্য, বিনা মূল্যে সেগুলো পাওয়া যায় না। এগুলো তৈরী করতে নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয় এবং এটাই তাদের মূল্য নির্ধারণ করে। সুতরাং 'শ্রমশক্তি' নামক পণ্যের মূল্য হচ্ছে – নিজের ও তার পরিবারের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে, স্বীয় শ্রমশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্যে এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থে ভবিষ্যৎ শ্রমশক্তির যোগান নিশ্চিত রাখার জন্যে – **শ্রমিককে যেসব পণ্য অবশ্যই ব্যবহার করতে হয় সেসব পণ্যের মূল্যের সমান।**

"সাধারণ শ্রমিকের দ্বারা স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজনীয় জীবন ধারণের পক্ষে অপরিহার্য বস্তু-সামগ্রীর মূল্যের দ্বারাই শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারিত হয়।" [মার্কস, "পুঁজি", ১ম খণ্ড]

কিন্তু এই পণ্য-সামগ্রীর মূল্য নির্ভর করে সেগুলো উৎপাদন করতে আবশ্যক শ্রমের উপর।

অন্য কথায় বলতে গেলে, শ্রমশক্তি নামক পণ্যটির মূল্য নির্ধারিত হয়, এই বিশেষ পণ্যটি উৎপাদন করতে গিয়ে আবশ্যক শ্রমের পরিমাণ দ্বারা ; অন্যদিকে, আমরা পূর্বেই যেভাবে উল্লেখ করেছি তেমনি, এই পণ্য গঠিত হচ্ছে শ্রমিক কর্তৃক ব্যবহৃত খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা। 'শ্রমশক্তি' নামক পণ্যের এই মূল্যই পুঁজিপতি মজুরীর রূপে পরিশোধ করে।

পুঁজিপতি হলো কারখানার মালিক ; সেখানে আছে ইমারত যেখানে থাকে মেশিন-পত্র, আছে গুদামঘর যেখানে থাকে কাঁচামাল ও জ্বালানী এবং সব ধরনের সহায়ক বস্তু-সামগ্রী। কিন্তু মনুষ্য-শ্রম ছাড়া এই সবকিছু অচল। সেজন্যেই পুঁজিপতি মজুরী দিয়ে মজুর নিযুক্ত করে। এর দ্বারা সে প্রয়োজনীয় শেষ পণ্যটি ক্রয় করে। এখন সব কিছুই ঠিকঠাক। উৎপাদন শুরু হতে পারে। শ্রমিকেরা কাজ শুরু করে, প্রতিষ্ঠান চালু হয়, যন্ত্রপাতি হয়ে ওঠে গতিশীল।

শ্রমিক নিযুক্ত করে তথা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তার শ্রমশক্তি খরিদ করে, পুঁজিপতি তাকে দিয়ে কাজ করায়। এখানেই নিহিত রয়েছে তার শ্রমশক্তি ক্রয় করার গোটা তাৎপর্য।

শ্রমের সাথে শ্রমশক্তিকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। **শ্রমশক্তি আর শ্রম কখনোই এক ও অভিন্ন বস্তু নয়**। শ্রমশক্তি হলো মানুষের কাজ করার ক্ষমতা। শ্রম হলো মূল্যের স্রষ্টা ঃ কিন্তু তা নিজে পণ্য হতে পারে না। **শ্রমশক্তিই হলো পণ্য**।

আমরা জানি যে, রেলগাড়ীর ইঞ্জিন ও ইঞ্চিনের গতির মধ্যে পার্থক্য আছে। ইঞ্জিন নিশ্চল হয়ে কোন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এই ক্ষেত্রে ইঞ্জিন রয়েছে, কিন্তু কোন গতি নেই। ইঞ্জিন চলার সামর্থ্যের অধিকারী, যখন দরকার তখন সে গতিশীল হয়। একইভাবে উদাহরণস্বরূপ, শ্রমশক্তির মালিক যদি বেকার থাকে, তাহলে তা অব্যবহৃত অবস্থায় থাকবে। কিন্তু, অসুস্থ হয়ে না পড়লে, কিংবা, ক্ষুধায় অবসন্ন না হলে, যেহেতু বেকার শ্রমিকের শ্রমশক্তি তখনও রয়েছে, সেহেতু যেকোন মূহুর্তে সে কাজ শুরু করতে পারে, ঠিক যেমনি দীর্ঘ সময় নিশ্চল থাকার পর একটি ইঞ্জিন গতিশীল হয়ে উঠতে পারে।

আমরা ইতিপূর্বেই পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি যে কোন পণ্যের দাম তার মূল্যের উপরে কিংবা নীচে হতে পারে। কিন্তু, অন্যান্য সকল পণ্যের বিসদৃশে, শ্রম-শক্তির ব্যাপারে দামের প্রবণতা সব সময়ই হলো তার মূল্যের নীচে থাকা। এর অর্থ, শ্রমিক তার সকল চাহিদা পূরণের জন্যে জীবন-ধারণার্থে আবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রীর পর্যাপ্ততা লাভ করে না। যখন আমরা বলি যে, শ্রমিকের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আবশ্যক জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যের দ্বারা শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারিত হয়, তখন এর দ্বারা আমরা মোটেই একথা জোর দিয়ে বলি না যে, শ্রমিক সব সময় তার শ্রমশক্তির পূর্ণ মূল্য পেয়ে থাকে। বিপরীত পক্ষে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেত্রেই সে মূল্যের অপেক্ষা কম দামেই তার শ্রমশক্তি বিক্রী করতে বাধ্য হয়। যাহোক, এমনকি শ্রমিক যখন তার শ্রমশক্তির পূর্ণ মূল্যও পায়, তখনও পুঁজিপতি উৎপাদন থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য লাভ করে এবং এটা তার সম্পদ বৃদ্ধির উৎস হিসেবে কাজ করে।

পুঁজিপতির মুনাফার উৎস কি ?

আমরা পূর্বেই দেখেছি কিভাবে বিভিন্ন পণ্য তাদের মূল্যে বিনিময় হয়। এখন দেখা যাক, কিছু লোকের দ্বারা সৃষ্ট মূল্য কিভাবে অন্য কিছু লোকের পকেটে চলে যায়।

কারবার শুরু করতে গিয়ে পুঁজিপতি উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় সব কিছুই খরিদ করে ঃ যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, জ্বালানী। শ্রমিক নিযুক্ত করে সে প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তিও খরিদ

করে। ফ্যাক্টরীতে শুরু হয় উৎপাদন ঃ জ্বালানী পোড়ে, যন্ত্রপাতি চালু হয়, শ্রমিকরা মেহনত ঢালতে থাকে, কাঁচামাল পণ্যে রূপান্তরিত হয়। যখন পণ্য তৈরী হয়ে যায়, তখন সেগুলো বিক্রী করে দেয়া হয় আর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে পুঁজিপতি পুনরায় উৎপাদন-চক্র শুরু করে।

এভাবে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য কত ? প্রথমতঃ, তাদের মূল্যের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে তাদের উৎপাদনে যে সমস্ত পণ্য ব্যয় হয়েছে সেগুলোর দাম ঃ যন্ত্রপাতি ব্যবহারাদির ফলে ক্ষয়, জ্বালানি খরচ, আর ব্যবহৃত কাঁচামাল। ধরা যাক, এই সব কিছুর মূল্য ৩০০০ শ্রম-ঘন্টা। তারপর এক নতুন মূল্য প্রবেশ করে, যা ঐ নির্দিষ্ট ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের সৃষ্ট। ধরা যাক, ২০ জন লোক দৈনিক ১০ ঘন্টা হিসেবে ৫ দিন কাজ করেছে। এটা সহজেই পরিদৃষ্ট যে, এ দ্বারা তারা ১০০০ শ্রম-ঘন্টার মূল্য সৃষ্টি করেছে। সুতরাং যে নতুন পণ্য পুঁজিপতি লাভ করলো তার পূর্ণ মূল্য হলো ৩০০০+১০০০ = ৪০০০ শ্রম-ঘন্টা।

এখন প্রশ্ন ওঠে, এর জন্যে পুঁজিপতি নিজে কত খরচ করলো ? এটা পুরোপুরি স্পষ্ট, ব্যবহারাদির কারণে যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতির জন্যে, নিঃশেষিত জ্বালানীর জন্যে ও কাঁচামালের জন্যে পুঁজিপতিকে এসবের পূর্ণ মূল্য, অর্থাৎ, ৩০০০ শ্রম-ঘন্টার সমতুল্য মুদ্রা দিতে হয়েছে। কিন্তু এই ৩০০০ শ্রম-ঘন্টা ছাড়াও, মজুরী-শ্রমিকদের ব্যয়িত ১০০০ শ্রম-ঘন্টাও এই নতুন পণ্যের মূল্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে। পুঁজিপতি কি তার শ্রমিকদের ১০০০ শ্রম-ঘন্টার সমতুল্য মূল্য পরিশোধ করেছে ? এখানেই নিহিত রয়েছে পুঁজিবাদী শোষণের সামগ্রিক গূঢ় রহস্যের সমাধান।

পুঁজিপতি ২০ জন শ্রমিককে ৫ দিনের শ্রমশক্তির মূল্য পরিশোধ করে। অর্থাৎ, ৫ দিনের জন্যে শ্রমশক্তি উৎপাদন করার পক্ষে যথেষ্ট অর্থই সে তাদের পরিশোধ করে। এটা সহজেই বোঝা যায় যে, এই অর্থের পরিমাণ ১০০০ শ্রম-ঘন্টার মূল্যের চেয়ে কম। ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় করে, আবশ্যিকভাবেই, তা হলো এক জিনিস, অপর পক্ষে, তার কাজ করার ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যে আবশ্যকীয় পণ্য-সামগ্রীর মূল্য হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

"..... শ্রম-শক্তির মূল্য আর শ্রম-প্রক্রিয়ায় শ্রমশক্তি যে মূল্য সৃষ্টি করে তা হলো পুরোপুরিভাবেই ভিন্ন তাৎপর্যসম্পন্ন।" [পূর্বোক্ত]

আমাদের উল্লেখিত দৃষ্টান্তে ফিরে আসলে, আমরা ধরে নিতে পারি যে, একজন শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য ৫ শ্রম-ঘন্টার সমান। তাহলে, পুঁজিপতি তার শ্রমিকদের ৫০০ শ্রম-ঘন্টার সমতুল্য পরিমাণ মুদ্রা পরিশোধ করবে।

এখন যোগ করে দেখা যাক। পুঁজিপতির খরচ তখন দাঁড়াবে ৩০০০+৫০০ = ৩৫০০ শ্রম-ঘন্টা। কিন্তু, আমরা পূর্বেই দেখেছি, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য হলো ৩০০০+১০০০ = ৪০০০ শ্রম-ঘন্টা।

উদ্বৃত্ত-শ্রম ও উদ্বৃত্ত-মূল্য

পুঁজিপতির মুনাফা আসে কোথা থেকে ? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়াটা এখন সহজ। মুনাফা হলো শ্রমিকদের অপরিশোধিত শ্রমের ফল। এই মুনাফা হলো শ্রমিকের অতিরিক্ত শ্রম, কিংবা, যেভাবে বলা হয়, **উদ্বৃত্ত শ্রমের** ফল, যে শ্রমিকেরা রোজের ৫ ঘন্টা ধরে তাদের মজুরীর সমান মূল্য সৃষ্টি করে এবং বাকি ৫ ঘন্টা ধরে উৎপন্ন করে **উদ্বৃত্ত মূল্য**, যা যায় পুঁজিপতিরই পকেটে। শ্রমের অপরিশোধিত অংশই হলো উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎস, সমস্ত মুনাফা, সকল অনুপার্জিত সম্পদ বৃদ্ধির উৎস।

"মজুরী-শ্রমিক জমি, ফ্যাক্টরী ও শ্রমের হাতিয়ার-পাতির মালিকের নিকট তার শ্রমশক্তি বিক্রী করে। শ্রম-দিবসের এক অংশ শ্রমিক ব্যবহার করে তার নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের খরচ মেটাবার জন্যে (মজুরী), আর দিনের অপর অংশ সে খেটে মরে কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই এবং সৃষ্টি করে পুঁজিপতির জন্যে **উদ্বৃত্ত-মূল্য**, যা হলো মুনাফার উৎস।

"উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব হলো মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তি-মূল।" [লেনিন, "মার্কসবাদের তিনটি উৎস ও তিনটি উপাদান", পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬]

মার্কসীয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব পুঁজিবাদী শোষণের গূঢ় রহস্যকে উদ্ঘাটন করে দিয়েছে। সে কারণে পুঁজিবাদের ধ্বংস সাধনের জন্যে, নয়া কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলার জন্যে সংগ্রামরত সর্বহারাশ্রেণীর হাতে এই শিক্ষা হলো এক অমূল্য হাতিয়ার। সে কারণেই বুর্জোয়া শ্রেণী ও তাদের 'বিজ্ঞ' অনুচরেরা মার্কসীয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্বের বিরুদ্ধে আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে কারণেই তারা এই শিক্ষাকে "মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে" ও "বিনাশ সাধন করতে" নিয়ত সচেষ্ট।

আমরা পূর্বেই দেখেছি, মার্কসীয় উৎদ্বৃত্ত-মূল্যের তত্ত্ব মার্কসের মূল্য সম্পর্কিত শিক্ষাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সে কারণে, মূল্য সম্পর্কিত মার্কসীয় শিক্ষাবলীকে সকল প্রকার বিকৃতির কবল থেকে রক্ষা করা অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, **শোষণের তত্ত্ব** গড়ে উঠেছে এর উপরই।

আমরা এখন পুঁজিপতিদের বিত্তবান হওয়ার উৎসগুলো সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধান-কর্মের সার-সংকলন করতে পারি। উৎদ্বৃত্ত-মূল্য প্রসঙ্গে শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আমরা পাই লেনিনের রচনায়, তা উদ্ধৃত করলেই এই সার-সংকলন হবে সর্বোত্তম ঃ

"পণ্যের সঞ্চলন থেকে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উদ্ভব হতে পারে না, কারণ তা কেবলমাত্র সমতুল্য বস্তুসমূহের বিনিময়কেই তুলে ধরে, দামের বৃদ্ধি থেকেও তা উদ্ভূত হতে পারে না, কারণ ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক লোকসান ও লাভ একে অপরের সমতা বিধান করে ; আর আমরা এখানে যে বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি তা স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের নিয়ে নয়, বরং ব্যাপক, গড়পড়তা, সামাজিক বিষয় নিয়ে। উদ্বৃত্ত মূল্য যাতে সে লাভ করতে সক্ষম হয় সে উদ্দেশ্যে, 'টাকার মালিককে অবশ্যই ..... পেতে হবে ..... বাজারে এমন একটি পণ্য যার ব্যবহারিক-মূল্যের রয়েছে মূল্যের উৎস হওয়ার বিশেষ গুণ' (মার্কস, 'পুঁজি', ১ম খণ্ড) – এমন এক পণ্য, যার ব্যবহারের প্রকৃত প্রক্রিয়া হলো একই সময়ে মূল্য সৃষ্টিরও প্রক্রিয়া। এ ধরনের একটি পণ্য আছে। তা হলো মনুষ্য শ্রমশক্তি। এর ব্যবহার হচ্ছে শ্রম, আর শ্রমই মূল্য সৃষ্টি করে। অর্থের মালিক শ্রমশক্তি ক্রয় করে তার মূল্য অনুসারে, যে মূল্যটি, অন্যান্য সকল পণ্যের মূল্যের ন্যায়ই, নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনের (অর্থাৎ, শ্রমিক ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের) জন্যে দরকার সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রম-সময় দ্বারা। শ্রমশক্তি ক্রয় করে, অর্থের মালিক তা ব্যবহার করার অধিকার পায়, অর্থাৎ, সমগ্র দিনের জন্যে, ধরা যাক, ১২ ঘন্টার জন্যে, কাজে নিয়োগ করার অধিকার পায়। ইতোমধ্যেই ছয় ঘন্টা সময়ের ('আবশ্যক' শ্রম-সময়ের) মধ্যে শ্রমিক তার নিজের ভরণ-পোষণের খরচ পরিশোধের পক্ষে যা যথেষ্ট তাই উৎপাদন করে ; আর পরবর্তী ছয় ঘন্টার (উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের) মধ্যে সে উৎপাদন করে উদ্বৃত্ত পণ্য-সামগ্রী বা উদ্বৃত্ত মূল্য, যার জন্যে পুঁজিপতি তাকে কোন মজুরী দেয় না।" [লেনিন, "কার্ল মার্কস", সঃ রঃ, ২১শ খণ্ড, ১৯৬৬, পৃঃ ৬২]

প্রাচীন যুগে, যখন মানুষ বর্বর অবস্থা থেকে তখনও বেরিয়ে আসতে পারেনি, তখন আদিম মানবকে জীবন ধারণের জন্যে একান্ত আবশ্যক দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করার জন্যে দেহের সকল শক্তি ও উদ্যমকে ব্যয় করতে হতো। এই শ্রম দ্বারা যেসব জিনিস তারা সংগ্রহ করতে পারতো তা দিয়ে বর্বর যুগের মানুষরা ক্ষুধায় মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদেরকে কেবল কোনক্রমেই রক্ষা করতে পারতো।

আদিম মানুষ যখন অতি কষ্টে ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতো, তখন মানুষ-মানুষে কোন ধরণের সামাজিক বৈষম্য থাকতে পারতো না, উদাহরণ স্বরূপ, জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে সেরূপ কোন বৈষম্য নেই। উদ্বৃত্ত-শ্রমের প্রচলন অসাম্যের উদ্ভবের, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। কিছু কিছু লোকের উদ্বৃত্ত-শ্রম অন্য কিছু লোকের লাভের কারণ হয়ে ওঠে, এই উদ্বৃত্ত-শ্রমের উৎপন্ন-দ্রব্য সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর হাতে গিয়ে পড়ে, যারা নিম্নতর শ্রেণীগুলোকে শোষণ করে।

এরূপ অবস্থা পুঁজিবাদী যুগ পর্যন্ত এবং পুঁজিবাদী যুগেও চালু আছে। এটা সত্য শোষণের রূপ পরিবর্তিত হয়। দাসতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষণের রয়েছে বিভিন্ন চেহারা, কিন্তু অন্তর্বস্তুর দিক দিয়ে তা একই। শাসকশ্রেণী কর্তৃক সমগ্র সমাজের উদ্বৃত্ত-মূল্যের আত্মসাৎই এসবের ভিতরে বিদ্যমান।

"সমাজের বিভিন্ন অর্থনৈতিক রূপের মধ্যেকার, উদাহরণ স্বরূপ, দাস-শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ আর মজুরী-শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের মধ্যেকার পার্থক্য নিহিত রয়েছে কেবল প্রথা-পদ্ধতির মধ্যে, যে পদ্ধতিতে এই উদ্বৃত্ত-শ্রম প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত উৎপাদক তথা মেহনতকারীর কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নেয়া হয়।" [মার্কস, "পুঁজি", ১ম খণ্ড]

মার্কস দেখিয়ে দিয়েছেন যে, পুঁজি উদ্বৃত্ত-শ্রম উদ্ভাবন করে নাই। যেখানেই সমাজ শোষক ও শোষিত নিয়ে গঠিত, সেখানেই সর্বত্র শাসকশ্রেণী ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষ ও শোষিত জনগণের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত-শ্রম ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত-শ্রম আত্মসাতের অদম্য লালসা শ্রেণী-সমাজের পূর্বের যে কোন রূপের চেয়ে এক অধিকতর অপরিমেয় চরিত্র পরিগ্রহ করে।

দাস-প্রথা ও ভূমিদাস-প্রথার যে ব্যবস্থায় স্বাভাবিক-উৎপাদনই ছিল প্রাধান্যপূর্ণ সেখানে উদ্বৃত্ত-শ্রম আত্মসাৎ করার একটা নির্দিষ্ট সীমা ছিল। দাস-মালিক বা সামন্তপ্রভূ তাদের দ্বারা শোষিত জনগণের কাছ থেকে সেই পরিমাণ শ্রমই নিংড়ে নিতো যা তাদের চাহিদা বা ইচ্ছা-অভিলাষ পূরণের জন্যে ছিল আবশ্যক। বিপরীতপক্ষে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত-শ্রম আত্মসাতের অদম্য লালসার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। পুঁজিপতি শ্রমিকদের কাছ থেকে যে উদ্বৃত্ত-শ্রম নিংড়ে নেয় তা রূপান্তরিত হয় ঝন্‌ঝনে মুদ্রায়, যে মুদ্রাকে পুনরায় বিনিয়োগ করা যায় নতুন তথা বাড়তি পুঁজি হিসেবে, যা আবার নিয়ে আসে নতুন উদ্বৃত্ত-মূল্য। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো উদ্বৃত্ত-শ্রম লাভের অদম্য লালসা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকদের উপর শোষণ বৃদ্ধির প্রবণতা কোন সীমা-পরিসীমা জানে না। পুঁজিপতিরা তাদের মজুরী-দাসদের উপর শোষণকে বাড়িয়ে তোলার কোন উপায়কেই উপেক্ষা করে না।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংস সাধনের সাথে সাথে, পুঁজিবাদী শোষণের অবসানের সাথে সাথেই, পুঁজিবাদীদের সুবিধার জন্য যে উদ্বৃত্ত-শ্রম শুষে নেয়া হয় তা বন্ধ হয়ে যায়। পুঁজির আধিপত্যের কালে যে অর্থে কাজের দিনকে প্রয়োজনীয় ও উদ্বৃত্ত ঘন্টা হিসেবে বিভক্ত করা হয়, সেই অর্থে কাজের দিনের বিভাগেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। এ ব্যাপারে মার্কস যা বলেছেন তা হলো ঃ

"উৎপাদনের পুঁজিবাদী রূপকে দমন করেই কেবলমাত্র শ্রম দিবসের দীর্ঘতাকে আবশ্যকীয় শ্রম-সময়ে কমিয়ে আনা যায়। কিন্তু এমনকি সে ক্ষেত্রেও, পরবর্তীটির (আবশ্যক শ্রম-সময়ের) সীমা প্রসারিত হয়ে যায়। একদিকে, এর কারণ হলো, 'জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী' সম্পর্কিত ধারণা বেশ পরিমাণে প্রসার লাভ করবে, আর শ্রমিকেরা সামগ্রিকভাবে এক ভিন্ন জীবনধারণের মান দাবি করবে। অন্যদিকে, এর কারণ হলো, এখন যা উদ্বৃত্ত-শ্রম তখন তার একটা অংশ আবশ্যক শ্রম

হিসেবে পরিগণিত হবে, মজুত ও সঞ্চয়ের জন্যে একটা তহবিল গঠনের শ্রমের কথাই আমি বলছি। (উৎপাদন-যন্ত্রের ও জীবন-ধারণের উপকরণাদির মজুদ যা শিল্পের বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করবে এবং অন্যান্যের মধ্যে দুর্ঘটনাজনিত কারণে যে সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি ঘটতে পারে তা পূরণ করবে)।" ["পুঁজি", ১ম খণ্ড]

যে সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিকদের উপর শোষণ আর বিরাজমান নেই, সেখানকার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে একটা উপলব্ধি অর্জনের জন্যে মার্কসের এই কথাগুলো সাহায্য করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইতিহাসে প্রথম বারের মতো শ্রেণী-শোষণকে শেকড়-শুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়েছে। পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান গুলোতে যেমন রয়েছে, সোভিয়েত প্রতিষ্ঠান সমূহে কোন বিপরীত স্বার্থসম্পন্ন দুটি শ্রেণী তেমনভাবে নেই। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সোভিয়েত রাষ্ট্রের তথা সর্বহারা একনায়কত্বের সম্পত্তি। যে শ্রেণী এসব কারখানা ও ফ্যাক্টরীর মালিক, আর যে শ্রেণী এসব প্রতিষ্ঠানে শ্রম করে, তারা উভয়েই এক ও অভিন্ন শ্রেণী। সোভিয়েত ব্যবস্থায় শ্রমিকরা কোন বিরোধী ও শত্রুভাবাপন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধির নিকট তাদের শ্রমশক্তি বিক্রী করে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কোন উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন নেই এবং তা হতে পারে না। শ্রমিকদের শ্রম তাদের উপার্জনের উপরে যে বাড়তি উৎপাদন করে তা ঐ একই শ্রমিকশ্রেণীর ও তার একনায়কত্বের যৌথ চাহিদা পূরণ করার কাজে লাগে ঃ অর্থাৎ দেশের সাধারণ প্রয়োজন পূরণ, সমাজতান্ত্রিক পুঞ্জীভবন, প্রতিরক্ষা চাহিদা পূরণের কাজে লাগে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান, সমাজতান্ত্রিক নয় – ট্রটস্কিবাদীদের এরূপ আবিষ্কার বিদ্বেষপূর্ণ কুৎসা ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব কুৎসা রটিয়ে ট্রটস্কিবাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণ-কর্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য তাদের দেশদ্রোহিতামূলক অপচেষ্টাকে আড়াল করতে চায়।

পুঁজি কি ?

উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন কি তা আমরা বিশ্লেষণ করেছি। পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিকদের মজুরীবিহীন শ্রম আত্মসাৎ করার অর্থনৈতিক গতি-বিজ্ঞানকেও আমরা অধ্যয়ন করেছি। আমরা দেখেছি যে, সর্বহারাদের শ্রমই হলো পুঁজিপতিদের অনুপার্জিত সম্পদের একমাত্র উৎস। যে অদৃশ্য শক্তি মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের খেয়াল-খুশীর নিকট কোটি কোটি লোককে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে, সেই শক্তির প্রতি এবার বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। পুঁজির শক্তিকে আরো গভীরভাবে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে, বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে পুঁজি কি।

পুঁজিপতিদের দ্বারা শ্রমিকদের শোষণ একমাত্র এ কারণেই সম্ভব যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমস্ত সম্পদ বুর্জোয়াদের হাতে কেন্দ্রীভূত। উৎপাদনের ও জীবন-ধারণের সকল উপায়ের মালিকই হলো পুঁজিপতিরা, কিন্তু এর কোনটির উপরই শ্রমিকদের মালিকানা নেই। সমাজের সমস্ত সম্পদ বুর্জোয়ারা একচেটে করে নিয়েছে (অর্থাৎ, একক অধিকার কায়েম করেছে)।

"পণ্য-উৎপাদনের ভিত্তিতে উদ্ভূত পুঁজিবাদী সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো – সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক উৎপাদন-যন্ত্রগুলোর উপর পুঁজিপতি শ্রেণী ও বড় ভূস্বামীদের একচেটে মালিকানা ; সর্বহারাশ্রেণীর মজুরী-শ্রমের শোষণ, উৎপাদন-যন্ত্র থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে যারা নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রী করতে বাধ্য হয় ; মুনাফার জন্য পণ্য উৎপাদন, আর এই সব কিছুর সাথে সংযুক্ত, সামগ্রিকভাবে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার পরিকল্পনাহীন ও নৈরাজ্যমূলক চরিত্র।" [কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মসূচী, পৃঃ ১, মডার্ন বুকস লিঃ, লণ্ডন, ১৯২৯]

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মসূচীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরিত্রকে এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বহারাশ্রেণী উৎপাদন-যন্ত্র থেকে বঞ্চিত। উৎপাদন-যন্ত্র দ্বারা আমরা সেইসব জিনিসকেই বুঝি কাজ করার জন্য যেগুলো মানুষের নিকট প্রাথমিকভাবে আবশ্যক। এটা সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, উৎপাদন-যন্ত্র বেশ কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে গঠিত। প্রথমতঃ, যেগুলো হলো শ্রমের হাতিয়ারপত্র, মুচির সরল সুঁচ থেকে আধুনিক কারখানা ও ফ্যাক্টরীর সর্বাপেক্ষা জটিল ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি পর্যন্ত। তারপর আছে কাঁচামাল, যা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। জুতার কাঁচামাল হলো চামড়া, লোহা গলিয়ে পরিশোধনের জন্যে কাঁচামাল হলো আকরিক লোহা ; সূতীবস্ত্র বয়নের জন্য কাঁচামাল হলো তুলা। সর্বশেষে, কাজ করার জন্য চাই বেশ কয়েকটি আনুসঙ্গিক মাল-মসলা, যেমন, তেল, বালু, চূন ইত্যাদি।

কাজের ক্ষেত্রে উৎপাদন-যন্ত্রের এসব বিপুল-সংখ্যক বিভিন্ন অপরিহার্য উপাদানগুলোর নিয়তি একই রূপ নয়। শ্রমের হাতিয়ার-পত্রগুলো দীর্ঘদিন টিকে থাকে। বস্ত্র কারখানায় একই তাঁত বহু খণ্ড বস্ত্র বয়ন করে। কিন্তু যেসব কাঁচামাল ব্যবহার হয় সেগুলোর রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়তি। উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল অদৃশ্য হয়ে যায় – রূপান্তরিত হয় সম্পূর্ণভাবেই নতুন উৎপন্ন-দ্রব্যে। মুচির হাতের চামড়া পরিণত হয় জুতায়, দর্জির হাতের কাপড় পরিণত হয় এক প্রস্থ পোষাকে, ধাতব কারখানায় আকরিক লোহা রূপান্তরিত হয় বিশুদ্ধ লোহায় ; আনুসঙ্গিক জিনিসপত্রগুলোও কাজের প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়ে যায় ঃ ফ্যাক্টরী বয়লার উত্তপ্ত করতে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায় জ্বালানী, যন্ত্রের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যায় তেল।

এসব যে উৎপাদন-যন্ত্রগুলো ছাড়া কোন কাজই করা সম্ভব নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সেগুলো সবই থাকে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে। এর ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী লাভ করে সমাজের উপর বিপুল কর্তৃত্ব। বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতের উৎপাদন-যন্ত্র হয়ে ওঠে শোষণের যন্ত্র, কারণ অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতেই সেগুলো কেন্দ্রীভূত, অন্যদিকে বিপুল ব্যাপক জনসাধারণ হলো সেগুলো থেকে বঞ্চিত আর সেহেতু তাদের শ্রমশক্তি বিক্রী করতে বাধ্য।

মার্কস বলেছেন – পুঁজি কোন জড় পদার্থ নয়, বরং তা হলো এক নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক। বুর্জোয়া শ্রেণীর করতলগত জিনিসপত্রাদি – উৎপাদন-যন্ত্র ও অন্যান্য সকল ধরণের পণ্য – স্বীয় দিক থেকে পুঁজি নয়। কেবল এক নির্দিষ্ট সমাজ-ব্যবস্থাই এসব জিনিসপত্রাদিকে শোষণের যন্ত্রে পরিণত করে, যে সামাজিক সম্পর্ককে আমরা বলি পুঁজি তার বাহনেই সেগুলোকে রূপান্তরিত করে। পুঁজি হলো "একটি বিশেষ, ঐতিহাসিক-ভাবে নির্দিষ্ট, সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক"। (লেনিন)

যে শ্রেণী উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক, আর উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে যে শ্রেণী শোষণের অধীনস্থ হতে বাধ্য হয়, পুঁজি হলো সেই শ্রেণীগুলোর মধ্যেকার সামাজিক সম্পর্ক। যেহেতু পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদন-যন্ত্র ক্রয় ও বিক্রয় হয়, সেহেতু সেগুলো হলো পণ্য। আর পণ্য হওয়ার কারণে সেগুলোর রয়েছে মূল্য এবং তা মুদ্রায় রূপান্তরিত (অর্থাৎ, বিক্রীত) হতে পারে ; বিপরীতপক্ষে, মুদ্রার বিনিময়ে যে-কেউই সর্বদা উৎপাদন-যন্ত্র পেতে (অর্থাৎ, ক্রয় করতে) পারে। সুতরাং অন্যভাবে বলতে গেলে, পুঁজিকে এমন এক মূল্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা উদ্বৃত্ত-মূল্য আনতে সক্ষম (মজুরী-শ্রম নিংড়ে নেয়ার মাধ্যমে)। কিন্তু মূল্য দানা-বাঁধা (crystallized) শ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। মূল্য হলো শ্রমের পরিণতি। মূল্য হলো ব্যয়িত, নিঃশেষিত শ্রম।

সে কারণেই মার্কস বলেছেন যে, "পুঁজি হলো নিঃশেষিত (dead) শ্রম, যা, রক্তচোষা বাদুরের মতো, জীবন্ত শ্রমকে শোষণ করেই কেবল বেঁচে থাকে ....." । ["পুঁজি", ১ম খণ্ড]

স্থির ও পরিবর্তনশীল পুঁজি

পুঁজিবাদী শোষণকে পুরোপুরিভাবে বুঝতে গেলে, স্থির এবং পরিবর্তনশীল পুঁজির মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয় করা আবশ্যক।

আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে, পণ্যের মূল্যের মধ্যে আছে কাঁচামাল ও ব্যবহারকৃত তেলের মূল্য এবং তার সাথে যন্ত্রপাতির মূল্যের একটি অংশ ইত্যাদি। মূল্যের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় না ঃ ব্যবহৃত পুঁজির এই অংশের আদিতে যে মূল্য ছিল নতুন পণ্যের মধ্যে সে পরিমাণ মূল্য বাহিত হয়ে যায়। এ কারণেই পুঁজির এই অংশকে অর্থাৎ, কারখানার ইমারত ও যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও জ্বালানীকে আমরা বলি **স্থির** [constant] পুঁজি।

কিন্তু আমরা এটাও জানি যে, নতুন পণ্যের মূল্যের মধ্যে আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রবেশ করে – তা হলো, কারখানায় শ্রমিকদের দ্বারা সৃষ্ট মূল্য। যদি কোন প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন শ্রমিক প্রত্যেকে দৈনিক ১০ ঘন্টা করে কাজ করে এবং এক ঘন্টার কাজের মূল্য, ধরা যাক, ৫০ সেন্ট হয়, তাহলে প্রতিদিন তাদের দ্বারা সৃষ্ট সামগ্রীর নতুন মূল্য হলো ৫০০ ডলারের সমান।

আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, শ্রমিকরা যে মজুরী লাভ করে তা তাদের সৃষ্ট নতুন মূল্যের চেয়ে কম। নব-সৃষ্ট মূল্যের যে অংশ শ্রমিকদের জীবন-ধারণার্থে আবশ্যক শ্রমের প্রতিনিধিত্ব করে, মজুরীর পরিমাণ কেবল সেই অংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, অন্যদিকে বাড়তি শ্রম যে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে তা যায় পুঁজিপতিদেরই পকেটে।

যদি আবশ্যক-শ্রমের পরিমাণ হয় দৈনিক ৫ ঘন্টা, তাহলে পুঁজিপতি একজন শ্রমিককে পরিশোধ করে দৈনিক ২·৫০ ডলার অর্থাৎ ১০০ জন শ্রমিককে ২৫০ ডলার। এভাবে পুঁজিপতি শ্রমশক্তি ক্রয় করার জন্য পুঁজির যে অংশ ব্যবহার করে তার পরিমাণ হলো ২৫০ ডলার, কিন্তু শ্রমশক্তি দ্বারা সৃষ্ট মূল্যের পরিমাণ হলো ৫০০ ডলার। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় পুঁজির এক অংশ দ্বিগুণ হয়েছে, অবশ্য আপনা-আপনি দ্বিগুণ হয়নি, বরং হয়েছে শ্রমিকদের মজুরী-বিহীন উদ্বৃত্ত-শ্রম আত্মসাৎ করার কারণে। সে কারণে, শ্রমশক্তি ক্রয় করার জন্য (অর্থাৎ, শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধের জন্য) ব্যবহৃত পুঁজির অংশকে আমরা বলি **পরিবর্তনশীল** [variable] পুঁজি।

পুঁজিপতিদের দৃষ্টিতে পুঁজির ক্ষেত্রে আরেক প্রকারের পার্থক্য রয়েছে। পুঁজির যে অংশ দ্রুত আবির্তিত হয়ে ফিরে আসে তার দিকে সে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করে, আর যে অংশ ধীরে ধীরে আবর্তিত হয় তা থেকে প্রথমোক্ত অংশকে স্বতন্ত্র করে দেখে। কারখানার ইমারত ও যন্ত্র-পাতি, যেগুলো দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকে, সেগুলোকে পুঁজিপতি বলে **স্থায়ী** [fixed] পুঁজি ; অন্যদিকে, পুঁজির যে অংশ দ্রুত আবর্তিত হয়ে ফিরে আসে সেই অংশকে সে বলে **চালু** [working] পুঁজি। কাঁচামাল, জ্বালানী ও শ্রমিকদের মজুরীর জন্য যে পুঁজি ব্যয় হয় তা শেষোক্তটির অন্তর্ভূক্ত।

উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় আর ফলতঃ সঞ্চলনের প্রক্রিয়ায়ও পুঁজির এই অংশগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে। তাদের স্থায়িত্বের সময়ও ভিন্ন ভিন্ন। ধরুন, কোন কারখানার ইমারতগুলো পঞ্চাশ বছর টিকে থাকতে পারে। ফলতঃ, এসব ইমারতের মূল্যের কেবলমাত্র পঞ্চাশ ভাগের একাংশই বাৎসরিক উৎপাদনের মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। এসব ইমারতের জন্য পুঁজিপতি যা ব্যয় করেছে তার পূর্ণ মূল্য কেবল পঞ্চাশ বছরেই তার নিকট ফিরে আসবে। ধরা যাক যে, যন্ত্রপাতি পনের বছর কাজ করবে। তাহলে একমাত্র পনের বছরেই উৎপাদিত পণ্যের দামের মধ্য দিয়ে এর মূল্য পুঁজিপতির নিকট ফিরে আসবে; এই পনের বছরের প্রত্যেকটিতে, পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে, পুঁজিপতি যন্ত্রপাতির মূল্যের এক-পঞ্চদশমাংশই কেবল লাভ করে। অন্যদিকে, কাঁচামাল ও জ্বালানী পণ্যের উৎপাদনে পুরোপুরিভাবেই খরচ হয়ে যায়। যদি কোন শিল্পপতি এক হাজার বেল তুলাকে ব্যবহারোপযোগী উৎপন্ন দ্রব্যে রূপান্তরিত করে এবং তা বিক্রয় করে দেয়, তাহলে কাঁচামালের জন্যে পুরো খরচ তৎক্ষণাৎ ও পুরোপুরিভাবেই তার নিকট ফিরে আসে। শ্রমশক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

স্থির ও পরিবর্তনশীল পুঁজির রূপে পুঁজির বিভাজন স্থায়ী ও চালু পুঁজি রূপে এর বিভাজনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

স্থির পুঁজির অন্তর্ভূক্ত হলো স্থায়ী পুঁজি এবং তার সাথে সাথে চালু পুঁজির সেই অংশ যা কাঁচামাল, জ্বালানী ও আনুষঙ্গিক দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য খরচ হয়। সাধারণতঃ উৎপাদনের জন্য আবশ্যক যে শ্রম (অন্য কথায় যাকে বলা হয় নিঃশেষিত শ্রম) ব্যয় করা হয়, স্থির পুঁজি দ্বারা তা ক্রয় করা হয়। অপর পক্ষে, পরিবর্তনশীল পুঁজি কেবল ব্যবহার করা হয় শ্রমিকদের মজুরীর জন্যে।

পুঁজিকে বিভক্ত করার এই পদ্ধতি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে ঃ

আবর্তনের ভূমিকা অনুসারে বিভাজন	পুঁজির অংশ	শোষণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা অনুসারে বিভাজন
স্থায়ী পুঁজি	কারখানা ইমারত, যন্ত্রপাতি	স্থির পুঁজি
চালু পুঁজি	কাঁচামাল, জ্বালানী, আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র, মজুরী	পরিবর্তনশীল পুঁজি

পুঁজি-বিভাজনের এই দুই পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থির ও পরিবর্তনশীল রূপে পুঁজির বিভাজন তাৎক্ষণিকভাবেই দেখিয়ে দেয় উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃত ও একমাত্র উৎস কি। স্থায়ী ও চালু পুঁজি রূপে বিভাজন উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃত স্রষ্টা অর্থাৎ শ্রমকে অন্যান্য উপাদানের সাথে গুলিয়ে ফেলে, যে উপাদানগুলো কোন নতুন মূল্যই সৃষ্টি করে না। সুতরাং পুঁজিবাদী প্রথায় প্রচলিত পুঁজি-বিভাজনের এই পদ্ধতি পুঁজিবাদী শোষণের মর্মবস্তুকে পর্দাবৃত তথা কুয়াশাচ্ছন্ন করে রাখে।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে, শ্রমিকরা প্রতিদিন ৫০০ ডলারের নতুন মূল্য সৃষ্টি করে এবং মজুরীর আকারে কেবলমাত্র পায় ২৫০ ডলার। এটা সুস্পষ্ট যে, অবশিষ্ট ২৫০ ডলার উদ্বৃত্ত-মূল্যের রূপেই পুঁজি আত্মসাৎ করে।

শ্রমিকদের শ্রমের কত অংশ পুঁজিপতিদের পকেটে যায় তা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে পুঁজিবাদী শোষণের মাত্রা প্রদর্শন করে এমন একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ আমরা খুঁজে পাব।

এ ধরনের নিরিখ হচ্ছে **উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার** [Rate of surplus value]। উদ্বৃত্ত -মূল্যের হার দ্বারা আমরা পরিবর্তনশীল পুঁজির সাথে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাতকে কিংবা, অন্য কথায়, আবশ্যক-শ্রমের সাথে মজুরীবিহীন শ্রমের অনুপাতকেই বুঝি। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে, উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার নিম্নলিখিত রূপ ধারণ করবে ঃ

$$\frac{\text{২৫০ ডলার উদ্বৃত্ত-মূল্য}}{\text{২৫০ ডলার পরিবর্তনশীল পুঁজি}} = \text{শতকরা ১০০}$$

যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার শতকরা ১০০ ভাগের সমান হয়, তাহলে তার অর্থ এই যে, শ্রমিকের শ্রম আবশ্যক ও উদ্বৃত্ত শ্রমে সমভাবে বিভক্ত, উদ্বৃত্ত-মূল্য পরিমাণের দিক দিয়ে পরিবর্তনশীল পুঁজির সমান, শ্রমিকদের কেবলমাত্র তার অর্ধেক শ্রমের মজুরী শোধ করা হয় এবং বাকি অর্ধেক আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি।

উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধি করার দুই পদ্ধতি

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, প্রত্যেক পুঁজিপতিই যথাসম্ভব অধিক পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূল্য লাভ করার চেষ্টা করে। সে কিভাবে এই উদ্দেশ্য সাধন করে ?

সর্বাপেক্ষা সহজ পন্থা হলো অধিক সংখ্যক মজুর নিয়োগ করা এবং উৎপাদন প্রসারিত করা। যদি ১০০ জন শ্রমিক ২৫০ ডলারের সমান উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে, তাহলে ২০০ জন শ্রমিক পুঁজিপতিকে প্রদান করবে ৫০০ ডলারের সম পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য। কিন্তু উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হলে বাড়তি পুঁজির দরকার হয়। যদি পুঁজিপতির এরূপ বাড়তি মুদ্রা কিংবা সাধারণভাবে উপায় থাকে, তাহলে সে স্বাভাবিকভাবেই তা করবে। এটা খুবই স্পষ্ট ও সোজা কথা।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, পুঁজির খরচার পরিমাণ না বাড়িয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃদ্ধি কিভাবে ঘটানো যায়। এ ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের সামনে দুটো পথ আছে।

আমরা দেখেছি যে, শ্রম-দিবস দুটো অংশ নিয়ে গঠিত – মজুরী-পরিশোধিত আবশ্যক- শ্রম আর মজুরী-অপরিশোধিত উদ্বৃত্ত-শ্রম। ধরা যাক, শ্রম-দিবস হলো ১২ ঘন্টার, যার ৬ ঘন্টা হলো মজুরী-পরিশোধিত অংশ আর অন্য ৬ ঘন্টা হলো তার উদ্বৃত্ত-শ্রম। এই

শ্রম-দিবসকে ১২ অংশে বিভক্ত একটি সরল রেখা দ্বারা উপস্থাপিত করা যাক, যার প্রত্যেকটি অংশ এক-একটি ঘন্টার প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন ঃ

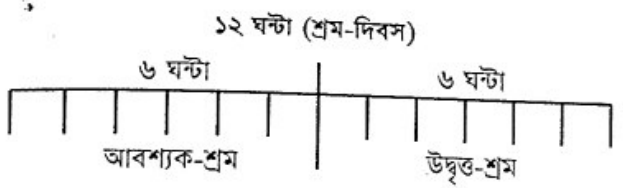

এরূপ পরিস্থিতিতে, **শ্রম-দিবসকে দীর্ঘায়িত** করে পুঁজিপতি তার প্রাপ্য উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণকে বৃদ্ধি করতে পারে। যেহেতু আবশ্যক-শ্রম অপরিবর্তিত থাকে, সেহেতু উদ্বৃত্ত -শ্রমের অন্তর্গত অংশ অধিকতর বড় হবে। ধরা যাক, শ্রম-দিবসকে বাড়িয়ে ১৪ ঘন্টা করা হয়েছে। এভাবে আমরা নিম্নোক্ত চিত্র দেখতে পাব ঃ

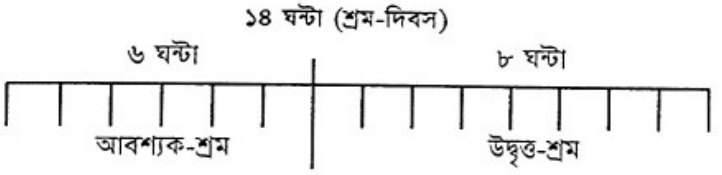

এ ক্ষেত্রে আমরা পাই, **আপেক্ষিক** [relative] উদ্বৃত্ত-মূল্যের এক বৃদ্ধি ঃ সামগ্রিকভাবে শ্রম-দিবসের এক **চূড়ান্ত** [absolute] বৃদ্ধিপ্রাপ্তির কারণে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধির আরেকটি পথ আছে। আবশ্যক-শ্রমের পরিমাণ হ্রাস করার কোন পথ যদি পুঁজিপতি খুঁজে পায় তাহলে শ্রম-দিবসের চিত্রটি কি রূপ ধারণ করবে ? এর উত্তর সহজ। ধরা যাক, আবশ্যক-শ্রম ৪ ঘন্টায় হ্রাস করা হয়েছে। তখন শ্রম-দিবসের চিত্রটি নিম্নরূপে দেখা যাবে ঃ

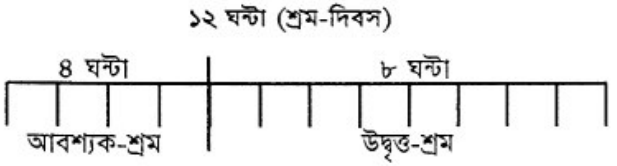

এই ক্ষেত্রে, **আপেক্ষিক** উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা বৃদ্ধি আমরা দেখতে পাই ঃ উদ্বৃত্ত-শ্রমের সাথে আবশ্যক-শ্রমের অনুপাত পরিবর্তন করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ একচেটেভাবে বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে শ্রম-দিবস থাকে অপরিবর্তিত। পূর্বে যে অনুপাত আমরা পেয়েছিলাম তা হলো ৬ ঃ ৬, আর এখন আবশ্যক-শ্রম-সময় হ্রাস করার ফলে অনুপাত দাঁড়াল ৪ ঃ ৮।

কিন্তু আবশ্যক শ্রম-সময়ের এই হ্রাস কিভাবে ঘটানো হয় ?

প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিকাশ শ্রমের বর্ধিত উৎপাদন-ক্ষমতার দিকে চালিত করে। শ্রমিকের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে অধিকতর কম শ্রম ব্যয় হয়। এসমস্ত সামগ্রীর মূল্যও হ্রাস পায়। একই নিদর্শন অনুসারে, আবশ্যক-শ্রমের পরিমাণ কমিয়ে এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যের আপেক্ষিক পরিমাণ বাড়িয়ে শ্রমশক্তির মূল্য হ্রাস করা হয়।

আবশ্যক শ্রমের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য পুঁজিপতি শ্রমিকদের স্ত্রী ও সন্তানদেরও কাজে নিয়োগ করে। পূর্বে পরিবারের প্রধান একা যা পেত এখন গোটা পরিবার মিলেই মজুরী হিসেবে তাই পায়। বর্ধিত প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে যখন শ্রমিকের ভূমিকা মেশিন-পত্রের উপর নজর রাখার এবং নিছক অত্যন্ত সহজ কর্ম-প্রণালীতে চালাবার মধ্যে কমিয়ে আনা হয়, তখন পুরুষ শ্রমিকদের স্থান খুব সহজেই নারী ও শিশুদের দ্বারা পূরণ করা যায়। পুঁজিপতিরা এ ধরনের শ্রমই বেশী পছন্দ করে কারণ তা হলো সস্তা ঃ পুরুষের স্থলে যে মহিলা শ্রমিক কাজ করে তাকে সাধারণতঃ পুরুষ শ্রমিকের কেবল অর্ধেক মজুরীই প্রদান করা হয় ; শিশু-শ্রমের জন্যে মজুরী আরোও কম।

অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য

আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধির নিম্নোক্ত পদ্ধতিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেক পুঁজিপতিই সার্বিক উপায়ে চায় তার মুনাফা বৃদ্ধি করতে। এই উদ্দেশ্যে সে সব ধরনের উন্নত পদ্ধতিই প্রবর্তন করে যাতে উৎপাদন-খরচ কমানো যায়। এই উদ্দেশ্যে সে ক্রয় করে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে প্রবর্তন করে নতুন কলা-কৌশল। যে পর্যন্ত পুঁজিপতি কর্তৃক প্রবর্তিত এসব প্রযুক্তিগত নবসৃষ্ট-কৌশল একই জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট অজ্ঞাত থেকে যায় সে পর্যন্ত সে লাভ করে অতি-মুনাফা, অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য। পণ্য-উৎপাদনের খরচ হয় কম, অন্যদিকে পূর্বের মতো একই দামে কিংবা নেহাত কিছুটা কম দামেই সে সেগুলো বিক্রী করে।

বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ এ ধরনের সুবিধা খুব কম সময়ই ধরে রাখতে পারে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রবর্তন করে। যেহেতু পণ্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত গড়পড়তা সামাজিকভাবে আবশ্যক শ্রম দ্বারা নির্দিষ্ট পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়, সেহেতু সাধারণভাবে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির প্রবর্তন প্রতিটি একক পণ্যের মূল্য হ্রাস করার দিকে চালিত হয় এবং এভাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠান তার বিশেষ সুবিধা ভোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, প্রযুক্তিগত উন্নতির মূল চালিকাশক্তি হলো অতি-মুনাফা লাভের সম্ভাবনা। বাড়তি উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভের প্রতিযোগিতা ঘটায় আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যের বৃদ্ধি, কারণ শ্রমিকদের জীবন ধারণার্থে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করতে আবশ্যক শ্রমের পরিমাণের ক্ষেত্রে তা ঘটায় হ্রাসপ্রাপ্তি। বাড়তি উদ্বৃত্ত-মূল্য হলো আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্যেরই কেবল আরেক রূপ।

শ্রম-দিবস কেন্দ্রিক সংগ্রাম

এটা পুরোপুরিভাবেই স্পষ্ট যে, পুঁজিপতিদের পক্ষে মুনাফা বাড়াবার সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো চূড়ান্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধি করা। এর জন্যে কোন প্রযুক্তিগত অগ্রগতির দরকার পড়ে না, যা প্রয়োজন তা হলো শ্রম-দিবসকে দীর্ঘায়িত করা। আর, প্রকৃতপক্ষে পুঁজিপতিরা সব সময়ই শ্রম-দিবসকে চরমভাবে বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চালায়। যদি তাদের পক্ষে এটা করা সম্ভব হতো, তাহলে দৈনিক ২৪ ঘন্টারও অধিক তারা শ্রমিকদের খাটাতো। কিন্তু শ্রম-দিবসকে দীর্ঘায়িত করার একটি স্বাভাবিক দৈহিক অন্তরায় রয়েছে। অধিকন্তু, তা শ্রমিকদের মধ্যে আরো অধিক দৃঢ় বিরোধিতার সৃষ্টি করবে। সে কারণে চূড়ান্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টার মধ্যেই পুঁজিপতিরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। এর সাথে সাথে তারা আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধির জন্যও সংগ্রাম চালায়, যার মধ্যে তারা দেখতে পায় সীমাহীন সম্ভাবনা।

পুঁজিবাদী যুগের সূচনাকালে সকল দেশেই এক অত্যন্ত দীর্ঘ শ্রম-দিবস বিরাজমান ছিল। প্রযুক্তিগত উন্নতি ছিল তখনও ক্ষীণ, আর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, শ্রমিকরা ছিল বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন এবং সংগ্রামের জন্যে ছিল না প্রস্তুত, সে কারণে চূড়ান্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপাদন ছিল সর্বত্রই প্রাধান্যপূর্ণ।

কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রম-দিবস ছিল প্রায় পুরো ২৪ ঘন্টা। নিদ্রার জন্যে শ্রমিকরা কেবল কয়েক ঘন্টা অবসর পেত, বাকি সমস্ত সময়ের মালিক ছিল পুঁজিপতি। এটা কল্পনা করা মোটেই কঠিন নয় যে, এই নির্মম শোষণের পরিণাম শ্রমিকদের জীবনে কিরূপ ছিল।

এখনও বহু দেশেই দীর্ঘ শ্রম-দিবস সাধারণ ব্যাপার। উদাহরণ-স্বরূপ, চীন দেশে বহু ফ্যাক্টরীতেই শ্রম-দিবস ষোল থেকে আঠার ঘন্টা দীর্ঘ [৩০-এর দশকের চীনের কথা বলা হচ্ছে – অনুঃ] ; এমনকি মাটির নীচের কয়লা খনিগুলোতে শ্রম-দিবস তদ্রূপ মাত্রাতিরিক্তভাবে দীর্ঘ। আর এরূপ দীর্ঘ শ্রম-দিবস কেবল পুরুষদের জন্যেই নয়, বরং নারী ও শিশুদের জন্যেও বিরাজমান।

মার্কস বলেছেন – পুঁজিবাদী সমাজে ব্যাপক জনগণের গোটা জীবনকে শ্রম-সময়ে পরিণত করে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর স্বচ্ছন্দ সময় বের করা হয়।

সর্বহারারা অবস্থার উন্নতির জন্যে যখনই সংগ্রাম শুরু করে তখনই তারা তাদের অন্যতম প্রথম দাবি হিসেবে **শ্রম দিবসকে সীমাবদ্ধ করার** দাবি তুলে ধরে। কেবল বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে অপেক্ষাকৃত পুরানো পুঁজিবাদী দেশগুলোতে (ইংল্যাণ্ডে ও তারপর ফ্রান্সে) শিশু-শ্রম ও শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য সীমাবদ্ধ করার আইন বিধিবদ্ধ হয়। শ্রমিক-শ্রেণীর পক্ষ থেকে তীব্র সংগ্রামের পরই কেবল সর্বত্র শ্রম-আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। সমগ্রভাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষাকারী বুর্জোয়া সরকারগুলো কেবলমাত্র একদিকে শ্রমিক আন্দোলনের চাপে, আর অন্যদিকে, শ্রমিকদের ছাড়া পুঁজিপতিদের কোন মুনাফা হবে না – এই কারণে শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবন বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেই এরূপ আইন প্রণয়নের সম্মতি দেয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে অতি-উন্নত দেশগুলোর অধিকাংশগুলোতেই দশ ঘন্টা শ্রম-দিবস চালু ছিল। কেবল মাটির নীচের কাজে (কয়লা ও ধাতুর খনিতে) কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্রম-দিবস ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট। শিশুশ্রম ও নারীদের কাজের (রাত্রিতে কাজ করা নিষেধ) ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিধি-নিষেধ ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ যখন পুঁজিবাদের খোদ অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুললো তখন বহু দেশেই বুর্জোয়াশ্রেণী কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য হলো। ১৯১৯ সালে বিশ্বব্যাপী ৮ ঘন্টার শ্রম-দিবস প্রবর্তন করার এক বিশেষ প্রস্তাব ওয়াশিংটনে তৈরী করা হয়, কিন্তু ফলাফল হিসেবে তা থেকে কিছুই বের হয়ে আসেনি। পরবর্তী বছরগুলোতে, পুঁজির তরফ থেকে পাল্টা আক্রমণ শুরু হবার পর অধিকাংশ সুযোগ-সুবিধাই কেড়ে নেয়া হয়। সর্বত্রই পুঁজিপতিদের দ্বারা ৮ ঘন্টা শ্রম-দিবসের বিরুদ্ধে সাধারণ আক্রমণ পরিচালিত হয় এবং অধিকাংশ দেশেই ৮ ঘন্টা শ্রম-দিবস আর বিরাজমান নেই।

শ্রমের তীব্রতা

শ্রমিকদের কাছ থেকে অধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য নিংড়ে নেয়ার অন্যতম পছন্দসই পদ্ধতি হলো শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি করা। একই অন্তবর্তী সময়ে শ্রমিকরা অধিক শ্রম নিয়োগ করবে, অধিক শক্তি-উদ্যম খরচ করবে – এরূপ ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে সে অধিক মূল্য সৃষ্টি করবে ঃ সে কারণে পুঁজিপতি যে উদ্বৃত্ত-মূল্য লাভ করে, তা বৃদ্ধি পাবে।

যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে যন্ত্রের গতিবেগ বৃদ্ধি করেই প্রায়শঃ শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি করা হয়। যন্ত্রপাতির সাথে তাল রাখবার জন্যে শ্রমিককে অবশ্যই প্রচেষ্টা নিতে হবে। যদি সে তা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার চাকুরী হারাতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে মজুরী প্রদানের বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে পুঁজিপতিরা অধিকতর তীব্রতা সহকারে শ্রমিকদের কাজ করাতে চেষ্টা করে।

অতিরিক্ত দীর্ঘ শ্রম-দিবসের মতোই, শ্রমের অতিরিক্ত তীব্রতা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও জীবনের পক্ষে সমান ক্ষতিকারক। আইনের দ্বারা যখন শ্রম-দিবসের দীর্ঘতাকে সীমাবদ্ধ করা হয় তখন পুঁজিপতিরা শ্রমের তীব্রতা অপরিমিত রূপে বৃদ্ধি করেই তা "পুষিয়ে নিতে" চায়। অধিকাংশ পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের শ্রমের তীব্রতা এত বেশী যে শ্রমিকরা অকালেই তাদের কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, দ্রুত বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং নানা রোগের শিকারে পরিণত হয়। পুঁজিপতিদের কাছে, শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি হলো শ্রমিকদের উপর শোষণ বৃদ্ধি করার, তাদের দাসত্বের মাত্রা বাড়িয়ে তোলার এক সুপরীক্ষিত পদ্ধতি।

পুঁজিবাদ ও প্রযুক্তিগত উন্নতি

বর্তমান সময়ে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী সংকটের কবলে নিপতিত হয়ে প্রযুক্তিগত উন্নতির এক শত্রু রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। পুঁজিপতিরা এবং তাদের বিজ্ঞ অনুচরেরা প্রায়শঃই যন্ত্রপাতিকে সকল অনর্থের কারণ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা চালায়। তারা বলে, অত্যধিক মেশিনপত্র, অত্যধিক যন্ত্রদানব সৎ-লোকের কাজ-কর্ম কেড়ে নিচ্ছে। এসব মেশিনপত্রে অতিরিক্ত পণ্য-সামগ্রী উৎপাদন হওয়ায় বাজারে সেগুলোর কোন কাটতি নেই। কিন্তু শ্রমিকরা জানে যে, মেশিন-পত্র নিজে থেকে বেকারত্ব, সংকট ইত্যাদি ডেকে আনে না। এসব অনিষ্টের কারণ হলো সুগভীর দ্বন্দ্ব-বিরোধ সহকারে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। মেশিন শ্রমিকের অন্ন-বস্ত্র কেড়ে নেয় না, বরং শোষণের যন্ত্র হিসেবে মেশিনপত্রের পুঁজিবাদী প্রয়োগই শ্রমিকদের অন্ন-বস্ত্র থেকে বঞ্চিত করে।

বর্তমান সংকটের অবস্থায়, বুর্জোয়াশ্রেণী স্পষ্টতঃ যান্ত্রিক উৎপাদন থেকে হস্ত-শ্রমে প্রত্যাবর্তনেরই পক্ষপাতী হয়ে উঠেছে। প্রগতির এত পরিপন্থী এসব উন্মাদ পরিকল্পনা বাস্তবে প্রয়োগ করা তাদের পক্ষে খুব একটা অসাধারণ ব্যাপার নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একদিকে যখন বহু সংখ্যক বাষ্পচালিত খননযন্ত্র ও ড্রেজিং মেশিন বেকার পড়ে থাকছে, অন্যদিকে তখন হাজার হাজার লোককে গণপূর্ত কাজে গাঁইতি ও বেলচা দিয়ে মেহনত করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এরূপ অবস্থায় দুনিয়ার বুকে সোভিয়েত ইউনিয়নই হচ্ছে একমাত্র দেশ যা সকল ক্ষেত্রে সবচেয়ে নতুন ও সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করার দিকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে আসছে। যে-দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা হচ্ছে – সে দেশই প্রযুক্তিগত উন্নতির পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে রাখছে।

আধুনিক কারিগরী প্রকৌশল শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতাকে শত-সহস্র গুণ বাড়িয়েই তুলেছে।

একজন শ্রমিক দৈনিক ৪৫০ খানি ইট হাতে তৈরী করতে পারে। সেখানে আধুনিক ইট প্রস্তুতকারী যন্ত্রে নিয়োজিত প্রত্যেক শ্রমিক দৈনিক প্রায় ৪ লক্ষ ইট তৈরী করে, অর্থাৎ, পূর্বের তুলনায় হাজার গুণ বেশী।

একটি হস্তচালিত ময়দার কল নিম্ন মানের ৪৫০-৬৫০ পাউণ্ড ময়দা প্রস্তুত করতে পারে। সেখানে মিনিয়াপোলিস শহরে (যুক্তরাষ্ট্র) একটি আধুনিক ময়দার কলে নিয়োজিত

প্রত্যেক শ্রমিক উৎকৃষ্ট মানের ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ময়দা উৎপাদন করে, অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় ২০ হাজার গুণ বেশী।

একটি আধুনিক জুতার কারখানা প্রতি ৬ দিনে শ্রমিক প্রতি ৮৩ জোড়া জুতা তৈরী করতে পারে, যেখানে একজন শ্রমিক নিজে কাজ করে উৎপাদন করতে পারে মাত্র ১ জোড়া জুতা।

যাই হোক, আধুনিক মুমূর্ষু পুঁজিবাদ এই সব সম্ভাবনা কাজে লাগাতে অক্ষম। এমনকি, বর্তমান সংকটের পূর্বে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও নতুনতম প্রযুক্তিগত উন্নতির প্রয়োগ প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়।

১৯২৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিল ২,৭৩০টি ইট প্রস্তুতকারী কারখানা, কাজে নিযুক্ত শ্রমিক ছিল ৩৯,০০০ আর তাতে ৮০০ কোটি ইট উৎপাদন হতো, সে তুলনায় ৬ থেকে ৭টি আধুনিক ইট প্রস্তুতকারী কারখানাই প্রতিটিতে ১০০ জন করে শ্রমিক নিয়ে সে দেশের বাজারের চাহিদা পুরোপুরি পূরণ করতে পারতো।

১৯২৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৬৫০ কোটি পাউণ্ড ময়দা উৎপাদিত হয়। মিনিয়াপোলিস-এর উপরিলিখিত ময়দার কলের স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা সহকারে এই পরিমাণ ময়দা উৎপাদন করার জন্য মাত্র ১৭ জন শ্রমিকের দরকার পড়তো। প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ময়দা শিল্পে কিন্তু ১৭ জন শ্রমিক ছিল না, বরং ছিল ২৭,০২৮ জন।

পাদুকা শিল্পে এমনকি ১৯২৯ সালেও অর্থাৎ, সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধির আমলেও ২,০৫,৬৪০ জন শ্রমিক উৎপাদন করেছিল ৩৬ কোটি ৫০ লক্ষ জোড়া জুতা, যাতে শ্রমিক-প্রতি প্রতি-সপ্তাহে পড়তো প্রায় ৩৫ জোড়া জুতা, ৮৩ জোড়া নয়।

এরূপ প্রায় বিপুল সংখ্যক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

এটা মনে রাখা আবশ্যক যে, পুঁজিবাদ তার যৌবন ও সমৃদ্ধির যুগে মানব সমাজের উৎপাদিকা শক্তির বিপুল উন্নতি সাথে নিয়ে এসেছিল। পুঁজিবাদের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প, তার উচ্চ প্রযুক্তিগত বিকাশ, যানবাহন ও যোগাযোগের আধুনিক উপায়গুলোর কথা কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতো না। পুঁজিবাদই সাথে নিয়ে এলো যান্ত্রিক উৎপাদন। মাটির গর্ভে যে বিপুল সম্পদরাজি চাপা দেয়া ছিল সে সম্পদ-লক্ষ্মীকে প্রাণ দান করলো সে। পুঁজিবাদ উদ্ভাবন করলো নিরতিশয় উন্নত প্রযুক্তি, লাঘব করলো যথেষ্ট পরিমাণে মানুষের শ্রম এবং বাড়িয়ে তুললো প্রকৃতির উপর মানুষের ক্ষমতা।

কিন্তু, সমাজের উৎপাদিকা শক্তির এ সমস্ত অগ্রগতিকে পুঁজিবাদ অর্পণ করলো এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর নির্মম শোষণের সেবায়। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উৎপাদন-যন্ত্রগুলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয় শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে উদ্বৃত্ত-মূল্য নিংড়ে নেয়ার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায়ে। লাভের জন্য প্রতিযোগিতা, মুনাফার জন্যে প্রতিযোগিতা – এটাই হলো পুঁজিবাদী শিল্পের চালিকা শক্তি। মুনাফা বৃদ্ধিই হলো লক্ষ্য যার জন্যে পুঁজিপতি নতুন প্রযুক্তিগত আবিষ্কারকে কাজে লাগায়।

সে কারণেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিকা শক্তির আরো অধিক বিকাশের অর্থ হলো শ্রমিকশ্রেণীর উপর শোষণের আরো মাত্রা বৃদ্ধি, বিপুল ব্যাপক জনগণের নিঃস্বতার বিনিময়ে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির আরো অধিক সমৃদ্ধি। কিন্তু উন্নত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা সম্পন্ন বিশালায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে, মনুষ্য-শ্রমের কারিগরী ক্ষমতার বিপুল বিকাশ ঘটিয়ে, পুঁজিবাদ একই সাথে সমাজতন্ত্রের বস্তুগত ভিত্তিও সৃষ্টি করে, প্রস্তুত করে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের বস্তুগত অবস্থা ও পূর্বশর্ত যার জন্য সর্বহারাশ্রেণী সংগ্রাম করছে। সর্বহারা বিপ্লবের বিজয়ের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তের সৃষ্টি – এখানেই নিহিত পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা।

মজুরী দাসত্ব

যে-বুর্জোয়ারা ধনী আর গরীবের, হৃষ্টপুষ্ট আর ক্ষুধার্তের, পরশ্রমজীবী ব্যক্তি আর অতি-পরিশ্রমী শ্রমিকের মধ্যেকার "সমতার" কথা জোর গলায় বলে, সেই-বুর্জোয়াদের এরূপ কদর্য ভণ্ডামির চেয়ে অসহনীয় আর কিছুই নেই। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধার কঙ্কাল সম হস্ত কঠোরতম আইন অপেক্ষাও অধিক কার্য্যকরী ভাবে শ্রমিকদের তাড়িয়ে নিয়ে যায় পুঁজিপতির দাসত্বের বন্ধনে। পুঁজিবাদ সর্বহারাশ্রেণীর জীবনযাত্রার অবস্থাকে বিরামহীন ভাবেই নিয়ে যায় অধিকতর মন্দের দিকে। পুঁজিবাদ ব্যাপক শ্রমিক সাধারণকে নিক্ষেপ করে অধিকতর দারিদ্র্যের মধ্যেই। শ্রমিকশ্রেণীর বাসগৃহে বুভুক্ষা হয়ে দাঁড়ায় অধিকমাত্রায় নিয়ত অতিথি। মার্কস বলেছেন ঃ

"প্রাচীন রোমের দাসদের বেঁধে রাখা হতো শৃঙ্খল দিয়ে ; মজুরী শ্রমিক তার মালিকের নিকট বাঁধা অদৃশ্য বন্ধন দিয়ে। নিয়ত মনিব বদল, আর চুক্তিপত্রের মিথ্যা আইনের সাহায্যেই, স্বাধীনতার ঠাট বজায় রাখা হয়।" [পুঁজি, ১ম খণ্ড]

আর প্রকৃতপক্ষে এক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান থেকে চাকুরী ছেড়ে অন্য পুঁজিপতির মালিকানাধীন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নেয়ার স্বাধীনতাই কেবল শ্রমিকের আছে।

বাধ্যতামূলক শ্রমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ছলে পুঁজিপতিরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এক আক্রমণাত্মক প্রচারাভিযান চালায়। শ্রমের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের শ্লোগান তুলে বিশ্বের একমাত্র স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে আধুনিক দাস-সর্দারদের এই হৈ-হল্লার চেয়ে অধিক হীন কিছু কল্পনা করাও কঠিন। বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নই হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে মজুরী-দাসত্বের পরিসমাপ্তি ঘটান হয়েছে, যেখানে মানব ইতিহাসে প্রথম বারের মতো সুবিপুল শ্রমিক সাধারণ অর্জন করেছেন সুস্থ ও স্বাধীন শ্রমের সুযোগ, আর সে শ্রম যেমন নিজেদের জন্য তেমনি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মঙ্গলের জন্যও, যে ব্যবস্থায় নেই কোন শোষক কিম্বা শোষিত।

গোটা পুঁজিবাদী বিশ্ব জুড়ে মেহনতী জনগণ নিদারুন ক্লান্তিকর ঘৃণ্য শ্রমের সাথে অদৃশ্য শৃঙ্খল-বন্ধনে আবদ্ধ, যে শ্রমের ফল কেবল তাদের দাসত্বকে আরো অধিক বাড়িয়েই তোলে, পুঁজিবাদী বন্ধন-শৃঙ্খলকে করে কঠোরতর। মুষ্টিমেয় পরশ্রম-জীবীর জন্যে সীমাহীন সম্পদরাজি সৃষ্টি করে শ্রমিকরা ক্ষুধা ও অভাবের তাড়নায় নিজেরা আরো অধিক পীড়িত হয়। পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান সমূহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মার্কস বলেছেন ঃ "দাস-সর্দারদের চাবুকের স্থান দখল করেছে কর্ম-তত্ত্বাবধায়কদের শাস্তির খাতা।" ["পুঁজি", প্রথম খণ্ড]

শ্রমিক-সর্দারের (foreman) জরিমানার খাতা – চাকুরী হারাবার ও ক্ষুধায় মৃত্য বরণের চিরন্তন আশংকা – বর্তমান যুগের শ্রমিককে দাস-মালিকদের চাবুকের চেয়ে নিঃসন্দেহে কম শঙ্কিত করে তুলে না।

কিন্তু আধুনিক পুঁজিবাদী দেশ সমূহে শ্রমিক-সর্দারদের চাবুক চালনাও কোনক্রমে বিরল নয়। কিছু সংখ্যক দেশে, বিশেষ করে উপনিবেশ সমূহে, পুঁজিপতিদের লাভের জন্যে অতিশয় নির্ভেজাল দাস-শ্রম বিরাজমান রয়েছে। "স্বাধীন" মজুরী শ্রমিকদের কাছ থেকে পুঁজি যথেষ্ট মুনাফাই লাভ করে। কিন্তু যেখানে পরিস্থিতি অনুকূল সেখানে দাস-শ্রমের সদ্ব্যবহার করতে সে বিমুখ নয়।

এমনকি সবচেয়ে অধিক উন্নত পুঁজিবাদী দেশ সমূহেও আমরা দাস-যুগের অনুরূপ অবস্থা দেখতে পাই।

অর্থনৈতিক সংকটের অবস্থায় বুর্জোয়ারা সানন্দচিত্তে বিভিন্ন রূপের "শ্রম-সেবার" [labour service] মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা সত্যিকার অর্থের বাধ্যতামূলক শ্রমিক, প্রধানতঃ

বেকার যুবকদের, নিয়োগ করে। জার্মানীর "শ্রম-সেবা" শিবিরগুলোতে, শত-সহস্র তরুণ শ্রমিক সেনা ছাউনীর সামরিক ব্যবস্থার মধ্যে বাস করে ; অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের জন্যে তারা পায় যৎসামান্য জীবিকা। একই সাথে, জার্মান ফ্যাসিবাদ এসব শিবিরের অধিবাসীদের সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য করে, তাদেরকে প্রস্তুত করে তোলে তাদের সামরিক হঠকারিতার কামানের খোরাকে পরিণত হতে।

আমেরিকায় এখনও নিগ্রো দাস-শ্রম বিদ্যমান। সেখানে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ নিগ্রো আছে, যাদের অধিকাংশই হলো শ্রমিক ও ক্ষুদে চাষী। ১৮৬৩ সালে দাস-প্রথার আনুষ্ঠানিক অবসানের পর অধিকাংশ নিগ্রো শ্রমিকদের ঠেলে দেয়া হয় তাদের নিয়োগ-কর্তার উপর নির্মম নির্ভরতার এক অবস্থায়।

মার্কিন দক্ষিণাঞ্চলীয় অঙ্গ-রাজ্যগুলোতে বহু ক্ষেত্রেই ভূম্যধিকারী ফসল কাটার মৌসুম না আসা পর্যন্ত এক চিলতে জমি, বীজ, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি দিয়ে থাকে। রায়ৎ কৃষককে তার সমুদয় ফসলই তুলে দিতে হয় ভূম্যধিকারীর হাতে, যে এর দ্বারা তার প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহ করে। কিন্তু ভূম্যধিকারী সব সময় এমন ব্যবস্থাই করে যাতে নিগ্রো তার নিকট দেনাদার হয়ে থাকে। ধরা যাক, একজন নিগ্রোর রয়েছে ১০০ বেল তুলা যার বাজার দাম হলো ৬০০ ডলার ; এমন ক্ষেত্রে ভূম্যধিকারী দেখাবার চেষ্টা করবে যে সে ৮০০ ডলার খাটিয়েছিল। সুতরাং, যদি ঐ নিগ্রো গোটা ফসলই ভূম্যধিকারীর হাতে সমর্পণ করে তথাপি তার নিকট ভূম্যধিকারীর পাওনা থাকবে ২০০ ডলার, এবং একই শর্তে সে পুনরায় চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হয়। বছরের পর বছর ধরে এরূপ প্রতারণা চলতে থাকে। যদি বিচারালয়ে সে বিচার প্রার্থনা করে তাহলে কেউ তার কথায় কর্ণপাত করে না ঃ কোন নিগ্রোর কথায় একজন শ্বেতাঙ্গের ভাষণ মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারে না। ভূম্যধিকারীরা তাদের নিজেদের আবাদী জমিরই কেবল একচ্ছত্র প্রভু তা নয়, সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর তাদের রয়েছে সীমাহীন প্রভাব এবং যখন তাদের কেউ একজন "বিচারালয়ের" সামনে জোর দিয়ে যা কিছু বলবে তখন তাই হবে আইন। দক্ষিণাঞ্চলের অঙ্গ-রাজ্যগুলোতে নিগ্রোরা কি অবস্থায় কাজ করবে তা নির্ধারণ করে দেয় ভূম্যধিকারীরাই। মনিবের বে-আইনী কাজে যদি কোন নিগ্রো ঘৃণায় ক্রোধান্বিত হওয়ার দৃষ্টতা দেখায় এবং পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে প্রশিক্ষিত কুকুরের সাহায্যে তাকে পুলিশ অবিলম্বে খুঁজে বের করে। যখন ঐ নিগ্রোকে পাকড়াও করা হয় তখন তাকে বিবেচনা করা হয় এক ভবঘুরে কিংবা পলাতক হিসেবে এবং ফিরিয়ে দেয়া হয় তার মনিবের কাছে।

সস্তা শ্রমশক্তি সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ভূম্যধিকারী অন্যান্য কৌশলেরও আশ্রয় নেয়, যে শ্রমশক্তিকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর দাসোচিত অবস্থার মধ্যে নিয়োগ করা হয়।

ভূম্যধিকারীর যখন শ্রমশক্তির দরকার হয় তখন সে স্থানীয় আদালতে আবেদন করে, এবং পুলিশ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিককে গ্রেফতার করে আনে। ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বহু ধরনের ভুয়া অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। আদালত নিগ্রোদের জরিমানা করে, যা পরিশোধ করতে তারা অক্ষম , আর এভাবে তাদেরকে বাধ্য করা হয় ভূম্যধিকারীর দাসত্বই বস্তুতঃ বরণ করতে, কারণ সে উপস্থিত মুহূর্তে তাদের জরিমানা শোধ করে দেয় পরবর্তী সময়ে তাদের ভবিষ্যৎ মজুরী থেকে তা কেটে নেয়ার শর্তে।

উপনিবেশসমূহে দাসত্ব

কিন্তু সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রমের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে উপনিবেশগুলোতে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদীরা স্থানীয় জনগণকে পুরোপুরি দাসে পরিণত করে।

ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে স্বর্ণ ও অন্যান্য খনিগুলোতে, আবাদী-খামার ও রাস্তা তৈরীর কাজে ব্যাপকভাবে বাধ্যতামূলক শ্রম ব্যবহার করা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় "মনিব-গোলাম আইন" অনুসারে যদি কোন স্থানীয় অধিবাসী তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে যায় তাহলে তাকে দাগী অপরাধী বলে বিবেচনা করা হয় এবং তাকে মনিবের নিকট ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। সর্বত্রই এরূপ 'ছাড়পত্র'ই তাকে দেখাতে হয় যা প্রদর্শন করে যে সে একজন ইউরোপীয় ব্যক্তির অধীনে কাজ করেছে। যদি তার 'ছাড়পত্র' ঠিক না থাকে তাহলে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার পূর্বতন নিয়োগকর্তার কাছে ফেরৎ পাঠানো হয় কিংবা অন্য কারো নিকট কাজ করতে বাধ্য করা হয়।

খনি শিল্পে, বিশেষ করে স্বর্ণ ও হীরক খনিগুলোতে, স্থানীয় শ্রমিকদের কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা 'খোয়াড়' (compound) নামের বিশেষ আবাসস্থলে বসবাস করতে হয়। গোটা চুক্তিকালীন সময়ে এই কয়েদখানা ত্যাগ করার কোন অধিকার শ্রমিকের নেই। কোন বহিরাগতকে বেড়ার ভেতরে যেতে দেয়া হয় না; সশস্ত্র প্রহরীরা সর্বক্ষণ পাহারা দেয়। তার গড়পড়তা মজুরী হলো দৈনিক অর্ধেক ডলারেরও কম এবং এর দ্বারাই তাকে নিজের ভরণ-পোষণ করতে হয়। এই নগণ্য মজুরীর বদলে তাকে দৈনিক বার-চৌদ্দ ঘন্টা খাটতে হয়।

আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশগুলোতে সর্বাপেক্ষ অমানবিক পদ্ধতির শোষণ বিরাজ করছে। পুরুষ লোকদের সাধারণতঃ দড়ি দিয়ে একত্রে বেঁধে খনিতে নিয়ে আসা হয়। সশস্ত্র প্রহরীদের তত্ত্বাবধানে কাজ পরিচালিত হয়। মদ খাইয়ে মাতাল করার পর স্থানীয় শ্রমিককে দিয়ে সাধারণতঃ এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করানো হয়, এবং সে জানেই না এই চুক্তির অর্থ কী।

দাসত্বের সাথে সাথে বহু ক্ষেত্রে পুরোপুরি দাস-ব্যবসাও চলে ; উদাহরণস্বরূপ, পর্তুগীজ আফ্রিকা (এঙ্গোলা ও বিশেষ করে মোজাম্বিক) ও লাইবেরিয়ার 'স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের' কথা বলা যেতে পারে ; শেষোক্তটি পুরোপুরিই মার্কিন পুঁজির করতলগত।

প্রকাশ্য দাসত্বের সথে সাথে রয়েছে ঋণ-দাসত্ব। মার্কসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ঋণ-দাসত্বের মর্মবস্তু হলো এই যে, যে-ঋণ কাজ করে পরিশোধ করতে হয় এবং বংশানুক্রমে যে-ঋণ চলতে থাকে সেই ঋণের সাহায্যে কেবলমাত্র স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ শ্রমিকই নয়, বরং তার গোটা পরিবারই ঋণদাতা মালিকের ও তার পরিবারের বংশানুক্রমিক দাসে পরিণত হয়।

নিরীক্ষামূলক প্রশ্নাবলী

১। পুঁজির আদিম পুঞ্জীভবন কি কি নিয়ে গঠিত ?
২। শ্রমশক্তি বিক্রী করতে শ্রমিক কি কারণে বাধ্য হয় ?
৩। শ্রমশক্তি ও শ্রমের পার্থক্য কি ?
৪। পুঁজি কি ?
৫। কোন্‌টি বড় ঃ স্থির না স্থায়ী পুঁজি ?
৬। শ্রমিকদের শোষণের মাত্রার পরিমাপ কি ?
৭। আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়াবার পদ্ধতি কি কি ?

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর মজুরী ও দারিদ্য

শ্রমশক্তির মূল্য ও দাম

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক তার শ্রম বিক্রয় করে পুঁজিপতির নিকট। পুঁজিপতি শ্রমিক নিয়োগ করে এবং তাদের দিয়ে কাজ করায়। শ্রমিক পায় মজুরী। এটাই হলো **শ্রমশক্তির ক্রয় ও বিক্রয়**।

কিন্তু শ্রমশক্তি হলো **এক বিশেষ ধরণের পণ্য**। শ্রমশক্তির ক্রয় ও বিক্রয় পুঁজিবাদী সমাজের দুটি মূল শ্রেণী – পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যেকার এক সম্পর্ককেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করছে। আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি, শ্রমিকের জীবন ধারণার্থে আবশ্যক উপকরণাদির মূল্যের দ্বারাই শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু এটা সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, পুঁজিপতিরা সব সময়ই চেষ্টা করে এই সীমারেখার নীচে মজুরীকে **কমিয়ে আনতে**। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক কিভাবে জীবনযাপন করে তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। প্রায়ই সে থাকে বেকার এবং ক্ষুধায় করে মৃত্যু বরণ। কিন্তু এমন কি যখন সে কর্মসংস্থান লাভ করে তখনও তার মজুরী নিজের নিতান্ত প্রাথমিক চাহিদা পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারিত হয় শ্রমিকের জীবন-ধারণার্থে আবশ্যক উপকরণাদির মূল্য দ্বারা। কিন্তু জীবন-ধারণার্থে আবশ্যক উপকরণাদিই বা কীভাবে নির্ধারিত হয় ? এটা সুস্পষ্ট যে, শ্রমিকের জীবন-ধারণের উপকরণসমূহ, সেইসবের পরিমাণ, সেগুলোর প্রকৃতি বেশ কয়েকটি অবস্থার উপর নির্ভর করে।

মার্কস দেখিয়ে দিয়েছেন যে ঃ

"..... প্রত্যেক দেশেই শ্রমের মূল্য নির্ধারিত হয় **জীবন ধারণের ঐতিহ্যগত মান** দ্বারা। এটা নিছক দৈহিক জীবন নয়, বরং যে সামাজিক অবস্থার মধ্যে মানুষ বসবাস করে ও লালিত পালিত হয় সেই সামাজিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত নির্দিষ্ট প্রয়োজনের পূরণ।" ["মূল্য, দাম ও মুনাফা"]

অন্যান্য পণ্যের বিসদৃশে, শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারণের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে **ঐতিহাসিক ও সামাজিক** উপাদান। শ্রমিকের সাধারণ জীবন ধারণের মান কোন চিরস্থায়ী বা চির প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার নয়। বিপরীত পক্ষে, ঐতিহাসিক বিকাশের গতিধারায় এই মানের পরিবর্তন ঘটে, এবং নির্দিষ্ট দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন দেশে তা বিভিন্ন রকম হয়। কিন্তু পুঁজিবাদ সব সময়ই শ্রমিক শ্রেণীর জীবন ধারনের মান অত্যন্ত নীচু স্তরে নামিয়ে আনার প্রয়াস পায়। মুদ্রার রূপে অভিব্যক্ত পণ্যের মূল্যকেই বলে তার দাম। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি, কোন পণ্যের দাম বিরামহীনভাবে তার মূল্যের উপরে বা নীচে ওঠানামা করে। মজুরী হলো "শ্রমশক্তি" নামক পণ্যের দামের এক বিশেষ রূপ। এটা স্পষ্ট যে, মজুরীর মান শ্রমশক্তির মূল্যের উপরে বা নীচে ওঠানামা করে। কিন্তু অপরাপর পণ্যের বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্যে এ ক্ষেত্রে দামের উড়তি-পড়তি মূলতঃ মূল্যের নীচে থাকে।

মজুরী – পুঁজিবাদী শোষণের মুখোশ

আমরা দেখেছি যে, কোন পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানে মজুরী-শ্রমিকের শ্রমের দুটি অংশ রয়েছে ঃ মজুরী-পরিশোধিত আবশ্যক-শ্রম ও মজুরী-অপরিশোধিত উদ্বৃত্ত-শ্রম। কিন্তু একজন শ্রমিক যখন মজুরী পায়, তখন এটা মোটেই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় না যে, এই মজুরী কেবল

আবশ্যক-শ্রমকে অন্তর্ভূক্ত করে, অন্যদিকে তার উদ্বৃত্ত-শ্রম কোন প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই মালিক আত্মসাৎ করে। বিপরীতপক্ষে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয় যে, শ্রমিকের গোটা শ্রমের পারিশ্রমিকই যেন পরিশোধ করা হয়েছে।

একজন খনি শ্রমিকের কথাই ধরা যাক, যাকে কর্ম-চুক্তির ভিত্তিতে পারিশ্রমিক দেয়া হয়। ধরুন, তার তোলা কয়লার প্রতি টনের জন্য সে ১ ডলার করে পায়। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে কেবলমাত্র রুটি কিনবার মতো যথেষ্ট মুদ্রাই সে অর্জন করে। এরূপ শোষণের অবিচার সম্পর্কে সে খনি মালিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো বলে মনে করা যাক। যদি খনি-মালিক তার প্রতি দয়াপরবশ হয় এবং ঐ শ্রমিককে আদৌ কিছু বলতে চায়, তাহলে সে বলবে ঃ

তুমি প্রতি টনে এক ডলার পাচ্ছ। পার্শ্ববর্তী খনিসমূহে বা অন্য কোথাও এর চেয়ে বেশী পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। তোমাকে ন্যায্য মজুরীই দেয়া হচ্ছে। তোমার দাম এর চেয়ে বেশী নয়। আরো বেশী কয়লা তুলতে চেষ্টা কর, তোমার মজুরীও তাহলে বেড়ে যাবে।

এভাবে এক ভ্রান্ত ধারণারই সৃষ্টি হয় যে, শ্রমিক কাজ করে যা উৎপাদন করে তার পূর্ণ মূল্যই সে পায়।

মনে করা যাক যে, আমাদের খনি শ্রমিকের এক বন্ধু নিকটবর্তী এক রাসায়নিক কারখানায় কাজ করে। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে সে দৈনিক নয় ঘন্টা কাজ করে এবং, ধরুন, প্রতিমাসে সে পায় ৪০ ডলার। তার মনিব যে শোষণ করছে তা কেমন করে সে উপলব্ধি করে ? ধরুন, এ ব্যাপারে তার মনিবের নিকট সে কিছু বলতে গেল, আর অসংকোচে সে এই উত্তরই পাবে ঃ

তোমার জায়গায় অন্য কেউ কাজ করলে যা পেত তুমিও তা পাও। তুমি ন্যায্য মজুরীই পাচ্ছ, এর চেয়ে বেশী কিছু তুমি রোজগার কর না। কিন্তু যদি তুমি চাও তাহলে উভয় 'শিফটে' কাজ করে দেখতে পার, দ্বিগুণ মজুরীই তুমি পাবে। কিন্তু প্রতিদিন নয় ঘন্টা কাজ করে তুমি চল্লিশ ডলার পাচ্ছ। এর চেয়ে বেশী মজুরী দেয়ার কোন অর্থ হয় না।

আর বাস্তবিকই, শ্রমিক কী করে জানবে তার মনিবের জন্যে প্রতি দিন সে কী পরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করে ? নয় ঘন্টার রোজ তো আর দৃশ্যতঃ বিভক্ত নয় যাতে সে জানতে পারে ঃ রোজের এই অংশ আমি কাজ করি আমার মজুরীর জন্যে আর এই কয় ঘন্টা কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই কাজ করি আমার মনিবের জন্যে। শ্রমের সকল ঘন্টাই সমান। আর এ ক্ষেত্রে সে এমনকি তার মজুরী বাড়াবার – মজুরী দ্বিগুণ করার সুযোগও পায়, অবশ্য শ্রম-দিবসকে দ্বিগুণ করেই। এরূপ ব্যাপার প্রকৃতপক্ষে খুব বিভ্রান্তিকর ; এতে মনে হয় যেন পুঁজিপতি তাকে সেই পরিমাণ মজুরীই প্রকৃতপক্ষে দিয়ে থাকে যে পরিমাণ মূল্য সে উৎপাদন করে।

এভাবে পুঁজিবাদী শোষণ **মুখোশাবৃতই** থাকে। এ ক্ষেত্রে জন-সাধারণের **মতাদর্শগত** দাসত্বের সকল শক্তিই মনিবের সহায়তা করে। ধর্ম প্রচার করে যে পার্থিব ব্যবস্থা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি আর একে পরিবর্তন করার যে কোন চিন্তা-ভাবনাই হলো পাপ। পুঁজিবাদী সংবাদপত্র, বিজ্ঞান, নাটক, চলচ্চিত্র, সাহিত্য ও শিল্প – সব কিছুই শোষণের ব্যাপারটিকে আড়াল করে রাখে, সবকিছুই বিষয়টিকে এমনভাবে দেখাতে চায় যেন পুঁজিপতির সমৃদ্ধি নির্মল শারদীয় সূর্য্যালোকের মতোই স্বাভাবিক ও অনিবার্য।

"মজুরী-রূপ এভাবে আবশ্যক-শ্রম ও উদ্বৃত্ত-শ্রম রূপে, মজুরী-পরিশোধিত শ্রম আর মজুরী-অপরিশোধিত শ্রম রূপে শ্রম-দিবসকে বিভাজনের সকল চিহ্নই মুছে ফেলে। সকল শ্রমই মজুরী-পরিশোধিত শ্রম বলে মনে হয়। 'কর্ভি' (বেগার ব্যবস্থায়) শ্রমিকের নিজের জন্যে শ্রম আর তার প্রভুর জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম সম্ভাব্য সুস্পষ্ট উপায়ে স্থান ও কাল ভেদে পৃথক। দাস শ্রমের ক্ষেত্রে, শ্রম-দিবসের যে অংশে মেহনত করে দাস তার নিজের জীবন-ধারণের উপকরণ সমূহের মূল্যই পরিশোধ করছে – সুতরাং বাস্তবতঃ তার নিজের জন্যেই কাজ করছে – সেই অংশও তার প্রভুর জন্যে শ্রম বলে মনে হয়। দাসের সমস্ত শ্রমই মজুরী-অপরিশোধিত শ্রম বলে মনে হয়। বিপরীতপক্ষে, মজুরী-দাসত্বে উদ্বৃত্ত-শ্রম তথা মজুরী-অপরিশোধিত শ্রমও মজুরী-পরিশোধিত শ্রম বলে মনে হয়।" [মার্কস, "পুঁজি", ১ম খণ্ড]

মজুরী ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম

শ্রমিকরা বহু পূর্বেই ট্রেড ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেছে, যে ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমের অবস্থার উন্নতি সাধন ও সীমাহীন শোষণকে খর্ব করার জন্য সংগ্রাম করে।

আমরা পূর্বেই দেখেছি, শ্রমশক্তির মূল্য দ্বারাই মজুরী নির্ধারিত হয়। কিন্তু, প্রথমতঃ, মজুরী যথেষ্ট পরিমাণে উঠা-নামা করে, বিশেষ করে শ্রমশক্তির মূল্যের নীচেই, আর দ্বিতীয়তঃ, বেশ কয়েকটি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বলে শ্রমশক্তির মূল্যও নিজে থেকে বেশ পরিমাণে পরিবর্তিত হয়।

মজুরীর হার নিয়ে বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নিয়ত সংগ্রাম চলে ; উভয় পক্ষের সংগঠন ও সংহতির মাত্রার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

যে পর্যন্ত শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হয়নি সে পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত লোকজনকে নিয়েই ছিল প্রতিটি পুঁজিপতির কারবার। এরূপ ক্ষেত্রে মজুরী সংক্রান্ত সংগ্রামে পুঁজিপতি ছিল সুবিধাজনক অবস্থানে ঃ যদি কোন শ্রমিক খারাপ শ্রমাবস্থার সাথে দ্বিমত পোষণ করতো তাহলে তাকে বরখাস্ত করে দেয়া হতো এবং তার জায়গায় কাজ করার মতো অন্য কাউকে মালিক দ্রুত খুঁজে নিত।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থাকলে পরিস্থিতি বদলে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে অসংগঠিত শ্রমিকদের বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন লোকজন দ্বারা পুঁজিপতি বিরোধিতার সম্মুখীন হয় না, বরং এখন তাকে মোকাবেলা করতে হয় সকল (কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ) শ্রমিকদের ইউনিয়নকে, যে ইউনিয়ন একই রূপ দাবীনামা উপস্থিত করে এবং একই রূপ শর্ত দাবী করে। আগে পুঁজিপতি স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের সাথে চুক্তি করতো, এখন তাকে ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যৌথ চুক্তিতে আসতে হয়। শ্রমিকদের মজুরী সাধারণতঃ নির্ধারিত হয় এর হার সংক্রান্ত বিশেষ চুক্তির মারফৎ।

পুঁজিপতিরা অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার বহু পন্থা খুঁজে বের করে। তাদের দিক থেকে তারা "মালিক সমিতিতে" ঐক্যবদ্ধ হয়। পুঁজিপতিদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে শ্রমিকশ্রেণীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী সেইসব "সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা"। তাদের নেতৃত্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে বানচাল করার চেষ্টা চালায়, বিপ্লবী ধর্মঘট-আন্দোলনের সময় ধর্মঘট-ভঙ্গকারী হিসেবে তারা কাজ করে।

এটাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, ট্রেড ইউনিয়নের তরফ থেকে কেবল অর্থনৈতিক সংগ্রামের সাহায্যে ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী শোষণ থেকে, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও দুঃস্থতা থেকে শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। এই উদ্দেশ্যে সর্বহারাশ্রেণীর পরিপূর্ণ বিজয় লাভ আবশ্যক, যা কেবল **বিপ্লবের** দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। তারপর পুঁজিবাদকে ধ্বংস করেই কেবল সর্বহারাশ্রেণী শ্রেণী-শোষণকে, তার দারিদ্রের উৎসকে নির্মূল করতে পারে।

এ সম্পর্কে মার্কস নিম্নোক্তভাবে লিখেছেন ঃ

"..... পুঁজিবাদী উৎপাদনের সাধারণ প্রবণতা হলো মজুরীর গড়পড়তা মান বৃদ্ধি করা নয়, বরং হ্রাস করা, কিম্বা শ্রমের মূল্যকে কম-বেশী তার নিম্নতম সীমায় ঠেলে নামানো। এই ব্যবস্থায় ঘটনাবলীর এরূপ প্রবণতা হওয়ায় একথা কি বলা যায় যে, পুঁজির এই অন্যায় অধিকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিরোধ প্রদান পরিত্যাগ করা উচিত, এবং অবস্থার সাময়িক উন্নতির জন্যে সাময়িক সুযোগের যথার্থ সদ্ব্যবহার করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত ? যদি তারা তাই করে তাহলে তারা উদ্ধারের অতীত হতভাগ্যদের অভিশপ্ত পর্যায়ে নেমে আসতো। আমি মনে করি আমি দেখিয়ে দিয়েছি যে, মজুরীর মানের জন্য তাদের সংগ্রাম হলো এমন ঘটনা যা সমগ্র মজুরী-ব্যবস্থার সাথে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত, তাদের মজুরী বৃদ্ধির একশত প্রচেষ্টার মধ্যে নিরানব্বইটিই হলো শ্রমের নির্দিষ্ট মূল্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা মাত্র এবং পুঁজিপতির সাথে তাদের মূল্য নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা তাদের নিজেদের পণ্য হিসেবে বিক্রয় করার অবস্থার মধ্যেই নিহিত। পুঁজির সাথে তাদের দৈনন্দিন সংঘাতে কাপুরুষের মতো সরে আসলে তারা নিশ্চিতভাবেই কোন বৃহত্তর আন্দোলনের জন্যে নিজেদের অযোগ্য করে তুলবে।

"একই সাথে, আর মজুরী-ব্যবস্থার সাথে জড়িত সাধারণ দাসবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে, এসব দৈনন্দিন সংগ্রামসমূহের চূড়ান্ত কার্যকারিতাকে নিজেদের কাছে শ্রমিকশ্রেণীর অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরা উচিত নয়। তাদের ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, তারা সংগ্রাম করছে কার্যের ফলাফলের (effects) সাথে, কার্যের কারণের (cause) সাথে নয় ; তারা নিম্নমুখী গতিকে মন্থর করছে, কিন্তু তার গতিপথকে পরিবর্তন করছে না ; তারা রোগের লাঘবকর ওষুধ প্রয়োগ করছে, কিন্তু রোগের কারণ দূর করছে না। সুতরাং পুঁজির বিরামহীন অন্যায় সীমা লংঘন কিংবা বাজারের অবস্থার পরিবর্তন থেকে নিয়তই যে অপরিহার্য গেরিলা সংগ্রাম উদ্ভূত হচ্ছে সে সংগ্রামেই কেবল তাদের সম্পূর্ণভাবে ব্যাপৃত থাকা উচিত নয়। তাদের অনুধাবন করা উচিৎ যে, বর্তমান ব্যবস্থা তাদের উপর সকল দুর্দশা চাপিয়ে দেয়ার সাথে সাথেই যুগপৎ সমাজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তুগত শর্ত ও সামাজিক রূপের জন্ম দিয়ে থাকে। **'ন্যায্য কাজের জন্যে ন্যায্য মজুরী!'** – এই রক্ষণশীল নীতিবাক্যের বদলে তাদের পতাকায় এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যটি উৎকীর্ণ করা উচিৎ ঃ 'মজুরী-ব্যবস্থার অবসান হোক !" [মার্কস, "মূল্য, দাম ও মুনাফা"]

মজুরীর রূপ

পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে মজুরী দেয়। মজুরী দানের সকল বিভিন্ন রূপের মধ্যে দুটি হলো মৌলিক।

কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা মজুরী পায় শ্রম-সময় অনুসারে, যেখানে ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ বা মাস হিসেবে মজুরীর হিসেব করা হয়। এটাকে বলা হয় **মজুরীর সময়-রূপ বা সময়-মজুরী** (time-wages)। অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরী নির্ভর করে সে যে-পরিমাণ দ্রব্য-সম্ভার উৎপাদন করে তার উপর ; কত টন কয়লা সে তুলেছে কিংবা কত মিটার সূতীবস্ত্র সে বয়ন করেছে, অথবা কতটি তালা সে তৈরী করেছে তার সংখ্যা বা পরিমাণ অনুযায়ীই শ্রমিককে মজুরী দেয়া হয়। এটাকে বলা হয় মজুরীর **ফুরন** রূপ (piece-work)। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শ্রমিকদের মজুরী দেয়ার বহু ধরনের রূপ বের করেছে, এর কোন কোনটি আবার বেশ জটিলও বটে। কিন্তু এ সমস্ত সকল রূপই হয় সময়-ভিত্তিক, না হয় ফুরন-ভিত্তিক, আবার কোন কোন সময় উভয় বৈশিষ্ট্যের সংযুক্তিসম্পন্ন।

প্রথমতঃ এটা মনে হতে পারে যেন সময়-ভিত্তিক মজুরী প্রদানের পদ্ধতি আর ফুরন-ভিত্তিক মজুরী প্রদানের পদ্ধতির মধ্যে কোন মিলই নেই, এই দুটি রূপই সম্পূর্ণরূপে আলাদা। প্রকৃতপক্ষে এটা সে রকম নয়। সময়-রূপ কাজের ক্ষেত্রে, শ্রমিককে নির্দিষ্ট সাপ্তাহিক মজুরী দিতে গিয়ে পুঁজিপতি হিসেব করে দেখে যে, এই সময়ে মজুরী-শ্রমিক কি পরিমাণ কাজ করবে। তা যদি সে হিসেব না করে তাহলে অচিরেই সে দেউলিয়া হয়ে পড়বে। কিন্তু এটা আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, মৌলিকভাবে বলতে গেলে, ফুরন কাজ প্রকৃতপক্ষে সময়-রূপ কাজের মতোই। ফুরনের হার নির্ধারণের সময় শ্রমিকের প্রতি ঘন্টা, প্রতিদিন কিংবা প্রতি সপ্তাহের উৎপাদনের পরিমাণকে হিসেবের মধ্যে নেয়া হয়। সে-কারণে ফুরনও কেবলমাত্র সাধারণ শ্রমিকের নিতান্ত আবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রীরই নিশ্চয়তা দেয়।

ফুরন ও সময়-রূপ কাজ – উভয়টিই হলো পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমশক্তি ক্রয় করার বিভিন্ন রূপই মাত্র। বিশেষ শিল্পে বিদ্যমান অবস্থার উপরই নির্ভর করে কোন্ রূপ ব্যবহার করা হবে।

সময়-রূপ কাজ

যেসব উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপন্ন-দ্রব্যের পরিমাণ যতদূর সম্ভব বাড়াবার জন্যে প্রত্যেক শ্রমিককে আকৃষ্ট করার কোন কারণ থাকে না সেসব ক্ষেত্রে সময়-রূপ কাজের পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়। এইরূপ ক্ষেত্র হচ্ছে অনেক।

অনেক শিল্পে শ্রমিকের দক্ষতা ও সামর্থ্য এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, উৎপাদিত পণ্যের গুণাগুণ এরই উপর নির্ভর করে। যেসব ক্ষেত্রে কাজ-কারবার হলো আধা-কারিকরী শিল্প নিয়ে, সেখানে মালিক তার উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিককে সপ্তাহ ভিত্তিতে (অর্থাৎ সময় ভিত্তিতে) মজুরী দেয়া যথার্থ মনে করে। পরিমাণের দিকে না তাকিয়ে, শ্রমিক প্রতিটি পণ্য অত্যন্ত যত্ন সহকারে উৎপাদন করে। পরিমাণের দিক দিয়ে পুঁজিপতি যা হারায় গুণের দিক দিয়ে সে তা পেয়ে যায়।

বিপরীতপক্ষে, অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিক পরিণত হয় নিছক যন্ত্রের লেজুড়ে। উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ যন্ত্রপাতি চালানোর গতিবেগের উপর নির্ভর করে। এরূপ ক্ষেত্রেও পুঁজিপতি সময়-রূপ কাজ সুবিধাজনক মনে করে।

ফুরন কাজ

অন্যদিকে, যেসব সকল ক্ষেত্রে পুঁজিপতি যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ পণ্য উৎপাদনে শ্রমিককে আকৃষ্ট করতে চায়, সেসব ক্ষেত্রে ফুরন কাজের বিভিন্ন পদ্ধতি সে ব্যবহার করে।

ফুরনে নিয়োগ-কর্তাকে নিয়োজিত ব্যক্তির কাজ তদারকি করার আবশ্যক হয় না; উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণের উপর মজুরী নির্ভর করে বিধায়, ফুরন শ্রমিকের দিক থেকে সবচেয়ে তীব্র শ্রম আদায় নিশ্চিত করে। যেসব শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ (সংখ্যা, ওজন, আয়তন বা দৈর্ঘ্য অনুসারে) গণনা কিংবা পরিমাপ করা সহজ, সাধারণভাবে তাতেই ফুরন সম্ভব।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকদের শ্রমের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়ে শ্রমিকদের শোষণকে বৃদ্ধি করার পছন্দসই পদ্ধতি হলো ফুরন কাজ। ফুরনের মজুরীর হার সাধারণতঃ নির্ধারণ করা হয় সবচেয়ে দক্ষ ও গতিশীল শ্রমিকদের আয় অনুসারে। প্রয়োজনীয় নিম্নতম মজুরী লাভ করার জন্যে অন্যান্য শ্রমিকদের সর্বোচ্চ মাত্রায় তাদের শক্তি খরচ করতে হয়। যখন মালিক

দেখতে পায় যে, অধিকাংশ শ্রমিক তাদের মজুরী বাড়াতে পেরেছে, তখন সে মজুরীর হার কমিয়ে দেয়। ফলে পূর্বতন মজুরী পেতে শ্রমিকদের আরো অধিক তীব্রতা সহকারে কাজ করতে হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদ্যমান অবস্থায় ফুরন রূপের মজুরী প্রদানের তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এখানে শোষকশ্রেণীর কাছে শ্রমিকরা তাদের কর্মশক্তি বিক্রী করে না, বরং সেসব প্রতিষ্ঠানেই তা ব্যবহৃত হয় যেগুলো হলো সর্বহারা রাষ্ট্রের সম্পত্তি। সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিকরা যে মজুরী পেয়ে থাকে তা হলো শ্রমের সামাজিক ভাতা (social allowance), আর তা স্থির করা হয় ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ ও গুণাগুণের অনুপাত অনুসারে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে, ফুরন-ভিত্তিক মজুরী প্রদান হলো ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ ও গুণাগুণের এবং স্বতন্ত্র শ্রমিকের মজুরীর মধ্যেকার সামঞ্জস্য বিধানের সর্বশেষ্ঠ পন্থা, তা হলো শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা উন্নত করার আর তার সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণীর মঙ্গল বৃদ্ধির এক শক্তিশালী হাতিয়ার। সুতরাং, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফুরন কাজ থেকে এটা সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন।

বোনাস ও মুনাফার অংশীদারত্ব

কোন কোন সময় পুঁজিপতিরা মজুরীর একটা অংশ **'বোনাসের'** (উপরি-মজুরী) আকারে দিয়ে থাকে। তারা মনে মনে হিসেব করে যে, 'বোনাস' শ্রমিকদের সবিশেষ খাটুনি খাটতে উৎসাহিত করবে এবং চরম তীব্রতা সহকারে কাজ করতে তাদের বাধ্য করবে।

এর চেয়েও বড় প্রতারণা হলো তথাকথিত **মুনাফার অংশীদারত্ব** (profit-sharing)। পুঁজিপতি এই অজুহাতে মূল মজুরী কমিয়ে দেয় যে, ব্যবসাটি লাভজনক করায় শ্রমিকরাও মনে হয় আগ্রহশীল। তারপর যে মজুরী কেটে রাখা হয়েছিল তার একটা অংশমাত্র "মুনাফার অংশীদারত্বের" ছদ্মাবরণে শ্রমিককে ফিরিয়ে দেয়া হয়। পরিণামে, "মুনাফার অংশীদার" হতে গিয়ে শ্রমিকরা প্রায়শঃই কেবল মজুরী নিয়ে যে কাজ করতো তদপেক্ষা কম পায়।

এই পদ্ধতি ব্যবহার করে মালিক শ্রমের তীব্রতাকে উচ্চমাত্রায় বাড়িয়ে তোলার কেবল চেষ্টা চালায় না, বরং কোন কোন সময় অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ শ্রমিকদের কোন কোন স্তরকে সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণী-আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে এবং এভাবে পুঁজির সমর্থক রূপে সেবা করতে প্রবৃত্ত করে।

"রক্ত জল করা ব্যবস্থা"

ফুরন কাজের ভিত্তিতে বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার সূচী-কর্ম শিল্পে তথাকথিত "রক্ত জল করা ব্যবস্থা" (sweating system) বিদ্যমান রয়েছে। এক্ষেত্রে অত্যন্ত নিম্ন হারে বাড়িতে বসে করার জন্যে কাজ বন্টন করে দেয়া হয়। এরূপ "রক্ত জল করা ব্যবস্থায়" কর্মরত দর্জিকে অনাহারে না থাকার জন্যে আক্ষরিক অর্থেই দিবারাত্র কাজ করতে হয়।

শ্রমের বিজ্ঞান সম্মত সংগঠন। টেলর ও ফোর্ড পদ্ধতি

সর্বহারাশ্রেণীর শ্রমশক্তি ক্রয় করে, মালিক তা থেকে নিজের জন্য যথাসম্ভব বেশী লাভ করতে চেষ্টা করে। সাম্প্রতিককালে অধিকতর চতুর ও সক্ষম মালিক শ্রমের তথাকথিত "বিজ্ঞান-সম্মত সংগঠন" (scientific organisation) প্রবর্তন করতে শুরু করেছে, যার অর্থ দাঁড়ায় নিম্নরূপ।

কারখানায় যে প্রত্যেক ধরণের কাজ করা হয় তা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা হয়। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার পর এইসব বিশেষজ্ঞরা এসব কাজ করার সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি নির্ধারণ করে। এভাবে কাজের এমন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা হয় যা শ্রমিকদের অনাবশ্যক হাঁটাচলা ও উদ্যম থেকে বাঁচিয়ে দেয়, তার সকল যন্ত্রপাতি সুসংবদ্ধভাবে সাজানো হয় যাতে শ্রমিক তার মূল কাজ থেকে বিক্ষিপ্ত না হয়, ইত্যাদি। এরূপ পরিস্থিতিতে, শ্রমিকের সকল শক্তি, তার ব্যয়িত সকল প্রচেষ্টা কোন অপচয় ছাড়াই প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে যে কাজ সম্পাদন করতে হয় তাতেই তা পুরোপুরি ব্যয় হয়। এভাবে তার কাজ থেকে শিল্প সর্বাধিক সুবিধা আদায় করে এবং শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বিপুলভাবে বেড়ে যায়।

মানবিক প্রচেষ্টার যুক্তিসম্মত সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে শ্রমের "বিজ্ঞান-সম্মত সংগঠন" এক বিরাট সাফল্য। পুঁজিবাদের উচ্ছেদের পর সর্বহারা সরকারের অধীন অবস্থায় শ্রমের বিজ্ঞান-সম্মত সংগঠনের জন্যে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদী সরকারের অধীনে সকল বৈজ্ঞানিক সাফল্যের ন্যায় শ্রমের বিজ্ঞান-সম্মত সংগঠনকে পুঁজিবাদীরা নিজেদের সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহার করে। শ্রমের বিজ্ঞান-সম্মত সংগঠনকে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের কাছ থেকে আরো অধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য নিংড়ে নেয়ার অন্যতম উপায়ে পরিণত করেছে।

শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠনের কথা প্রথম যারা ওকালতি করেছেন তাদের মধ্যে মার্কিন প্রকৌশলী টেলর অন্যতম। 'টেলর পদ্ধতি' নামে অভিহিত তার এই পদ্ধতি বহু পুঁজিবাদী কারখানায়ই ব্যবহৃত হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য বাড়াবার জন্যে। শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতাকে বিপুলভাবে বৃদ্ধি করে, কড়াকড়িভাবে হিসেবী চলন মারফৎ শ্রমিকদের যন্ত্রে পরিণত করে 'টেলর পদ্ধতি' শ্রমিকদের শেষ শক্তি বিন্দু পর্যন্ত নিঃশেষিত করে এবং কয়েক বছর পর তাদেরকে অকর্মণ্য করে দেয়। 'টেলর পদ্ধতি' প্রবর্তনের পর ফুরন কাজের যে হার কমিয়ে দেয়া হয় তার ফলে একই মজুরীতে, আর কোন কোন সময় কম মজুরীতেও, শ্রমিককে আরো কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

(প্রথম) বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে, মার্কিন মটর গাড়ি শিল্পের রাজা হেনরী ফোর্ড শোষণের যে সূক্ষ্ম পদ্ধতি ব্যবহার করেন তা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তাঁর শোষণ-পদ্ধতি কেবল আমেরিকায়ই দ্রুত বিস্তার লাভ করেনি, বরং ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশসমূহেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। "ফোর্ড পদ্ধতি"র মূল বৈশিষ্ট্য হলো এক পরিবাহক যন্ত্র (conveyor) বরাবর অবিরাম ধারায় উৎপাদন। পরিবাহক যন্ত্রের গতি বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি করা হয়। পরিবাহক যন্ত্রের গতির সাথে তাল রাখতে যে ব্যর্থ হয় পুঁজিবাদী কারখানায় সে তার চাকুরী হারায়। এভাবে কোন যন্ত্রের প্রতিটি প্রযুক্তিগত উন্নতিকে পুঁজিপতি সর্বহারাশ্রেণীর আরো অধিক দারিদ্র্য ও দাসত্বকে বৃদ্ধি করার হাতিয়ারে পরিণত করে, শ্রমিকদের খোদ জীবনী শক্তিকে নিংড়ে বের করার হাতিয়ারে রূপান্তরিত করে।

বস্তুতে কিংবা মুদ্রায় মজুরী দান

আগের যুগে গ্রাম দেশে কোন শ্রমিককে যখন কামলা খাটার জন্যে ডাকা হতো তখন কদাচিৎই তাকে কাজের জন্যে মুদ্রায় মজুরী পরিশোধ করা হতো। তা করা হতো নিম্নোক্তভাবে ঃ শ্রমিক তার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা লাভ করতো আর তার সাথে সাথে গ্রীষ্মের শেষে পেত কিছু শস্য। এখানে শ্রমিককে বস্তুর রূপে মজুরী

পরিশোধ করা হতো, সে তার শ্রমশক্তির বিনিময়ে জীবন ধারণার্থে আবশ্যক সামগ্রী-সমূহ সরাসরি লাভ করতো। এরূপ সরল লেনদেন উৎপন্ন-দ্রব্যের বিনিময়েরই অনুরূপ – মনে করা যাক, শস্যের বদলে কুড়াল। বিনিময় যখন এরূপ সরল চরিত্র পরিগ্রহ করে তখন এটা অত্যন্ত স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, জীবন-ধারণার্থে আবশ্যক উপকরণাদির মূল্যই হলো শ্রমশক্তির মূল্যের ভিত্তি।

পুরোপুরিভাবে বস্তুর রূপে মজুরী পরিশোধ পুঁজিবাদী শিল্পে খুবই বিরল। কিন্তু এমনকি এ ক্ষেত্রেও কোন কোন সময় মজুরীর অংশ-বিশেষ বস্তুর রূপে পরিশোধ করা হয়। মজুরী পরিশোধের এই পদ্ধতি সাধারণতঃ শ্রমিকদের ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির এক সুবিধাজনক পদ্ধতি মাত্র। মালিকের মালিকানাধীন কোম্পানী স্টোর থেকে সকল প্রকার বাজে মাল তিন গুণ দামে শ্রমিকদের সরবরাহ করা হয়। শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী এভাবে যথেষ্ট পরিমাণে কমে যায়। সে কারণে শ্রমিক সংগঠনগুলো সর্বদাই এরূপ রীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কোন কোন সময় পুঁজিপতি চড়া দামে জিনিস কিনতে শ্রমিকদের বাধ্য করে আরো সূক্ষ্ম চাতুর্যপূর্ণ পন্থায় একই উদ্দেশ্য সাধন অর্থাৎ শ্রমিকদের মজুরী কমিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালায়। তারা শ্রমিকদের বসতি বা জেলার সকল স্টোরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, আর মুদ্রার রূপে মজুরী লাভ করে শ্রমিকরা ঠিক আগের মতোই চড়া দামে জিনিসপত্র ক্রয় করতে বাধ্য হয়। শ্রমিকরা "ক্রেতা সমবায় সমিতি" গড়ে তুলে এরূপ শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার চেষ্টা করে।

নামমাত্র মজুরী ও প্রকৃত মজুরী

কয়েকটি বিরল ক্ষেত্র ছাড়া, উন্নত পুঁজিবাদী শিল্পে মুদ্রার রূপেই মজুরী পরিশোধ করা হয়। শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রী করে, আর অন্য যেকোন পণ্যের বিক্রীর মতোই, তার দাম লাভ করে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার রূপেই।

কিন্তু শ্রমিকের নিকট মুদ্রার প্রয়োজন মুদ্রার জন্যেই নয়, বরং আবশ্যকীয় যেসব জিনিস-পত্রাদি তার দরকার তা পাওয়ার জন্যেই তার মুদ্রার প্রয়োজন। নির্দিষ্ট মজুরী পেয়ে শ্রমিক তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে ; সে সময়ে এগুলোর জন্যে যে দাম প্রচলিত সে সেই দাম দেয়।

কিন্তু আমরা জানি যে, পণ্যের দামের মান অপরিবর্তিত থাকে না। বিভিন্ন ঘটনার প্রভাবে মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতা পরিবর্তিত হয়। যদি দেশে স্বর্ণ-মান প্রচলিত থাকে তাহলে স্বর্ণ সস্তা হয়ে গেলে দাম বৃদ্ধি পায় ; স্বর্ণের মূল্যের ক্ষেত্রে পড়তি মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। যখন বিপুল পরিমাণে কাগুজে মুদ্রা ছাড়া হয় তখন পণ্যের দামে ব্যাপক ও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে, মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতা পড়ে যায়, যা প্রায় সব সময় কাগুজে মুদ্রার অনুগামী।

সুতরাং আমরা যদি বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরী তুলনা করতে চাই, তাহলে তারা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কি পরিমাণ মুদ্রা লাভ করে তা জানাই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুদ্রা দ্বারা কি পরিমাণ সামগ্রী ক্রয় করা যায় তা জানাও আবশ্যক। মজুরীর নামমাত্র হারকে আমাদের নিছক তুলনা করলেই হবে না (মজুরীর **নামমাত্র হার** বলতে আমরা শ্রমিক কর্তৃক প্রাপ্ত মুদ্রার পরিমাণকেই বুঝাচ্ছি), বরং প্রাপ্ত মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতাকেও আমাদের বিবেচনার মধ্যে অবশ্যই আনতে হবে। কেবলমাত্র তাহলেই আমরা প্রকৃত (**real**) মজুরী যথার্থভাবে নির্ণয় করতে পারবো, যা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রার দ্বারা যে-পরিমাণ ব্যবহার -মূল্য ক্রয় করা যায় তার দ্বারা পরিমাপ করা যায়।

দক্ষ শ্রমিকের মজুরী

প্রত্যেকেই জানেন যে, বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকেরা বিভিন্ন হারেই মজুরী পেয়ে থাকে। বিশেষ কোন কারিগরী প্রশিক্ষণ বিহীন অদক্ষ শ্রমিকদের চেয়ে দক্ষ শ্রমিকরা অনেক বেশী মজুরী পেয়ে থাকে। সাধারণতঃ দক্ষতা যত বেশী, মজুরীও তত বেশী।

শিল্পের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকার দক্ষতার শ্রমিক আবশ্যক। সুতরাং বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকের মজুরীও একই রূপ নয়।

বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকদের মজুরীর হারের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা ছাড়াও একই শিল্পের বিভিন্ন দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিকদের মজুরীর হার বিভিন্ন রকম। দক্ষ শ্রমিক আধা-দক্ষ শ্রমিকের চেয়ে বেশী মজুরী পায়, আবার আধা-দক্ষ শ্রমিক সাধারণ শ্রমিকের চেয়ে বেশী মজুরী পায়।

দক্ষতা অনুসারে শ্রমিকদের মজুরীর হারের ক্ষেত্রে এরূপ বিভিন্নতা থাকার কারণ কি ? এটা উপলব্ধি করা খুব কঠিন নয়। যে কেউই অদক্ষ শ্রমিকের মতো কাজ করতে পারে, কিন্তু দক্ষ শ্রমিককে এক নির্দিষ্ট সময় ধরে তার বৃত্তি শিখতে হয়, ঐ দক্ষতা অর্জন করতে বেশ সময় ও উদ্যম ব্যয় করতে হয়। যদি মজুরীর হারের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য না থাকে তা হলে কেউই কোন বৃত্তি শিখার জন্য সময় ও শক্তি ব্যয় করতে চাইবে না, কেউই দক্ষতার একটি নির্দিষ্ট মান অর্জনের জন্য চেষ্টা করবে না।

কিন্তু দক্ষতা যতই থাকুক না কেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অমানবিক ও বিরামহীন শোষণ থেকে শ্রমিক তবুও রক্ষা পায় না।

নতুন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন সাধারণতঃ বিপুল সংখ্যক উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিককে অপ্রয়োজনীয় করে তুলে। স্বীয় দক্ষতা অর্জন করতে বহু বছর ব্যয় করেছে এমন সব উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন ওস্তাদ পূর্বে যা করতে পারতো তা এখন যন্ত্রের দ্বারাই করা যায়। বেশ একটা বড় অংশ দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে পড়ে এবং বেকার হয়ে যায়। অনাহারে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা অনেক কম মজুরীতে অদক্ষ শ্রম করতে বাধ্য হয়।

বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে মজুরীর মান

বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে মজুরীর মান (level) এক নয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে এক্ষেত্রে অতিশয় গুরুতর পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যগুলো বহু কারণেই হয়ে থাকে।

এরূপ মনে করা হাস্যকর যে, শ্রমিকদের সাথে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে এক দেশের পুঁজিপতিরা অন্যান্য দেশের পুঁজিপতিদের থেকে অধিক দয়াপরবশ। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে, সর্বত্রই পুঁজিপতিরা সম্ভাব্য সর্বনিম্ন সীমায় মজুরীকে নামাতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে বিদ্যমান অবস্থা বেশ পরিমাণে ভিন্ন। বিভিন্ন দেশের রয়েছে বিভিন্ন ইতিহাস। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকায় পুঁজিবাদ এমন এক পরিস্থিতিতে বিকাশ লাভ করে যেখানে বাহুল্যের চেয়ে শ্রমিকের অভাবই বেশী অনুভূত হয় ঃ অনাবাদী জমির প্রাচুর্য কিছু সময়ের জন্যে ইউরোপীয় দেশগুলোর দেশত্যাগীদের ঐ জমিতে আবাস স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে। অপেক্ষাকৃত পুরানো পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পূর্বেই সংগঠিত হয়। অধিকতর উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে শ্রমের তীব্রতা, সাথে সাথে শ্রমিকদের গড়পড়তা দক্ষতার মান, অত্যন্ত উচ্চ।

এসব অবস্থা বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে বিভিন্ন মানের মজুরীর জন্ম দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, তদনুযায়ী যদি আমরা ইংল্যাণ্ডের মজুরীকে ১০০ ধরি, তাহলে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে অন্যান্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশের মজুরী (ঘন্টা অনুযায়ী গড়পড়তা হার) ছিল নিম্নরূপ ঃ

ইংল্যাণ্ড	১০০	ফ্রান্স	৬৪
জার্মানী	৭৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৪০

অন্য হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের গড়পড়তা বাৎসরিক মজুরী (১৯০০-১৯০৭ সাল, ডলারের হিসাবে) ছিল ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪৬৩	অষ্ট্রিয়া	১৬৭
ইংল্যাণ্ড	২৫৮	রাশিয়া	৯৭
জার্মানী	২৩৭	জাপান	৫৫

(প্রথম) বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশে বেশ পরিমাণ বিভিন্ন হারের মজুরী নজরে পড়ে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলির বিভিন্ন বড় বড় শহরের প্রকৃত মজুরীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান পার্থক্যকে নিম্নের সংখ্যাগুলি তুলে ধরছে। এই সংখ্যাগুলি ১৯২৯ সালের জানুয়ারীতে বিদ্যমান অবস্থাকে প্রদর্শন করছে এবং তা ১৯২৭ সালের লণ্ডনের প্রকৃত মজুরীর মানকে ১০০ ধরে তৈরী করা হয়েছে ঃ

ফিলাডেলফিয়া	২০৬	বার্লিন	৭৭
ডাবলিন	১০৬	মাদ্রিদ	৫৭
লণ্ডন	১০৫	ব্রুসেলস	৫০
স্টকহোলম	৯৩	মিলান	৫০
আমস্টারডাম	৮৮	রোম	৪৪

বুঝা যাচ্ছে যে, যেসব দেশে পুঁজিবাদ অতি সম্প্রতি বিকাশ লাভ করতে শুরু করেছে সেসব দেশে মজুরী বিশেষ করে নীচু। এসব দেশে আদিম পুঞ্জীভবন কৃষক ও কারিকরদের ধ্বংস করে দিয়েছে, তাদের নিক্ষেপ করছে কর্ম-সন্ধানকারী বিশাল বাহিনীতে। উপনিবেশসমূহে সর্বহারাশ্রেণীর জীবন-ধারণের মান অতিশয় নীচু। বিশেষ করে চীনের শ্রমিকরা সবচেয়ে নিষ্ঠুর শোষণের অধীন। যে চীনা শ্রমিকরা (Coolie) এক মুঠো ভাত খেয়ে জীবন ধারণ করে, শুয়ে থাকে রাস্তার পাশে কিংবা পার্কে আর পরিধান করে ছিন্ন বসন, পুঁজিপতিদের কাছে সেই চীনা শ্রমিকরাই হলো বিশ্বের সবচেয়ে আদর্শ শ্রমিক। অতি নির্লজ্জ পুঁজিপতিরা ইউরোপীয় শ্রমিকদের উপদেশ দেয় চীনা শ্রমিকদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে, তাদের মতোই "মিতব্যয়ী" জীবন যাপন করতে। এ ধরনের উপদেশ বর্তমান সময়েই বিশেষ করে প্রায়শঃ শোনা যাচ্ছে।

পুঁজিবাদী শোষণের বৃদ্ধি

পুঁজিবাদ যতই বিকাশ লাভ করে, শ্রমিকশ্রেণীর ওপর শোষণও ততই বাড়তে থাকে। যে অবস্থার মধ্যে শ্রমিকরা মজুরী নিয়ে পুঁজিপতিদের সাথে সংগ্রাম করে সে অবস্থা ক্রমান্বয়ে শ্রমিকদের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদ তার বিকাশের সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্য – আপেক্ষিক ও চূড়ান্ত – উভয়টিই নিয়ে আসে।

পুঁজিপতিদের অংশ বাড়তেই থাকে, শ্রমিকদের অংশ (share) কমতেই থাকে। বেশ কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশের হিসাব দেখলেই এটা স্পষ্ট বুঝা যায়। ধরা যাক ইংল্যাণ্ডের কথা। যদি আমরা এ দেশের উৎপাদিত মোট মূল্য (তথাকথিত জাতীয় আয়) ধরি ১০০, তাহলে শ্রমিকদের ভাগে যে অংশ পড়ে তা নিম্নলিখিত রূপে পরিবর্তিত হয়েছে ঃ

সাল	দশ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং-এ জাতীয় আয়ের পরিমাণ	দশ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং-এ মজুরীর পরিমাণ	জাতীয় আয়ে শ্রমিকদের অংশ (শতকরা)
১৮৪৩	৫১৫	২৩৫	৪৫·৬
১৮৬০	৮৩২	৩৯২	৪৭·১
১৮৮৪	১২৭৪	৫২১	৪১·৪
১৯০৩	১৭১০	৬৫৫	৩৮·৩
১৯০৮	১৮৪৪	৭০৩	৩৮·১

শ্রমিকের প্রাপ্য অংশ ক্রমাগতই কমছে।

একই সময়ে অবশ্য গোটা দেশের জাতীয় আয়ের যে অংশ পুঁজিপতিদের ভাগে পড়ে তা ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রমিকশ্রেণী যা হারায় পুঁজিপতিরা তাই লাভ করে।

(প্রথম) মহাযুদ্ধের পূর্বে লিখিত এক নিবন্ধে শ্রমিকশ্রেণীর দুঃস্থতা প্রদর্শন করতে গিয়ে লেনিন নিম্নলিখিত সংখ্যাসমূহের উল্লেখ করেছেন। ১৮৮০ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জার্মানীতে মজুরী বাড়ে গড়পড়তা শতকরা ২৫ ভাগ হারে, কিন্তু একই সময়ে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ে শতকরা ৪০ ভাগ। লেনিন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন যে, এটা ঘটে এমন এক সমৃদ্ধ ও উন্নত পুঁজিবাদী দেশ জার্মানীতে, যেখানে বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার শ্রমিকদের চেয়ে এখানকার শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অতুলনীয়ভাবেই উত্তম, আর তার কারণ জার্মানীর উচ্চ সাংস্কৃতিক মান, ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা এবং তুলনামূলকভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, যেখানে শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর সদস্য সংখ্যা ছিল লক্ষ লক্ষ আর শ্রমিক সংবাদপত্রের পাঠকও ছিল লক্ষ লক্ষ।

এ থেকে লেনিন নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত টানেন ঃ

"শ্রমিক **চূড়ান্তভাবেই** নিঃস্ব হয়ে পড়ে, অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা দরিদ্রতর হয়ে পড়ে, বাধ্য হয় নিকৃষ্ট জীবন-যাপন করতে, কম খাদ্য গ্রহণ করতে, থাকে অর্ধভুক্ত, মাটির নীচের ঘরে কিংবা চিলে কোঠায় খুঁজে আশ্রয়। যে পুঁজিবাদী সমাজ দ্রুত অর্জন করে সমৃদ্ধি সেই সমাজে শ্রমিকদের আপেক্ষিক অংশ আরো ক্ষুদ্রতর হয়ে ওঠে, কারণ কোটিপতিরা সততই দ্রুততর গতিতে সম্পদশালী হচ্ছে ····। পুঁজিবাদী সমাজে মেহনতী জনতার দারিদ্র্য বৃদ্ধির পাশাপাশি অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে বাড়তে থাকে সম্পদ।" [লেনিন ঃ "পুঁজিবাদী সমাজে নিঃস্বতা"]

বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী যেসব পুঁজিবাদী দেশের পুঁজিপতিরা উপনিবেশ সমূহ থেকে বিপুল মুনাফা লাভ করার দরুণ শ্রমিকদের কিছুটা সুবিধা দান করতে পারে সেসব দেশেই হলো এই পরিস্থিতি। অবশ্য অধিতকর অনুন্নত দেশে, যে উপনিবেশ সমূহে সহজে মুনাফা লাভের জন্য পুঁজি রপ্তানী করা হয়, সেখানে শ্রমিকদের উপর শোষণ বেড়ে চলে আরো **অধিক দ্রুত গতিতে।**

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, পুঁজিবাদী শোষণ অবিরত বাড়তে থাকে, আর শ্রমিকশ্রেণীর ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেকার ব্যবধান গভীরতর হতে থাকে। সকল দেশের সুবিধাবাদীরাই সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিরোধ সমূহের প্রশমন, শ্রেণী সমূহের মধ্যে সামাজিক শান্তির প্রয়োজনীয়তা, এমনকি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি বিধানের সম্ভাবনার কথা অনবরত

বলে থাকে। শ্রমিকশ্রেণী অবশ্য (বুর্জোয়াশ্রেণীর মুনাফার সীমাহীন বৃদ্ধির তুলনায়) আপেক্ষিকভাবে নয়, চূড়ান্তভাবেই দরিদ্রতর হতে থাকে। এমনকি সবচেয়ে সমৃদ্ধ পুঁজিবাদী দেশেও শ্রমিকশ্রেণীর খাদ্য-খাবার ক্রমাগত নিকৃষ্টতর হতে থাকে, আরো অধিক জনাকীর্ণ আবাসস্থলে তারা বসবাস করে, আরো অধিক অভাবের স্বাদ গ্রহণ করে। একই সময়ে শ্রমিকদের শ্রমের তীব্রতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। পূর্বের তুলনায় শ্রমিককে প্রতি ঘন্টার কাজের জন্য অধিক শক্তি ব্যয় করতে হয়। শ্রমের মাত্রাতিরিক্ত তীব্রতা, অনবরত তাগিদ শ্রমিকের শরীর-দেহকে দ্রুত পতনের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রশমনের কোন কথাই বলা যেতে পারে না, বরং বিপরীত পক্ষে এসব দ্বন্দ্বের বিরামহীন তীব্রতা ঘটেছে, অনিবার্যরূপে সেগুলো বাড়ছে।

বেকারত্ব ও শ্রমের মজুত বাহিনী

পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটার সাথে সাথে, বেকারত্ব বাড়তে থাকে এবং তথাকথিত "শ্রমের মজুত বাহিনী" বৃদ্ধি পায় ; যখন শিল্পের সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দেয় কিংবা যখন পুরাতন অবস্থাধীনে পুরাতন শ্রমিকরা কাজ করতে আর রাজী না হয় তখন পুঁজিপতিদের এই মজুত বাহিনী শ্রমিক যোগান দেয়। দেখা যাক এটা কিভাবে ঘটে।

পুঁজিবাদের সূচনাকালে বাজারে সম্ভাব্য-মজুরী-শ্রমিকের যথেষ্ট সরবরাহ ছিল। এই সরবরাহ ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষক, কারিকর ও হস্তশিল্পীদের মধ্য থেকে, যারা তাদের উৎপাদন-যন্ত্র হারিয়েছিল। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার মতো আর্থিক সংস্থান প্রদান করলে এরা পুঁজিপতিদের জন্যে কাজ করতে প্রস্তুত ছিল। বেকার লোকের নির্দিষ্ট মজুত সব সময়ই বজায় থাকা আবশ্যক। একমাত্র এই শর্তেই মজুরী-শ্রমের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী শিল্প উদ্ভূত হতে পারে।

পুঁজিবাদের আরো অধিক বিকাশ কোন্ দিকে পরিচালিত হয় ?

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, বিকাশমান পুঁজিবাদ তার প্রতিযোগিতা দ্বারা কারিকর ও হস্তশিল্পীদের ক্ষুদ্রায়তন-উৎপাদনকে ধ্বংস করে। কৃষকরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আর, ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, তাদের অনেকে ঘরবাড়ী ছেড়ে পুঁজিবাদী দাসত্ব বরণ করতে বাধ্য হয়। নতুন শ্রমিক-সাধারণকে আত্মীকরণ করে পুঁজিবাদী শিল্প বেড়ে ওঠে, নতুন নতুন কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয়। ক্ষুদে-উৎপাদকদের ধ্বংস করে দিয়ে পুঁজি তাদেরকে মজুরী-শ্রমিক রূপে নিজের কবলে টেনে আনে।

যন্ত্রের দ্বারা শ্রমিক উচ্ছিন্ন করণ

কিন্তু এর সাথে সাথে আরেকটি ঘটনা দেখা দেয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধনের এক অব্যাহত প্রক্রিয়া বজায় থাকে। আর এই প্রযুক্তিগত অগ্রগতির অর্থ কি ? নব নব আবিষ্কারের তাৎপর্যই বা কি ? এসবের তাৎপর্য হলো এই যে যান্ত্রিক কাজের দ্বারা মনুষ্য-শ্রমকে স্থলাভিষিক্ত করায় উৎপাদন সস্তা হয়। অতএব প্রযুক্তিগত উন্নতির বিকাশ সাধনের সাথে সাথে একই পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করতে কমসংখ্যক শ্রমিক আবশ্যক হয়। যন্ত্র শ্রমিককে **উচ্ছিন্ন করে** (supplant)। যন্ত্র শ্রমিককে বাধ্য করে আরো **তীব্রতার** সাথে কাজ করতে। এ ঘটনা শ্রমিকদের অংশবিশেষকে শিল্প থেকে উচ্ছেদ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং পুঁজিবাদের প্রারম্ভকালে, যখন শ্রমিকরা তখনও খুঁজে পায়নি তাদের প্রকৃত শত্রু কে, তখন তারা প্রায়শঃই যন্ত্রের উপর আঘাত হেনে

বিদ্যমান অবস্থার বিরুদ্ধে তাঁদের বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটাতো। যন্ত্রপাতিকে তাদের শোচনীয় অবস্থার মূল কারণ মনে করে ধর্মঘট ও বিক্ষোভের সময় শ্রমিকেরা প্রথমতঃ ধ্বংস করতো যন্ত্রপাতি।

নতুন যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করে এবং এসব যন্ত্র দ্বারা উচ্ছিন্নকৃত শ্রমিকদের রাস্তায় ঠেলে দিয়ে পুঁজিবাদ অব্যাহতভাবেই বেকারত্ব সৃষ্টি করে।

শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি করেও তারা বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ; এক নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিক প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে পড়ে। এসব শ্রমিক তাদের শ্রমের কোন চাহিদাই খুঁজে পায় না। তারা গড়ে তোলে এক শিল্পীয় মজুত বাহিনী। এই বাহিনীর তাৎপর্য বাস্তবিকই অত্যন্ত বড়। বেকারদের এই স্থায়ী বাহিনীর অস্তিত্ব পুঁজিপতিদের প্রদান করে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক শক্তিশালী হাতিয়ার। বেকাররা সাধারণতঃ যেকোন শর্তে কাজে যোগদান করতে ইচ্ছুক ঃ অনাহারের আশংকায় তাদের অন্য কোন উপায় থকে না। এভাবে কর্মে নিযুক্ত সর্বহারাদের জীবন-ধারণের মানের ওপর বেকাররা এক নিম্নাভিমুখী চাপ সৃষ্টি করে। মজুত বাহিনীর আরেকটি তাৎপর্য হলো, যখন বাজারের অবস্থা শিল্পের সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে তখন তা যোগান দেয় বেকার শ্রমিক। তখন বহু সহস্র বেকার নিজেদের জন্যে কাজ খুঁজে পায়, ফ্যাক্টরী ও কারখানাগুলো তাদের নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ায়। বেকারত্ব সাময়িকভাবে হ্রাস পায়। কিন্তু নতুন উন্নত পদ্ধতির প্রবর্তন পুনরায় হাজার হাজার শ্রমিককে পথে বসিয়ে দেয়।

এভাবে পুঁজিবাদ এক হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত ক্ষুদে-উৎপাদকদের সারি থেকে আগত নতুন শ্রমিক-সাধারণকে কাজ দেয়, আর অন্য হাতে, পুঁজিবাদী প্রযুক্তিগত অগ্রগতির উন্নয়নের সাথে সাথে যন্ত্র কর্তৃক উচ্ছিন্ন হাজার হাজার শ্রমিকের গ্রাস থেকে শেষ রুটির টুকরাও ছিনিয়ে নেয়।

পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবনের সাধারণ নিয়ম

যন্ত্রের দ্বারা শ্রমিকদের এই নিয়ত স্থলাভিষিক্তকরণ হলো পুঁজিবাদেরই ফলাফল, আর তা সৃষ্টি করে পুঁজিবাদী দেশসমূহে যাকে বলা হয় "আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা"। প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ায় এবং কাজ পাওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা না থাকায় প্রতি বছরই শত-সহস্র লোক নিজেদের ভূমি থেকে দেশত্যাগী হতে বাধ্য হয়। (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বছরগুলোতে এই অবস্থা আরো খারাপের দিকে গিয়েছে। এসব স্বদেশত্যাগীরা যেসব দেশে গিয়েছে সেসব দেশের দরজাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শিল্পীয় মজুত বাহিনীর অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি শ্রমিকশ্রেণীর সামগ্রিক অবস্থার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়, আগামীকল্যের অনিশ্চয়তা নিয়ত বর্তমান থাকে এবং মজুরী হ্রাস পায়। শ্রমিক শ্রেণী তার শ্রম দিয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে, কিন্তু তা যায় পুঁজিপতিদের পকেটে। শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশবিশেষ পুঁজিপতিরা ভোগ করে এবং এভাবে ধ্বংস করে দেয় ; অবশিষ্টাংশ তারা তাদের মূল পুঁজির সাথে যোগ করে। যদি পুঁজিপতির মূল পুঁজি হয় ১,০০,০০০ ডলার এবং বছরে সে যদি ২০,০০০ ডলার মুনাফা রূপে শ্রমিকদের কাছ থেকে নিংড়ে বের করতে পারে, তাহলে সে এর প্রায় অর্ধেক পরবর্তী বছরের মূল পুঁজিতে যোগ করে। এক্ষেত্রে পরবর্তী বছরের জন্য তার পুঁজি ইতিমধ্যে হবে ১,১০,০০০ ডলার। সে তার পুঁজির বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, পুঞ্জীভবন করেছে ১০,০০০ ডলার। সুতরাং পুঁজির পুঞ্জীভবন হলো পুঁজির সাথে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সংযুক্তি। উদ্বৃত্ত-মূল্য পুঞ্জীভূত করণের পরিণতি হিসাবে পুঁজির বৃদ্ধি হলো বিরাট গুরুত্বের। পুঁজিবাদ যতই বিকাশ লাভ করে শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে নিংড়ে নেয়া উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণও ততই বাড়তে থাকে।

পুঁজিবাদীদের দ্বারা পুঞ্জীভূত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ, আর যে উদ্বৃত্ত-মূল্য তাদের পুঁজি বাড়িয়ে তোলে সেই পুঁজিও দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে।

সুতরাং পুঁজির পুঞ্জীভবন নিজের সাথে সাথে নিয়ে আসে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির সম্পদের বৃদ্ধি। শ্রমিকশ্রেণীর শ্রম দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য হয়ে দাঁড়ায় শোষকদের ক্রমবর্ধমান শক্তির উৎসে। পুঁজির পুঞ্জীভবনের সাথে সাথে শ্রমিকদের ওপর শোষণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। এভাবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী তার নিজের শ্রম দ্বারাই সৃষ্টি করে তার নিজের ওপর আরো বৃহত্তর মাত্রার শোষণের পরিস্থিতি।

পুঁজির পুঞ্জীভবনের সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণীর জীবন ধারণের অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দতর হতে থাকে, তাদের ওপর শোষণের মাত্রাও বাড়তে থাকে।

এই সবকিছুই হলো পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবনের অনিবার্য ফলাফল। পুঁজিপতি যত বেশী পুঁজি পুঞ্জীভূত করে, যতই সে উৎপাদন সম্প্রসারণ ও নতুন যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করে, ততই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বিস্তৃত হতে থাকে।

এটাই হলো মার্কস কর্তৃক আবিষ্কৃত পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবনের সাধারণ নিয়ম ; পুঁজিবাদকে বুঝার জন্যে, পুঁজিবাদ কোন্ দিকে বিকাশ লাভ করছে তা বুঝার জন্যে এই সাধারণ নিয়ম হলো বিপুল তাৎপর্য সম্পন্ন।

পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবনের সাধারণ নিয়মকে মার্কস নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন ঃ

"সামাজিক সম্পদ, কার্য্যরত পুঁজি, তার বৃদ্ধির মাত্রা ও শক্তি, আর সেজন্যে, সর্বহারাশ্রেণীর চূড়ান্ত সংখ্যা ও তার শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা যত বেশী হবে, শিল্পীয় মজুত বাহিনীও ততই বড় হবে। যে সমস্ত একই রূপ কারণ পুঁজির সম্প্রসারণ মূলক ক্ষমতার বিকাশ ঘটায় সেই সমস্ত কারণ পুঁজির আয়ত্তাধীন শ্রমশক্তিকেও বিকশিত করে। সুতরাং সম্পদের সম্ভাব্য শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্পীয় মজুত বাহিনীর আপেক্ষিক সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কর্মরত শ্রমিক বাহিনীর অনুপাতে এই মজুত বাহিনী যতই বড় হবে, সুসংবদ্ধ উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাবে, যাদের দুর্দশা ও শ্রমের যন্ত্রণা বিপরীত অনুপাতে (in inverse ratio) বাড়ে-কমে। সর্বশেষে, শ্রমিক শ্রেণীর ভিক্ষোপজীবী অকর্মণ্য অংশ আর শিল্পীয় মজুত বাহিনী যতই ব্যাপক হবে, ততই বৃদ্ধি পাবে আনুষ্ঠানিক ভিক্ষাবৃত্তি। **এটাই পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবনের চূড়ান্ত সাধারণ নিয়ম**" [পুঁজি, ১ম খণ্ড]

এই নিয়ম সম্পর্কে মার্কস আরোও বলেন ঃ

".....পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরে শ্রমের সামাজিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সকল পদ্ধতি স্বতন্ত্র শ্রমিকদের ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেই প্রবর্তন করা হয় ; উৎপাদনকে বিকশিত করার সকল উপায় উৎপাদকের উপর প্রভূত্ব ও শোষণের উপায় হিসাবে নিজেদের রূপান্তরিত করে ; সেগুলো শ্রমিকের অঙ্গহানি ঘটিয়ে মানুষের এক অসম্পূর্ণ অংশে পরিণত করে, তাকে মেশিনের লেজুড়ের পর্যায়ে অবনমিত করে ; তার কাজের ক্ষেত্রে আনন্দের প্রতিটি অবশেষকে ধ্বংস করে দেয় এবং তাকে পরিণত করে ঘৃণিত শ্রমে। শ্রম-প্রক্রিয়াতে বিজ্ঞান যে পরিমাণে এক স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয় সেই একই পরিমাণে শ্রম-প্রক্রিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্ভাবনাকে তারা তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ; যে অবস্থার অধীনে সে কাজ করে সে অবস্থাকে তারা বিকৃতি সাধন করে ; শ্রম-প্রক্রিয়ার ধারায় তাকে হীনতার আরো ঘৃণ্য স্বেচ্ছাচারিতার অধীনস্থ করে, তারা তার জীবন-কালকে রূপান্তরিত করে শ্রম-সময়ে..... কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের সকল পদ্ধতিই একই সময়ে পুঞ্জীভূতকরণেরও পদ্ধতি ; আবার পুঞ্জীভূতকরণের প্রতিটি সম্প্রসারণও পুনরায় ঐসব পদ্ধতির বিকাশের এক উপায়ে পরিণত হয়। সুতরাং, এ থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, পুঁজি যে অনুপাতে পুঞ্জীভূত হতে থাকে সে অনুপাতেই, মজুরী কমই হোক আর বেশীই হোক, শ্রমিকের ভাগ্য অবশ্যই আরো খারাপ হবে। সর্বশেষে, যে নিয়ম সর্বদাই আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা, কিংবা শিল্পীয় মজুত বাহিনীকে পুঞ্জীভবনের মাত্রা ও শক্তির সমভার করে দেয়, সেই নিয়ম শ্রমিককে পুঁজির সাথে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেয়। ..... তা পুঁজির পুঞ্জীভবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দুঃখ-দুর্দশার পুঞ্জীভবনও প্রবর্তন করে। সুতরাং, এক প্রান্তে সম্পদের পুঞ্জীভবন হলো একই সাথে অন্য প্রান্তে, অর্থাৎ, যে শ্রেণী পুঁজির আকারে নিজের উৎপন্ন-দ্রব্য উৎপাদন করে সেই শ্রেণীর দিক দিয়ে দুর্দশা, শ্রমের যন্ত্রণা, দাসত্ব, অজ্ঞতা, বর্বরতা, মানসিক অবমাননার পুঞ্জীভবন।" [ঐ]

শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্য

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে-পরিমাণে পুঁজির পুঞ্জীভবন ঘটে সেই পরিমাণেই শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থাও আরো খারাপ হতে বাধ্য। সর্বহারাশ্রেণীর অবস্থার এই সাধারণ অবনতি মজুরী হ্রাসের জন্যেই কেবল ঘটে না। বেকারত্ব বিস্তার লাভ করে এবং বেশ ঘন ঘন দেখা দেয় ; প্রায়শঃই প্রত্যেক শ্রমিকের উপর, শ্রমিক-পরিবারের প্রতিটি সভ্যের উপর এর প্রভাব পড়ে। শ্রমিকের শ্রম আরো তীব্র হয় এবং এর পরিণামে শ্রমিক দ্রুত বুড়িয়ে যায় আর প্রায়শঃই অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। যে বয়ঃসীমায় পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শ্রমিক বরখাস্ত হয়ে যায়, তা ক্রমেই কমে আসছে।

শ্রমিকদের ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীকে পুঁজি উৎকোচ দিয়ে কিনে নেয়, যাদেরকে সে বিশ্বস্ত গোলামে পরিণত করে। সৃষ্টি হয় সর্বহারাশ্রেণীর বিশেষ-সুবিধাপ্রাপ্ত উচ্চ স্তর – শ্রমিক অভিজাত সম্প্রদায়। উপনিবেশ-সমূহ থেকে আহরিত বিপুল মুনাফা আর শ্রমিকশ্রেণীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর অত্যধিক বর্বর শোষণের বদৌলতে পুঁজিপতিরা দক্ষ-শ্রমিকদের গোষ্ঠী-বিশেষকে উচ্চ মজুরী দিয়ে থাকে। পুঁজির দ্বারা কেনা ও নীতিভ্রষ্ট সর্বহারাশ্রেণীর এই উচ্চ স্তরই বিশ্বাসঘাতক সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলোর মূল শক্তির যোগান দেয়, যে পার্টিগুলো হলো পুঁজিবাদী প্রভুত্বের সবচেয়ে বিশ্বস্ত দুর্গ।

কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে যারা বেশী মজুরী পায় তাদের এক বড় অংশ সর্বদাই তাদের অবস্থানে নিরাপত্তার অভাব ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা বোধ করে।

সংকটের অবস্থায় সর্বহারাশ্রেণীর দারিদ্র্য ও বেকারত্ব

সংকটের সময়ই শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্য চরম সীমায় পৌঁছে। সংকট পুঁজিবাদের সকল দ্বন্দ্বকেই উদ্ঘাটিত ও তীব্র করে। সর্বহারাশ্রেণী দারিদ্র্যের সবচেয়ে নিম্নতম স্তরে পতিত হয়। প্রত্যেক সংকটেই উৎপাদন হ্রাস করার প্রবণতা দেখা দেয় এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে রাস্তায় নিক্ষেপ করে। যারা কাজে নিযুক্ত থাকে তাদেরও মজুরী হ্রাস পায়।

পুঁজিবাদ আজ পর্যন্ত যত সংকটের সম্মুখীন হয়েছে বর্তমান সংকট হলো তার মধ্যে সবচেয়ে গভীর ও তীব্র ['৩০-এর দশকের সংকটের কথা বলা হচ্ছে – অনুঃ]। জীবন্ত থাকা সত্ত্বেও যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হলো মুমূর্ষু ও ক্ষয়িষ্ণু, সেই ব্যবস্থা কোটি কোটি জনসাধারণকে নজিরবিহীন নির্যাতনের কবলে ঠেলে দিয়েছে। বেকারত্ব ভয়ঙ্কর সীমায় পৌঁছে। বেকার লোকজনের সাথে আমাদের সেই বিশাল বাহিনীকেও যোগ করতে হবে যারা আংশিক সময় কাজ করে এবং তদনুযায়ী সামান্য মজুরীই পায়।

ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশেই বর্তমান সংকট নিয়ে এসেছে মজুরীর প্রভূত পরিমাণ হ্রাস। সংকটের সমস্ত বোঝা শ্রমিক শ্রেণীর কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের মজুরী কমিয়ে দেয়ার জন্যে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে, শ্রমিকদের পক্ষে এমনকি তাদের সবচেয়ে জরুরী চাহিদা পূরণও

অসম্ভব করে তুলে তাদেরকে ভিক্ষুকের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। এমনকি সবচেয়ে সমৃদ্ধ পুঁজিবাদী দেশেও, এই সংকটের কালে শ্রমিকশ্রেণীর জীবন ধারনের মান অবিশ্বাস্যরূপে নীচে নেমে গিয়েছে।

বিপুল সংখ্যক বাস্তব ঘটনাই এর সাক্ষ্য দেয়। ইংল্যাণ্ডের খনি শ্রমিকদের অবস্থা অনুসন্ধান করে একজন সাংবাদিক লিখেছেন ঃ

"দক্ষিণ ওয়েল্‌স্ বা ডারহামের কোন খনি শ্রমিকের ঘরে যদি আপনি যান, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে সুদিনে যেসব আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছিল তার সমস্তই এখন সে বেচে দিয়েছে। বাড়ী ভাড়া পরিশোধের কাজে সহায়তা করার জন্যে অতিথি-ভাড়াটে (বোর্ডার) রাখা হয়েছে ; কিন্তু খুব সম্ভব এই বোর্ডারও তার চাকুরী হারিয়েছে এবং এক কপর্দকও দিতে পারে না। পরিবারের পিতার যদি কাজ থাকে, তাহলে পুত্র নিশ্চিতই বেকার ; কিংবা তার বিপরীতে পুত্রের কাজ থাকলে পিতা কর্মহারা, বন্ধক দেয়ার মতো যা কিছু ছিল তার সবই গেছে। নিজের জন্যে, স্ত্রী বা সন্তানদের জন্যে কাপড়-চোপড় কিনে বিলাসিতা করতে পারে এমন একজন খনি শ্রমিকও খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুরাতন ছেঁড়া কাপড় কিনে মা তাতে কোনভাবে তালি লাগিয়ে দিলে তবেই তাদের পক্ষে কাপড় বদলানো সম্ভব।"

এক সময়ে নিজেদের তোলা চাঁদা দিয়ে খনি-শ্রমিকদের পল্লীতে গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছিল এবং নাট্যশালা খোলা হয়েছিল। কিন্তু এখন গ্রন্থাগার পুস্তকাদি কিনতে পারে না, আর নাট্যশালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ইংল্যাণ্ডে শিল্পের অন্যান্য কয়েকটি শাখায় শ্রমিকেরা আরো শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র শিল্প শ্রমিকদের তুলে ধরা চিত্র হচ্ছে এমনকি আরো বেশী হতাশাব্যঞ্জক।

এমনকি পূর্ণ উৎপাদন-ক্ষমতায় কাজ করেও (অর্থাৎ প্রত্যেক তাঁতী ৪ খানা করে তাঁত চালিয়েও) একজন তাঁতীর গড়পড়তা সাপ্তাহিক মজুরী বিগত ৪ বছরে ৩৯ শিলিং ৬৭ পেন্সের বেশী হয়নি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একজন তাঁতী কেবল ২ খানা তাঁত চালায় এবং উদাহরণস্বরূপ, বিভারলি শহরে, একজন তাঁতীর সাপ্তাহিক মজুরী ১৫ থেকে ২০ শিলিংএ ওঠা-নামা করে। তথাপি এই মজুরীও আবার পাওয়া যায় কেবল ভাল কাঁচামাল পেলে। সংকটের অবস্থায় পড়ে, মালিক সব ধরনের নিকৃষ্ট কাঁচামাল ব্যবহার করে। সুতরাং তাঁতীদের মজুরীও এই কারণে আরো হ্রাস পায়। বহু সরকারী তদন্তের গতিধারায় সংগৃহীত তথ্যাদি ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতীদের দারিদ্রের জ্বলন্ত প্রমাণ উপস্থিত করছে। উদাহরণ স্বরূপ, উইগানে ১৯৩১ সালের তদন্ত দেখিয়ে দিচ্ছে যে, "মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য" বলে নগর নির্মাণ কমিশন কর্তৃক বাতিলকৃত ঘর-বাড়ীগুলোতে শত শত শ্রমিক বসবাস করছে। বোল্টনেও এরূপ কমিশন প্রমাণ করেছে যে, শ্রমিকরা যেসব আবাসগৃহে বসবাস করে সেগুলোর অধিকাংশই "নগরের আবর্জনা, ময়লাস্তূপ, পঙ্কিল-স্থান, কিংবা গোশালার পাশেই অবস্থিত, জঞ্জালের পাহাড়ে পরিবেষ্টিত"।

সংকটের বছরগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প ক্ষেত্রে গড়পড়তা সাপ্তাহিক মজুরী নিম্নলিখিত রূপে হ্রাস পায় ঃ

সাল	সাপ্তাহিক মজুরী (ডলারে)
১৯২৯	২৮.৫
১৯৩০	২৫.৮
১৯৩১	২২.৬
১৯৩২	১৭.১
১৯৩৩	১৭.৭

১৯৩৩ সালে মজুরীর কিছুটা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেলেও তা ছিল কেবল এক আপাত বৃদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে বললে এই সময়ে জীবনযাত্রার ব্যয়ের বৃদ্ধি ছিল বাহ্যিক মজুরীর বৃদ্ধি অপেক্ষা বেশ পরিমাণে অধিক। অত্যন্ত কম করে বর্ণিত সরকারী হিসাব অনুযায়ীও ১৯৩২ সালের তুলনায় ১৯৩৩ সালে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে শতকরা ৭ ভাগ, কিন্তু 'শ্রমিক গবেষণা ব্যুরোর প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৩৩ সালে খাদ্যের দামই বেড়েছে শতকরা ১৮ ভাগ। রুজভেল্ট সরকারের দ্বারা পাস করানো কুখ্যাত "জাতীয় পুনরুজ্জীবন বিধি" শ্রমিকদের জীবনাবস্থায় আরো অধিক অবনতিই ডেকে এনেছে।

ফ্যাসিবাদী জার্মানীতে শ্রমিকদের অবস্থা মন্দ থেকে আরো মন্দ হচ্ছে। ফ্যাসিবাদীরা শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে বস্তুতপক্ষে যে কয়েদখানার অবস্থা প্রবর্তন করেছে, জার্মান শ্রমিকদের চিঠিপত্র থেকে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, সিয়েমেন্‌স্-এর বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ফ্যাক্টরী থেকে একজন শ্রমজীবী নারী বিদেশস্থ এক জার্মান পত্রিকায় যা লিখেছে তা হলো ঃ

"সিয়েমেনস্টেড-এর ছোট ছোট ফ্যাক্টরীর চাপকলের ঘরগুলোতে শ্রমের অবস্থা ভয়াবহ। প্রতি সপ্তাহে পাঁচ শ্রম-দিবসে, ফুরন কাজে, মজুরী খুব বেশী উঠলে ১৫ মার্ক হয়। এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে একটি মেয়ে সপ্তাহে চার দিন কাজ পায় এবং এই সময়ে সর্বসাকুল্যে মজুরী পায় ৯ মার্ক। এ প্রকার অবস্থায় জীবন ধারণের জন্যে মোটের উপর অবশিষ্ট থাকে ২ মার্ক, কারণ ৫ মার্ক যায় বাড়ী ভাড়ায় আর ২ মার্ক যায় যাতায়াত ভাড়ায়। কাজের গতিবেগ আতঙ্কজনক। অধিকাংশ নারী শ্রমিক ফুরন কাজের অবস্থার সাথে তাল রাখতে পারে না। জিনিসপত্র আনা ও নেয়া, কাজের কার্ডের হিসাব রাখা, যন্ত্রপাতির ত্রুটি সংশোধন করা, প্রাতঃরাশ গ্রহণ করা ইত্যাদির জন্যে যে সময় ব্যয় হয় তা হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না।"

সংকটের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্যের মাত্রা নিম্নলিখিত সংখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয়। সংকটের বছরগুলোতে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবীদের ও তাদেরকে মোট যে মজুরী দেয়া হয়েছিল তার সূচক সংখ্যাগুলো (index number) নীচে দেয়া হলো (১৯২৩-২৫ সালের সূচক = ১০০ হিসাবে) ঃ

মাস ও বছর	নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা	পরিশোধিত মজুরীর পরিমাণ
মে ১৯২৯	১০৫·৩	১১২.৯
মে ১৯৩০	৯৪·৮	৯৫.৪
মে ১৯৩১	৪০·১	৭৩.৪
মে ১৯৩২	৬৩·৪	৪৬.৮

এসব সংখ্যা থেকে দেখা যায় যে, সংকটের পূর্বের বছর, অর্থাৎ ১৯২৯ সালে, নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৯২৩-২৫ সালেরই অনুরূপ, কিন্তু মজুরী ছিল কিছু বেশী। তারপর এক ভয়াবহ হ্রাসপ্রাপ্তি শুরু হয়ে গেল, যেখানে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যার চেয়ে মজুরী অনেক বেশী দ্রুত হারে পড়তে শুরু করলো। এর অর্থ হলো এই যে, পরিশোধিত মজুরীর পরিমাণ কমে গেলো, তা দুইটি কারণে ঃ ১) বেকারত্বের দরুন এবং ২) নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরী হ্রাসের দরুন। সংকটের তিন বছরে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমেছিল শতকরা ৩০ ভাগ, অথচ মজুরী কমেছিল শতকরা ৬০ ভাগ। সুতরাং এসময়ে মজুরী কাটা হয়েছিল অর্ধেক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকাররা সরকারের কাছ থেকে কোন সাহায্যই পায় না , এসব লক্ষ লক্ষ বেকারদের জীবনযাপনের অবস্থা বিশেষভাবে শোচনীয়। হাজার হাজার বেকার বাড়ী ভাড়া শোধ করতে না পেরে আশ্রয়হীন হয়ে পথে পথে ঘুরে ফিরে, বড় বড় শহরের উপকণ্ঠে

তাঁবু ফেলে থাকে। আমেরিকায় বেকারদের এসব তাঁবুগুলোকে বলে "জঙ্গল"। ক্যালিফোর্নিয়ার স্টক্টনের নিকট জলাভূমিতে একটি আস্তানা সম্পর্কে একটি বুর্জোয়া সাময়িকী নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছে। লেখক বলেছেন ঃ

"যখন আমরা তাঁবুর আস্তানাটি পরিদর্শন করলাম, তখন বেকারদের বিভিন্ন দলগুলোর দ্বারা স্থাপিত তাঁবুগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছিল। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র গ্রুপই ব্যস্ততার সাথে নিজেদের খাবার রান্না করছিল। সমস্ত চিত্রটিই ছিল উদ্ভট ঃ এখান থেকে একদিকে যেখানে দেখা যাচ্ছিলো বিপণীরাজি সমৃদ্ধ নগরী, শস্যে পূর্ণ শস্য-উত্তোলক যন্ত্রের সারি, আর অন্যদিকে দেখা যাচ্ছিল চিনি শোধনাগার, সারা জাহাজঘাট জুড়ে খাদ্য-সম্ভার পূর্ণ গুদামঘর, সেখানে কাজ করতে ইচ্ছুক এই লোকগুলো গুদামঘরগুলো থেকে ছুড়ে ফেলা আবর্জনার মধ্যে অন্বেষণ করছিল খাদ্য, পরিষ্কার করছিল আধা-পচা গাঁজর, পেঁয়াজ বা সীম এবং কুড়িয়ে পাওয়া টিনের পাত্রে সেগুলোকে করছিল রান্না।"

তাদের দুঃস্থতার এই চিত্রের বিবরণ লেখক সমাপ্ত করছেন নিম্নলিখিত কথায় ঃ

"বনেদী মার্কিনী চালে আমাদেরকে বরাবর এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আমাদের দেশ স্বাধীন। প্রকৃতই স্বাধীনই বটে ঃ চুরি, অনাহারে মৃত্যু কিংবা আবর্জনাভুক জন্তুতে পরিণতি – এই তিনটির মধ্যে যেকোন একটি বিকল্পকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা এই লোকগুলোর আছে।"

কিন্তু এই বুর্জোয়া সংবাদপত্রসেবীরা আরেকটি বিকল্পের কথা ভুলে গিয়েছিলেন আর তা হলো ঃ পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রাম।

আত্মহত্যার সংখ্যার নজিরবিহীন বৃদ্ধি, সমস্ত রকম রোগের বিস্ময়কর বিস্তৃতি, অনাহারজনিত অসংখ্য মৃত্যুর ঘটনা – এটাই হলো সেই অমানুষিক জীবনাবস্থার পরিণতি, যার মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পুঁজিবাদ নিক্ষেপ করেছে। শিশুদের মৃত্যু আর ব্যাধি বিশেষ দ্রুততার সাথেই এখানে বেড়ে চলে।

যদি সমৃদ্ধ পুঁজিবাদী দেশগুলোতে এটাই হয় সর্বহারাশ্রেণীর "দারিদ্র্যের মাত্রা", তাহলে পশ্চাদ্‌পদ পুঁজিবাদী দেশগুলোর অবস্থা হলো আরো শোচনীয়। এ ক্ষেত্রে **পোল্যাণ্ড** হলো এক আদর্শ নমুনা। সম্প্রতি বেকার ২০৪টি ওয়ারশ-বাসী পরিবারের তদন্তের ফলাফল বেরিয়েছে। এমন এক বুর্জোয়া সংগঠনের দ্বারা এই তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় যা সাম্যবাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতিশীল নয়। দক্ষ শ্রমিক পরিবারগুলোতেই কেবল তদন্ত চালানো হয়েছিল। তদন্তের রিপোর্টে বলা হয় ঃ

"এটা বলতেই হবে যে, খাদ্যের পরিমাণ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেত্রেই অনাহার থেকে বাঁচতে পারে তদপেক্ষাও কম। উদাহরণস্বরূপ ঃ ৪ জন মানুষ নিয়ে গঠিত এক ঢালাইকরের পরিবার খাদ্যের জন্যে সপ্তাহে ১২ জ্লোতি (১.৫০ ডলার) ব্যয় করে। দিনে দুবার তারা খায় ঃ আলু, বাধাকপি আর রুটি। মাংস বা দুধ তারা কিনতেই পারে না। ছয়জন লোক নিয়ে গঠিত একটি দর্জির পরিবার কমিশনের পরিদর্শনের কালেও তিন দিন যাবৎ অভুক্ত ছিল ; জ্বালানী বা কেরোসীন কিছুই তাদের ছিল না। অন্য এক ক্ষেত্রে চারজনের এক পরিবার তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে কোন খাবারই রাঁধেনি। তাদের একমাত্র খাবার ছিল রুটি ও চা। এক বেকার শ্রমিকের পরিবার চলে স্ত্রীর উপার্জনে, যে রাস্তায় বিস্কিট ফেরী করে বেড়ায়। তার উপার্জন হলো প্রতি দিনে১-১.৫ জ্লোতি (প্রায় ১৫ সেন্ট), আর দশজন লোক নিয়ে গঠিত পরিবারের এটাই হলো আয়ের একমাত্র উৎস।"

সার-সংকলন করে রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ

"বেকারদের প্রধান খাদ্য হলো আলু ও বাঁধাকপি, কদাচিৎ রুটি ও চা, মাঝে-মধ্যে যব-জাতীয় শস্য, অতি কদাচিৎ ময়দার পিঠা ইত্যাদি অথবা শাক-সবজি। যে ২০৪টি পরিবারের তদন্ত চালানো হয়েছিল তার মধ্যে কেবল ২০টি পরিবার সপ্তাহে একদিন মাংস খায়।"

বস্ত্রাদি সম্পর্কে অবস্থা আরো শোচনীয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ

"সবচেয়ে বেশী অভাব অনুভূত হয় জুতা ও বহির্বাস সম্পর্কে। উদাহরণস্বরূপ, ছয়জন লোক নিয়ে গঠিত এক বেকার রুটিওয়ালার পরিবারের কারোরই কোন জুতা নেই। বাড়ীর বাইরে যাবার সময়, বাড়ীর পিতা এক জোড়া জুতার তলি দড়ি দিয়ে পায়ে বেঁধে নেয় ; ছোটরা বাড়ীর বাইরে যায় না। অন্য একটি ক্ষেত্রে দুটি ছেলের একটি মাত্র কোট আছে। মা ছোট ছেলেটিকে স্কুলে পৌঁছিয়ে দিয়ে তার কোট খুলে নেয়, তারপর দৌড়ে বাড়ী গিয়ে বড় ছেলেটিকে তা পরিয়ে দেয়। স্কুল থেকে ছেলের বাড়ী ফেরার সময় একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।"

বেকারদের বাসস্থানের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদনে এই কথা বলা হয়েছে ঃ

"যেসব বাড়ীতে তদন্তানুষ্ঠান করা হয়েছে তাদের অধিকাংশগুলোতেই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্পর্কে নিতান্ত প্রাথমিক প্রয়োজনও পূরণ করা হয়নি।"

এখানে কিছু বৈশিষ্ট্যসূচক উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

"বাসস্থান হচ্ছে ভূগর্ভস্থ খুপড়ি। দেয়াল বেয়ে জল পড়ে। ঘরে ঢুকবার চাতালের মেঝেতে সর্বদাই তিন সেন্টিমিটার পানি থাকে। এই কক্ষে তিনজন বয়স্ক লোক আর চারটি শিশু থাকে। অনেক ক্ষেত্রে, দশাধিক লোক এক ঘরে থাকে। যে ৯২৯ জন লোককে প্রশ্ন করা হয়েছিল তার মধ্যে কেবল ১৯৩ জন আলাদা বিছানায় ঘুমায়। এর মধ্যে ১১ জন রয়েছে যারা মেঝেতে শোয়, চৌদ্দজন শিশু ঘুমায় ছোট খাটে, আর নয়জন শিশু শোয় পেটারা, বেঞ্চ বা চেয়ারে। অধিকাংশই ঘুমায় একই বিছানায় দুই, তিন বা চারজন করে। নয়টি ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাঁচজন করে ঘুমায় এক বিছানায়, আর তিনটি ক্ষেত্রে এমনকি এক বিছানায় ছয়জনও।"

শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি সত্ত্বেও বর্তমান বছরে পোল্যাণ্ডের বেকারদের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশী। ১৯৩৪ সালের জানুয়ারীতে শ্রমিক নিয়োগ কেন্দ্রের রেজিস্টার খাতায় বেকারদের সংখ্যা ছিল ৪,১০,০০০ ; ১৯৩৪ সালের বসন্ত কালে তা ছিল ৩,৫০,০০০, কিন্তু এমনকি বুর্জোয়া সংবাদপত্রসমূহের সাক্ষ্য অনুযায়ী বেকারদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল পনের লক্ষেরও বেশী। ১৯২৯ সালে বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রমিকদের পরিশোধিত মজুরীর মোট পরিমাণ ছিল প্রকৃতপক্ষে ১৬৪,৫৯,৩৭,০০০ জ্লোতি (সরকারী হিসাব অনুযায়ী) ; আর ১৯৩২ সালে মাত্র ৭৩,৭৮,৩০,০০০ জ্লোতি, শতকরা ৫৫ ভাগ মজুরী হ্রাস। (১৯৩৩-৩৪ সালের সরকারী হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি)। ৮ ঘন্টা শ্রম-দিবস তুলে দেয়া হয়েছে। বেকারত্ব ও স্বাস্থ্যবীমা, দুর্ঘটনা ও কর্মক্ষমতা হারানোজনিত সাহায্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে লব্ধ ছোট-খাট সুযোগ-সুবিধা থেকে পর্যায়ক্রমিক ফ্যাসিবাদী বিধানগুলো শ্রমিক-শ্রেণীকে বঞ্চিত করেছে।

পুঁজিবাদী "যৌক্তিক পুনর্গঠন" (rationalization), অর্থাৎ, সরকার কর্তৃক উৎসাহিত এবং মালিকদের দ্বারা ফ্যাক্টরী ও খনিগুলোতে প্রবর্তিত নির্মম রক্ত-জল-করা-ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে শিল্পের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন দুর্ঘটনার বৃদ্ধি ঘটেছে। এটা বলাই যথেষ্ট যে, ১৯২৭ সালে থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত, সরকারী হিসাব অনুযায়ী, এই কয় বছরে একমাত্র কয়লা

খনি শিল্পেই ১,০৩৯ জন খনি-শ্রমিক নিহত হয়েছে, আর ৭,৪৭১ জন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, আর ৯৭,৩৩১ জন সাধারণভাবে আহত হয়েছে, যেখানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১,০০,০০০-এর কিছু বেশী।

জাপানে ১৯৩০ সালে কয়লা শিল্পে একজন পুরুষ শ্রমিকের মজুরী ছিল ১.৭২ ইয়েন, আর ১৯৩৩ সালে ১.১১ ইয়েন ; ১৯৩০ সালে একজন মহিলা-শ্রমিকের মজুরী ছিল ১.৫২ ইয়েন, আর ১৯৩৩ সালে ০.৭৩ ইয়েন। শিশুরা সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করে পায় মাসিক ৫ থেকে ১০ ইয়েন। জাপানে বস্ত্র শিল্পে মেয়েরা প্রায়শঃই দিনে ১৫ ঘন্টা কাজ করে আর সপ্তাহে পায় ৩ থেকে ৫ শিলিং এবং ফ্যাক্টরী ব্যারাকে থাকার স্থান।

১৯৩৩ সালে এক জাপানী সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত চিত্তাকর্ষক ঘটনার বিবরণ প্রকাশ পায় ঃ

"দশজন মেয়ের এক ক্ষুদ্র দলকে পুলিস আটক করলো। শীত থাকা সত্ত্বেও তারা গ্রীষ্মের পোশাক পরে ইতস্ততঃ ঘোরাঘুরি করছিল। অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসলো যে তারা এক বয়ন কারখানা থেকে পালিয়ে এসেছে, কারণ বিরতিহীন পনের ঘন্টা শ্রম-দিবসের নির্মম অত্যাচার আর শোচনীয় অবস্থা তারা আর সহ্য করতে পারেনি। তাদেরকে যখন কারখনায় ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হলো, তখন তারা উত্তর দিলো – এর চেয়ে মরণ অনেক ভাল।"

জাপানী সংবাদপত্রসমূহে অনুরূপ ধরনের সংবাদ রিপোর্ট প্রায়ই দেখা যায়।

নিরীক্ষামূলক প্রশ্নাবলী

১। অন্যান্য পণ্যের মূল্য থেকে শ্রমশক্তির মূল্য কোন্ কোন্ দিক দিয়ে পার্থক্যপূর্ণ ?

২। মজুরীর বিভিন্ন রূপ কেমন করে পুঁজিবাদী শোষণকে আড়াল করে রাখে ?

৩। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর সংগ্রামের তাৎপর্য কি ?

৪। কোন্ অবস্থায় সময়-রূপ কাজের ভিত্তিতে আর কোন অবস্থায় ফুরন কাজের ভিত্তিতে মজুরী পরিশোধ করা পুঁজিপতির নিকট সুবিধাজনক ?

৫। বিভিন্ন দেশে মজুরীর হারের ক্ষেত্রে পার্থক্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ?

৬। শ্রমিকদের মজুত বাহিনীর অস্তিত্ব কোথা থেকে জন্ম নেয় ?

৭। পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবনের সাধারণ নিয়মের পরিণতি কি ?

৮। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্যের কারণসমূহ কি ?

Lalsalamml.wordpress.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুঁজিপতিদের মধ্যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের বন্টন

আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি, শ্রমিকের শ্রমের দ্বারাই কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একই সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে না। অধিকন্তু, যেসব প্রতিষ্ঠান সর্বাপেক্ষা বেশী পুঁজি বিনিয়োগ করেছে সেসব প্রতিষ্ঠানেই সব সময় সর্বোচ্চ সংখ্যক লোক নিয়োগ করা হয় না। দুইজন পুঁজিপতির কথা ধরা যাক, প্রত্যেকেরই সমান পরিমাণ পুঁজি – দশ লক্ষ ডলার করে আছে। একজন স্থাপন করেছে বিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্র ; সমস্ত আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জামে তা সজ্জিত। আরেকজন খুলেছে এক পাথরের খনি, যেখানে অনেক কায়িক শ্রমের প্রয়োজন। বিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্রে মাত্র ৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত, অন্যদিকে পাথর খনিতে ৫০০ জন শ্রমিক কাজ করে। প্রশ্ন হলো ঃ বিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্রের মালিকের চেয়ে পাথরের খনির মালিক কি দশ গুণ বেশী মুনাফা অর্জন করে ?

আমরা জানি যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের লক্ষ্য হলো **মুনাফা করা**। বিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্রের চেয়ে (একই পুঁজি খাটিয়ে) যদি পাথরের খনি পরিচালনার কাজ অধিক লাভজনক হতো তাহলে বহু ভাগ্যান্বেষী খনির ব্যবসায় নেমে পড়েছে বলে দেখা যেত। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্রে পুঁজি খাটাতে খুব কম লোকই রাজী হতো। কিন্তু আমরা ইতোমধ্যেই জানি তার ফল কি দাঁড়াত ঃ খনিজ পাথরের দাম যেত পড়ে এবং বিদ্যুৎ শক্তির দাম যেত বেড়ে। কিন্তু এ প্রশ্ন জাগ্রত হতে পারে, যে ব্যাপ্তির মধ্যে এই কমা-বাড়াটা হতো তার সীমাটা কি ?

ধরে নেয়া যাক, দাম এমন পরিমাণেই পরিবর্তিত হলো যে উভয় প্রতিষ্ঠানেই মুনাফা সমান হয়েছে। এর পরেও কি দামের পরিবর্তন ঘটবে ? স্পষ্টতঃই না। সুতরাং বিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্রের কোন মালিকই আর পাথরের খনির ব্যবসায়ে যাওয়াটা অধিক লাভজনক বলে মনে করবে না ঃ উভয় প্রতিষ্ঠানে একই সুবিধা বিদ্যমান।

পুঁজিবাদী শিল্প-স্থাপনাসমূহ একটি বা দুটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত নয়, বরং তা বিপুলসংখ্যক কলকারখানা, ফ্যাক্টরী নিয়েই গঠিত। এগুলোর প্রত্যেকটিতে বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণ অবশ্য ভিন্ন জিনিস। কিন্তু এ সমস্ত বিনিয়োগের সবগুলোরই নিজেদের মধ্যে পার্থক্য হলো তাদের আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতি [organic composition] অর্থাৎ, স্থির ও পরিবর্তনশীল পুঁজির মধ্যেকার সম্পর্কের মধ্যে। পরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনায় স্থির পুঁজি যত বেশী বড়, পুঁজির আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতিও তত উন্নত। বিপরীত পক্ষে, যখন স্থির পুঁজির তুলনায় পরিবর্তনশীল পুঁজি হয় বড়, তখন পুঁজির নিম্ন স্তরের আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতির কথাই বলা হয়।

সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, বিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হলো পুঁজির **উচ্চ** আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতি। বিপরীত পক্ষে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আমরা পুঁজির নিম্ন আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতি লক্ষ্য করবো। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তা ঘটে ? এর উত্তর দেয়া কঠিন নয়। যেখানে বহুসংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে অথচ ইমরাত, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদির মূল্য খুব বেশী নয়, সেখানেই আমরা দেখতে পাব পুঁজির **নিম্ন** আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতি। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, রেললাইন বসানোর কাজে একজন ঠিকাদার বাঁধ তৈরী করছে – তার স্থির পুঁজি সম্পর্কিত খরচ খুব বেশী নয় ঃ কিছু মাল টানার গাড়ী, শাবল, বেলচা ইত্যাদি সে খরিদ করে এবং তাই যথেষ্ট। কিন্তু সে বহুসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে ঃ শ্রমশক্তি খাটাতেই তার পুঁজির বৃহত্তর অংশ চলে যায়।

যেহেতু শ্রমের দ্বারাই কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হয়, সেহেতু পুঁজির নিম্ন আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো সবচেয়ে বেশী লাভজনক রূপে দেখা দেয়। কিন্তু পুঁজিপতিদের মধ্যেকার মুনাফার জন্যে সংগ্রামের ফলে দেখা দেয় একই পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ সহকারে মুনাফার সমতা। বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণের সাথে পুঁজিপতির মুনাফার অনুপাতকে বলা হয় মুনাফার হার। উদাহরণস্বরূপ, কোন প্রতিষ্ঠানে দশ লক্ষ মুদ্রা বিনিয়োগ করে যদি পুঁজিপতি এক লক্ষ পরিমাণ মুদ্রা মুনাফা করে, তাহলে তার মুনাফার হার হবে এক-দশমাংশ বা শতকরা ১০ ভাগ। পুঁজিপতিদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার ফল হিসাবে দেখা দেয় **সাধারণ বা গড়পড়তা মুনাফার হারের নিয়ম** [law of general or average rate of profit]। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যান্য সকল নিয়মের মতো এই নিয়মটিও সকলের বিরুদ্ধে সকলের সংগ্রামে বিরামহীন ওঠা-নামার মধ্যে দিয়ে নিজেকে আরোপ করে।

পুঁজিবাদী সমাজে মুনাফার হার কিভাবে সমতা লাভ করে তা একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা দেখাচ্ছি। সহজভাবে বোঝার জন্যে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, সমাজে মাত্র তিনটি (বা তিন শ্রেণীর) পুঁজি রয়েছে, সবগুলো একই পরিমাণের, কিন্তু আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতির দিক থেকে ভিন্ন। ধরা যাক, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুঁজির পরিমাণ ১০০ একক। প্রথমটির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্থির পুঁজির ৭০ একক আর পরিবর্তনশীল পুঁজির ৩০ একক, দ্বিতীয়টির স্থির পুঁজির ৮০ একক, আর পরিবর্তনশীল পুঁজির ২০ একক, এবং তৃতীয়টির স্থির পুঁজির ৯০ একক, আর পরিবর্তনশীল পুঁজির ১০ একক। ধরা যাক, তিনটি প্রতিষ্ঠান বা তিন শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সবগুলোতেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার একই রূপ এবং শতকরা ১০০ ভাগের সমান। এর অর্থ হলো এই যে, প্রত্যেক শ্রমিকই তার নিজের মজুরী উপার্জনের জন্যে অর্ধেক দিন কাজ করে আর বাকি অর্ধেক দিন কাজ করে পুঁজিপতির জন্যে। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্জিত উদ্বৃত্ত-মূল্য পরিবর্তনশীল পুঁজির সম-পরিমাণের হবে। অর্থাৎ প্রথমটির ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-মূল্য হবে ৩০ একক, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ২০ একক, আর তৃতীয়টির ক্ষেত্রে ১০ একক। যদি পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎপাদিত পণ্যসমূহ তাদের মূল্যের সমান দরে বিকায়, তাহলে প্রথম প্রতিষ্ঠান লাভ করবে ৩০ একক মুনাফা, দ্বিতীয়টি ২০ একক আর তৃতীয়টি ১০ একক। কিন্তু তিনটির প্রত্যেকটিতেই বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণ হলো সমান। এরকম একটা পরিস্থিতিকে প্রথম পুঁজিপতি স্বাগত জানালেও, তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত পুঁজিপতির নিকট তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এরূপ ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত পুঁজিপতির পক্ষে প্রথম শ্রেণীতে চলে যাওয়াই সুবিধাজনক। এর ফলাফল হিসেবে প্রথম শ্রেণীভুক্ত পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হবে, যা তাদেরকে বাধ্য করবে দাম কমাতে এবং একই সাথে সৃষ্টি করবে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত পুঁজিপতিদের পক্ষে দাম বাড়ানোর সম্ভাবনা, যাতে তিনটি শ্রেণীর ক্ষেত্রেই মুনাফা সমান হয়।

নীচের সারণিতে মুনাফার হারের ক্ষেত্রে সমতা লাভের এই ধারাকে ছকাকারে দেখানো যেতে পারে।

পুঁজি	স্থির পুঁজি	পরিবর্তনশীল পুঁজি	উদ্বৃত্ত মূল্য	উৎপাদিত পণ্যের মূল্য	পণ্যের বিক্রয় দাম	মুনাফার হার %
১ম	৭০	৩০	৩০	১৩০	১২০	২০
২য়	৮০	২০	২০	১২০	১২০	২০
৩য়	৯০	১০	১০	১১০	১২০	২০
মোট	২৪০	৬০	৬০	৩৬০	৩৬০	২০

পুঁজির আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতির ক্ষেত্রে ভিন্নতা ছাড়াও, শ্রমিকদের নিংড়ে নেয়া উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ **পুঁজির আবর্তনের গতির** [speed of turnover of capital] উপরও নির্ভর করে। দুইজন পুঁজিপতির যদি একই পরিমাণ পুঁজি থাকে এবং যদি তাদের পুঁজির আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতিও একই থাকে, তাহলে যার পুঁজি দ্রুত আবর্তিত হয়ে আসবে সে তত বেশী উদ্বৃত্ত-মূল্য নিংড়ে বের করতে সক্ষম হবে। ধরা যাক, একজনের পুঁজি বৎসরে একবার আবর্তিত হয়, আরেকজনের হয় তিন বার। এটা সুস্পষ্ট, দ্বিতীয় পুঁজিপতি তিনগুণ শ্রমিক নিয়োগ করতে এবং তিন গুণ উদ্বৃত্ত-মূল্য নিংড়ে নিতে সক্ষম হবে। মোটের উপর, এই পার্থক্য দূর হয়ে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় মুনাফার গড়পরতা হারের একই নিয়ম দ্বারা, যা পুঁজিপতিদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বলবৎ হয়।

কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে এই যে, পুঁজিবাদী সমাজে পণ্য সমূহ তাদের মূল্যের সমান দামে বিকায় না, বরং এমন দামেই বিক্রয় হয় যা তাদের মূল্য থেকে কিছুটা ভিন্ন। আর প্রকৃত পক্ষে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য সমূহ বিক্রী হয় এমন দামে যা তাদের উৎপাদন-খরচের কাছাকাছি ওঠা-নামা করে। কোন পণ্যের উৎপাদন-খরচ হলো উৎপাদন করতে গিয়ে ব্যয়িত খরচের পরিমাণ যোগ বিনিয়োগকৃত পুঁজির উপর গড়পড়তা মুনাফা।

"মুনাফা হলো উদ্বৃত্ত-মূল্য আর কোন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগকৃত মোট পুঁজির মধ্যেকার অনুপাত। 'উচ্চ আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতি' সম্পন্ন পুঁজি (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনায় স্থির পুঁজির এমন মাত্রার আধিক্য যেখানে তা সামাজিক গড়পড়তার ঊর্ধ্বে) গড়পড়তা হারের মুনাফার চেয়ে কম মুনাফা দেয় ; 'নিম্ন আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতি' সম্পন্ন পুঁজি গড়পড়তা হারের মুনাফার চেয়ে বেশী মুনাফা দেয়। পুঁজিপতিদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতা আর বিনিয়োগের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পুঁজি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনতা – উভয় ক্ষেত্রেই মুনাফার হারকে গড়পড়তা হারের সমানে নামিয়ে আনে। কোন নির্দিষ্ট সমাজে সকল পণ্যের মূল্যের মোট পরিমাণ ঐসব পণ্যের মোট দামের পরিমাণের সাথে সম্পূর্ণভাবে সদৃশ হয়ে যায় ; কিন্তু, আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠানে, এবং উৎপাদনের আলাদা আলাদা শাখায়, প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতিতে, পণ্যসমূহ তাদের মূল্য অনুসারে নয়, বরং **উৎপাদনের দাম** (কিংবা উৎপাদন-দাম) অনুসারেই বিক্রী হয়, যা হলো ব্যয়িত পুঁজি যোগ গড়পড়তা মুনাফার সমান।" [লেনিন, "কার্ল মার্কস", পূর্বোক্ত]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য-সামগ্রী তাদের মূল্যের দরে বিক্রী হয় না, বিক্রী হয় উৎপাদন-দাম অনুসারে। কিন্তু, এর অর্থ কি এই যে, পুঁজিবাদী উৎপাদনে মূল্য-সূত্রের [Law of value] কোন প্রভাব নেই ? আদৌ তা নয়। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, উৎপাদন-দাম হলো **মূল্যেরই এক ভিন্ন রূপ**।

কোন কোন পুঁজিপতি তাদের পণ্য বিক্রী করে মূল্যের চেয়ে বেশী দামে, অন্য কেউ কেউ বেচে কম দামে, কিন্তু এক সাথে ধরলে, সকল পুঁজিপতিই তাদের সমস্ত পণ্যের পূর্ণ মূল্য পেয়ে থাকে, আর গোটা পুঁজিপতি শ্রেণীর সর্বমোট মুনাফা হলো অপরিশোধিত সামাজিক শ্রম দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমান। সমগ্র সমাজের গঠন-কাঠামোর অভ্যন্তরে, উৎপাদন-দামের সর্বমোট পরিমাণ হলো উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর মূল্যের সর্বমোট পরিমাণের সমান, আর মুনাফার সর্বমোট পরিমাণ হলো শ্রমিকদের অপরিশোধিত শ্রমের সর্বমোট পরিমাণের সমান। পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে তাদের উৎপাদন-দামের ক্ষেত্রে হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে, অন্যদিকে তাদের মূল্যের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি তাদের উৎপাদন-দামের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটায়। এই ভাবেই মূল্য-সূত্র উৎপাদন-দামের মধ্য দিয়ে তার প্রভাব কার্য্যকর করে।

"এইভাবে, দাম ও মূল্যের মধ্যেকার বিপরীতমুখীনতা এবং মুনাফার সমতা-লাভের সুবিদিত ও তর্কাতীত বিষয়টিকে মূল্য–সূত্রের সাথে সঙ্গতি রেখে মার্কস পুরোপুরিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ; কারণ যাবতীয় পণ্যের সর্বমোট মূল্য হলো সর্বমোট দামের সমান।" [ঐ]

নিম্ন মুনাফার হার অভিমুখী প্রবণতা

মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যেই পুঁজিপতি তার প্রতিষ্ঠান চালায় যা থেকে সে মুনাফা বের করে আনে। পুঁজিবাদী শিল্পের চালিকা শক্তি হলো মুনাফা। কিন্তু, পুঁজিবাদের বিকাশ অনিবার্যরূপে মুনাফার গড়পড়তা হার হ্রাস করার প্রবণতা প্রদর্শন করে।

কোন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগকৃত গোটা পুঁজির পরিপ্রেক্ষিতে যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য আহরিত হয় তাই হলো মুনাফা। মুনাফার হার হলো পুঁজিপতির পুঁজির সাথে তার লাভের অনুপাত। কিন্তু আমরা জানি যে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয় পরিবর্তনশীল পুঁজির পরিমাণ অনুসারে, অর্থাৎ, পুঁজির যে অংশটি শ্রমশক্তি নিয়োগ করার জন্য ব্যবহার করা হয় তার দ্বারা।

কিন্তু, পুঁজির আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতি পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে অব্যাহতভাবেই পরিবর্তিত হতে থাকে, অব্যাহতভাবেই উচ্চতর হতে থাকে। প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধন বৃদ্ধির সাথে সাথে, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও প্রতিষ্ঠানের সাজ-সরঞ্জাম নিয়তই বৃহত্তর হতে থাকে, আর পুঁজির যে অংশ **নিঃশেষিত** শ্রমের [dead labour] জন্য খরচা হয় তা পরিবর্তনশীল পুঁজির, অর্থাৎ **জীবন্ত** শ্রমের [live labour] জন্য যে খরচা হয় তার তুলনায় বেশ পরিমাণে অধিক দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজির উচ্চতর আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতির পরিণাম হলো নিম্নতর হারের মুনাফার দিকে অনিবার্য প্রবণতা প্রদর্শন। যন্ত্রের দ্বারা শ্রমিককে স্থলাভিষিক্ত করে প্রত্যেক স্বতন্ত্র পুঁজিপতিই উৎপাদন সস্তা করে, তার পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করে এবং নিজের জন্যে অধিকতর মুনাফা অর্জনের চেষ্টা চালায়। এটা স্বতঃই প্রতীয়মান যে, তা না হলে সে যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে যেত না। কিন্তু পুঁজির উচ্চতর আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতির মধ্যে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির যে বিকাশ স্বীয় দিক থেকে অভিব্যক্তি লাভ করে তা এমন ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে যার প্রতিকার করা স্বতন্ত্র পুঁজিপতিদের **সাধ্যের বাইরে**। এরই ফলাফল হলো মুনাফার নিম্নতর সাধারণ (বা গড়পড়তা) হারের দিকে প্রবণতা প্রদর্শন।

"শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার ক্ষেত্রে বৃদ্ধির অর্থ হলো পরিবর্তনশীল পুঁজির সাথে তুলনায় স্থির পুঁজির অধিকতর দ্রুত বৃদ্ধি। যেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্য হলো কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল পুঁজির অপেক্ষক [function] সেহেতু এটা স্পষ্ট যে, মুনাফার হার (কেবল পুঁজির পরিবর্তনশীল অংশেরই নয়, সমগ্র পুঁজির সাথে উদ্বৃত্ত-মূল্যের অনুপাতের) পড়তির ঝোঁক প্রদর্শন করে। এই ঝোঁকের এবং যেসব পরিস্থিতি একে আড়াল করে বা বিরুদ্ধ-ক্রিয়াশীল হয় সেসবের একটা বিশদ বিশ্লেষণ মার্কস করেছেন।" [ঐ]

বিরুদ্ধ-ক্রিয়াশীল পরিস্থিতির মধ্যে প্রথমেই আসে শ্রমিকদের উপর **শোষণের হারের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি**। এ উপলক্ষে আরো মনে রাখতে হবে যে, শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে, যন্ত্রপাতি, কল-কব্জা ইত্যাদির **মূল্য কমতে থাকে**। আগে যেখানে একজন শ্রমিক দুটি তাঁত চালাতো সেখানে এখন যদি সে ষোলটি তাঁত চালায়, তাহলে এটা মনে রাখা আবশ্যক যে, তাঁতের মূল্যও এখন আগের চেয়ে কম।

ষোলটি তাঁতের মূল্য এখন পূর্বের দুটি তাঁতের মূল্যের আট গুণ নয়, বরং খুব বেশী হলে চার কিংবা পাঁচ গুণ। সুতরাং, শ্রমিক-প্রতি বিনিয়োগ করা স্থির পুঁজির অংশ পূর্বের তুলনায় আট গুণ বেশী নয়, বরং চার কিংবা পাঁচ গুণ মাত্র। মুনাফার হার পড়ে যাওয়ার গতিবেগ হ্রাসের আরো অন্যান্য কারণও আছে।

এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মুনাফার হারের ক্ষেত্রে হ্রাস-প্রাপ্তির অর্থ মুনাফার পরিমাণের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে নিংড়ে নেয়া উদ্বৃত্ত-মূল্যের পূর্ণ পরিমাণের ক্ষেত্রে হ্রাসপ্রাপ্তি নয়। বিপরীত পক্ষে, পুঁজি অব্যাহত ভাবে বাড়তে থাকার কারণে, শোষিত শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়তে থাকার আর শোষণের মাত্রা বৃহত্তর হতে থাকার কারণে, পুঁজিবাদী মুনাফার পরিমাণ অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে।

যাই হোক, নিম্ন মুনাফার হারের দিকে ঝোঁক তবুও বজায় থাকে এবং পুঁজিবাদের সামগ্রিক বিকাশের উপর এক শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে। মুনাফার হারের ক্ষেত্রে হ্রাসপ্রাপ্তির এই ঝোঁক **পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব সমূহকে বিপুলভাবে বৃদ্ধি করে**। শ্রমিকদের উপর শোষণ বাড়িয়ে দিয়েই মুনাফার হারের ক্ষেত্রে ক্ষয়-ক্ষতিটা পুঁজিপতিরা পূরণ করার চেষ্টা করে, যার ফলাফল হিসেবে দেখা দেয় সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে বেশ কতকগুলি দ্বন্দ্ব। মুনাফার হারের ক্ষেত্রে হ্রাস পুঁজিবাদী শিবিরের অভ্যন্তরে সংগ্রামকে তীব্র করে তুলে। মুনাফার হারের হ্রাসপ্রাপ্তির এই ঝোঁক থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য পুঁজিপতিরা পশ্চাদ্‌পদ দেশ সমূহে শিল্প-স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে উন্নত শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলোর তুলনায় শ্রমিক সস্তা, শোষণের হার উচ্চ এবং পুঁজির আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতি নিম্ন। অধিকন্তু, চড়া দাম বজায় রাখার জন্যে, এভাবে তাদের মুনাফা বাড়াবার জন্যে এবং মুনাফার হার যাতে না পড়ে সে উদ্দেশ্যে পুঁজিপতিরা বিভিন্ন ধরণের সংঘ বা সমিতিতে (ট্রাস্ট, কার্টেল ইত্যাদিতে) মিলিত হয়।

সংকটের সময়, যখন পুঁজিবাদের সমস্ত দ্বন্দ্ব সবচেয়ে তীব্র হয়ে ওঠে, তখন মুনাফার হার পড়ে যাওয়ার ঝোঁকের দরুণ সৃষ্ট দ্বন্দ্ব সমূহ স্পষ্টতঃ প্রকট হয়ে ওঠে।

বণিক পুঁজি ও তার আয়

আমরা পূর্বেই বলেছি, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে জিনিসপত্র আও ব্যবহারের জন্যে উৎপাদিত হয় না, বরং বিক্রয়ের জন্যেই উৎপাদিত হয়। সুতরাং পণ্য-সামগ্রী উৎপাদিত হয়ে গেলেই শিল্প-উদ্যোক্তার ঝামেলা শেষ হয়ে যায় না ; সেগুলো বিক্রী করার কাজটা বাকী থাকে। নিজের পুঁজিকে পুনরায় মুদ্রায় পরিণত করার জন্যে পুঁজিপতিকে তার উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী বিক্রী করতে হবে।

উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদনকারী পণ্যের খরিদ্দারের আসার জন্যে অপেক্ষা করে না। নিয়মানুযায়ী, প্রস্তুতকারক **মধ্যবর্তী বণিকের** (মধ্যস্থ কারবারী) নিকট তার পণ্যদ্রব্য বিক্রী করে এবং শেষোক্ত জন ভোক্তার কাছে পণ্য-সামগ্রী পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে, ভোক্তার নিকট সেগুলো বিক্রী করা হয়।

প্রত্যেকেই জানেন যে, ব্যবসা করতে গেলে পুঁজির দরকার। সঙ্গতি না থাকলে ক্রেতার নিকট তথা পণ্য ভোগকারীর নিকট পৌঁছে দেয়ার কাজটি বণিক করতে পারে না। যদি শিল্পপতিকে নিজে থেকে তার পণ্যদ্রব্য বিক্রী করার কাজটা করতে হয় তাহলে তাকে দোকান, কেরানী-কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদির জন্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি ব্যয় করতে হবে। সে কারণে, শিল্পপতি বণিককে মুনাফার একটা অংশ দিয়ে এটা দেখাশোনার ভার তার উপর ছেড়ে দেয়।

সুতরাং বণিক পুঁজির [commercial capital] মুনাফাটা হলো উদ্বৃত্ত-মূল্যের সেই অংশ যা শিল্পপতি ব্যবসায়ীকে ছেড়ে দেয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পুঁজি খাটানোর কারণে,

বণিকেরও তার পুঁজির উপর প্রচলিত হারের মুনাফা লাভ করা চাই। তার মুনাফা যদি গড়পড়তা হারের চেয়ে কম হয় তাহলে বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া তার জন্যে লাভজনক হবে না এবং বণিক তার পুঁজি শিল্পে স্থানান্তরিত করবে।

বণিক শুধু পুঁজিবাদী কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরীতে উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রীর মধ্যবর্তী কারবারী হিসেবে কাজ করে না, বরং কৃষক, কারিকর ও হস্তশিল্পীদের কাছ থেকেও পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করে।

ধরা যাক, কোন পল্লীতে তালাচাবি তৈরীর ব্যবসাটি বহুকাল যাবৎ সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। হস্তশিল্পীদের নিজেদের পক্ষে তাদের তৈরী পণ্যের বাজার খুঁজে বের করা মুশকিল; তাদের নিকটবর্তী অঞ্চলে ইতিমধ্যেই তালার যথেষ্ট সরবরাহ রয়েছে। কোন খরিদ্দার এসে একসঙ্গে অনেকগুলো তালা কেনে, দেশের অন্য এক অঞ্চলে সেগুলো নিয়ে যায়, যেখানে সে সুবিধামতো দরে সেগুলো বিক্রী করে। তালাগুলি বিক্রী করে খরিদ্দার সেগুলোর মুল্যটা পায়, কিন্তু হস্তশিল্পীদের কাছ থেকে যে দামে সে তালাগুলি কিনেছিল তা ছিল অনেক কম। বিক্রয় মূল্য ও ক্রয় মূল্যের মধ্যেকার পার্থক্যের একটা অংশ বিভিন্ন ধরণের খরচ মেটাতে যায়, যেমন প্যাকিং, পরিবহন ইত্যাদি। বাকী যা থাকলো তা হলো মুনাফা, ব্যবসা থেকে পাওয়া তার লাভ। সুতরাং, বণিক পুঁজি ক্ষুদে স্বাধীন পণ্য-উৎপাদকদের শোষণ করে, ক্রমান্বয়ে তাদের রূপান্তরিত করে শ্রমিকে, যারা নিজ গৃহে বসে কাজ করে।

বাণিজ্যের বিভিন্ন রূপ, ফাট্‌কাবাজী

আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে কেবলমাত্র ভোগের জিনিসপত্র নিয়েই যে কেবল ব্যবসা চলে তা নয়। বিপরীত পক্ষে বাণিজ্যের লেন-দেনের একটা বিপুল অংশই চলে আরো অধিক উৎপাদন বা পরিবহনের জন্যে দরকারী পণ্য-সামগ্রী নিয়ে।

একটি কাপড়ের কল কেনে তুলা, কয়লা, যন্ত্রপাতি, তাঁত, রং ইত্যাদি। একটি যন্ত্রপাতি-তৈরীর কারখানা কেনে কয়লা, লোহা ও যন্ত্রপাতি। রেল পরিবহন শিল্প কেনে বিপুল পরিমাণে লোহার রেল, টানা, বগী, ইঞ্জিন ইত্যাদি।

পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যেও পার্থক্য নিরূপণ করা দরকার। প্রস্তুতকারক সাধারণতঃ তার উৎপন্ন-দ্রব্য পাইকারী বিক্রেতার নিকট বিক্রী করে। পাইকারী বিক্রেতা সে পণ্যগুলি পুনরায় বিক্রী করে ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের নিকট, যারা পালাক্রমে সেগুলো খুচরা বিক্রী করে ভোক্তার কাছে।

পুঁজিবাদী দেশসমূহে ব্যবসা সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থার গঠন-কাঠামো অত্যন্ত জটিল। বড় বড় লেন-দেনগুলো ঘটে 'সংগঠিত পাইকারী পণ্য-বাজার সমূহে' [produce exchanges – যেমন, লণ্ডনের চায়ের বাজার, নারায়ণগঞ্জের পাটের বাজার, বোম্বাইয়ের তুলার বাজার –অনুঃ]। কতকগুলি পণ্য বহু হাত ঘুরেই কেবল চূড়ান্ত ভোক্তার হাতে এসে পৌঁছায়। এসব লেনদেন এবং বিক্রয়-পুনঃ বিক্রয়ে যারা অংশ নেয় তারা প্রায়শঃই পণ্যগুলি চোখেই দেখে না ঃ সাধারণতঃ ঐসব পণ্যের মালগুদামের রশিদগুলোই কেবল বিক্রয় হয়, যা পণ্যগুলির অস্তিত্বই কেবল প্রমাণ করে এবং সেগুলো সরবরাহ নেয়ার অধিকারই প্রদান করে। এটা সুস্পষ্ট যে, সব পণ্যের ক্ষেত্রে বেচা-কেনা এভাবে করা যায় না ; তার জন্য পণ্যগুলি যথার্থভাবেই একই রকম হতে হবে, তাদের গুণাগুণ সহজেই প্রতিপাদন করা ও অনুরূপ মালগুদামের দলিল-পত্রে তার উল্লেখ থাকতে হবে।

প্রায়ই, ভোক্তার নিকট বিক্রী করার উদ্দেশ্যেই যে বণিক 'সংগঠিত পাইকারী পণ্য বাজার' থেকে পণ্য-সামগ্রী কেনে থাকে তা নয়, বরং তা এই কারণে যে, তারা বাজার দরের

একটা বৃদ্ধি আশা করে যাতে এসব জিনিস পুনরায় বিক্রী করে মুনাফা আদায় করা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে, বেশ কতকগুলো কারণের উপর নির্ভর করে বাজারে দাম ওঠা-নামা করে যা পূর্ব থেকে অনুমান করা কঠিন বা একান্তই অসম্ভব। ধরা যাক, গ্রীষ্মের শুরুতে ফসল ভাল হবে বলে আশা করা গেল এবং ফসলের দাম পড়ে গেল ; পরে যদি হঠাৎ দেখা যায় যে যেমন আশা করা গিয়েছিল ফসল তার চেয়ে খারাপ হবে তাহলে সাধারণতঃ শস্যের দামের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এক হঠাৎ-বৃদ্ধি ঘটবে।

এরূপ ঘটনা ফাটকাবাজির সুযোগ সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদী বাণিজ্যের সমগ্র প্রকৃতির সাথেই ফাটকাবাজি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ফাটকাবাজের ভাগে যে লাভটা জোটে তা হলো যেসব পণ্য নিয়ে ফাটকাবাজি চলছে সেগুলোর উৎপাদনে অথবা ব্যবসায় জড়িত শত সহস্র লোকের লোকসান।

ঋণ পুঁজি ও ঋণ

পুঁজিবাদী সমাজে কেবল যে শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিক পুঁজিপতিরা অনুপার্জিত আয় ভোগ করে তা নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অব্যাহতভাবে বৃদ্ধিমান বেশ কিছু পরজীবীও বাড়তে থাকে, যারা কোন রকম কাজ না করেই বিপুল আয়ের মালিক হয়, নিছক তা এই কারণে যে তারা হলো বিপুল পরিমাণ পুঁজির মালিক, বিপুল সংখ্যক মুদ্রার অধিকারী।

এসব পুঁজিপতিদের মুদ্রা কিভাবে বৃদ্ধি পায় ?

মুদ্রা-রূপ পুঁজির মালিকরা সাধারণতঃ তাদের মুদ্রা জমা রাখে **ব্যাংকে**। ব্যাংক ঐ আমানতের উপর নির্দিষ্ট হারে **সুদ** প্রদান করে। কিন্তু ব্যাংক যে এই সুদ দেয় তার উপায়টা কি ? সোনা বা হুণ্ডির রূপে ব্যাংকের সিন্দুকে যে টাকা পড়ে থাকে তা তো নিজে থেকে বাড়ে না।

পুঁজি বাড়ানোর কেবল একটি উৎসই পুঁজিবাদের জানা আছে ; এই উৎস হলো উৎপাদন ঃ কল-কারখানা, ফ্যাক্টরী, খনি, কৃষি-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে উৎপাদন।

সুতরাং ব্যাংকে যে টাকা আমানত হিসেবে জমা থাকে সেই টাকাকে আধুনিক ব্যাংক লুকিয়ে রাখে না কিংবা ধরে রাখে না। আমানতকারীদের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণের মতো যথেষ্ট টাকাই তারা সিন্দুকে রেখে দেয়। অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, সাধারণ সময়ে আমানতকারীদের এক ক্ষুদ্র অংশই প্রতি দিন তাদের টাকা ফেরৎ চায়। যে পরিমাণ টাকা তারা তুলে নেয় তা সাধারণতঃ নতুন পাওয়া জামানত-রূপ জমা দ্বারা পূরণ করা যায়। অবশ্য, কোন অস্বাভাবিক ঘটনার সময়, যেমন সংকট, যুদ্ধ ইত্যাদির সময় বিষয়টা ভিন্ন রকম হয়ে দাঁড়ায়। তখন তাবৎ আমানতকারীই অকস্মাৎ এক যোগে টাকা ফেরৎ চায়। যদি ব্যাংক এই আক্রমণের ব্যাপারে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ না করে এবং অন্যান্য ব্যাংক, সরকার ইত্যাদির কাছ থেকে ধার করার মাধ্যমে তার সিন্দুকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা যোগাড় করে না রাখে, এবং যদি সে ব্যাংকে থেকে টাকা তোলার এই "হিড়িক" কমাতে সফল না হয়, তাহলে সে 'ফেল' মারে। এর অর্থ হলো এই যে, সে আমানতকারীর পাওনা পরিশোধে অক্ষম বলে নিজেকে ঘোষণা করে। ব্যাংকের দেউলিয়া হয়ে পড়ার অর্থ হলো বহু-পুঁজিপতির সর্বনাশ, পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী ইত্যাদির সঞ্চয়ের বিলোপ। সুতরাং ব্যাংকের দেউলিয়া হয়ে পড়া এভাবে কেবল সংকটকে গভীরতর করে।

কিন্তু, সাধারণ অবস্থায়, সিন্দুকে তুলনামূলকভাবে কম টাকা রেখেও যেসব আমানতকারী টাকা তুলতে ইচ্ছুক সেসব সকল আমানতকারীর দাবী পূরণ করতে ব্যাংক সক্ষম। বাকী টাকাটা ব্যাংক যাদের টাকার দরকার তেমনি পুঁজিপতিদের ধার দেয়।

কেন পুঁজিপতির টাকার দরকার হয় তা আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি। পুঁজি হিসেবে ব্যবহারের জন্য, উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের জন্য তার টাকার দরকার হয়। স্থায়ীভাবে নয়, বরং কেবল এক নির্দিষ্ট সময়কালের জন্যেই যে টাকা পাওয়া যায় তাতে কিছু যায় আসে না। তার পণ্য-সামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের বিভিন্ন সময়ে সে বিভিন্ন পরিমাণ টাকা আদায় করে। এভাবে প্রাপ্ত টাকা থেকে পুঁজিপতি ব্যাংক ঋণ শোধ করতে পারে। এটাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, উন্নত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যাংকসমূহ পুঁজিপতিদেরকে শুধু যে কম-বেশী স্বল্প-মেয়াদী ঋণই মঞ্জুর করে তা নয়, বরং অত্যন্ত দীর্ঘ সময়ের জন্য শিল্পক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ টাকাও বিনিয়োগ করে থাকে।

শিল্প-পুঁজিপতিরা ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত মুদ্রাকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে। ঋণ না পেলে যে পরিমাণ উৎপাদন সে বাড়াতে পারতো এই পুঁজির সাহায্যে সে তার চেয়ে অনেক বেশী উৎপাদন বাড়াতে পারে। ঋণ-পুঁজির পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য এই বাস্তব ঘটনার মধ্যে নিহিত যে, যে পুঁজিপতি এর মালিক, তার দ্বারা তা উৎপাদনে বিনিয়োজিত হয় না, বরং তা বিনিয়োজিত হয় অন্যের দ্বারা। ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণকে নিজ প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করে ঋণ-লাভকারী শিল্প-পুঁজিপতি আরো অধিক শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে ঃ সে কারণে আরো অধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য পেতে পারে। ব্যাংক তাকে পুঁজি ব্যবহার করতে দিয়েছে বলে শিল্প-পুঁজিপতিকে তার **উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটা অংশ** ব্যাংককে দিতে হয়। যদি সে ১০০০ ডলার ঋণ করে এবং বৎসরান্তে তাকে দিতে হয় ১০৭০ ডলার, তাহলে এটা বলা হয়ে থাকে যে, প্রদত্ত ঋণের উপর ব্যাংক শতকরা ৭ ভাগ হারে সুদ নিল।

যে কেউই বুঝতে পারেন যে, এই লেনদেন অন্য যেকোন সাধারণ ব্যবসায়িক লেন-দেনের একান্তই অনুরূপ। যদি একজন বণিক ৫০ ডলারে একটি ঘোড়া কিনে ৭০ ডলারে বিক্রী করে, তাহলে সে মুনাফা করে ২০ ডলার। একমাত্র পার্থক্য হলো এই যে, ব্যাংক যে পণ্য নিয়ে কারবার করলো তা একটি ঘোড়া নয়, কিংবা সাধারণ কোন পণ্য নয়, তা হলো খুবই বিশেষ ধরনের পণ্য। এই পণ্যটা কি তা আমরা পূর্বেই দেখেছি ঃ ১০০ ডলার পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। ব্যাংক করে পুঁজির ব্যবসা ; ব্যাংক হলো এমন **এক বণিক যে পুঁজির কারবার করে।**

সুদের হার

এভাবে পুঁজি রূপান্তরিত হয় পণ্যে যার সাহায্যে বিভিন্ন ভাবে লেন-দেন চলে। এসব লেন-দেনের মধ্য দিয়ে **পুঁজির দাম** নির্ধারিত হয়। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে ১০০ ডলার মূল্যের পুঁজির এক বৎসরের জন্যে শিল্পপতিকে দিতে হয়েছিল ৭০ ডলার দাম। পুঁজির ব্যবসায়ী ব্যাংককে এই দাম দিয়েছিল শিল্পের উদ্যোক্তা। পালাক্রমে এই পুঁজিকে এক বছরের জন্য ব্যবহারের অধিকার লাভ করে ব্যাংক পুঁজি মালিকদের দিয়েছিল ৫০ ডলার।

এখন প্রশ্ন হলো, পুঁজির দামটা কিসের উপর নির্ভর করে, পুঁজির জন্যে যে সুদ দেয়া হয় সেই **সুদের হার** কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

সুদের এই হার প্রায়ই বদলে যায়। পুঁজিপতিরা প্রায়ই বলে ঃ টাকা এখন সস্তা, কিংবা টাকা এখন মহার্ঘ। প্রথম ক্ষেত্রে কথাটার অর্থ হলো, কম সুদের হারে টাকা ঋণ পাওয়া যায়; বিপরীতপক্ষে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো, ঋণের উপর চড়া হারে সুদ দিতে হবে। প্রতিটি বাণিজ্যিক লেন-দেনের মতোই, এ ক্ষেত্রেও দাম শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের দ্বারা। যদি এক নির্দিষ্ট মাসে বহুসংখ্যক পুঁজিপতিরই অতিরিক্ত টাকার দরকার হয় এবং যেকোন দামেই তারা তা যোগাড় করতে চায়, তাহলে ঋণের জন্যে টাকার চাহিদা হলো অনেক। এখন দেখা যায়, এই দামটা কি পরিমাণে বাড়তে পারে।

আমাদের দৃষ্টান্তে, শিল্প-পুঁজিপতি এক বৎসর সময় ধরে ১০০ ডলার পরিমাণ পুঁজি ব্যবহারের জন্যে ব্যাংককে দিয়েছিল ৭০ ডলার। এই লেন-দেনটা তার নিকট সুবিধাজনক হয়েছিল কেন ? কারণ, তার প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগকৃত পুঁজির উপর সে খুব সম্ভবতঃ শতকরা ১৫-১৬ ভাগ মুনাফা করেছে। এর অর্থ হলো এই যে, বিনিয়োগকৃত প্রতি ১০০০ ডলারের উপর শিল্পপতি ১৫০-১৬০ ডলার মুনাফা করেছে। ব্যাংককে ৭০ ডলার দেয়ার পরও তার কাছে ৮০-৯০ ডলার ছিল। শিল্পে লব্ধ মুনাফার হার এবং ব্যাংককে পরিশোধ করা সুদের হারের মধ্যে এই হলো পার্থক্য।

ঋণের চাহিদার কারণে সুদের হার বেড়ে গেলেও তার অবশ্যই একটা সীমা আছে। ব্যাংক ৭০ ডলারের বদলে ৮০-৯০ ডলার দাবী করতে পারে। শিল্পপতির পক্ষে ঋণ নেয়াটা সুবিধাজনকই হবে। কিন্তু ব্যাংক যদি ১৫০-১৬০ ডলার দাবী করে তাহলে সে প্রত্যাখান করবে। কারণ এসব শর্তে তার কোন মুনাফা হবে না, কেবল ঝামেলাই বাড়বে।

সুতরাং সুদের হারের বৃদ্ধির সীমা উদ্যোক্তার গড়পড়তা সুদের হারের দ্বারা নির্দিষ্ট। তা সাধারণতঃ গড়পড়তা মুনাফার হারের চেয়ে বেশ পরিমাণে কম। খুব বিরল ক্ষেত্রেই (সংকটের সময়) তা সে সীমায় পৌঁছায়। অপর পক্ষে চাহিদার তুলনায় টাকার যোগান বেশী হলে সে টাকা ব্যবহারের জন্যে যে হারে সুদ দিতে হয় তা কমবে।

কতকগুলি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, এক্ষেত্রে সুদের হার অত্যন্ত কমে যেতে পারে যদিও কেউই অবশ্য মাগনা ধার দেয় না।

নিরীক্ষামূলক প্রশ্নাবলী

১। শিল্পের বিভিন্ন শাখায় পুঁজির আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ?
২। সুদের হার কিভাবে সমতা লাভ করে ?
৩। উৎপাদনের দাম কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয় ?
৪। উৎপাদন-দামে পণ্যের বিক্রয় কি মূল্য-সম্পর্কিত মার্কস-এর শিক্ষাবলীকে বিরোধিতা করে ?
৫। মুনাফার হারের ক্ষেত্রে পড়তির ঝোঁকগুলির কারণ কি কি ?
৬। বণিক পুঁজিপতিদের মুনাফা কোথা থেকে আসে ?
৭। ব্যাংক কিভাবে পুঁজির ব্যবসা করে ?

সপ্তম অধ্যায়

কৃষিতে পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ না করা পর্যন্ত আধুনিক শিল্প বলে কিছু ছিল না। ছিল না হাজার হাজার শ্রমিক নিয়োগকারী ধাতু পরিশোধন শিল্প, ছিল না খনিজ তেল উত্তোলন করার যন্ত্র, ছিল না শত সহস্র গুঞ্জনরত মাকু ও তাঁত সহ কোন কাপড়ের কল। পুঁজিবাদের আবির্ভাবের পূর্বে ছিল না কোন রেল পথ কিংবা বাষ্পীয় জাহাজও। পুঁজিবাদই বৃহদায়তন শিল্প সৃষ্টি করেছে ঃ বৃহদায়তন শিল্পের পূর্বে তার স্থানে ছিল কেবল কারিকর ও হস্তশিল্পীরা।

কৃষির ব্যাপারটা ছিল অন্য রকমের। পুঁজিবাদের আবির্ভাবের অনেক অনেক পূর্বে মানুষ ভূমি চাষাবাদ করতো, গবাদী পশু পালন করতো, মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় জীবজন্তু লালন-পালন করতো ও উদ্ভিদাদি লাগাতো। পুঁজিবাদের যখন আবির্ভাব ঘটলো কৃষি তখন সামন্ততান্ত্রিক অবস্থার মধ্যে। পুঁজিবাদের বিকাশ দ্রুতগতিতে কৃষির প্রধান অবলম্বনগুলিকে ধ্বংস করতে শুরু করলো ; কিন্তু, তা সত্ত্বেও, বহু দেশেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশেষ সমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হলো এবং এমনকি পুঁজিবাদের বিজয় লাভের পরেও টিকে রইলো। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবশেষ [survival] হলো ভূস্বামীদের হাতে, সাধারণভাবে ব্যক্তি-মালিকদের হাতে জমির মালিকানা অব্যাহত থাকা।

পুঁজিবাদ কৃষি থেকে শিল্পকে আলাদা করেছে। পুঁজিবাদ শহর ও গ্রামের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেছে, শিল্প ও কৃষির মধ্যেকার পরস্পর-বিরোধিতা [antithesis] সৃষ্টি করেছে ও অব্যাহতভাবে গভীরতর করেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিকাশ সাথে করে নিয়ে এসেছে প্রযুক্তিগত উন্নতির দ্রুত বৃদ্ধি ; প্রতি দশকে, কোন কোন সময় প্রতি বছরে, উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি, নতুন অগ্রগতি, নতুন যন্ত্রপাতি দেখা দেয়। এমনকি সবচেয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে শিল্পের প্রচণ্ড অগ্রগতির পেছনেই পড়ে থাকে কৃষি। পূর্বতন স্বাভাবিক অর্থনীতির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্য থেকে কৃষিকে টেনে বের করে এবং ভূমিদাসত্বের বন্ধন থেকে তাকে মুক্ত করলেও পুঁজিবাদ একই সাথে নিয়ে আসে গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক জনসাধারণের উপর শোষণের ক্রমবর্ধমান নিপীড়ন, তাদেরকে নিক্ষেপ করে অজ্ঞতা, পশ্চাদ্‌মুখীনতা ও দারিদ্রের কবলে। এমনকি সবচেয়ে উন্নত দেশ-সমূহেও গ্রাম্য জনসংখ্যর কোটি কোটি মানুষ কৃষকরা নগর সভ্যতা থেকে থাকে বিচ্ছিন্ন, বাস করে অজ্ঞতা ও পশ্চাদ্‌মুখীনতার এক অবস্থার মধ্যে।

শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধি ও কৃষির চূড়ান্ত পশ্চাদ্‌পদতা – এটাই হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যতম এক গভীরতম দ্বন্দ্ব, যা জন্ম দেয় সমস্ত ধরণের তোলপাড় ও সংকটের, আর পূর্বাভাস প্রদান করে ও প্রস্তুত করে পুঁজিবাদের অনিবার্য পতন।

"কৃষির বিকাশ শিল্পের বিকাশের পেছনে পড়ে থাকে – সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই এটা হচ্ছে এক অন্তর্নিহিত ঘটনা এবং তা-ই হলো জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার অনুপাতকে উলট-পালট করে দেয়ার, সংকট ও চড়া দামের সবচেয়ে গভীর কারণগুলির অন্যতম।

"পুঁজিবাদ কৃষিকে সামন্ততন্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে, টেনে এনেছে বাণিজ্যিক ঘূর্ণিস্রোতের মধ্যে আর এর সাথে সাথে বিশ্বের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে ; বন্ধ্যাত্ব, মধ্য-যুগের বর্বরতা আর পিতৃতান্ত্রিকতা থেকে কৃষিকে তা টেনে-হিচড়ে বের করেছে। তা সত্ত্বেও, পুঁজিবাদ জনগণের উপর নিপীড়ন, শোষণ ও তাদের দারিদ্র্যকে কেবল যে বিদূরিত করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই নয়, বরং, বিপরীত পক্ষে, পুঁজিবাদ এসব দুর্দশাকে নতুন রূপে সৃষ্টি করেছে এবং দুর্দশার পুরানো রূপগুলিকে 'আধুনিক' ভিত্তির উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। শিল্প ও কৃষির মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে পুঁজিবাদ দূর তো করেই না, বরং বিপরীত পক্ষে, এই দ্বন্দ্ব অধিকতর মাত্রায় ব্যাপক ও তীব্রতর হয়ে ওঠে। প্রধানতঃ বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রে পুঁজির যে চাপ প্রধানতঃ বাড়তে থাকে তা আরো গভীর মাত্রায় পড়তে থাকে কৃষির ওপর।" [লেনিন ঃ "কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশের নিয়মাবলীর উপর নতুন তথ্য"]

ভূমি-খাজনা

কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদনের জন্যে প্রাথমিকভাবে দরকারী হলো জমি। সকল পুঁজিবাদী দেশেই জমি হলো স্বতন্ত্র ভূমি-মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এসব দেশের প্রায় সবগুলিতেই সুবিপুল পরিমাণ জমি রয়েছে ভূস্বামীদের [Landlord] হাতে, বিরাট বিরাট জমির মালিকদের হাতে – যারা নিজেরা জমি চাষ করে না, বরং খাজনা-শর্তে জমি বিলি করে দেয়। ভূমিদাসত্বের যুগ থেকেই ভূস্বামীরা তাদের বড় বড় জমিদারী বজায় রেখেছে। আগের মতোই তারা এখনো অন্যের শ্রমে উৎপন্ন জিনিসের সারাংশ আত্মসাৎ করেই বেঁচে আছে। যে রূপে তারা কৃষকদের শোষণ করে, যে রূপে নিজেদের আয়কে নিংড়ে বের করে, সেই রূপই নিছক বদলেছে। কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নেই জমি জাতীয়করণ করা হয়েছে অর্থাৎ ভূস্বামীদের এবং অন্যান্য সকল ব্যক্তি-মালিকদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হয়েছে, এবং জমির মালিকানা ন্যস্ত করা হয়েছে সর্বহারা রাষ্ট্রের হাতে, যে রাষ্ট্র এই জমির একাংশ মেহনতী কৃষকদের কাছে হস্তান্তরিত করেছে, বিনা খাজনায় সমস্ত মেহনতী কৃষকদের জমি প্রদান করেছে, এবং অপরাংশ বৃহদায়তন রাষ্ট্রীয় কৃষি-খামার সংগঠনের জন্যে ব্যবহার করেছে, যে খামারগুলি শ্রমিকদের জন্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে এবং যেসব রাষ্ট্রীয় শিল্প এই একই শ্রমিকদের সেবা করে সেই শিল্পগুলোর চাহিদা পূরণের জন্যে দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জমির মালিক খাজনা [rent] নেয়। যে ব্যক্তি কৃষি কাজে নিযুক্ত হতে চায় এবং তার জন্যে প্রয়োজনীয় পুঁজি তার রয়েছে, সে ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম যার জমি আছে তার কাছ থেকে নির্দিষ্ট খাজনায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এক খণ্ড জমি ইজারা নিতে হবে। যাদের জমির দরকার তাদের কাছ থেকে জমির মালিক তার মালিকানা স্বত্বের বলে কর আদায় করে। জমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত এই করকে বলে ভূমি-খাজনা।

পার্থক্যমূলক [differential] খাজনা ও চূড়ান্ত [absolute] খাজনার মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার করা দরকার। প্রথমতঃ, পার্থক্যমূলক-খাজনার কথা ধরা যাক। আমরা জানি যে, শিল্পের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য ও তাদের উৎপাদন-খরচ নির্ধারিত হয় উৎপাদনের গড়পড়তা অবস্থা দ্বারা। কৃষির ক্ষেত্রে তা হয় না। জমির আয়তন সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে দরকার মতো তা বাড়ানো যায় না। বিভিন্ন খণ্ড জমির উর্বরতা একই রকম নয়। বড় বড় শহর, নদী, সমুদ্র বা রেল পথের থেকে জমির দূরত্বটাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। একই পুঁজি খরচ করে উর্বরা জমি থেকে অধিকতর ভাল ফসল পাওয়া যায়। জমি যখন বিচ্ছিন্ন স্থানে অবস্থিত থাকে তখন উৎপাদিত ফসল পরিবহন করতে যে খরচ দরকার হয়, সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত জমি সে খরচ থেকে চাষীদের রক্ষা করে। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন-খরচ নির্ধারিত হয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমিতে উৎপাদনের অবস্থা দ্বারা, অন্যথায় পুঁজিবাদী উদ্যোক্তারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমি চাষাবাদ না করে, তাদের পুঁজিকে শিল্পে স্থানান্তর করতো। কিন্তু বিষয়টি যদি তাই হয় তাহলে অধিক ভাল জমিতে যারা পুঁজি খাটায় তাদের অতিরিক্ত আয় হয়। এই আয়টা পায় কে ? এটা স্পষ্ট যে, এটা জমির মালিকের হাতেই যায়।

কিন্তু এই পার্থক্যমূলক-খাজনা ছাড়াও জমি মালিক চূড়ান্ত খাজনাও পেয়ে থাকে। জমি হলো ব্যক্তি-মালিকদের একচেটে সম্পত্তি। জমির এই একচেটে মালিকানা শিল্প থেকে কৃষিতে পুঁজির অবাধ গতিকে বাধা দেয়। জমিতে চাষ করতে গেলে, জমির মালিকের অনুমতি নিতেই হবে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে শিল্পের চেয়ে কৃষি রয়েছে নিম্নতর স্তরে। সুতরাং কৃষির ক্ষেত্রে পুঁজির আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতি (organic composition) শিল্পের চেয়ে কম। এর অর্থ হলো এই যে, একই পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করে শিল্পের চেয়ে কৃষিতে অধিক উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করা যায়। যদি কৃষি ও শিল্পের মধ্যে পুঁজির অবাধ চলাচল থাকতো, তাহলে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে মুনাফার হার সমতা অর্জন করতো। কিন্তু জমির উপর ব্যক্তি-মালিকানা থাকার কারণে সেরূপ স্বাধীনতা বিরাজ করে না। সে কারণে কৃষি-জাত উৎপন্ন-দ্রব্য উৎপাদন-খরচের চেয়ে বেশী দামে বিক্রি হয়। এভাবে যে অতিরিক্ত আয় হয় তা যায় জমির মালিকের পকেটে এবং তাকে বলা হয় ভূমি-খাজনা। মার্কস বলেছেন যে, চূড়ান্ত ভূমি-খাজনা হলো জমির মালিককে দেওয়া কর।

যে অবস্থাসমূহের কারণে পার্থক্যমূলক ও চূড়ান্ত খাজনার উৎপত্তি হয় লেনিন নিম্নোক্তভাবে তার এক সংক্ষিপ্ত চরিত্র চিত্রন করেছেন ঃ

"..... প্রথমতঃ আমরা দেখি জমির ব্যবহারের (পুঁজিবাদী) একচেটে অধিকার। এই একচেটেপনার উৎস হলো জমির পরিমাণের সীমাবদ্ধতা, আর সে কারণে যেকোন পুঁজিবাদী সমাজে তা অবশ্যম্ভাবী। এই একচেটেপনার ফলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জমিতে উৎপাদনের অবস্থাসমূহ দ্বারা শস্যের দাম নির্ধারিত হয় ; সর্বোৎকৃষ্ট জমিতে পুঁজি বিনিয়োগের দ্বারা অথবা পুঁজির আরো উৎপাদনশীল বিনিয়োগের দ্বারা যে উদ্বৃত্ত মুনাফা পাওয়া যায় তাই হলো পার্থক্যমূলক-খাজনা। জমির উপর ব্যক্তি-মালিকানা থাকুক আর নাই থাকুক এই পার্থক্যমূলক-খাজনার উৎপত্তি ঘটেই, যা জমির মালিককে কৃষকদের কাছ থেকে তা আদায় করায় নিছক সমর্থ করে তুলে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখতে পাই, জমির উপর ব্যক্তি-সম্পত্তির একচেটেপনা। যৌক্তিক বা ঐতিহাসিক – কোন দিক দিয়েই পূর্বতন একচেটেপনার সাথে এই একচেটেপনা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত নয়।

"এই ধরণের একচেটেপনা পুঁজিবাদী সমাজের জন্যে এবং কৃষির পুঁজিবাদী সংগঠনের জন্যে জরুরী নয়। একদিকে, জমির উপর কোন ব্যক্তি-মালিকানা ছাড়াই আমরা খুব সহজেই পুঁজিবাদী কৃষিকে কল্পনা করতে পারি, এবং যেসব বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ আগাগোড়া সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন তারা জমির জাতীয়করণ দাবী করেছেন। অপর দিকে, এমনকি বাস্তবেও জমির উপর কোন ব্যক্তি-মালিকানা ছাড়াই কৃষির পুঁজিবাদী সংগঠন আমরা দেখতে পাই, উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্রের ও এজমালি [communal] বলে গণ্য জমিতে। ফলতঃ, এই দুই ধরণের একচেটেপনার মধ্যেকার পার্থক্য টানা চূড়ান্তভাবেই প্রয়োজন, আর ফলতঃ, এটাও স্বীকার করা প্রয়োজন যে, জমিতে ব্যক্তি-মালিকানার দ্বারা সৃষ্ট চূড়ান্ত-খাজনা বিরাজ করে পার্থক্যমূলক-খাজনার পাশাপাশি।" [লেনিন, সঃ রঃ, ৪র্থ খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৯৯-২০০, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউইয়র্ক, ১৯২৯]

ভূমি-খাজনার উৎস

উপরে বর্ণিত খাজনা সম্পর্কিত মার্কসবাদী তত্ত্ব নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞা (বা প্রস্তাবনা - proposition) সমূহ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভূমি-মালিক তার জমি ইজারা দেয়। জমি যে ইজারা নেয় সে হলো একজন পুঁজিপতি, যে মজুরী-শ্রমিক দিয়ে জমি চাষ করায়। এরূপ ক্ষেত্রে ভূমি-মালিকের পকেটে যে ভূমি-খাজনা যায় তার উৎস হৃদয়ঙ্গম করাটা কঠিন নয়। মজুরী-শ্রমিকরা তাদের মজুরী-অপরিশোধিত শ্রম দ্বারা উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে।

এই উদ্বৃত্ত-মূল্যটা প্রথম যায় পুঁজিপতির কাছে যে ইজারা নিয়েছে ; সে এটাকে দুই ভাগে ভাগ করে ঃ এক অংশ সে নিজে রাখে – এটা হলো উদ্যোক্তার মুনাফা, তার বিনিয়োগকৃত পুঁজির মুনাফা, আর অন্য অংশ হলো, নিশ্চিতই এই মুনাফার অতিরিক্ত, ভূমি-মালিককে এটা সে দিতে বাধ্য হয়। উদ্বৃত্ত-মূল্যের এই অংশ খাজনা। এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিনাশ্রমে পাওয়া অন্য যেকোন আয়ের মতোই, চূড়ান্ত ও পার্থক্যমূলক খাজনার কেবল একটিমাত্র উৎসই থাকতে পারে – তা হলো, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রম দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য।

মার্কস বলেছেন ঃ

"সকল ভূমি-খাজনাই হলো উদ্বৃত্ত-মূল্য, উদ্বৃত্ত শ্রমের ফল।

"খাজনার তত্ত্ব ধরে নেয় যে, সমগ্র কৃষিজীবি জনসাধারণ জমিদার, পুঁজিপতি এবং মজুরী শ্রমিকে পরিপূর্ণভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এটা ধনতন্ত্রের আদর্শ হলেও তা কোনক্রমেই বাস্তব সত্য নয়।" ["পুঁজি", ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭৪৩]

বাস্তবতঃ কিন্তু বিষয়টি আরো অধিক জটিল। তৎসত্ত্বেও খাজনার তত্ত্ব এমনকি অধিকতর জটিল পরিস্থিতিতে পূর্ণ শক্তি নিয়ে কার্যকরী থাকে। পুঁজিবাদী সমাজে এটা প্রায়শঃ ঘটে থাকে যে, ভূমি-মালিক তার জমি ইজারা দেয় না, বরং নিজে জমি চাষাবাদ করার জন্য মজুর নিয়োগ করে। তখন সে একই সাথে যেমন ভূমি-মালিক, তেমনি পুঁজিবাদী উদ্যোক্তাও বটে। ভূমি-মালিক হিসেবে সে পায় খাজনা, আর পুঁজিপতি হিসেবে তার বিনিয়োগকৃত পুঁজির উপর সে পায় মুনাফা। এই ক্ষেত্রে খাজনা ও মুনাফা একই ব্যক্তির পকেটে যায়।

প্রায়শঃই ভূমি-মালিকের জমি পুঁজিবাদী উদ্যোক্তার বদলে কৃষকরা ইজারা নেয়, যারা কোন মজুরী-শ্রমিক নিয়োগ না করে নিজেরাই জমি চাষাবাদ করে। জমির দুর্লভতার চাপে পড়ে কৃষকরা অতি হীন শর্তে ভূস্বামীর কাছ থেকে জমি ইজারা নিতে বাধ্য হয়। এই ক্ষেত্রেও এটা স্পষ্ট যে, ভূস্বামী খাজনা পায় পরিশোধ্য টাকার রূপে, শ্রম-খাজনার (ভূস্বামীর জন্যে বেগার পরিশ্রম) রূপে, পরিশোধ্য ফসলের রূপে, যেগুলোর দ্বারা সে কৃষকদের গোলামে পরিণত করে। এক্ষেত্রে যেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টিকারী মজুর-শ্রমিক নেই, সেহেতু খাজনা কোথা থেকে আসে ?

এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, এই ক্ষেত্রে ভূমি-খাজনার উৎস হলো **কৃষক শ্রমের শোষণ**। কৃষকরা তাদের শ্রমের সৃষ্ট উৎপন্ন-দ্রব্যের একাংশ খাজনা হিসেবে ভূস্বামীকে দেয়। ভূস্বামীদের দ্বারা নেয়া এই অংশটা প্রায়শই এত বেশী হয় যে, সবচেয়ে কঠিন ও হাড়ভাঙা কাজ করতে গিয়েও কৃষক আধ-পেটা খেয়ে জীবন ধারণ করতে বাধ্য হয়। সে জন্যেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কৃষকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে মার্কস বলেছেন, **"শিল্প-সর্বহারাশ্রেণীর শোষণ থেকে কৃষকদের শোষণের পার্থক্য হলো কেবল রূপের ক্ষেত্রে।"** ["ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম"]

ভূমির ক্রয়-বিক্রয়

কিন্তু, পুঁজিবাদী দেশসমূহে কৃষকরা প্রায়শই তাদের নিজেদের ভূমি-খণ্ডে কাজ করে। এক্ষেত্রে খাজনার ব্যাপারটি কি দাঁড়ায় ?

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, জমি হলো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। এর ক্রয়-বিক্রয় হয়। পুঁজিবাদী অবস্থায় জমির মালিক হতে হলে কৃষককে জমি কিনতে হয়। দেখা যাক জমির দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়।

নির্দিষ্ট এক ভূমি মালিকের এক খণ্ড জমি আছে যা সে ইজারা দেয়। ইজারাদার তাকে বৎসরে ৫০০০ ডলার খাজনা প্রদান করে। ইজারাদার সমৃদ্ধি অর্জন করে ভূমি-মালিককে অনুরোধ করলো তার জমি-খন্ড বিক্রী করতে। ভূমি-মালিক জমির দাম কত চাইবে ? সে এভাবে হিসাবে করবে। যদি আমি জমিটা বিক্রী না করি তাহলে প্রতি বছর জমি থেকে ৫০০০ ডলার খাজনা পাওয়া যাবে। কোন অবস্থাতেই বিক্রয়ের দ্বারা আমার যেন লোকসান না হয়। কাজেই জমির বাবদ এমন পরিমাণ মুদ্রাই আমাকে পেতে হবে যা ব্যাংকে জমা রাখলে বৎসরে সুদ হিসেবে কমপক্ষে ৫,০০০ ডলার পাওয়া যায়। ধরা যাক, ব্যাংক আমানতকৃত মুদ্রার উপর বৎসরে শতকরা ৪ ডলার হারে সুদ দেয়। তাহলে আমাদের ভূমি-মালিক অতি সহজেই হিসেব করে বের করবে যে, জমি বিক্রয় বাবদ তাকে ১,২৫,০০০ ডলার পেতে হবে, কারণ যদি আমানতের উপর শতকরা ৪ ডলার হিসেবে সুদ প্রদানকারী ব্যাংকে ১,২৫,০০০ ডলার জমা রাখা হয় তাহলে বৎসরে তা থেকে পাওয়া যায় ৫,০০০ ডলার। এক্ষেত্রে জমির দাম হবে ১,২৫,০০০ ডলার।

কখনও কখনও জমির মূল্যের কথা বলা হয়। এটা ভুল। মানব শ্রম দ্বারা যেসব উন্নতি সাধন করা হয়েছে (উদাহরণস্বরূপ, চাষাবাদ যোগ্যতা, জলের কল ও জলসেচ) যদি সেসবের কথা হিসাবের মধ্যে না ধরি, তাহলে কিন্তু স্বীয় দিক থেকে জমির কোন মূল্য নেই বা থাকতে পারে না। জমি মানব-শ্রমের সৃষ্ট কোন বস্তু নয়। তবে, যদিও জমির কোন মূল্য নেই, তথাপি তার দাম থাকতে পারে (এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বদা তা থাকেও)। এ বাস্তব ঘটনা থেকেই এই দামের উৎপত্তি হয়েছে যে, ভূমি-মালিকরা ব্যক্তি-সম্পত্তি হিসেবে জমিকে আত্মসাৎ করেছে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, জমির দাম নির্ধারিত হয় বাৎসরিকভাবে জমি থেকে যে আয় হয় তার দ্বারা। দাম হিসেবে টাকার পরিমাণটি স্থির করা হয় এমন অঙ্কে যা একটি নির্ধারিত সুদের হারে ব্যাংকে জমা রাখলে সম-পরিমাণ আয় পাওয়া যাবে। এভাবে দাম হিসাব করার পদ্ধতিকে বলে **পুঁজিকরণ** (Capitalization)। সে কারণেই মার্কস বলেছেন যে, "জমির দামটা তার পুঁজিকৃত খাজনা ছাড়া আর কিছুই নয়"। ["পুঁজি", ৩য় খণ্ড]। সুতরাং একখণ্ড জমি কিনে কৃষক বহু বছরের খাজনা আগাম পরিশোধ করে দেয়।

ভূমি-খাজনা ও কৃষির পশ্চাদ্‌পদতা

ভূমি-খাজনা হলো এক দুঃসহ বোঝা যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কৃষির উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করে রাখে। কৃষির ক্ষেত্রে যে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদিত হয় তার এক বড় অংশ যায় বড় বড় ভূমি-মালিকদের হাতে, যারা জমির উন্নতি সাধনের জন্যে তা পুনরায় বিনিয়োগ না করে বরং শহরে গিয়ে ব্যয় করে। জমি কিনে নিলেও অবস্থার কোন হেরফের হয় না। কৃষি-উৎপাদকের (চাষীর) পুঁজির বড় অংশটাই চলে যায় জমির দাম শোধ করতে এবং যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম কেনার জন্যে খুব সামান্যই থাকে অবশিষ্ট। ভূমি-খাজনা হচ্ছে এক ধরণের পাম্পের মতো, যা কৃষি থেকে বিপুল সম্পদ পরজীবী ভূস্বামীদের পকেটে পাম্প করে নিয়ে যায়। এভাবে ভূমি-খাজনা কৃষির সুপ্রাচীন পশ্চাদ্‌পদতা ও বর্বরতাকে আরো তীব্র করে তোলে। সুতরাং যে ভূমি-খাজনা হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জমির উপর ব্যক্তি-মালিকানার ফলাফল স্বরূপ, তা শহর ও গ্রামের মধ্যেকার পরস্পর-বিরোধিতাকে বৃদ্ধি করতেই সহায়তা করে।

পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে অত্যন্ত দ্রুত ঘটে **ভূমি খাজনার পরিমাণের বৃদ্ধি।** এটা সহজেই বোঝা যায়। চাষাবাদের আওতাধীন জমির আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ে

চূড়ান্ত খাজনা। কিন্তু, পার্থক্যমূলক খাজনা বাড়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে, কারণ প্রতিখণ্ড নতুন জমির চাষাবাদের আওতাধীনে আনার সাথে সাথে জমির উর্বরতা ও তার অবস্থানের ক্ষেত্রে পার্থক্য, এবং তার সাথে সাথে একই জমিতে পুঁজির বিভিন্নমুখী বিনিয়োগের ফলে উৎপাদন-ক্ষমতার ক্ষেত্রে পার্থক্য বাড়তেই থাকে। বিভিন্নমুখী উন্নয়ন সাধনের (সেচ, সার, রাস্তা তৈরী, গাছ-গাছালির শিকড় উৎপাটন ইত্যাদি) জন্যে বিপুল পরিমাণ শ্রম বিনিয়োগের দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে চষা জমির উর্বরা শক্তিকে বাড়ানো হয় বলে ভূমি-খাজনাও বেশ পরিমাণে বাড়ে। শেষাবধি, এসমস্ত শ্রমের ফল যায় ভূমি মালিকের হাতে।

ভূমি-খাজনার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে জমির দামও অব্যাহতভাবে বাড়ে। বড় বড় শহর ও তাদের পার্শ্ববর্তী শহরতলীগুলোতে যেখানে প্রতি বর্গফুট জমির দাম মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়ে যায় সেখানকার কথা বাদ দিলেও গ্রামাঞ্চলে জমির দামও বেড়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, ১৯০০ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত দশ বছর সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত কৃষি সংক্রান্ত সম্পত্তির মূল্য ২,০০০ কোটি ডলারেও বেশী বেড়েছিল ; এর মধ্যে মাত্র ৫০০ কোটি ডলার বেড়েছিল যন্ত্রপাতি ও ইমারতের মূল্যের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির কারণে, অবশিষ্ট ১,৫০০ কোটি ডলার বেড়েছিল জমির দামের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির কারণে।

পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে তাল রেখে ভূমি-খাজনার পরিমাণের ক্ষেত্রে যে বৃদ্ধি ঘটে তার অর্থ হলো পরগাছা ভূস্বামীদের সমাজ যে কর প্রদান করে সেই করেরই বৃদ্ধি। ভূমি-খাজনার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি কৃষির বিকাশকে আরো অধিক কঠিন করে তোলে, কৃষির পশ্চাদ্‌পদতাকে আরো অধিক দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে এবং শিল্প ও কৃষির মধ্যেকার প্রভেদকে আরো অধিক ব্যাপক করে তোলে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কৃষির বিকাশ কেবলমাত্র ভূমি-খাজনা দ্বারা রুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় না। মুনাফার জন্যে উৎপাদন, সাধারণ পরিকল্পনা-হীনতা এবং পুঁজিবাদী উৎপাদনের নৈরাজ্যের ফলে জমির উর্বরতা শোচনীয়ভাবে বিড়ম্বিত হয়। পুঁজিবাদী সংকটের পর সংকট গোটা অর্থনীতিকে বিপুলভাবে নাড়িয়ে দিয়ে, কৃষির ক্ষেত্রে প্রায়ই সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। পুঁজিবাদী দ্বন্দ্বসমূহের বৃদ্ধি শিল্প ও কৃষি উভয়টিকে গ্রাস করে।

কৃষিতে বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন

পুঁজিবাদ সাথে নিয়ে আসে **ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের উপর বৃহদায়তন উৎপাদনের বিজয়।** বৃহদায়তন উৎপাদনের রয়েছে বিপুল-ব্যাপক সুবিধা। বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যাপক মাত্রায় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। বৃহদায়তন উৎপাদন ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের চেয়ে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বিপুলভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে। পুঁজিবাদী শিল্প এভাবে কারিকর ও হস্তশিল্পীদের ক্রমাগতই হটিয়ে দেয়। পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের মধ্যে এক নিরন্তর সংগ্রাম চলতে থাকে, যার ফলে প্রতি ক্ষেত্রেই অধিকতর বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোর কয়েকটিই বিজয় অর্জন করে।

শিল্পের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের ওপর বৃহদায়তন উৎপাদনের বিজয় তর্কাতীত ব্যাপার। এমনকি পুঁজিবাদের সবচেয়ে উগ্র সমর্থকরাও কদাচিৎ এটা অস্বীকার করে। ক্ষুদে-উৎপাদকদের উপর বড় পুঁজির বিজয়, পুঁজির কেন্দ্রীভূতকরণ ও কেন্দ্রীয়করণের (Concentration and centralization) বিজয়ী অগ্রগতি জাগ্রত করে বিপুল মাত্রায় **শ্রেণী দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি।** সমাজের মধ্যবর্তী অংশগুলো ক্রমান্বয়ে নির্মূল হয়ে যায়,

ক্ষুদে-উৎপাদক, কারিকর, ক্ষুদে ব্যবসায়ী ইত্যাদি লোক নিয়ে গঠিত বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যেকার মধ্যবর্তী স্তরগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী নিষ্পিষ্ট হয়ে যায়, কালে-ভদ্রে এক-আধজন পুঁজিপতি শ্রেণীতে আরোহণ করে আর হাজারে হাজার শ্রমিকশ্রেণীর সারিতে নেমে আসে। দুই বিপরীত শ্রেণী – মুষ্টিমেয় সংখ্যক বুর্জোয়া আর বিপুল সংখ্যক সর্বহারা – ভয়ানক ভাবে পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়ায় ; বৃহদায়তন পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিজয়ী অগ্রগতির এই হলো পরিণতি।

ক্ষুদ্রাকার শিল্পগুলোর এই বেদখল হওয়া ও ধ্বংসের ঘটনাকে অস্বীকার করতে ব্যর্থ হয়ে পুঁজিবাদের সমর্থকরা জোরগলায় বলতে চায় যে, কৃষিতে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। তাদের মতে, শিল্পে যেভাবে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা রয়েছে কৃষিতে তা নেই।

পুঁজিবাদের সমর্থকরা তাদের এই বক্তব্য আঁকড়ে ধরে থাকে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে, কৃষির ক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদন ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের চেয়ে অপরিমেয়রূপে অধিক সুবিধাজনক। সোভিয়েত ইউনিয়নে বড় বড় রাষ্ট্রীয় খামার ('সবখোজ') এবং যৌথ খামার ('কোলখোজ') সমূহের বৃদ্ধি-বিকাশ তর্কাতীতভাবেই একথা প্রমাণ করেছে, আর এই খামারগুলোর উৎপাদন-ক্ষমতা ছড়ানো-ছিটানো ক্ষুদে খামারের চেয়ে অপরিমেয়রূপে অধিক। কিংবা এমনকি পুঁজিবাদী বিশ্বেও কৃষিতে **বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা তর্কাতীত** ব্যাপার।

এটা স্বতঃপ্রতীয়মান যে, পুঁজিবাদী অবস্থাধীনে আর সোভিয়েত ইউনিয়নে বিরাজমান অবস্থাধীনে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধাবলী চরিত্রের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবেই ভিন্ন। সোভিয়েত ব্যবস্থাধীনে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার সমূহে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধাবলী এই ঘটনার মধ্যে নিহিত যে, খামারগুলো সমাজতান্ত্রিক নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, শ্রমজীবী ব্যাপক জনসাধারণের জন্যে তা নিয়ে এসেছে অশেষ উপকার, তাদের জন্যে এ হলো সমাজতন্ত্রের অভিমুখে প্রশস্ত পথ। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বৃহদায়তন উৎপাদন ক্ষুদে-উৎপাদকদের তুলনায় পুঁজিপতিকে অধিক সুবিধা প্রদান করে, শ্রমজীবি জনগণকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে সহায়তা করে।

একমাত্র বৃহদায়তন উৎপাদনেই ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, হারভেস্টর কম্বাইন ইত্যাদি ব্যবহার করা পোষায়, যেগুলো শ্রমের উৎপাদনশীলতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। কেবলমাত্র বৃহদায়তন উৎপাদনই পুঁজিবাদী ব্যাংকসমূহ থেকে অবাধে ঋণ লাভ করে এবং ক্ষুদে কৃষকের তুলনায় অপরিমেয় সহজ শর্তে তা পেয়ে থাকে। উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাদি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোই অধিক সুবিধাজনকভাবে সংগঠিত করতে পারে। কেবলমাত্র বৃহদায়তন কৃষিতেই বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভব। সুতরাং কৃষির ক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদনের বিপুল সুবিধাগুলি খুবই স্পষ্ট।

শিল্পের সাথে তুলনায় কৃষির পশ্চাদ্‌পদতা সত্ত্বেও, যন্ত্রপাতি ও কৃত্রিম সারের ব্যবহার পুঁজিবাদী দেশ সমূহে ক্রমান্বয়েই বাড়ছে। কেবল বৃহৎ খামারগুলিতেই জটিল যন্ত্রপাতির সুবিধাজনক ব্যবহার সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাক্টরের সংখ্যা ১৯১৮ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ৮০,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০,০০,০০০ হয়েছে, হারভেস্টর কম্বাইনের সংখ্যা ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে ৩,৫০০ থেকে বেড়ে ৫০,০০০ হয়েছে। জার্মানীতে নাইট্রোজেনজাত সারের ব্যবহার ১৯১৩ থেকে ১৯২৮-২৯ সালের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে আড়াই গুণ, পটাশ সারের ব্যবহার দেড়গুণ। ফ্রান্সে নাইট্রোজেন জাত সারের ব্যবহার দ্বিগুণ হয়েছে, পটাশ সারের ব্যবহার পাঁচ গুণ, সুপার ফসফেট সারের ব্যবহার পূর্বের দ্বিগুণ। জার্মানীতে বড় খামার গুলির বেশীর ভাগই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ; ছোট খামারগুলির অবশ্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার সাধ্যে কুলায় না। নিজেদের ট্রাক্টর, মালটানা ট্রাক বা বৈদ্যুতিক মটর রাখার

সাধ্য ছোট খামারগুলির নেই। বৃহৎ খামারগুলির বেশীর ভাগেরই এসব রয়েছে। যেমন, ১৯২৫ সালে জার্মানীতে ২০০ হেক্টরের (১৭৫০ বিঘা) উপর আয়তনের খামারগুলির শতকরা ৭০টিতে বৈদ্যুতিক মটর, শতকরা ১৪৫টিতে ট্রাক্টর, শতকরা ৬০টিতে বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং শতকরা ৮টিতে ট্রাক ব্যবহার হতো। কিন্তু, খামারের আয়তন যেরূপ হলে আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নতিকে প্রকৃতই বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা যায়, পুঁজিবাদী ব্যক্তি-মালিকানা খামারের সেরূপ আয়তন বৃদ্ধির পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করে। আধুনিক শক্তিশালী ট্রাক্টর ও কম্বাইনগুলো পুরোপুরি ব্যবহার করতে গেলে যেরূপ বড় খামার দরকার, পুঁজিবাদী দেশগুলোর এমনকি অপেক্ষাকৃত বড় খামারগুলোও কদাচিৎ সেরূপ বড় হয়ে থাকে ; আর এমনকি বড় খামারগুলোতেও এসব যন্ত্রপাতির পূর্ণ ক্ষমতা কাজে লাগানো হয় না। ব্যক্তি-মালিকানার সকল বাধাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নতির পূর্ণ ব্যবহারের উপযুক্ত শর্ত সৃষ্টি করে।

পুঁজিবাদ শিল্পের সাথে সাথে কৃষিতেও **বৃহদায়তন উৎপাদনের বিজয় সাধন** এবং বৃহদায়তন উৎপাদন দ্বারা ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনকে উচ্ছেদকরণের দিকে চালিত করে। কিন্তু, কৃষির পশ্চাদ্‌পদতার দরূণ পুঁজিবাদী বিকাশের এই সাধারণ নিয়ম কৃষির ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। কৃষির **পশ্চাদ্‌পদতার** কারণে, যন্ত্রপাতির প্রবর্তন তুলনামূলকভাবে মন্থরগতিসম্পন্ন। সে কারণে এমনকি সবচেয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশেও বহু **ক্ষুদ্র কৃষক খামার** এখনও রয়েছে, যেসব খামারে শ্রমিশক্তির বর্বরোচিত অপব্যবহার ঘটে ও প্রকৃতির উপর চালানো হয় লুণ্ঠন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ক্ষুদে কৃষক তার ক্ষুদ্র জমিখণ্ড তথা তার বাহ্যিক স্বাধীনতার ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে সব ধরণের বঞ্চনার শিকার হয়। ক্ষুদে খামারটি টিকে থাকে কেবল কৃষক ও তার গোটা পরিবারের সবচেয়ে হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর জোরে। একই সাথে, ক্ষুদে খামার জমির উর্বরতাকে লুটে নেয় ঃ জমিতে সার দেয়া হয় কম, চাষও ভালভাবে করা হয় না। গবাদি পশুর গুণমানও নীচে নেমে যায়। ক্ষুদে-কৃষক ও তার পরিবার দিন কাটায় অর্ধাহারে, অন্যদিকে করে অমানুষিক পরিশ্রম। আগামীকাল কেমন করে কাটবে এই নিয়ত উৎকণ্ঠার মধ্যে সে বাস করে। প্রতিটি কর বৃদ্ধি, তার উৎপন্ন-দ্রব্যের দামের প্রতিটি পড়তি, শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রীর দামের প্রতিটি বৃদ্ধি তার স্বাধীনতা আর কতদিন টিকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সে সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করে। নিজেদের স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য তাদের অতিমানবিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক ক্ষুদে কৃষক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অনেক সময় উদ্যোগ-উদ্যমহীন কোন ভূস্বামী তার চতুর্পার্শ্বস্থ কৃষকদের ক্ষুদে খামার-গুলোকে টিকিয়ে রাখা তার পক্ষে সুবিধাজনক মনে করে। ক্ষুদ্র এক খন্ড জমি নিয়ে কৃষক তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না। পার্শ্ববর্তী বৃহৎ ভূমি-মালিকের নিকট তার শ্রমশক্তি বিক্রী করতে সে বাধ্য হয়। অতিশয় ক্ষুদ্র জমি খণ্ড যদি কৃষককে ঐ স্থানে বেঁধে না রাখতো, তাহলে সে সম্ভবতঃ কাজের খোঁজে শহরে চলে যেত আর ভূস্বামী এই সস্তা **শ্রমশক্তি** পেতো না। এই কৃষকরা হয়ে দাঁড়ায় "ক্ষুদে-জমিওয়ালা মজুরী-শ্রমিক", লেনিন এভাবেই এসব কৃষকদের অভিহিত করেছেন।

"সুতরাং আমরা দেখি যে, পুঁজিবাদের প্রধান ও মৌলিক প্রবণতা হলো শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই বৃহদায়তন উৎপাদন কর্তৃক ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনকে প্রবেশে বাধা দেয়া। কিন্তু এই প্রবেশে বাধা দানকে কেবলমাত্র আশু বেদখল হিসেবে বুঝলে চলবে না, এই প্রবেশে বাধা দানের আরোও অন্তর্ভূক্ত হলো ক্ষুদে ভূমি-মালিকদের ধ্বংস ও অবস্থার আরো অবনতি, যা বছরের পর বছর কিংবা দশকের পর দশক ধরে চলতে পারে। অবস্থার এই অবনতি পরিলক্ষিত হয় মাত্রাতিরিক্ত শ্রম, ক্ষুদে কৃষকদের দ্বারা লব্ধ যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, তার ঋণের বোঝা, তার গবাদি-পশুর নিকৃষ্ট

পশুখাদ্য ও দীন সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ, চাষ, উর্বরতা বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপারে তার জমির অবনতিমূলক অবস্থা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন ইত্যাদির ব্যাপারে বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি দ্বারা।" [লেনিন, "কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে নতুন উপাত্ত"]

বৃহদাকার কৃষির তুলনায় ক্ষুদ্রাকার কৃষির সুবিধার কথা জোর গলায় বলতে গিয়ে পুঁজিবাদের সমর্থকরা সচেতনভাবেই এ সমস্ত অবস্থাকে মুছে ফেলতে চায়। তারা ক্ষুদে খামার মালিকদের ধৈর্য্য ও সহনশক্তির আকাশচুম্বী প্রশংসায় মেতে ওঠে। কিন্তু যে বঞ্চনার শিকার তারা হয়, সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করাকে তারা সচেতনভাবেই পরিহার করে।

পুঁজিবাদী দেশসমূহে ভূমির বন্টন ও কৃষকদের অবস্থা

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পুঁজিবাদী দেশসমূহে অত্যধিক পরিমাণেই জমির সবচেয়ে বড় অংশটি রয়েছে বড় বড় ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে। পুঁজিবাদী দেশসমূহে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের একত্রে ধরলে মুষ্টিমেয় বড় ভূস্বামীদের তুলনায় তাদের জমি রয়েছে কম। অধিকাংশ জমিই বড় বড় ভূস্বামীদের হাতে কেন্দ্রীভূত।

জার্মানীতে ১৯২৫ সালের শুমারী অনুযায়ী ২ হেক্টর (১৭.৫ বিঘা) পর্যন্ত আয়তন সম্পন্ন খামারগুলি হলো মোট খামার সংখ্যার শতকরা ৬০ ভাগ এবং সেগুলো মোট জমির শতকরা ৬.৫ ভাগই কেবল গঠন করছে ; অন্যদিকে ১০ হেক্টরের উপর আয়তনের খামারগুলি হলো ১১.৫ ভাগ আর সেগুলো মোট জমির শতকরা ৬৭ ভাগ গঠন করছে। এর অর্থ হলো এই যে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি বড় জমিদারির (সকল খামারের প্রায় এক-দশমাংশ) অধীনে রয়েছে সমগ্র জমির দুই-তৃতীয়াংশ, অন্যদিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুদে কৃষকদের হাতে রয়েছে সমগ্র জমির কেবল এক-ষোড়শাংশ। ১৯০৮ সালে ফ্রান্সে, এক হেক্টরের চেয়েও কম আয়তনের খামারগুলি মোট খামারের শতকরা ৩৮ ভাগ গঠন করছিল ; কিন্তু তাদের মোট জমির পরিমাণ ছিল সমগ্র জমির কেবল শতকরা ২.৫ ভাগ। সুতরাং দুই-পঞ্চমাংশ কৃষকের হাতে ছিল কেবল মোট জমির চল্লিশ ভাগের একাংশ। কিন্তু ১০ হেক্টরের উপর জমির অধিকারী জমিদারিগুলি মোট খামারের শতকরা ১৬ ভাগ গঠন করছিল এবং জমির পরিমাণ ছিল মোট জমির শতকরা ৭৪.৫ ভাগ, অর্থাৎ মোট জমির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। পোল্যাণ্ডে ১৯২১ সালে ২ হেক্টরের চেয়ে কম জমি-সম্পন্ন খামারগুলি সমস্ত খামারের শতকরা ৩৪ ভাগ গঠন করছিল ; কিন্তু এদের আওতায় জমি ছিল মাত্র শতকরা ৩.৫ ভাগ। কিন্তু ১০০ হেক্টরের উপর আয়তনের জমিদারিগুলি মোট খামারের শতকরা ০.৫ ভাগ গঠন করছিল এবং এগুলোর দখলে ছিল মোট জমির প্রায় অর্ধেক (শতকরা ৪৪ ভাগ)। হাঙ্গেরীতে সমস্ত খামারের (ক্ষুদে ও মাঝারী আকৃতির খামার) শতকরা ৯৯ ভাগের অধীনে ছিল অর্ধেক জমি, অন্যদিকে বাকী অর্ধেকের মালিক ছিল কেবল শতকরা ১ ভাগ বৃহৎ ভূমি-মালিকরা। অন্য কথায় বলতে গেলে, ১০ হাজার জমিদারের আছে প্রায় ১০ লক্ষ কৃষকের সমপরিমাণ জমি।

বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়াতেও জমির বড় অংশ ছিল ভূস্বামী, রাজকীয় পরিবার, গীর্জা ও 'কুলাকদের' (ধনী, শোষক কৃষক) হাতে। বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার ৩০ হাজার বড় বড় ভূস্বামীদের হাতে ছিল ৭০ কোটি বিঘা জমি। এক কোটি দরিদ্রতম কৃষি-খামারের হাতেও ছিল ৭০ কোটি বিঘা জমি। এভাবে ৩২৪টি দরিদ্র কৃষক খামার ছিল ভূস্বামীদের মালিকানাধীন প্রতিটি বৃহৎ জমিদারির সমান। গড়পড়তা একেক জন বড় ভূস্বামীর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২৩,০০০ বিঘা, আর একেকজন কৃষকের জমির পরিমাণ ছিল ৭০ বিঘা। খুবই

কম জমি, না হয় কোন জমিই নয় – এটাই ছিল গ্রাম্য দরিদ্রের ভাগ্য। কেবলমাত্র অক্টোবর বিপ্লবই জমি থেকে পরস্বোপজীবীদের বিতাড়িত করেছে এবং মেহনতী কৃষকদের হাতে সে জমি তুলে দিয়েছে।

ভূমি-মালিকানার এইরূপ বন্টনের ফলে কৃষকরা দাসত্ব ও দারিদ্র্যের কবলে পড়ে। শ্রমজীবী কৃষক ভূস্বামীর কাছ থেকে সবচেয়ে দাসত্ব-মূলক শর্তে জমি ইজারা নিতে বাধ্য হয়। প্রযুক্তিগত পশ্চাদ্‌পদতা সহকারে ক্ষুদ্রায়তন চাষাবাদের যে অসুবিধা সমূহ রয়েছে তা ছাড়াও অন্যান্য কতকগুলি পরিস্থিতি ক্ষুদ্র কৃষকের উপর চেপে বসে। স্বীয় উৎপাদনের সিংহ-ভাগই তাকে দিতে হয় জমিদারের হাতে ভূমি-খাজনা রূপে। সরকারও তার কাছ থেকে কর আদায় করে। উদাহরণ স্বরূপ, আমেরিকার কৃষকের আয়ের দুই-তৃতীয়াংশই কর দিতে গিয়ে নিঃশেষিত হয়ে যায়। শস্যহানি বা কোন পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণে যদি সে কখনও ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তবে সুদ পরিশোধের দায় থেকে সে নিজে কখনও আর মুক্ত হতে পারে না। ফড়িয়া ব্যাপারীও ক্ষুদে কৃষককে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করে এবং বিভিন্ন ধরনের দাসোচিত শর্তে তাকে বেঁধে ফেলে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৩০ সালের শুমারির তথ্যাদি মার্কিন কৃষকদের দারিদ্র্যকে ছকাকারে চিত্রিত করেছে। ১৯২০-৩০ সাল – এই দশ বৎসরে চাষাবাদযোগ্য জমির মোট মূল্য ৫,৫০০ কোটি ডলার থেকে ৩,৫০০ কোটি ডলারে নেমে এসেছে। প্রতিটি খামারে ভূমি ও ঘরবাড়ির গড়পড়তা মূল্য ১০,০০০ ডলার থেকে ৭,৫০০ ডলারে নেমে এসেছে। খামারের সংখ্যা ১৯২০ সালে ৬৪ লক্ষ থেকে নেমে ১৯৩০ সালে ৬৩ লক্ষতে নেমে এসেছে। একই সময়ে যেসব কৃষক ইজারা নিয়েছে তাদের সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৫৫ হাজার থেকে ২৬ লক্ষ ৬৪ হাজার হয়েছে। নিজস্ব মালিকানাধীন খামারের সংখ্যা ৬৩ কোটি ৭০ লক্ষ একর থেকে কমে ৬১ লক্ষ ৮০ হাজার একর হয়েছে ; একই সময়ে ইজারা নেয়া খামারের চাষের জমির পরিমাণ ২২ কোটি ৫০ লক্ষ একর থেকে বেড়ে ৩০ কোটি ৬০ লক্ষ একর হয়েছে। মার্কিন কৃষকদের প্রধান অংশের দারিদ্র্য, কৃষকদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ হ্রাস, ইজারা জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রায়তন খামার অর্থনীতির অবক্ষয় ইত্যাদির সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এইসব তথ্যাদি।

জাপানের কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত ১৯৩২ সালের সরকারী সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী, ৫৫ লক্ষ ৭৬ হাজার কৃষক পরিবারের মধ্যে ১৪ লক্ষ ৭৮ হাজারের কোন রকমের জমি নাই, এরা বড় বড় ভূস্বামীর কাছ থেকে জমি ইজারা নেয়। ২৫ লক্ষের প্রত্যেকের নিজের জমির পরিমাণ সোয়া চার বিঘারও কম ; ১২ লক্ষ ৪০ হাজারের প্রত্যেকের সোয়া চার বিঘা থেকে পৌনে নয় বিঘা জমি আছে। এই উভয় বর্গের "মালিকদের" ২৩ লক্ষ ৬০ হাজারকে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে অতিরিক্ত জমি ইজারা নিতে হয়। সাধারণ নিয়মে ভূস্বামীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে জমি ভাগ করে ইজারা দেয়, কারণ সস্তা শ্রমশক্তির তীব্রতম শোষণেও খাজনা থেকে কম আয়ই নিয়ে আসে। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি খণ্ড কৃষক পরিবারদের নিকট ইজারা দেয়ার দরুন (কৃষক খামার সমূহের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ খামার প্রতি পৌনে নয় বিঘার কম জমি চাষ করে) মোট উৎপাদিত ধানের শতকরা ৫০ ভাগ বা তারও বেশী জমির খাজনা হিসেবে আদায় করা হয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে কৃষকদের মধ্যে বৈষম্য

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে টিকে থাকার জন্য কৃষককে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়। নিজের "স্বাধীন" খামার বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাকে প্রাণান্ত শ্রম করতে হয়। জমির উর্বরতা শক্তি

নিঃশেষিত হয়, গবাদি পশুর অবস্থা হয় আরো খারাপ ; কৃষক ও তার পরিবারের জীবন ধারণের অবস্থা দিন দিন দীনতর হতে থাকে। কর তাকে গ্রাস করে ফেলে, আবার জমির জন্যও তাকে খাজনা দিতে হয়। সে সহজেই সুদখোর মহাজনের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যে তার শেষ রক্তবিন্দু নিঃশেষে শোষণ করে নিয়ে যায়। দূরবর্তী বাজারে নিয়ে যেতে পারে না বলে সে সাধারণতঃ তার উৎপন্ন শস্যাদি ও গবাদি পশু ফড়িয়া ব্যাপারীদের নিকট বিক্রয় করে। সুদখোর আর ব্যাপারীরা তাদের মুঠোর মধ্যে কৃষককে দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে। গ্রামের উপর পুঁজির চাপ ক্রমান্বয়েই বাড়তে থাকে।

পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে অতি স্বল্প-সংখ্যক কৃষকই সমৃদ্ধি অর্জন করে। তাদের কেউ কেউ জমি খরিদ করে, চড়া সুদে টাকা ধার দেয় ; আবার কেউ-বা ব্যবসা করে ধনী হয়। একই সময়ে বিপুল জনসংখ্যা আরো অধিক মাত্রায় দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবতে থাকে। অনেকেই প্রথমতঃ তাদের গরু এমনকি পরে তাদের ঘোড়াও বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। ঘোড়া হারিয়ে কৃষক অবিলম্বেই ধনীর শোষণের শিকারে পরিণত হয় ঃ জীবিকা নির্বাহের জন্য হয় তাকে ভাড়াটে শ্রমিকে পরিণত হতে হয়, না হয় গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে হয়।

এভাবে কৃষকদের এক অংশ বুর্জোয়ায় (কুলাক) আর অপর অংশ মজুরী-শ্রমিকে পরিণত হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় **গ্রামাঞ্চলের বৈষম্য** এভাবেই গঠিত হয়।

এই বিপরীত প্রান্তের দুই স্তরের মধ্যে রয়েছে এক ব্যাপক অংশ – **মধ্য কৃষক**।

"তাদের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, পণ্য-উৎপাদনকারী কৃষি তাদের মধ্যে **সবচেয়ে কম** বিকশিত। কেবল শুভ বৎসরে এবং বিশেষভাবে অনুকুল অবস্থায় এই ধরণের কৃষকের স্বতন্ত্র কৃষিকর্ম তার ভরণপোষণ যোগাতে সক্ষম, আর সে কারণে তার অবস্থানও অত্যন্ত অনিশ্চিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রম ইত্যাদি দ্বারা পরিশোধযোগ্য ঋণ গ্রহণ ব্যতীত, অংশতঃ শ্রমশক্তি বিক্রয় ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত পার্শ্ববৃত্তি দ্বারা 'উপরি' উপার্জনের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া মধ্য-কৃষক তার সংসার চালাতে পারে না। ফসলের প্রতিটি অজন্মাতেই বহু সংখ্যক মধ্য কৃষক সর্বহারাশ্রেণীর সারিতে নিক্ষিপ্ত হয়।" [লেনিন, "রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ"]

অনেক দেশেই ব্যাপক সংখ্যক মধ্য কৃষকের অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান।

পুঁজিবাদ অধিকাংশ মধ্য-কৃষকের জন্য একটিমাত্র পথই খোলা রেখেছে ঃ গ্রামীণ দরিদ্রের পর্যায়ে নেমে যাওয়া এবং তারপর কৃষি-শ্রমিকে পরিণত হওয়া। এক ক্ষুদ্র অংশই উর্ধ্বে আরোহণ করে এবং শোষকে পরিণত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৩০ সালের শুমারীর প্রদত্ত তথ্য হলো মধ্য-কৃষকদের ক্রমান্বয়ে নিশ্চিহ্ন হওয়ার সাক্ষ্য। শুমারীর তথ্যে দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্র খামারের (২০ একরের কম) এবং বৃহৎ খামারের (৫০০ একরের বেশী) সংখ্যা বৃদ্ধি। মধ্য খামারের (২০-৫০০ একর) সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে বেশ পরিমাণে।

পুঁজিবাদী দেশসমূহের কৃষকদের দারিদ্র্য

পুঁজিবাদ গ্রামের ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের জন্যে বিপুল দুর্দশাই বয়ে নিয়ে আসে। পুঁজিবাদ শিল্প ও কৃষির মধ্যে সৃষ্টি করে এক সুগভীর ফাটল। যুগান্তব্যাপী পশ্চাদ্‌পদতার মধ্যে নিপতিত থাকতে হয় গ্রামাঞ্চলকে, ক্ষুদে কৃষক খামারকে থাকতে হয় দুর্দশাপূর্ণ অস্তিত্বের মধ্যে। করের বোঝা, অপ্রচুর জমি আর কৃষিজাত পণ্যের অতি নিম্ন দরের চাপে পড়ে কৃষক যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। বড় বড় ভূস্বামীদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে জমির কেন্দ্রীভবন পুঁজিবাদ বিরাজমান থাকা পর্যন্ত কৃষক জনতাকে অব্যাহত দাসত্ব ও পরাধীনতার দণ্ডে দণ্ডিত করে। অধিকতর লাভজনক বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রতিযোগিতার মুখে দরিদ্র কৃষক তার নিরতিশয় ক্ষুদ্র খামার রক্ষার জন্য অমানুষিক শ্রম করতে বাধ্য হয়। কৃষকদের

মধ্যেকার বৈষম্য-পার্থক্য বিপুল-ব্যাপক গরীব কৃষককে কৃষি-শ্রমিকের সারিতে নিক্ষেপ করে, যারা সবচাইতে দুঃসহ শোষণের কবলে পড়ে।

সংকট পুঁজিবাদের সকল দ্বন্দ্বকে চরমভাবে তীব্র করে তোলে। পুঁজিবাদী বিশ্বকে যেসব সংকট নাড়া দিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে তীব্র ও চরম বর্তমান সংকট [৩০-এর দশকের সংকট – অনুঃ] বিপুল-ব্যাপক কৃষক সম্প্রদায়ের অভাব ও দারিদ্র্যকে চূড়ান্ত মাত্রায় বৃদ্ধি করেছে। সংকটের ফলে শহর ও গ্রামের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব আরো গভীর হয়েছে। সংকট গ্রামাঞ্চলের পশ্চাদ্‌পদতাকেও গভীরতর করেছে। কৃষিজাত পণ্যের অবিশ্বাস্য নিম্ন দর ব্যাপক মধ্য-কৃষকদের ধ্বংস করে দিয়েছে। একই সময়ে, ভোক্তা-শ্রমিককে জীবন-ধারণের সামগ্রী সমূহের জন্যে চিরাচরিতভাবে চড়া দাম দিতে হয়।

বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণীর মিত্র কৃষক

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, পুঁজিবাদী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তার বিপ্লবী সংগ্রামে সর্বহারাশ্রেণী গ্রামাঞ্চলে তার বন্ধু ও মিত্র খুঁজে পায়। গ্রামীণ মজুরী-শ্রমিকও হলো সর্বহারা ; কেবল পার্থক্য হলো এই যে, একজন চালায় ভূস্বামী বা ধনী কৃষকের জন্য লাঙ্গল, আর অপরজন চালায় উৎপাদকের জন্যে মেশিন। ধ্বংসপ্রাপ্ত **গ্রামীণ দরিদ্র** হলো **শ্রমিকশ্রেণীর** এক নির্ভরযোগ্য সমর্থক ও দৃঢ় মিত্র। পুঁজিবাদের নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব দ্বারা তার লাভ করার মতো কিছু যেমন নেই, তেমনি পুঁজিবাদের ধ্বংসের দ্বারা তার হারাবারও কিছু নেই। সর্বশেষে যে **মধ্য-কৃষকরা** প্রায়শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সর্বহারাশ্রেণীর কর্মনীতি যদি নির্ভুল হয় তাহলে তারাও সর্বহারাশ্রেণীকে সহায়তা করতে পারে। ক্ষমতার জন্যে লড়াইয়ের সময় মধ্য-কৃষককে নিরপেক্ষ করে রাখা, অর্থাৎ, সর্বহারাশ্রেণীর শত্রুদের পক্ষে তার চলে যাওয়াকে রোধ করা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিজয় লাভের পর, সর্বহারাশ্রেণী **মধ্য-কৃষকদের সাথে** এক স্থায়ী **মৈত্রী** (Union) প্রতিষ্ঠা করে। নতুন জীবন গড়ে তোলায় শ্রমিকশ্রেণী মধ্য-কৃষককে দৃঢ়ভাবে তার সাথে নিয়ে চলে।

গ্রাম্য বুর্জোয়া 'কুলাক'দের বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত ও বিরামহীন সংগ্রাম হলো একমাত্র ভিত্তি যার উপর সর্বহারাশ্রেণী ও মধ্য-কৃষকদের মৌলিক জনগণের মধ্যেকার স্থায়ী মৈত্রী স্থাপিত হতে পারে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে গরীব ও মধ্য-কৃষকরা যে হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে সেই পরিস্থিতি থেকে সর্বহারা বিপ্লবই মুক্তির পথ খুলে দিতে পারে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কেবলমাত্র মধ্য-কৃষকদের বিরল কোন ব্যক্তিবিশেষই উপরে উঠতে পারে এবং শোষক ধনী কৃষকে পরিণত হতে পারে। কিন্তু তাদের বিপুল-ব্যাপক অংশকেই বেঁচে থাকার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়। ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভীতি, নিঃস্বতা, তাদের ক্ষণভঙ্গুর স্বাধীনতা এবং গরীব সর্বহারাশ্রেণীর সারিতে তাদের বাধ্য হয়ে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা – পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মধ্যে-কৃষককে নিয়ত এরই মুখোমুখী থাকতে হয়। একমাত্র সর্বহারা বিপ্লবই মধ্য-কৃষকের সামনে অন্য এক সুদূরপ্রসারী পথ খুলে দেয়, তাকে দেখিয়ে দেয় এই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ। সর্বহারা বিপ্লব শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদী শোষণের শেকড় উৎপাটন করে। ব্যাংক মালিক, ভূস্বামী ও কারখানা মালিকদের পরোপজীবী সুলভ মালিকানার অবসান ঘটিয়ে সর্বহারা বিপ্লব তাৎক্ষণিকভাবেই যুগ-যুগান্তব্যাপী যে শৃঙ্খল তাদের হাত-পা বেঁধে রেখেছিল সেই দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে দরিদ্র ও মধ্য-কৃষকদের মুক্ত করে ঃ প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থার বন্ধন, ব্যাংক, মহাজন ইত্যাদির নিকট ঋণের

সমাজতান্ত্রিক কৃষির দ্বার খুলে দেয়, এভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে ধ্বংস ও দারিদ্র্য ছিল অবশ্যম্ভাবী তা এড়ানো যায়।

নিরীক্ষামূলক প্রশ্নাবলী

১। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গ্রাম ও শহরের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব কি নিয়ে গঠিত ?
২। চূড়ান্ত ও পার্থক্যমূলক খাজনার উৎস কি ?
৩। জমির দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় ?
৪। কৃষিতে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন অপেক্ষা বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধাবলী কি কি ?
৫। পুঁজিবাদী দেশসমূহে ভূ-সম্পত্তি কিভাবে বন্টিত হয় ?
৬। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কৃষকদের মধ্যেকার বৈষম্য কিভাবে ঘটে ?

অষ্টম অধ্যায়

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুনরুৎপাদন ও সংকট

উৎপাদন-যন্ত্র ও ভোগের উপকরণ

যেকোন দেশের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, বৎসরের পর বৎসর ধরে বহু রকমের পণ্য-সামগ্রী নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে ঃ যেমন, রুটি, ছিট কাপড়, রেল ইঞ্জিন, লাঙল, বাড়ি-ঘর, কয়লা, মেশিন-পত্র, চিনি, রাবার ইত্যাদি।

মনুষ্য-শ্রমের সৃষ্টি এসব উৎপাদিত দ্রব্যের চূড়ান্ত গন্তব্য স্থলও ভিন্ন ভিন্ন। রুটি, চিনি ও মাংস মানুষ খায় আর মানুষের পরিধানের কাজে ব্যবহৃত হয় বস্ত্র, বসবাসের জন্য লাগে বাড়িঘর। মনুষ্য-শ্রমে তৈরী অন্যান্য অনেক উৎপন্ন-দ্রব্যের নিয়তি হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ঃ লাঙল যায় চাষীর কাছে জমি চষার জন্য ; যন্ত্রপাতি ও কারখানার দর-দালান ব্যবহৃত হয় আরো পণ্য-সামগ্রী উৎপাদনের জন্য ; রেল ইঞ্জিন ও বগীগুলো মালামাল ও মানুষ পরিবহনের কাজে লাগে।

মনুষ্য-শ্রম জাত যেসব উৎপন্ন-দ্রব্য মানুষের আশু চাহিদা পূরণের কাজে লাগে, অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বিনোদন, আশ্রয় ইত্যাদি ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের কাজে লাগে, সেগুলোকে বলা হয় **ভোগের উপকরণ** ; আর মনুষ্য-শ্রম জাত যেসব উৎপন্ন-দ্রব্য আরো দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনের কাজে লাগে সেগুলোকে বলা হয় **উৎপাদনের উপকরণ বা উৎপাদন-যন্ত্র**। এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, মনুষ্য-শ্রমজাত সকল উৎপাদিত দ্রব্যই শেষ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা সামাজিক গোষ্ঠীর কোন-না-কোন চাহিদা পূরণের কাজে লাগে। একমাত্র পার্থক্য হলো, এদের মধ্যে কিছু কিছু জিনিস এই উদ্দেশ্য **প্রত্যক্ষভাবে** পূরণ করে – এগুলো হলো মানুষের ব্যক্তিগত ব্যবহারের বস্তু, আর অন্যান্য কিছু জিনিস এসব প্রত্যক্ষ ব্যবহারের বস্তুগুলি উৎপাদনের কাজে লাগে – এই পর্যায়ের জিনিসগুলি হলো উৎপাদনের উপকরণ বা উৎপাদন যন্ত্র।

অবশ্য, এমন কিছু কিছু জিনিসও আছে যা প্রত্যক্ষ ভোগের বস্তু ও উৎপাদন যন্ত্র, এই দুই ভাবেই কাজে লাগে। এর সবচেয়ে সহজ দৃষ্টান্ত হলো কয়লা, যা কারখানার স্টীম বয়লার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদন-যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এরূপ উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা যায় এমন আরো বহু জিনিসের কথা প্রত্যেকেরই জানা আছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা থাকে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা বা তাদের গোষ্ঠিগুলির হাতে। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, কারখানা মালিক একটি মাত্র উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তার প্রতিষ্ঠান চালায় – তা হলো মুনাফা, ব্যক্তিগত লাভ অর্জন। সুতরাং রেলগাড়ী না দেশলাই, সাধারণ ছিট কাপড় না সুগন্ধী দ্রব্য – কোনটা সে উৎপাদন করবে তা নিয়ে তার মাথা-ব্যাথা নেই। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল একটাই ঃ আরো মুনাফা। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, উৎপাদনের উপকরণ আর ভোগের উপকরণের উৎপাদনের মধ্যে পুঁজিপতি কোন পার্থক্য দেখে না। সে রাবার উৎপাদন করবে, না রাবার বেল্টিং উৎপাদন করবে তা নির্ভর করে কেবল একটি জিনিসের উপর – কোনটায় তার মুনাফা বেশী।

পুনরুৎপাদন কাকে বলে ?

যেকোন দেশেই উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী রয়েছে এক অব্যাহত গতি-প্রবাহের মধ্যে। ভোগের বস্তুগুলি যায় প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে ব্যবহারকারীর কাছে। সেখানে তা নিঃশেষিত হয়ে যায় ঃ কোন কোনটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ধরে মানুষের চাহিদা পূরণের কাজে লাগে (যেমন, বস্ত্র, বই), আবার অন্যগুলি নিঃশেষিত হয় বেশ তাড়াতাড়ি (যেমন, খাদ্য)। কারখানা ও ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুত কিংবা ভূগর্ভ থেকে তুলে আনা উৎপাদনের উপকরণ সমূহও ব্যবহারে লাগানো হয়। এসব উৎপন্ন-দ্রব্যের কোন কোনটি স্বল্পকাল স্থায়ী (উদাহরণ স্বরূপ, কয়লা বা তেল), বিপরীত পক্ষে, অন্যান্যগুলি অত্যন্ত ধীরগতিতে ব্যবহৃত হয় এবং দীর্ঘকাল পরেই কেবল সেগুলি বদল করার দরকার পড়ে (উদাহরণস্বরূপ, যন্ত্রপাতি)।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট। সমাজকে টিকে থাকতে হলে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি রক্ষা করতে হলে, এটা প্রয়োজন যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য কেবল একবার নয়, বরং অব্যাহতভাবেই, বারবারই উৎপাদন করতে হবে। এটা যে একটা বাস্তব ঘটনা তা প্রত্যেকেই জানে।

জামা পুরানো হয়ে ছিড়ে যায়, কিন্তু কারখানায় নতুন জামা সব সময়ই তৈরী হয়। খাদ্য নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু একই সময়ে মাঠে নতুন শস্য পরিপক্ক হচ্ছে। কয়লা জ্বালানো হয়, কিন্তু, খনি থেকে সব সময়ই নতুন কয়লা তোলা হচ্ছে। রেল ইঞ্জিন ক্ষয় পাচ্ছে, যন্ত্রপাতি পুরানো হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মনুষ্য শ্রম অবিরাম নতুন নতুন দ্রব্য-সামগ্রী তৈরী করায় ব্যস্ত থাকছে।

এসব সকল ক্ষেত্রেই, এসব উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এমন একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো যা সবগুলির মধ্যে **সাধারণভাবে** বর্তমান রয়েছে। বিভিন্ন ধরণের পণ্য-সামগ্রী উৎপাদিত হচ্ছে, ব্যবহৃত হচ্ছে এবং আবার তা উৎপাদন করা হচ্ছে। দ্রব্যসামগ্রীর এক অব্যাহত পুনরুৎপাদন চলছে।

"কোন সমাজে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার রূপ যাই হোক না কেন, তা অবশ্যই হবে এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, কিছু সময় অন্তর অন্তর একই পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে তা অব্যাহত থাকতে হবে। কোন সমাজ যেমন ভোগ বন্ধ করতে পারে না, তেমনি উৎপাদনও বন্ধ করতে পারে না। সুতরাং, একত্র-বাঁধা সামগ্রী রূপে, এবং অবিরাম পুনরাবৃত্তির প্রবাহ রূপে যখন দেখা হয়, তখন প্রত্যেকটি সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়া হলো, একই সময়ে, পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়াও।" [মার্কস, "পুঁজি", ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭৭-৭৮]

সরল ও বর্ধিত পুনরুৎপাদন

সরল ও বর্ধিত [simple and extended] পুনরুৎপাদনের মধ্যে আমাদের অবশ্যই পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে। যদি কোন নির্দিষ্ট সমাজে বৎসরের পর বৎসর কোন দ্রব্য একই পরিমাণে উৎপাদিত হতে থাকে, তাহলে আমরা পাই **সরল পুনরুৎপাদন**। এ ক্ষেত্রে এক বৎসরে যা কিছুই উৎপাদিত হয় তার সবই ভোগ-ব্যবহারে নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু পুঁজিবাদের বিকাশের অর্থ হলো উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধি। প্রত্যেক বৎসরেই পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় সমস্ত ধরণের উৎপন্ন-দ্রব্য আরো অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এক্ষেত্রে আমরা পাই **বর্ধিত পুনরুৎপাদন** ; পুনরুৎপাদন ঘটে বর্ধিত আকারে। সমাজের পুরানো নিশ্চল অবস্থা থেকে তার প্রচণ্ড বিকাশের দিকে এক পরিবর্তনই পুঁজিবাদ নিয়ে আসে। সে কারণে বর্ধিত পুনরুৎপাদন হলো পুঁজিবাদের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুনরুৎপাদন

সমাজ-ব্যবস্থা নির্বিশেষেই যেকোন সমাজে পুনরুৎপাদন ঘটে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থায় যে পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন ঘটে তাও ভিন্ন ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুনরুৎপাদন যেভাবে ঘটে তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণই **ভিন্ন**। "যদি রূপের দিক দিয়ে উৎপাদন হয় পুঁজিবাদী, তাহলে, পুনরুৎপাদনও হবে সে ধরণেরই"। [ঐ, পৃঃ ৫৭৮]

পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মনুষ্য-শ্রম জাত বিভিন্ন উৎপন্ন-দ্রব্যই কেবল পুনরুৎপাদিত হয় না, বরং সামাজিক উৎপাদন-সম্পর্ক সমূহ, মানুষের মধ্যেকার উৎপাদন-সম্পর্ক সমূহ পুনরুৎপাদিত হয়। আর বাস্তবিক পক্ষে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে ব্যবহারে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া শস্য, কয়লা ও যন্ত্রপাতির স্থান পূরণ করার জন্য নতুন পরিমাণ শস্য, কয়লা ও যন্ত্রপাতি বাজারে উপস্থিত করাই পুনরুৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং মানুষে মানুষে সম্পর্কের পুঁজিবাদী রূপেরও অবিরাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখাও তার অন্তর্ভুক্ত। বৎসরের পর বৎসর পুঁজিবাদী কারখানা ও ফ্যাক্টরী সমূহে শ্রমিকরা অব্যাহতভাবে পরিশ্রম করতে থাকে, বৎসরের পর বৎসর এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকরা শ্রমিকশ্রেণীর শ্রম দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যকে আত্মসাৎ করে। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রুটি, মাংস, ধাতু, কয়লা ইত্যাদি পণ্য-সামগ্রীই পুনরুৎপাদিত হয় না, বরং উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যেকার নির্দিষ্ট সম্পর্কও পুনরুৎপাদিত হয়। শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার সম্পর্কও পুনরুৎপাদিত হয়। বিভিন্ন পুঁজিপতি গোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্যেকার সম্পর্কের মতোই, অন্যান্য উৎপাদন-সম্পর্কও পুনরুৎপাদিত হয়।

কিন্তু **পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের** পুনরুৎপাদনের আরো অর্থ হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত অতিশয় গভীর সেসব **দ্বন্দ্বেরও পুনরুৎপাদন**। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে **বর্ধিত পুনরুৎপাদনের** অর্থ কেবল বৎসরের পর বৎসর উৎপাদিত বিভিন্ন ধরণের দ্রব্যের পরিমাণের ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে **বর্ধিত পুনরুৎপাদনের** আরো অর্থ হলো পুঁজিবাদী কারখানা ও ফ্যাক্টরীর সংখ্যা ও আয়তনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি, এসব প্রতিষ্ঠানে **শ্রমিকদের বর্ধিত শোষণ**। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে **বর্ধিত পুনরুৎপাদনের** অর্থ হলো মজুরী-শ্রমিকের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী সম্পর্কসমূহের সম্প্রসারণ, দেশ থেকে দেশান্তরে পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ, পুঁজিবাদ কর্তৃক উৎপাদনের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় দখল কায়েম। অতএব, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে বর্ধিত পুনরুৎপাদনের অর্থ হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তীব্র দ্বন্দ্ব সমূহের অবিরাম বৃদ্ধি, যে দ্বন্দ্বগুলি এই ব্যবস্থাকে তার পতনের দিকে, নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা তার স্থলাভিষিক্ত করণের দিকে চালিত করে। এভাবে **পুঁজিবাদের বৃদ্ধি-বিকাশ** সাথে করেই নিয়ে আসে তার নিজের ধ্বংস।

পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবন

অধিক কয়লা কিম্বা লোহা উৎপাদন করতে হলে, নতুন খনি ও খাদ খুঁড়তে হবে। আরো অধিক বস্ত্র উৎপাদন করতে হলে নতুন তাঁত বসাতে হবে। সাধারণভাবে, উৎপাদন সম্প্রসারণের জন্যে হয় বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান সমূহকে সম্প্রসারিত করতে হবে, না-হয় নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এটা কিভাবে ঘটে ?

পুঁজিবাদী দেশসমূহে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক হলো ক্ষুদ্র একদল লোক ঃ কারখানা ও ফ্যাক্টরী, কয়লা ও ধাতু খনি – সবই হলো পুঁজিপতিশ্রেণীর ব্যক্তি-সম্পত্তি। পূর্ববর্তী এক

অধ্যায়ে যখন আমরা আদিম পুঞ্জীভবনের কথা অধ্যয়ন করেছি, তখন আমরা শিখেছি যে পুঁজিবাদী ব্যক্তি-সম্পত্তির উৎপত্তি ঘটেছে ডাকাতি, হিংসাত্মক কাজকর্ম ও উচ্ছৃংখল অনাচারের মধ্য থেকে। কিন্তু একবার যখন তার উৎপত্তি ঘটেছে তখন উৎপাদন-যন্ত্রের উপর পুঁজিবাদী মালিকানা বজায় থেকেছে এবং বৎসরে বৎসরে তা সম্প্রসারিত হয়েছে।

পুঁজি তার মালিককে উদ্বৃত্ত-মূল্য এনে দেয়। উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎসের কথাও আমরা অধ্যয়ন করেছি। শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোন্ রূপে ও কিভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্য বণ্টিত হয় তাও আমরা দেখেছি।

প্রথমতঃ এটা মনে হতে পারে যেন বিনিয়োগকারী তার মুনাফা নিয়ে যা খুশী তাই করতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে এ ব্যাপারে পুঁজিবাদে কোন বিধি-নিয়ম নেই। যদি একজন বস্ত্রকল মালিক বৎসরে ১,০০,০০০ ডলার মুনাফা করে তাহলে ঐ মুদ্রা দিয়ে সে যা খুশী তাই করতে পারে। ভোজন-বিলাসী হলে সে এই মুদ্রা খাদ্য-দ্রব্যের জন্য খরচ করতে পারে, মদ্যপ হলো, মদের জন্যই তা সে ব্যয় করতে পারে। পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে এমন বহু লোকই আছে যারা প্রকৃতপক্ষে এসব জিনিসের জন্য তাদের মুনাফাটা খরচও করে। কিন্তু, বিষয়টির সারবস্তু এটা নয়।

কোন রকম লিখিত বিধি-বিধান না থাকলেও, অত্যন্ত বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, পুঁজিপতি তার মুনাফার একটি অংশ তার প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করে। মূল পুঁজির সাথে উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশের এইরূপ যোগ করাকে আমরা বলি **পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবন।**

আমাদের উদ্ধৃত বস্ত্রকল মালিক তার বাৎসরিক এক লক্ষ ডলার মুনাফার মধ্যে হয়তো ৬০-৮০ হাজার ডলার তার কারখানা সম্প্রসারণ, নতুন ও উন্নত যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য তার কারবারে ফের বিনিয়োগ করবে। দুটি শক্তি তাকে এ কাজ করতে বাধ্য করে ঃ লাভের লালসা ও প্রতিযোগিতার ভয়। লাভের লালসার কোন সীমা নেই – ঠিক এই বৈশিষ্ট্য দ্বারাই পুঁজিবাদ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উদ্যোক্তার পুঁজি যতই বড় হোক না কেন আর তার মুনাফা যত বিপুলই হোক না কেন, সে অবিচলিত ভাবে চেষ্টা করবে তার সম্পদ ও মুনাফা বৃদ্ধি করতে। আর এই লক্ষ্য হাসিল করতে গেলে উপায় মাত্র একটাই ঃ তার মুনাফা থেকে একাংশ যোগ করে পুঁজির আরো পুঞ্জীভবন। প্রতিযোগীদের পর্যবেক্ষণ করে আমাদের বস্ত্রকল মালিকটি নিশ্চিন্তে তার সমস্ত মুনাফাটা তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কিংবা সবরকম নিষ্ফল বিলাসে ব্যয় করতে পারে না। সে দেখতে পায় যে, তার প্রতিযোগীরা আরো সস্তায় ও আরো উন্নত মানের পণ্য উৎপাদনের জন্য এবং এভাবে তার প্রতিযোগীদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তাদের কারবারের উন্নতি সাধন, সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টায় সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করছে। যদি আমাদের বস্ত্রকল মালিক নির্মূল হতে না চায়, তাহলে তাকেও তার মুনাফার এক বড় অংশ তার কারবারে পুনঃ-বিনিয়োগ করতে হবে।

সুতরাং, এমনকি যদিও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঞ্জীভবনে বাধ্য করার জন্য কোন বিধান নেই, তথাপি প্রাথমিক (elemental) শক্তিগুলো এই বাধ্য-বাধকতা আরোপ করে এবং অধিকাংশ পুঁজিপতিকে মুনাফার একটা অংশ পুঞ্জীভবন করতে বাধ্য করে। সর্বহারাশ্রেণী কর্তৃক সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যের পুঞ্জীভবন বর্ধিত পুনরুৎপাদনের একটা প্রয়োজনীয় শর্ত।

পুঁজির কেন্দ্রীভূতকরণ ও কেন্দ্রীয়করণ

প্রতি বৎসর মুনাফার একটা অংশ পুঞ্জীভবন করে কারখানা মালিক আরো অধিক পুঁজির মালিক হয়। যদি তার প্রতিষ্ঠানের পূর্বেকার মূল্য ১০ লক্ষ ডলার হয়, তাহলে, মনে করা যাক, প্রতি বৎসর ৫০-৭০ হাজার ডলার পরিমাণ মুনাফার ক্রমান্বয় পুঞ্জীভবন সহকারে দশ বৎসর পরে আমাদের কারখানা-মালিকের পুঁজি দাঁড়াবে ১৫ লক্ষ ডলার থেকে ১৭ লক্ষ

ডলার, অর্থাৎ, তার পুঁজি দেড় গুণ বা তার চেয়েও বেশী বাড়বে। উদ্বৃত্ত-মূল্য পুঞ্জীভবনের মধ্যে দিয়ে পুঁজির সম্প্রসারণকে বলা হয় **পুঁজির কেন্দ্রীভূতকরণ** [concentration of capital]।

আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে যার সাহায্যে স্বতন্ত্র পুঁজিপতিদের পুঁজি বৃদ্ধি পায়। আমরা পূর্বেই দেখেছি অধিকতর শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান সমূহ কিভাবে অধিকতর দুর্বল প্রতিষ্ঠান সমূহকে ধ্বংস করে দেয়, বড় পুঁজিপতি তার চেয়ে ছোট ও দুর্বল প্রতিযোগীকে কিভাবে গিলে খায়। ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রতিযোগীদের বিষয়-সম্পত্তি তাদের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশ পরিমাণ কম দামে কিনে নিয়ে কিংবা অন্য কোন উপায়ে (যেমন, তাদের দেনা শোধ করে) নিজেদের প্রতিষ্ঠানের সাথে সেগুলোকে সংযুক্ত করে বৃহৎ কারখানা-মালিক তার পুঁজি বৃদ্ধি করে। বেশ কয়েকটি পুঁজিপতির একত্রে সংযুক্তির এরূপ ঘটনাবলী হলো এমন এক সংগ্রামের ফলশ্রুতি যা কোন পুঁজিপতির জন্য নিয়ে আসে ধ্বংস আর অন্য পুঁজিপতির জন্যে বিজয়। কিন্তু, প্রায়ই পুঁজির এরূপ সংযুক্তি ঘটে শান্তিপূর্ণভাবে ঃ স্টক কোম্পানী, কর্পোরেশন ইত্যাদি গঠনের মারফৎ। এ পর্ব সম্পর্কে পরে আমরা আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবো। একটি প্রতিষ্ঠানে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তি দ্বারা পুঁজির সংযুক্তির সকল ঘটনাকেই **পুঁজির কেন্দ্রীয়করণ** [centralization of capital] বলা হয়।

পুঁজির কেন্দ্রীভূতকরণ ও কেন্দ্রীয়করণ অব্যাহতভাবেই সংঘটিত করে মুষ্টিমেয় সংখ্যক ধনী লোকের হাতে পুঁজির পুঞ্জীভবন। মুষ্টিমেয় সংখ্যক লক্ষ-কোটিপতিরা, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারীরা নিয়ন্ত্রণ করে অপরিমেয় সম্পদরাজি। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য থাকে তাদের হাতের মুঠোয়। এভাবে পুঁজির কেন্দ্রীভূতকরণ ও কেন্দ্রীয়করণের ফলে শ্রেণী-দ্বন্দ্বগুলো আরো তীব্র হয়ে ওঠে, দুটি বিপরীত শ্রেণী – মুষ্টিমেয় বৃহৎ পুঁজিপতি আর ব্যাপক শোষিত সর্বহারাতে পুঁজিবাদী সমাজের বিভক্তি হয়ে ওঠে আরো স্পষ্ট।

পুঁজির কেন্দ্রীভূতকরণ ও কেন্দ্রীয়করণ অল্প কয়েকটি লোকের হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ কেন্দ্রীভূত করে বিপুলায়তন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পথ তৈরী করে দেয়। আমরা পূর্বেই দেখেছি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের চেয়ে বৃহদায়তন শিল্প অনেক বেশী সুবিধাজনক। কাজেই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ধনতন্ত্রে অধিক থেকে অধিকতর বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোই প্রাধান্য অর্জন করে, যেখানে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ লাভ করে। উদাহরণ স্বরূপ, এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান সমূহের আয়তনের ক্ষেত্রে ত্রিশ বছর সময়কালে (প্রতিষ্ঠান-প্রতি গড়পড়তা) যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার একটা তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেয়া হলো ঃ

	১৮৮৯	১৮৯৯	১৯০৯	১৯১৯
শ্রমিক সংখ্যা	৮·১	১৩·৮	২৪·১	৩৮·০
পুঁজি (হাজার ডলারে)	৬·৭	১৯·০	৬৮·৭	১৫৪·১
উৎপাদন (হাজার ডলারে)	১৩·৪	২৮·১	৭৭·২	২১৬·৯

বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান সমূহের দ্রুত বৃদ্ধির ঘটনা হলো এমনকি আরো অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যেখানে আয়তন অনুসারে প্রতিষ্ঠান-প্রতি শ্রমিকদের বন্টন ছিল নিম্নরূপ ঃ

*প্রতিষ্ঠান	১৮৯৫	১৯১৫
বৃহৎ (৫০০-এর বেশী শ্রমিক নিয়োগকারী)	৪৫·২%	৬১·২%
মাঝারী (৫০-৫০০ এর মধ্যে ,, ,,)	৩৮·৯%	৩০·৬%
ছোট (১০-৫০ ,, ,, ,, ,,)	১৫·৯%	৮·২%

* দশ জনের চেয়ে কম শ্রমিক নিয়োগকারী ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান সমূহকে হিসেবের মধ্যে নেয়া হয়নি।

১৮৯৫ সালে কোন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের গড়পড়তা সংখ্যা ছিল ৯৮·৫, ১৯১৫ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭৩·৪।

১৯০১ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত (অন্তর্ভুক্ত করা) দশ বছরে রাশিয়ায় শিল্পের কেন্দ্রীভূতকরণ প্রক্রিয়া প্রদর্শনকারী আরো বিস্তৃত তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হলো ঃ

প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রুপ	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		শ্রমিকের সংখ্যা (হাজারে)	
	১৯০১	১৯১০	১৯০১	১৯১০
৫০ জন পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগকারী	১২,৭৪০	৯,৯০৯	২৪৪	২২০
৫১-১০০ জন ,, ,,	২,৪২৮·	২,২০১	১৭১	১৫৯
১০১-৫০০ ,, ,, ,,	২,২২৮	২,২১৩	৪৯২	৫০৮
৫০০-১০০০ ,, ,,	৪০৩	৪৩৩	২৬৯	৩০৩
১০০০-এর উপর ,, ,,	২৪৩	৩২৪	৫২৬	৭১৩
মোট =	১৮,১০২	১৫,০৮০	১৭০২	১৯০৩

বিপ্লব-পূর্ব কালের পত্রিকা প্রাভদায় তাঁর অন্যতম এক নিবন্ধে এই সারণী ব্যবহার করে লেনিন লিখেছিলেন ঃ

"এটা হলো সকল পুঁজিবাদী দেশেরই সাধারণ চিত্র। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমে যায় ঃ পেটি-বুর্জোয়া, ছোট-খাট প্রস্তুতকারকরা ধ্বংস হয়ে যায় এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, পরিণত হয় কেরাণীতে, কোন কোন সময় সর্বহারায়। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিকভাবে শিল্পে তাদের অনুপাতটি আরো অধিক দ্রুত গতিতে বাড়ে। ১৯০১ সাল থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে প্রত্যেকটিতে ১,০০০-এর উপর শ্রমিক নিয়োগকারী বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা দেড়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ঃ ২৪৩ থেকে ৩২৪টিতে। ১৯০১ সালে এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় ৫ লক্ষ (৫,২৬,০০০) শ্রমিক নিযুক্ত ছিল, অর্থাৎ, মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের কম ; আর ১৯১০ সালে তাদের নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষেরও বেশী, মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী। বড় বড় ফ্যাক্টরীগুলো ছোট ছোট ফ্যাক্টরীগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং আরো অধিকতর ব্যাপক মাত্রায় উৎপাদন কেন্দ্রীভূত করেছে। ক্রমান্বয়েই স্বল্পতর সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে আরো বৃহত্তর সংখ্যক শ্রমিক জমায়ত হচ্ছে আর সম্মিলিত শ্রমিকদের শ্রম থেকে গোটা মুনাফাটাই মুষ্টিমেয় সংখ্যক কোটিপতির পকেটে চলে যাচ্ছে।"

পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবনের ঐতিহাসিক প্রবণতা

পুঁজিবাদ তার বিকাশের মধ্য দিয়ে শ্রমের আরো অধিক সামাজিকীকরণের দিকে এগিয়ে যায়। আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠান সমূহ, অঞ্চল ও গোটা দেশের মধ্যেকার সমস্ত ধরণের সম্পর্ক অভূতপূর্ব মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বেকার কম-বেশী স্বাধীন, শিল্পের স্বতন্ত্র ক্ষেত্রগুলি ভেঙে যেতে থাকে এবং কতকগুলি পরস্পর-সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পর আন্তঃ-নির্ভরশীল শাখায় পুনঃবিভক্ত হতে থাকে। পুঁজিবাদ বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের কাজকে এক সূত্রে গ্রহীত করে, অদৃশ্য বন্ধন দিয়ে তাদের একত্রে বেঁধে ফেলে, কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে উৎপাদনের সামাজিকীকরণ সমগ্রভাবে সমাজের স্বার্থে কিংবা ব্যাপক শ্রমজীবিদের স্বার্থে ঘটে না – তা ঘটে কেবল ক্ষুদ্র এক দল পুঁজিপতিদের স্বার্থে, যারা তাদের লাভের পরিমাণ বাড়াতেই সচেষ্ট। শ্রমের সামাজিকীকরণ বৃদ্ধির সাথে সাথে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার

শ্রমের পুনর্বিভাগ, আর পুঁজিপতিদের মধ্যেকার সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতাও যুগপৎ বৃদ্ধি পায়। একমাত্র উৎপাদন-যন্ত্রের উপর ব্যক্তি-মালিকানার বিলোপ সাধন এবং সমগ্রভাবে সমাজের নিকট এই মালিকানা হস্তান্তর করে, একমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণীর উচ্ছেদ ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠিত করেই এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান যায়।

পুঁজির কেন্দ্রীভূতকরণ ও কেন্দ্রীয়করণের সাথে সাথে ক্ষিপ্র গতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্প্রসারণই উৎপাদন-যন্ত্রের সামাজিকীকরণের, সমাজতান্ত্রিক নীতিমালার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠনের সকল শর্ত সৃষ্টি করে। যেসব বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে, কারিকরের কারখানা থেকে সেগুলো সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন। যেখানে অসংখ্য ক্ষুদে কারখানার কর্তৃত্ব হাতে তুলে নেয়াটা সমাজের পক্ষে কঠিন, সেখানে উৎপাদন যখন কয়েকটি বিরাট বিরাট কল-কারখানায় কেন্দ্রীভূত তখন সেই উৎপাদনের সামাজিকীকরণ করা সম্পূর্ণই সম্ভব।

পুঁজিবাদী পুঞ্জীভবনের ঐতিহাসিক প্রবণতাকে মার্কস নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন ঃ

"বলতে গেলে, নিজের শ্রমের অবস্থার সাথে বিচ্ছিন্ন, স্বাধীন শ্রমদানকারী ব্যক্তির একীভূতকরণের উপর যে স্ব-উপার্জিত ব্যক্তি-সম্পত্তি দাঁড়িয়ে আছে তার স্থানে আসে পুঁজিবাদী ব্যক্তি-সম্পত্তি, যার ভিত্তি হলো নামেমাত্র স্বাধীন অন্যের শ্রমের অর্থাৎ মজুরী-শ্রমিকের শোষণ।

"যে মুহূর্তে পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া পুরানো সমাজকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যথেষ্টভাবে পচিয়ে দেয়, যে মুহূর্তে শ্রমিকরা পরিণত হয় সর্বহারায়, তাদের শ্রমের উপকরণগুলি পরিণত হয় পুঁজিতে, যে মুহূর্তে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি তার নিজের পায়ের উপর দাঁড়ায়, তখন শ্রমের আরো অধিক সামাজিকীকরণ এবং জমি ও অন্যান্য উৎপাদন-যন্ত্রের সামাজিক-ভাবে-ব্যবহার-করায় আরো অধিক রূপান্তর সাধন, সে কারণে, উৎপাদনের সর্বজনীন যন্ত্রগুলো এবং তার সাথে সাথে ব্যক্তি-মালিকদের আরো অধিক উচ্ছেদটা নতুন রূপ নেয়। এখন আর যাকে উচ্ছেদ করার থাকে সে আর নিজের জন্য শ্রমে নিযুক্ত শ্রমিক নয় বরং সে হলো বহু শ্রমিকের শোষণকারী পুঁজিপতি। এই উচ্ছেদটা সাধিত হয় পুঁজিবাদী উৎপাদনের নিজের অন্তর্নিহিত নিয়মের কার্যক্রম দ্বারা, পুঁজির কেন্দ্রীয়করণের দ্বারা। এক একজন পুঁজিপতি সব সময় অনেক পুঁজিপতির বিনাশ ঘটায়। এই কেন্দ্রীয়করণের বা মুষ্টিমেয় কয়েক জন পুঁজিপতির দ্বারা অনেক পুঁজিপতির উচ্ছেদের সাথে সাথে, ক্রমবর্ধমান মাত্রায় বিকাশ লাভ করে শ্রম-প্রক্রিয়ার সমবায় রূপ, বিজ্ঞানের সচেতন প্রযুক্তিগত প্রয়োগ, জমির পদ্ধতিগত চাষাবাদ, শ্রমের যন্ত্রগুলির কেবল সর্বজনীনভাবে ব্যবহারোপযোগী শ্রমের যন্ত্রে রূপান্তর সাধন, সম্মিলিত তথা সামাজিকীকৃত শ্রমের উৎপাদন-যন্ত্র হিসেবে তাদের ব্যবহারের দ্বারা যাবতীয় উৎপাদন-যন্ত্রগুলোর ব্যয় সংকোচ, বিশ্ব বাজারের জালে সকল জাতির জড়িয়ে পড়া, আর এর সাথে সাথে, পুঁজিবাদী শাসনের আন্তর্জাতিক চরিত্র। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ার সকল সুবিধাবলীকে যারা আত্মসাৎ করে এবং একচেটে অধিকারভুক্ত করে সেই বৃহৎ পুঁজিপতিদের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাসপ্রাপ্তির সাথে সাথে বাড়তে থাকে দুর্দশা, নিপীড়ন, দাসত্ব, অবনতি ও শোষণের পরিমাণ ; কিন্তু সেই সাথে বাড়তে থাকে শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্রোহও, যে শ্রেণী সংখ্যায় নিয়তই বাড়ছে এবং খোদ পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাটির দ্বারাই সুশৃংখল, ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হয়ে উঠছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সাথে সাথে আর অধীনেই যে একচেটে পুঁজিবাদ জন্ম নিয়েছে ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তাই আবার সেই উৎপাদন-পদ্ধতির পায়ে শৃংখল হয়ে উঠেছে। উৎপাদন-যন্ত্রের কেন্দ্রীয়করণ এবং শ্রমের সামাজিকীকরণ অবশেষে এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছায় যেখানে সেগুলো তাদের পুঁজিবাদী কাঠামোটিরই সম্পূর্ণ বিরোধী হয়ে ওঠে। সেই কাঠামোটি তখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পুঁজিবাদী ব্যক্তি-সম্পত্তির মৃত্যুঘন্টা বেজে ওঠে। উচ্ছেদকারীরাই তখন উচ্ছেদ হয়ে যায়।" [মার্কস, "পুঁজি", ১ম খন্ড]

পুনরুৎপাদন ও পণ্যের বিক্রয়

আমরা দেখেছি যে, প্রত্যেক পুঁজিপতিই উৎপাদন শুরু করতে গিয়ে উৎপাদনের উপকরণ বা যন্ত্রগুলি (কাঁচামাল, জ্বালানী) বাজার থেকে কিনে এবং শ্রমিক নিয়োগ করে (অর্থাৎ, শ্রমশক্তি ক্রয় করে)। কিন্তু এখন তার বাৎসরিক উৎপাদন শেষ হয়েছে। কাঁচামাল ও জ্বালানী খরচ হয়ে গিয়েছে, শ্রমিকরা তাদের সারা বৎসরের শ্রম খরচ করেছে, বিপুল পরিমাণ উৎপন্ন পণ্য উৎপাদনকারীর গুদামে এখন মজুত রয়েছে, ধরা যাক, সেগুলি হল জুতা। এখন উৎপাদনের **পুনরাবৃত্তির** জন্যে কি কি দরকার ? জুতার উৎপাদন **অব্যাহত রাখার** জন্যে কি কি প্রয়োজন ?

এটা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান যে, উৎপাদকের জন্যে দরকার হলো **নতুন** এক দফা কাঁচামাল ও জ্বালানী ক্রয় করা, পরবর্তী বছরের জন্যে পুনরায় শ্রমিক নিয়োগ করা। কিন্তু এই কাজের জন্য তার চাই টাকা। উৎপাদক কোথা থেকে টাকা পাবে ? সে অবশ্য টাকা ধার করতে পারে, কিন্তু এর অর্থ হলো এই যে শেষাবধি তাকে তা শোধ করে দিতে হবে। নিজের তৈরী পণ্য **বিক্রী করেই** উৎপাদনকারীকে এই টাকাটা পেতে হবে (কিংবা, কোন কোন সময় বলা হয়, তাকে অবশ্যই তা **নগদ টাকায় পরিণত করতে হবে)**। উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে উৎপাদনকারীকে পুনরায় শ্রমশক্তি ও উৎপাদনের উপকরণ সমূহ ক্রয় করতে হবে এবং তার পরবর্তী উৎপাদন-চক্র শুরু করতে হবে। সুতরাং উৎপাদিত পণ্যের নগদ টাকায় পরিণত করাটা হলো উৎপাদনের পুনরাবৃত্তির এক **প্রয়োজনীয় শর্ত**, পুনরুৎপাদনের এক প্রয়োজনীয় শর্ত। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, স্বতন্ত্র পুঁজিপতির জন্যে পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় তিনটি স্তর বা ধাপ রয়েছে ঃ (১) উৎপাদনের উপকরণ ও শ্রমশক্তি ক্রয় ; (২) খোদ উৎপাদন-প্রক্রিয়া ; (৩) উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়। এটা সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, দ্বিতীয় স্তর হলো **উৎপাদনের প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া**, যে প্রক্রিয়ায় শ্রমিকরা পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে। প্রথম ও শেষ স্তর হলো **সঞ্চলনের** [circulation] **প্রক্রিয়া** ঃ প্রথম স্তরে পুঁজিপতি তার টাকাকে পণ্যে রূপান্তরিত করে, বিপরীতপক্ষে, শেষ স্তরে, সে তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রী করে এবং সেগুলোকে নগদ টাকায় পরিণত করে। যাই হোক না কেন, উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্যে, অব্যাহত উৎপাদনের জন্যে, পুনরুৎপাদনের জন্য, যেসব জিনিস-পত্রাদি লাগে তা কেনার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ তার এই টাকা দরকার। এভাবে পুঁজি আবর্তন-চক্রের মধ্য দিয়ে বারবার পরিক্রম করতে থাকে।

এটা সুবিদিত যে, পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি একজন নয়, বরং তাদের সংখ্যা অনেক, যারা নিজেদের মধ্যে নিয়ত সংগ্রাম করছে। নিজের পক্ষে সবচেয়ে ভাল বলে যা সে মনে করে, সেভাবেই প্রত্যেক পুঁজিপতি তার পুঁজিটা ব্যবহার করে। স্বতন্ত্র পুঁজিপতিদের কার্যক্রমের আর ফলশ্রুতি স্বরূপ স্বতন্ত্র পুঁজিসমূহের চলাচলের [movement] মধ্য দিয়ে একে অপরের সাথে তারা যেমন সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং তেমনি সংমিশ্রিতও হয়। একত্রে ধরলে স্বতন্ত্র পুঁজিগুলোর গোটা পরিমাণটি গঠন করছে সমগ্রভাবে সামাজিক পুঁজি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুনরুৎপাদনটি ঘটে পৃথক পৃথক স্বাধীন পুঁজির চলাচলের এই সংমিশ্রণের [intermingling] মধ্যে, যেগুলো একই সাথে আবার গঠন করছে সমগ্রভাবে সামাজিক পুঁজি। পুনরুৎপাদনের কাজটি কার্যকরী করতে হলে কেবলমাত্র স্বতন্ত্র পুঁজিপতির পক্ষেই নয়, **গোটা পুঁজিপতি সম্প্রদায়কেই** তাদের প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রীকে নগদ টাকায় পরিণত করতে হবে।

"সামাজিক পুঁজির পুনরুৎপাদন ও সঞ্চলনের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা দানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মার্কস-এর তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক মূল্য।" [লেনিন, "মূল্য আদায়ের সমস্যা সম্পর্কে আরো কিছু"]

সামগ্রিকভাবে সামাজিক পুঁজির পুনরুৎপাদন ও সঞ্চলনের প্রক্রিয়াটির ব্যাখ্যা দান করে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব পুঁজিবাদী **পুনরুৎপাদনের** প্রক্রিয়ায় সর্বাপেক্ষা গভীর যে দ্বন্দ্ব সমূহ দেখা দেয় সেগুলোকেও উদ্ঘাটিত করে দেয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে উৎপাদিত সমস্ত পণ্য সম্ভারের নগদ দাম আদায় করার জন্য যে জটিল **শর্তসমূহ** আবশ্যক, পুনরুৎপাদনের তত্ত্ব সেগুলোকে স্পষ্ট করে দেয়। পুঁজিবাদী বিকাশের খোদ প্রক্রিয়াটি কিভাবে নিয়তই এই শর্তগুলি ক্ষুণ্ন করে পুনরুৎপাদনের গোটা প্রক্রিয়ায় ফাটল সৃষ্টি করে, আর তার ফলে প্রচণ্ড ধাক্কা ও সংকট দেখা দেয়, পুনরুৎপাদনের তত্ত্বটি তাও দেখিয়ে দেয়।

সরল ও বর্ধিত পুনরুৎপাদনে নগদ দাম আদায়ের শর্তাবলী

পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের ব্যবস্থায় পণ্য-সামগ্রীকে কিভাবে টাকায় পরিণত করা হয় (বা নগদ দাম আদায় করা হয়) সেই শর্তগুলিকে আরো নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাক। যে কোন একক পণ্যের মতোই, কোন পুঁজিবাদী দেশের মোট উৎপন্ন-দ্রব্যের মূল্যটা হলো নিম্নোক্ত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত ঃ (১) স্থির পুঁজি, (২) পরিবর্তনশীল পুঁজি এবং (৩) উদ্বৃত্ত মূল্য। আমরা আরো জানি যে, বিভিন্নমুখী সকল প্রতিষ্ঠানের সমগ্রগুলোকেই দু'টি বৃহৎ গ্রুপে ভাগ করা যায় ঃ (১) উৎপাদনের উপকরণ বা যন্ত্র (যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, জ্বালানী ইত্যাদি) প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, এবং (২) ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

"নগদ দাম আদায়ের সমস্যাটির অন্তর্ভূক্ত হলো পুঁজিবাদী উৎপন্ন-দ্রব্যের প্রতিটি ভাগের জন্যে, মূল্যের (স্থির পুঁজি, পরিবর্তনশীল পুঁজি ও উদ্বৃত্ত মূল্যের) দিক থেকে এবং তার বস্তুগত রূপের (উৎপাদনের উপকরণ, ভোগ্যদ্রব্য, বিশেষ করে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ও বিলাস দ্রব্য) দিক থেকে সমতুল্য পুঁজিবাদী উৎপন্ন-দ্রব্যের আরেকটি ভাগ বাজারে খুঁজে পেতে হবে।" [লেনিন, "নারদপন্থী অর্থনীতিবিদদের তত্ত্বগত ভ্রান্তি"]

বিষয়টি সহজভাবে বোঝার জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি যে, দেশের গোটা অর্থনীতিই পুঁজিবাদী নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত। প্রকৃত অর্থে বিশ্বের কোন অংশের ক্ষেত্রেই এ কথাটি পুরোপুরি সত্য নয় ; এমনকি সবচেয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশেও কিছু পরিমাণে কারিকর ও স্বতন্ত্র কৃষক-উৎপাদন বহাল থাকে, যা পুঁজিবাদী প্রকৃতির নয়। যাই হোক, আমরা যদি এরূপ এক অবিমিশ্র, বা যাকে বলা হয়, বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনীতির কথা ধরি, তাহলে সরল পুনরুৎপাদন ব্যবস্থার অধীনে আমরা নিম্নোক্ত পরিস্থিতি দেখতে পাব। প্রথম 'গ্রুপ'-ভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে উৎপাদিত সমস্ত উৎপন্ন-দ্রব্য অবশ্যই ঐ বৎসরে উভয় 'গ্রুপ' দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর সমান হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি ঐ বৎসরে ২ কোটি টন কয়লা ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাহলে কয়লা খনিগুলির বাৎসরিক উৎপাদনও হবে ২ কোটি টন। যদি ঐ বৎসরে ১ লক্ষ তাঁত ব্যবহারের দরুন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে নতুন তাঁত উৎপাদনের সংখ্যাও হতে হবে এর সমান। দ্বিতীয় 'গ্রুপ'-ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে বলতে গেলেও, তাদের দ্বারা উৎপাদিত সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী, তথা ভোগ্য দ্রব্যগুলোর মূল্য উভয় গ্রুপের প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্ত শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের সংযুক্ত আয়ের সমান হতে হবে। আর প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে, যেহেতু আমাদের ধারণা অনুযায়ী এই সমাজে আর কোন শ্রেণী নেই সেহেতু উৎপাদিত সমস্ত ভোগ্যদ্রব্যই ব্যবহৃত হয়ে যাবে শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের দ্বারা। কিন্তু শ্রমিক ও পুঁজিপতিরা কেবলমাত্র সে পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রীই কিনতে পারে যা তাদের সম্মিলিত আয়ে কুলায়, তার বেশী নয় ঃ শ্রমিকরা কিনতে পারে তাদের মজুরীর সমান, আর পুঁজিপতিরা তাদের উদ্বৃত্ত-মূল্যের সম পরিমাণ।

বাৎসরিক উৎপাদনের বিভিন্ন অংশগুলোর নগদ দাম কিভাবে আদায় হয় ? প্রথমোক্ত 'গ্রুপের' স্থির পুঁজি ঐ গ্রুপের মধ্য থেকেই আদায় হবে, কারণ তা উৎপাদনের উপকরণের রূপেই বিরাজমান থাকে। দ্বিতীয় 'গ্রুপের' পরিবর্তনশীল পুঁজি ও উদ্বৃত্ত মূল্যও একই 'গ্রুপের' মধ্য থেকেই আদায় হবে, কারণ তা বিরাজমান থাকে ভোগ্য দ্রব্যের রূপেই। দুটি 'গ্রুপের' পরস্পরের মধ্যে কোন্ কোন্ অংশের বিনিময় ঘটবে ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও খুব কঠিন নয়। প্রথম 'গ্রুপের' পরিবর্তনশীর পুঁজি ও উদ্বৃত্ত মূল্যের বিনিময় হবে ভোগ্য-দ্রব্যের সাথে আর দ্বিতীয় 'গ্রুপের' স্থির পুঁজির বিনিময় হবে উৎপাদনের উপকরণের সাথে। কোনরূপ বাধা-বিপত্তি ছাড়া বিনিময় যাতে ঘটতে পারে সেইজন্য এইসব অংশগুলির স্পষ্টতঃই পরস্পরের সমান হওয়া চাই। সুতরাং সরল পুনরুৎপাদনের একটি শর্ত হলো নিম্নোক্ত সমীকরণ ঃ প্রথম 'গ্রুপের' পরিবর্তনশীল পুঁজি ও উদ্বৃত্ত-মূল্য অবশ্যই সমান হতে হবে দ্বিতীয় 'গ্রুপের' স্থির পুঁজির সাথে।

মার্কস স্থির পুঁজিকে [constant capital] **c** দ্বারা, পরিবর্তনশীল পুঁজিকে [variable capital] **v** দ্বারা এবং উদ্বৃত্ত-মূল্যকে [surplus value] **s** দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। উৎপাদনকারী 'গ্রুপ' দুটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে রোমান সংখ্যা **I** এবং **II** দ্বারা। তাহলে সরল পুনরুৎপাদনের সূত্রটি হয় নিম্নরূপ ঃ

$$\mathbf{I\,(v+s) = IIc}$$

এখন দেখা যাক, বর্ধিত পুনরুৎপাদনের অধীনে নগদ দাম আদায়ের শর্তগুলি কি। আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে, সরল পুনরুৎপাদন হলো কেবল একটা কাল্পনিক বিষয় এবং প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ এগিয়ে চলে বর্ধিত পুনরুৎপাদনের পথ ধরে। বর্ধিত পুনরুৎপাদনের অধীনে উৎপাদিত দ্রব্যগুলির নগদ দাম আদায়ের শর্তগুলি কিভাবে বদলে যায় ? বর্ধিত পুনরুৎপাদনের অর্থ হলো পুঁজির পুঞ্জীভবন। একটি প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রসারিত করতে গেলে, এটাকে বড় করতে হবে, না-হয় আরেকটি নতুন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে হবে। যেভাবেই তা ঘটুক না কেন, কিছু নতুন উৎপাদনের উপকরণ বা উৎপাদন-যন্ত্র যোগ করতে হবে। কিন্তু এসব উৎপাদন-যন্ত্রগুলোই প্রথমত উৎপাদন করতে হবে, কারণ এগুলো নিজে থেকে জন্ম নেয় না। এর অর্থ হলো এই যে, যে প্রথমোক্ত 'গ্রুপের' প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদনের উপকরণ বা যন্ত্রগুলি তৈরী করে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির অবশ্যই থাকতে হবে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে আবশ্যক কিছুটা পরিমাণে অতিরিক্ত উৎপাদনের উপকরণ। আর এর অর্থ হলো এই যে, প্রথমোক্ত 'গ্রুপের' পরিবর্তনশীল পুঁজি ও উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণটিকে অবশ্যই হতে হবে দ্বিতীয় 'গ্রুপের' স্থির পুঁজির চেয়ে অধিকতর বড়। কেবল এই ক্ষেত্রেই বর্ধিত পুনরুৎপাদনের জন্যে আবশ্যক অতিরিক্ত উৎপাদনের উপকরণ বা যন্ত্র থাকবে। এর অর্থ হলো এই যে, **I (v+s)** কে অবশ্যই **IIc**-এর চেয়ে অধিকতর বড় হতে হবে।

আমরা জানি যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে পরিবর্তনশীল পুঁজির চেয়ে স্থির পুঁজি অধিকতর দ্রুত হারে বাড়ে। পুঁজির আঙ্গিক গঠন-প্রকৃতির একটা বৃদ্ধি ঘটে, নিযুক্ত শ্রমিক-প্রতি যন্ত্রপাতির পরিমাণ বাড়ে। আমরা আরো দেখি যে, বর্ধিত পুনরুৎপাদনের অধীনে প্রথমোক্ত 'গ্রুপের' পরিবর্তনশীল পুঁজি (উদ্বৃত্ত-মূল্য সহ) দ্বিতীয় 'গ্রুপের' স্থির পুঁজির চেয়ে অবশ্যই অধিকতর দ্রুত বাড়াতে হবে। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, প্রথমোক্ত 'গ্রুপের' স্থির পুঁজির ক্ষেত্রে বৃদ্ধি দ্বিতীয় 'গ্রুপের' স্থির পুঁজির বৃদ্ধিকে অবশ্যই বিপুলভাবে ছাড়িয়ে যাবে। আর এর অর্থ হলো এই যে, বর্ধিত পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন-উপকরণ বা যন্ত্র তৈরীতে নিয়োজিত সামাজিক উৎপাদনের অংশটিকে অবশ্যই ভোগ্য-দ্রব্য তৈরীতে নিযুক্ত অংশের চেয়ে দ্রুত গতিতে এগোতে হবে।

এবার দেখা যাক, বর্ধিত পুনরুৎপাদনের অধীনে নগদ দাম আদায়ের জটিলতর শর্তগুলি কি। সরল পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমস্তটাই পুঁজিপতির দ্বারা ভোগ-ব্যবহারে নিঃশেষ হয়ে যায়। বর্ধিত পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে, প্রত্যেক (উৎপাদনকারী) 'গ্রুপের' উদ্বৃত্ত-মূল্য দুটি অংশে বিভক্ত ঃ (১) ভোগ-ব্যবহারে নিঃশেষিত অংশ, এবং (২) পুঞ্জীভবন-কৃত অংশ। পুঞ্জীভবন-কৃত অংশটি (মূল্য) পুঁজির সাথে যুক্ত হয়। যেহেতু প্রত্যেক 'গ্রুপের' পুঁজিই স্থির ও পরিবর্তনশীল অংশ নিয়েই গঠিত, সেহেতু পুঞ্জীভবন-কৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যও অবশ্যই দুটি ভাগে বিভক্ত হবে ঃ স্থির ও পরিবর্তনশীল। আমরা গোটা উদ্বৃত্ত-মূল্যকেই ইংরেজী অক্ষর **s** দ্বারা চিহ্নিত করেছি। পুঁজিপতিদের দ্বারা ভোগ-ব্যবহার কৃত (উদ্বৃত্ত-মূল্যের) অংশটিকে ইংরেজী অক্ষর **a** দ্বারা, আর পুঞ্জীভবন-কৃত অংশটিকে ইংরেজী অক্ষর **b** দ্বারা চিহ্নিত করা যাক। পুঞ্জীভবন-কৃত উদ্বৃত্ত-মূল্যের যে অংশটা স্থির পুঁজির সাথে যুক্ত করা হয় তাকে আমরা চিহ্নিত করবো **bc** দ্বারা, আর পরিবর্তনশীল পুঁজির সাথে যুক্ত অংশকে চিহ্নিত করবো **bv** দ্বারা। এখন তাহলে বর্ধিত পুনরুৎপাদনের অধীনে নগদ দাম আদায়ের প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্ত রূপ ধারণ করবে। সরল পুনরুৎপাদনের মতোই উৎপাদনকারীদের দ্বিতীয় 'গ্রুপকে' প্রথম 'গ্রুপের সাথে তার স্থির পুঁজি **c** অবশ্যই বিনিময় করতে হবে ; বৎসরের শেষে সেটা বিরাজমান থাকে ভোগ্য-দ্রব্য রূপে, কিন্তু উৎপাদনের প্রয়োজনে সেটা উৎপাদনের উপকরণ বা যন্ত্র রূপে, অর্থাৎ, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি রূপে পাওয়া দরকার। পালাক্রমে প্রথম 'গ্রুপকে' আবার দ্বিতীয় 'গ্রুপের' সাথে তাদের পরিবর্তনশীল পুঁজিকে বিনিময় করতে হবে, যে পুঁজিটা লাগবে শ্রমিকদের ভোগের কাজে, কিন্তু তা বিরাজমান থাকে উৎপাদনের উপকরণ রূপে। দ্বিতীয় গ্রুপের উদ্বৃত্ত-মূল্যের ভোগ-ব্যবহার কৃত অংশ বিরাজমান থাকে ভোগ্য-দ্রব্য রূপে ; সে কারণে প্রথম 'গ্রুপের' সাথে তা বিনিময় করার দরকার হয় না। প্রথম 'গ্রুপের' উদ্বৃত্ত-মূল্যের ভোগ-ব্যবহারকৃত অংশটা, যা **a** দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, তা থাকে উৎপাদনের উপকরণ বা যন্ত্র রূপে ; সুতরাং দ্বিতীয় 'গ্রুপের' দ্বারা উৎপাদিত ভোগ্য-দ্রব্যের সাথে প্রথমতঃ তা বিনিময় করতে হবে। প্রথম 'গ্রুপের' উদ্বৃত্ত-মূল্যের পুঞ্জীভবনকৃত অংশ বিভক্ত হয়ে পড়ে **bc** অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণ বা যন্ত্র এবং **bv** অর্থাৎ শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য-দ্রব্যে। স্পষ্টতঃ যে দ্বিতীয় 'গ্রুপের' হাতে রয়েছে সমস্ত ভোগ্য-দ্রব্য, সেই দ্বিতীয় 'গ্রুপের" সাথে **bv** অংশ বিনিময় করতে হবে। কিন্তু, পালাক্রমে, প্রথম 'গ্রুপের' সাথে দ্বিতীয় 'গ্রুপকে' বিনিময় করতে হবে **bc** অংশ, যা তার স্থির পুঁজির সাথে যোগ করতে হবে, অন্যদিকে দ্বিতীয় গ্রুপের **bv** অংশ বিনিময় করতে হবে না ; কারণ এইগুলি হওয়া চাই শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য-দ্রব্য এবং সেই রূপেই দ্বিতীয় 'গ্রুপের' কাছে বর্তমান থাকে। এখন আমরা দেখতে পারছি বর্ধিত পুনরুৎপাদনের জন্যে প্রথম ও দ্বিতীয় 'গ্রুপের' মধ্যে কি রকম বিনিময় সম্পন্ন হবে। প্রথম 'গ্রুপকে' বিনিময় করতে হবে **c** এবং **bc** অংশগুলি। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, উপরোক্ত দুটি দিকের প্রত্যেক অংশের পরিমাণগুলি যদি পরস্পরের সমান হয়, অর্থাৎ যখন আমরা পাই **I (v+a+bv) = II (c+bc)**, তাহলেই বিনিময় ঘটতে পারে। বর্ধিত পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে নগদ দাম আদায়ের এটাই হলো শর্ত।

পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের দ্বন্দ্বসমূহ

সরল ও বর্ধিত পুনরুৎপাদনের অধীনে পণ্যের নগদ মূল্য আদায়ের জন্যে প্রয়োজনীয় শর্তগুলি কি কি মার্কসীয় তত্ত্ব তা আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেয়। কিন্তু মার্কসীয় তত্ত্ব

মোটেই একথা জোর দিয়ে বলে না যে, এসব শর্ত বাস্তবে বর্তমান রয়েছে। বিপরীত পক্ষে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামগ্রিক অগ্রগমনটাই ঘটে অব্যাহত **পরিবর্তনশীলতা** (variations) এবং **বিচ্যুতির**(deviations)-এর মধ্য দিয়ে, শিল্পের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকা উচিত সেসবের ক্রমাগত **লঙ্ঘনের** (infringement) মধ্য দিয়ে।

পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত সকল দ্বন্দ্বকেই প্রকাশিত করে দেয়। পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায়, **পুঁজিবাদের মৌলিক দ্বন্দ্ব** – উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর ভোগ-আত্মসাৎ-এর ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী চরিত্রের মধ্যেকার দ্বন্দটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহ হাজার হাজার শ্রমিকদের একত্রিত করে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কাজই সমগ্রভাবে সমাজের পক্ষে অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয়। এসব প্রতিষ্ঠান সমাজ বিকাশের সকল শক্তিকে, প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সকল শক্তিকে, হাজার হাজার মানুষের ঐক্যবদ্ধ সামাজিক শ্রমের শক্তিকে উৎপাদন-কর্মে নিয়োজিত করে। কিন্তু এসবের মালিক থাকে মুষ্টিমেয় সংখ্যক পুঁজিপতিরা যারা এগুলো পরিচালনা করে তাদের নিজস্ব লাভালাভের জন্য, হন্যে হয়ে ধেয়ে বেড়ায় সর্বাধিক পরিমাণ মুনাফার জন্যে।

পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে **বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়।** যেভাবে আমরা দেখেছি তেমনিই, পুনরুৎপাদন ও পুঁজির পুঞ্জীভবনের ফলে, একদিকে বৃদ্ধি পায় অপরিমেয় সম্পদ, যার মালিক হলো ক্ষুদ্র এক দল পুঁজিপতি, আর অন্যদিকে, বাড়ে শোষণ, নিপীড়ন, দুর্দশা এবং, একই সাথে, ব্যাপক সর্বহারা শ্রেণীর বিক্ষোভ ও সংগ্রামের আকাংখা।

পুঁজিবাদের মৌলিক দ্বন্দ্বটি – উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর ভোগ-আত্মসাৎ-এর ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্বটি – সুস্পষ্টভাবে নিজেকে প্রকাশ করে **উৎপাদনের নৈরাজ্যের** (অর্থাৎ, তার পরিকল্পনা-হীনতার) মধ্য দিয়ে। পুঁজিবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সামাজিক উৎপাদনের এই নৈরাজ্য সম্পর্কে এঙ্গেলস্ নিম্নোক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ

" ..... পণ্য-উৎপাদনের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই সমাজের মধ্যে উৎপাদনকারীরা তাদের নিজস্ব সামাজিক সম্পর্কের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। প্রত্যেকের স্বীয় অধিকারে যে উৎপাদন-যন্ত্র রয়েছে তার সাহায্যে প্রত্যেকেই উৎপাদন করে নিজের জন্য এবং বিনিময়ের মাধ্যম দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত অভাব পূরণের জন্যে। কেউই জানেনা, সে যে জিনিসটি উৎপাদন করছে, তা কি পরিমাণে বাজারে আমদানী হয়, কিংবা বাজারে তার চাহিদাটা কত, কেউই জানেনা তার নিজের তৈরী জিনিসটা দিয়ে কোন প্রকৃত প্রয়োজন মিটবে কিনা, কিংবা তা বিক্রী করে তার পুরো খরচ উঠবে কি না, অথবা সে আদৌ তা বেচতে পারবে কিনা। সামাজিক উৎপাদনে রাজত্ব করে নৈরাজ্য। কিন্তু অন্যান্য সকল উৎপাদন-রূপের মতোই, পণ্য-উৎপাদনের রয়েছে নিজস্ব নিয়ম-বিধি, যা তার নিজের মধ্যেই অন্তর্নিহিত এবং তা থেকে অবিচ্ছেদ্য ; আর নৈরাজ্য সত্ত্বেও, নৈরাজ্যের মধ্যে এবং নৈরাজ্যের মধ্য দিয়ে এসব নিয়ম সজোরে নিজেদের প্রকাশ করে। সামাজিক সম্পর্কের একমাত্র যে রূপটি বিদ্যমান থাকে তা হলো বিনিময় এবং সে রূপের মধ্যেই এসব নিয়ম নিজেদের অভিব্যক্ত করে, এবং প্রতিযোগিতার বাধ্যতামূলক নিয়ম হিসাবে স্বতন্ত্র উৎপাদকদের উপর নিজেদের বলবৎ করে। এই কারণে, প্রথমতঃ এমনকি এসব উৎপাদকদের কাছেও এই নিয়মগুলি থাকে অজানা, এবং ক্রমান্বয়ে, কেবলমাত্র দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই সেগুলো তাদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। সুতরাং এই নিয়মগুলো উৎপাদকদের ছাড়াই এবং উৎপাদকদের বিরুদ্ধেই, তাদের উৎপাদন-রূপের স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবেই জাহির করে নিজেদেরকে, কাজ করে অন্ধভাবে। উৎপন্ন-দ্রব্য প্রভুত্ব করে উৎপাদকের উপর।" [এঙ্গেলস্, "এ্যান্টি-ড্যুরিং", "বিজ্ঞানে বিপ্লব", পৃঃ ৩০৫]

পুঁজিবাদী নগদ দাম আদায়ের শর্তগুলি কিরূপ জটিল তা আমরা দেখেছি। কিন্তু এই শর্তগুলি কঠোরভাবে পালন করা হচ্ছে কি না তা দেখে কে ? এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মতো পরিকল্পনাহীন, নৈরাজ্যিক ব্যবস্থায়, নগদ দাম আদায়ের এই শর্তগুলি কেবলমাত্র **বাজারের অন্ধ শক্তিগুলোর** দ্বারাই কার্য্যকরী হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে পণ্যের নগদ দাম আদায়ের জন্যে শিল্পের বিভিন্ন শাখার মধ্যেকার পারস্পরিক যে সম্পর্কসমূহ থাকাটা হলো প্রয়োজনীয় সেই সম্পর্কসমূহ অসংখ্য পরিবর্তন ও বিচ্যুতি (variations and deviations) এবং বিরামহীন লঙ্ঘনের মধ্য দিয়েই তাদের পথ করে নেয়।

শিল্পের সীমাহীন সম্প্রসারণের অভিমুখী প্রবণতা পুঁজিবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত। মুনাফা লাভের প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক পুঁজিপতিই বাজারে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ পণ্য এনে উপস্থিত করার ঝোঁক প্রদর্শন করে। সে তার প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের, তার উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু যে পণ্যই উৎপাদন করা হোক না কেন তা কারো না কারো কাছে বিক্রয় করতে হবে। বিপরীত পক্ষে, পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত চরিত্রটাই এমন যে তা ব্যাপক সংখ্যক জনগণের মধ্যে **ভোগের পরিমাণটা কমিয়ে সবচেয়ে শোচনীয় নিম্নতম স্তরে নামিয়ে আনার ঝোঁক প্রদর্শন করে।** পুঁজিবাদী বাজারের যে সম্প্রসারণটা ঘটে তা কিছুটা পরিমাণে হয়ে থাকে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণের কারণে উৎপাদনের উপকরণগুলির যে চাহিদা বৃদ্ধি পায় তার দরুন। তবে শেষ পর্যন্ত এইসব উৎপাদনের উপকরণ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমবর্ধমান পরিমাণ ভোগ্য-পণ্য উৎপাদন করতে থাকে। কিন্তু সর্বহারা জনগণের দারিদ্র্যের কারণে এসব পণ্যের বাজার থাকে সীমাবদ্ধ। এভাবে, পুঁজিবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত **উৎপাদন ও ভোগের** মধ্যেকার দ্বন্দ্বটি পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় নিজেকে প্রকাশ করে দেয়, যে দ্বন্দ্বটি হলো কেবল অন্যতম এক রূপ যার মধ্যে পুঁজিবাদের মৌলিক দ্বন্দ্ব – উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর ভোগ-আত্মসাতের ব্যক্তিগত প্রকৃতির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব – অভিব্যক্ত হয়।

কিন্তু, পুঁজিবাদের এই দ্বন্দ্বগুলিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, এই সিদ্ধান্ত টানাটা হবে সম্পূর্ণতঃই ভুল যে, সাধারণভাবে পুঁজিবাদ টিকে থাকতে পারে না। বর্তমান সময়ে পুঁজিবাদ বেঁচে রয়েছে তার পতন ও ধ্বংসের যুগে। তা সত্ত্বেও, একটা নির্দিষ্ট যুগে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিজের সাথে সাথে নিয়ে এসেছিল একটি উন্নততর ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমাজের উৎপাদিকা-শক্তি সমূহের বিকাশ। পর্যায়-পরম্পরায় বহুসংখ্যক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ছাড়া পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটতে পারে না, আর এই দ্বন্দ্বগুলি লক্ষ্য করলে সহজেই পুঁজিবাদের ঐতিহাসিকভাবে ক্ষণস্থায়ী চরিত্রটি আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, এক উন্নততর রূপের দিকে সমাজের উত্তরণের প্রবণতাটির শর্ত ও কারণ সমূহ পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

পুনরুৎপাদনের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বটি পুঁজিবাদের সমর্থকদের সমস্ত সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন যেকোন ধরণের বাধা-বিঘ্ন, আঘাত ও সংকট ছাড়াই স্বাচ্ছন্দ্য ও স্থিরতা সহকারে এগিয়ে চলতে পারে – পুঁজিবাদের ভাড়াটে অনুচরদের এই আবিষ্কারের সম্পূর্ণ অসারতা এই তত্ত্বটি উদ্ঘাটিত করে দেয়। নিজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের কারণে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন আদৌ ঘটতে পারে না বলে যে অভিমতটি ছিল এই তত্ত্ব তারও অসারতা চূড়ান্তভাবেই দেখিয়ে দেয়। পুঁজিবাদ যখন তার প্রথম পদক্ষেপই মাত্র গ্রহণ করেছিল সেই সময়েই এই অভিমতের অনুসারীরা পুঁজিবাদ "অসম্ভব" বলে ঘোষণা করেছিল। আধুনিক অবস্থায় এই ভ্রান্ত তত্ত্বের অনুসারীরা এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক সিদ্ধান্তে এসেছে যে, নিজের অন্তর্নিহিত ধ্বংসকর দ্বন্দ্বগুলির কারণে,

সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষ থেকে কোনরূপ বিপ্লবী সংগ্রাম ছাড়াই পুঁজিবাদ, স্বয়ংক্রিয়ভাবে, নিজে থেকেই অনিবার্যভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

মার্কস পুঁজিবাদী উৎপাদনের নিয়মটি উদ্ঘাটন করেছেন। মার্কস দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুনরুৎপাদন ঘটে। মার্কস-এর কোন কোন সমালোচক, রোজা লুক্সেমবার্গ তাঁদের মধ্যে অন্যতম, দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন সেই অবধিই সম্ভব যতদিন পুঁজিবাদ পূর্বতন উৎপাদন-ব্যবস্থার – ক্ষুদ্রায়তন পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থার – সকল অবশেষকে বিলোপ না করে। রোজা লুক্সেমবার্গ-এর এই ভ্রান্ত তত্ত্বের অনুসারীরা প্রায়শই এই তত্ত্বটি থেকে অত্যন্ত ক্ষতিকারক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তারা অনেকটা এ রকম যুক্তি দেখায় ঃ সরল পণ্য-উৎপাদনের অবশেষ সমূহ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর আর পুনরুৎপাদন চালাতে সক্ষম হবে না বলে যেহেতু পুঁজিবাদ ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য, সেহেতু পুঁজিবাদের ক্ষমতার উচ্ছেদের জন্য সংগ্রামে অগ্রবর্তী হওয়া আমাদের দরকার নেই – আর তাই পুঁজিবাদ কখন নিজে থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে সেই মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষায় তারা শান্তভাবে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকে। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এরকম অবস্থান হলো বিপ্লবী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ঘোরতর বিরোধী। পুঁজিবাদ নিজে থেকে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে না। কেবলমাত্র, অপরিসীম আত্মত্যাগের দাবী সহকারে, সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামই পুঁজিবাদ, দাসত্ব ও উৎপীড়নের সমাধি রচনা করবে।

অতি-উৎপাদনের পুঁজিবাদী সংকট

আমেরিকার খনি-শ্রমিকদের জীবন বর্ণনাকারী একটি বই থেকে নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"একজন খনি-শ্রমিকের পুত্র তার মাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ 'আগুন জ্বালাচ্ছো না কেন মা ? বড় যে ঠাণ্ডা'।

"আমাদের যে কয়লা নেই বাবা। তোর বাবা যে বেকার, আর তাই আমাদের কয়লা কেনার টাকা নাই'।

'কিন্তু বাবার চাকরী নাই কেন মা ?'

"অনেক কয়লা মজুত রয়েছে তাই"। [এ রচেষ্টার, "শ্রমিক ও কয়লা", পৃঃ ১১, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৩১]

প্রতিটি পুঁজিবাদী সংকটের সময় যে জ্বলন্ত দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তা চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে। কয়লা ভূ-গর্ভের তলদেশ থেকে "অত্যন্ত বেশী পরিমাণে" তোলা হয়েছে বলেই তো কয়লা খনি-শ্রমিকের পরিবারকে শীতে জমতে হয়। লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধার্ত হয়েই দিন কাটায় কারণ "অত্যন্ত বেশী পরিমাণ" রুটি উৎপাদিত হয়েছে, আর সে কারণে গম ব্যবহার করা হচ্ছে রেল ইঞ্জিনের জ্বালানী হিসেবে। বেকার ও তাদের পরিবারগুলোর মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, কারণ, "অনেক বেশী" বাড়ী-ঘর তৈরী হয়েছে আর সেজন্যে সেগুলি খালি পড়ে রয়েছে।

কিন্তু সত্যিই কি "অনেক বেশী পরিমাণে" রুটি, কাপড়, কয়লা, বাড়ীঘর ইত্যাদি তৈরী হয় ? এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, সংকটের সময় বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ জীবন ধারণের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির মারাত্মক অভাব অনুভব করে। কিন্তু সেসব পণ্য কেনার জন্যে টাকা তাদের থাকে না। আর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কোন পণ্যের প্রয়োজনের অর্থ হতে পারে একমাত্র তখনই যখন সে প্রয়োজন হয় **দাম পরিশোধ করার সামর্থ্য সম্পন্ন**। সংকটের সময়কালে রুটি, কয়লা ইত্যাদির জন্য চাহিদা থাকে বিপুল, কিন্তু ব্যাপক জনগণের

দারিদ্র্যের কারণে, বেকারদের চরম দারিদ্র্যের কারণে, দাম পরিশোধ করার সামর্থ্য সম্পন্ন চাহিদা থাকে অল্প। এই জাজ্বল্যমান দ্বন্দ্বটা ভয়ানক মাত্রায় বেড়ে যায় সংকটের সময়।

পুঁজিবাদী সংকটটা হলো অতি-উৎপাদনের সংকট। এত বেশী পরিমাণ পণ্য উৎপাদিত হয় যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ব্যাপক জনগণের ক্রয়-ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়, সেই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে পণ্যের বাজার পাওয়া যায় না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সংকটের মূল উৎস কি ?

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সংকট অবশ্যম্ভাবী কেন ?

পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বতন্ত্র উৎপাদকরা সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এই সম্পর্কটা হলো স্বতঃস্ফূর্ত। বাজারের অন্ধ শক্তিগুলো প্রত্যেক স্বতন্ত্র উৎপাদকের উপর প্রভুত্ব করে। এরূপ এক ব্যবস্থায় যা উৎপাদিত হয় আর যার চাহিদা-প্রয়োজন রয়েছে – এই দুয়ের মধ্যে একটা সামগ্রিক অসামঞ্জস্য থাকাটা সব সময়ই সম্ভব। খোদ পণ্য-উৎপাদনই নিজে থেকে সংকটের আবির্ভাবের, পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলার ও ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

সরল পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থায় কিন্তু সংকট দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা অনিবার্য নয়। সংকটের **অনিবার্যতা** কেবল দেখা দেয় পুঁজিবাদেই। পুঁজিবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বসমূহই কেবল বারে বারে (পর্যাবৃত্তিতে) অতি-উৎপাদনের সংকট অনিবার্য করে তোলে।

আমরা দেখেছি, পুঁজিবাদের ফলে শ্রমের সামাজিক চরিত্র ব্যাপকতর হয়, স্বতন্ত্র শ্রমিকদের বিভিন্নমুখী শ্রম একটি একক প্রবাহে সম্মিলিত হয়। একই সাথে লক্ষ-কোটি শ্রমিকের এই ঐক্যবদ্ধ শ্রমের ফলগুলি পুঁজিপতিদের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠির পরিপূর্ণ কবলে গিয়ে পড়ে, যারা শিল্পের সামগ্রিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।

"সকল উৎপাদনই এইভাবে একটি সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়, অথচ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই পৃথক পুঁজিপতির দ্বারা পরিচালিত হয়, তার স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, সামাজিক শ্রমজাত উৎপন্ন-দ্রব্যকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে। তাহলে এটা কি পরিষ্কার নয় যে, উৎপাদনের এই রূপটি ভোগ-আত্মসাতের রূপের সাথে এক মীমাংসার অতীত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয় ?" [লেনিন, সঃ রঃ, ১ম খণ্ড, "জনগণের বন্ধুরা' কি এবং কিভাবে তারা সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে"]

উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র আর ভোগ-আত্মসাতের ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব – **পুঁজিবাদের এই মৌলিক দ্বন্দ্বটিই** পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সংকটের পর সংকট অনিবার্য করে তোলে। আর এই দ্বন্দ্বই সংকটের কালে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে।

এই দ্বন্দ্বই অনিবার্যভাবে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে যেখানে উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ পণ্য-সামগ্রী **কোন বাজার খুঁজে পায় না**। বাজার না পাওয়ার কারণ এই নয় যে, কারো কোন খাদ্য বা বস্ত্রের দরকার নেই ; বিপরীত পক্ষে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা যাদের রয়েছে তেমন মানুষের সংখ্যা বিপুল। মুশকিল হচ্ছে এই, যে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের এসব জিনিসপত্রাদির দরকার রয়েছে তাদের সেগুলো লাভ করার মতো কোন উপায় নেই। বাজারটা হয়ে যায় ছোট, কলকারখানাগুলি তাদের উৎপন্ন-দ্রব্য বিক্রয় করতে পারে না, শিল্পের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় অতি-উৎপাদন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। গুদামগুলো তৈরী-পণ্যে ভরে যায়, কারখানাগুলো উৎপাদন কমিয়ে দেয়, বহু প্রতিষ্ঠান একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়, শ্রমিকরা নিক্ষিপ্ত হয় রাস্তায়।

বেকারত্বের বৃদ্ধি শ্রমিক-শ্রেণীর দ্বারা উৎপন্ন-দ্রব্যের ভোগ-ব্যবহার কমিয়ে দেয়, পণ্যের চাহিদা যায় কমে। গুদামগুলি যখন দ্রব্য-সামগ্রীতে পূর্ণ, তখন বিপুল সংখ্যক শ্রমিক থাকে অভুক্ত – পুঁজিবাদী সংকটের এই হলো চিত্র।

১৯০১ সালের সর্বনাশা সংকটের বর্ণনা দিতে গিয়ে, লেনিন পুঁজিবাদী সংকট সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"পুঁজিবাদী উৎপাদন বিকাশ লাভ করতে পারে না উল্লম্ফন ছাড়া – কখনও দুই পা সামনে আবার কখনও এক পা (কোন কোন সময় দুই পা) পেছনে। আমরা পূর্বেই দেখেছি, পুঁজিবাদী উৎপাদন হলো বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন, বাজারের জন্য পণ্যের উৎপাদন। উৎপাদন পরিচালিত হয় স্বতন্ত্র পুঁজিপতিদের দ্বারা, প্রত্যেকেই নিজ ইচ্ছা মতো উৎপাদন করে, আর তাদের কেউই বলতে পারে না বাজারে যথার্থভাবে কোন ধরনের পণ্য, এবং তা কি পরিমাণে দরকার। উৎপাদন চলে এলোমেলো ভাবে ; প্রত্যেক উৎপাদকই কেবল অন্যদের ছাড়িয়ে যেতে চায়। সুতরাং সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই, উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণটি বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতিশীল নাও হতে পারে। এই যখন অবস্থা তখন সম্ভাবনা হয়ে ওঠে বিপুল যখন হঠাৎ করে নতুন আবিষ্কৃত ও সুবিস্তৃত ভূখণ্ড বিশাল এক বাজার সৃষ্টি হয়ে যায়"। [সঃ, রঃ, ৪র্থ খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ১৭১-৭২, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউইয়র্ক, ১৯৩৯]

নিজেদের লাভালাভের অন্বেষণে, বুর্জোয়াশ্রেণী উন্মত্ত তাড়াহুড়ার মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্রমুখী সব পণ্যের উৎপাদন বিকশিত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা আরো অধিক মুনাফা আনতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত পুঁজিপতির কাছে পণ্যে পণ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। প্রত্যেক উদ্যোক্তাই চায় উৎপাদন বাড়াতে ঃ সুযোগ যত বড়, মুনাফার আশাও তত বেশী। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, মুনাফার জন্য এ প্রতিযোগিতা, পুঁজিপতিদের সকলের বিরুদ্ধে সকলের এ সংগ্রামে, উৎপাদনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য যেসব জটিল শর্ত বজায় থাকা দরকার তা আর পালিত হয় না।

"যাদের একমাত্র চিন্তা হলো মুনাফা অর্জন করা, শক্তিশালী সামাজিক উৎপাদিকা-শক্তি সেইসব একদল ধনী লোকের পদানত হওয়ার কারণেই কেবল দানবীয় সংঘাত হয়ে ওঠেছে সম্ভব ও অনিবার্য।" [ঐ, পৃঃ ১৭২]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, উৎপাদন বৃদ্ধি পায় **স্বতঃস্ফূর্তভাবে**। শিল্প চলে পরিকল্পনাহীন ভাবে, নৈরাজ্য সহকারে। মুনাফার জন্যে প্রতিযোগিতা উৎপাদনের সীমাহীন সম্প্রসারণের দিকে ঝোঁক প্রদর্শন করে। কিন্তু, এই ঝোঁক পুঁজিবাদী সম্পর্ক সমূহের অলঙ্ঘনীয় বাধাগুলির সম্মুখীন হয়। এসব বাধার উৎস নিহিত রয়েছে এই বাস্তব ঘটনার মধ্যে যে, পুঁজির শোষণের কারণে ব্যাপক সর্বহারা জনগণের ভোগ-ব্যবহারের ক্ষমতা হলো সীমাবদ্ধ।

"একটি প্রতিষ্ঠান যাতে মুনাফা করতে পারে তার জন্যে সে প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী অবশ্যই বিক্রী করতে হবে, সেসবের জন্যে ক্রেতা যোগাড় করতে হবে। এখন এসব দ্রব্যের ক্রেতাদের অবশ্যই হতে হবে বিপুল-ব্যাপক জনসাধারণ, কারণ এসব বিশাল প্রতিষ্ঠান সমূহ বিপুল পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রীই উৎপাদন করে। কিন্তু সকল পুঁজিবাদী দেশের জনসংখ্যার নয়-দশমাংশই হলো গরীব ; তাদের মধ্যে আছে শ্রমিক, যারা অতি সামান্য মজুরীই পায়, আর আছে কৃষক, যারা শ্রমিকদের চেয়ে এমনকি আরো অধিক খারাপ অবস্থার মধ্যে মূলতঃ বাস করে। বর্তমানে বাজারে তেজী ভাবের আমলে, যখন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ যতটা সম্ভব বিপুল পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করতে শুরু করেছে, তখন তারা বাজারে এত বেশী পরিমাণ এসব দ্রব্য ছাড়ছে যে, দরিদ্র হওয়ার কারণে, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকই তার সবটা কিনতে সক্ষম হচ্ছে না। মেশিনপত্র, কল-কব্জা, গুদাম, রেলপথ ইত্যাদি অব্যাহতভাবেই বাড়ছে। কিন্তু, সময় সময় বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াটি বাধাপ্রাপ্ত

হচ্ছে, কারণ উৎপাদনের এসব উন্নত যন্ত্রগুলো, শেষ বিশ্লেষণে, যাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে, সেই ব্যাপক জনসাধারণই বাস করছে দারিদ্র্যের মধ্যে, যে দারিদ্র্য ভিক্ষাবৃত্তির দিকে ঝুঁকছে।" [ঐ, পৃঃ ১৭৩]

এইভাবে, পুঁজিবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে, উৎপাদন সম্ভাবনার সুবিপুল বৃদ্ধি আর শ্রমজীবি জনগণের তুলনামূলকভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যেকার গভীরতম দ্বন্দ্ব। উৎপাদিকা-শক্তিসমূহ সীমাহীন ভাবেই বৃদ্ধির প্রবণতা প্রদর্শন করে। আরো অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে, পুঁজিপতিরা উৎপাদন সম্প্রসারণ করে, প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন করে, শ্রমিকদের শোষণ করে আরো তীব্রভাবে। ঋণদান ব্যবস্থার বিকাশ স্বতন্ত্র পুঁজিপতিদের পক্ষে তাদের নিজ নিজ পুঁজির সীমা ছাড়িয়ে উৎপাদন অনেক বেশী সম্প্রসারণ করা সম্ভব করে তোলে। মুনাফার হারের হ্রাসপ্রাপ্তির দিকে যে অবিরাম ঝোঁক হলো পুঁজিবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সেই ঝোঁক প্রত্যেক উদ্যোক্তাকে অধিকতর উৎপাদন সম্প্রসারণের দিকে প্ররোচিত করে। কিন্তু **শিল্পের সীমাহীন সম্প্রসারণ** অভিমুখী এই ঝোঁক অনিবার্যরূপেই ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের **ভোগ-ব্যবহারের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার** সাথে সংঘাতের মুখে পড়ে। শোষণের বৃদ্ধির অর্থ কেবল উৎপাদনেরই বৃদ্ধি নয়। এর আরো অর্থ হলো ব্যাপক জনগণের ক্রয়-ক্ষমতার হ্রাসপ্রাপ্তি, পণ্য-সমগ্রী বিক্রীর সম্ভাবনারও হ্রাসপ্রাপ্তি। ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষক-জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা পড়ে থাকে নিম্নস্তরে। সে কারণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় **অতি-উৎপাদনের সংকট অনিবার্য হয়ে ওঠে।**

সংকটের পর্যাবৃত্তি (Periodicity of Crises)

পুঁজিবাদের আদি সূত্রপাত থেকেই সংকট হলো তার সহচর। পুঁজিবাদী শিল্পের খোদ শুরু থেকেই, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সংকট পুঁজিবাদকে নাড়া দিয়ে আসছে। সংকটের জন্ম হয়েছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে সাথেই। গত একশত বছর ধরে প্রতি আট থেকে বার বছর পর পর সংকট পুঁজিবাদী বিশ্বকে নাড়া দিয়ে চলেছে।

প্রথম সাধারণ সংকট দেখা দিয়েছিল ১৮২৫ সালে। তারপর নিয়মিত ব্যবধানে সংকট দেখা দেয় ১৮৩৬, ১৮৪৭, ১৮৫৭, ১৮৭৩, ১৮৯০, ১৯০০ ও ১৯০৭ সালে। ১৮৪৭ সাল থেকে শুরু করে, কেবলমাত্র একটি দেশ নয়, বরং যেসব দেশে পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করেছিল এমন সকল দেশেই সংকট হানা দিয়েছে।

এই পর্যায়ক্রমিক সংকট থেকে দেখা যায়, পুঁজিবাদের বিকাশের সারা পথ জুড়েই নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর তা দেখা দেয়। পুঁজিবাদী সংকটের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তাদের পর্যাবৃত্তি (অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সেগুলো ঘটে)। দুটি সংকটের মধ্যবর্তী সময়ে পুঁজিবাদী শিল্প একটা নির্দিষ্ট বৃত্তাকার, বা যাকে বলা হয়, চক্রাকার গতির মধ্য দিয়ে চলে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পূর্বে, সংকটের পর সাধারণতঃ দেখা দিত মন্দা (depression), তার পর এ মন্দা কেটে গিয়ে দেখা দিত (শিল্পের) সীমাবদ্ধ পুনরুজ্জীবন, পুনরুজ্জীবন পালাক্রমে পথ করে দিত এক সমৃদ্ধির যুগের যখন (শিল্পের) সম্প্রসারণ ও মুনাফার জন্য প্রতিযোগিতা পৌঁছাতো তাদের সর্বোচ্চ শীর্ষে। তারপর আসত সংকট এবং নতুন করে চক্রাকার গতি শুরু হতো।

এক সংকটকাল থেকে আরেক সংকটকালে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের প্রক্রিয়াকে এঙ্গেলস্ এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"……১৮২৫ সালে যখন প্রথম সাধারণ সংকট দেখা দেয়, তখন থেকে সমগ্র শিল্প ও বাণিজ্যিক জগৎ, সমস্ত সভ্য জাতি ও তাদের অধীন কম-বেশী অসভ্য জাতিসমূহের উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থা কার্যতঃ প্রতি দশ বৎসরে একবার বিপর্যস্ত হয়েছে। ব্যবসা হয়ে পড়ে অচল, বাজারগুলিতে মালের পাহাড় জমে ওঠে, উৎপাদিত দ্রব্যগুলি বিপুল পরিমাণে পড়ে থাকে অবিক্রীত হয়ে, নগদ টাকা উধাও হয়ে যায়, ঋণ দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে, কল-কারখানা হয়ে পড়ে অচল, শ্রমজীবী জনতার কপালে জোটে না খাদ্য – কারণ তারা অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করেছে, একের পর এক প্রতিষ্ঠান বিক্রী হতে থাকে। বছরের পর বছর ধরে এই বন্ধ্যাত্ব চলতে থাকে, যে-পর্যন্ত জমে ওঠা পণ্য-সম্ভার অবশেষে কম-বেশী বিশেষ দাম হ্রাস দিয়ে বিক্রী করা না হয়, যে-পর্যন্ত উৎপাদন ও বিনিময় ক্রমান্বয়ে পুনরায় শুরু না হয়, সে-পর্যন্ত উৎপাদিকা-শক্তি ও উৎপন্ন-দ্রব্য – উভয়টিরই ব্যাপক আকারে অপচয় চলতে থাকে, দুই-ই নষ্ট হতে থাকে। ক্রমে চলার বেগ বাড়ে, জোর কদমে চলা শুরু হয়, শিল্পের কদম কদম চলার গতি বেড়ে পরিণত হয় লাফিয়ে লাফিয়ে চলার, এবং পালাক্রমে এই লাফিয়ে চলা আবার পরিণত হয় গোটা শিল্প, বাণিজ্য, ঋণ ও ফাটকা-কারবারের ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার উন্মত্ত সম্মুখ-ধাবনে, কিন্তু এ সবই কেবল পরিণামে সর্বনাশা পড়ি কি মরি দৌড়-ঝাঁপের পরে পুনরায় একটা সংকটের গর্ভে পড়ার জন্যই। আর এরকম ঘটতে থাকে বারে বারে।....

"এই সংকটগুলিতে, সামাজিক উৎপাদন ও পুঁজিবাদী ভোগ-আত্মসাতের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ফেটে পড়ে এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে। সাময়িকভাবে পণ্য-সামগ্রীর সঞ্চলন (লেন-দেন) হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় শূণ্যে ঃ সঞ্চলনের মাধ্যম, মুদ্রাই, হয়ে দাঁড়ায় সঞ্চলনের পথে এক বাধা ; পণ্য-উৎপাদনের ও পণ্য সঞ্চলনের সকল নিয়মই যায় উল্টে। অর্থনৈতিক সংঘর্ষ চরম বিন্দুতে পৌঁছায় ঃ **উৎপাদন-পদ্ধতি বিদ্রোহ করে বিনিময়-পদ্ধতির বিরুদ্ধে** (The mode of production rebels against the mode of exchange)। ["এ্যান্টি ড্যুরিং", "বিজ্ঞানে বিপ্লব"]

আমরা পূর্বেই দেখেছি, সংকটের নিয়মিত আবির্ভাবের কারণগুলির মূল নিহিত রয়েছে পুঁজিবাদের মৌলিক দ্বন্দ্বের মধ্যে – শ্রমের সামাজিক চরিত্র এবং ভোগ-আত্মসাতের ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের মধ্যে। সংকট একবার দেখা দিলে এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংস করে দিলে, মন্দা থেকে পুনরুজ্জীবনের দিকে উত্তরণের জন্যে চাই নির্দিষ্ট উদ্দীপনা। উৎপাদনের উপকরণগুলি উৎপাদনকারী মৌলিক শিল্প-সমূহের পুনরুজ্জীবনের জন্যে এরূপ উদ্দীপনাটি হলো **শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন যন্ত্রপাতিতে পুনর্সজ্জিতকরণ** (re-equipment of enterprises)। সংকটের পর কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরীগুলির দরকার হয় নতুন ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি। তাই তারা যন্ত্রপাতির ফরমাস দেয় এবং এটা সৃষ্টি করে চাহিদার এক ঢেউ, যার স্পন্দন গিয়ে লাগে সবচেয়ে দূরবর্তী শিল্পগুলিতেও। ধরা যেতে পারে, কোন প্রতিষ্ঠানের **যন্ত্র-পাতি সরঞ্জাম মোটামুটি দশ বৎসর কাজে লাগে**। তাহলে একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্থির পুঁজিকে প্রত্যক দশ বছর পর পর নতুন করে রদবদল করা দরকার। সুতরাং, প্রত্যেক দশ বৎসরে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের যন্ত্রপাতি-সরঞ্জামের রদবদলের প্রয়োজনীয়তা থেকে সৃষ্ট উদ্দীপনা শিল্প লাভ করে।

যুদ্ধোত্তর কালে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ – অনুঃ) এই ছবিটা গেছে বদলে। পুঁজিবাদ বর্তমানে পতনের মধ্য দিয়ে চলেছে, তার ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটছে, তথাপি তা এখনও বেঁচে আছে। এখন এক-একটা সংকট তার ভিত্তিমূলকে আগের চেয়ে তুলনামূলক অধিক ভয়ানকভাবে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। শিল্পের পূর্বেকার চক্রাকারে বিকাশের যে গতি ছিল তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

বহু দেশেই শিল্পের আদৌ কোন উন্নতি দেখা দেয়নি, অন্যান্য দেশে অত্যল্প সময়ের জন্যে কিঞ্চিৎ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিপরীত পক্ষে, বর্তমান সংকট কালে তার অবক্ষয় ঘটেছে অত্যধিক গভীর।

সংকটের তাৎপর্য

পুঁজিবাদী বিকাশের গোটা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সংকট হলো বিপুল তাৎপর্যসম্পন্ন। পুঁজিবাদ যে শক্তিগুলোর নিজেই জন্ম দিয়েছে সে শক্তিগুলোর সাথে পুঁজিবাদের এঁটে ওঠা অক্ষমতা সংকটের সময়কালেই সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়। পুঁজিবাদী **উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের** নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খল অবস্থাটা সংকটের সময়েই সবিশেষ স্পষ্টতা সহকারে উদ্ঘাটিত হয়। বিপুল-ব্যাপক জনগণের এমনকি নিতান্ত অপরিহার্য চাহিদাগুলো অপূর্ণ রেখেই যে পুঁজিবাদ বিপুল সম্পদ-রাশি বিনষ্ট হতে দেয়, সেই পুঁজিবাদের **লুঠেরা প্রকৃতিকে** সংকট আরো অধিক উদ্ঘাটিত করে দেয়।

"সংকট দেখিয়ে দেয় যে, আধুনিক সমাজ যা উৎপাদন করে তার চেয়ে অপরিমেয় রূপে অধিক জিনিস সে উৎপাদন করতে পারে, এবং জনগণের দারিদ্র্যের সুযোগে যে ব্যক্তি-মালিকরা যদি জমি, ফ্যাক্টরী, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মালিক না হতো, তাহলে সেই উৎপাদন সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের জীবন ধারণের অবস্থার উন্নতি সাধনের কাজে ব্যবহার করা যেত"। [লেনিন, সঃ রঃ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৬]

শ্রমিকদের অবস্থা আরো শোচনীয় করে তুলে এবং বেকারের সংখ্যা প্রচণ্ড মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়ে, **সংকট শ্রেণী-দ্বন্দ্বগুলোকে তীব্র করে তোলে**। পূর্বে যে শ্রমিকরা পুঁজিবাদের সাথে শান্তিতে থাকতে চাইতো বা পুঁজিবাদ সম্পর্কে উদাসীন ছিল, সেই শ্রমিকদের বহু সংখ্যককেই সংকট বাধ্য করে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্রিয় হয়ে উঠতে, পুঁজিবাদের সকল **দ্বন্দ্বকেই** সংকট উন্মোচিত করে দেয় এবং প্রদর্শন করে তার **ধ্বংসের অনিবার্যতা**।

বর্তমান সংকটের পরিস্থিতিতে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা উৎসাহের সাথে এই বিশ্বাসঘাতকতামূলক তত্ত্ব রচনা করেছে যে সংকট সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামকে ব্যাহত করে এবং পূর্ব থেকেই সে সংগ্রামের ব্যর্থতা নির্ধারণ করে দেয়। ট্রট্স্কি সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের এই 'কোরাসের' সাথে গলা মিলিয়েছে। "বাম" সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা এই বিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে যে, সংকটের অবস্থাটি বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করে প্রতি-বিপ্লবী পরিস্থিতি। সুতরাং, তাদের মতে, শ্রমিকশ্রেণী আক্রমণাত্মক সংগ্রাম নয়, কেবল আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামই চালাতে পারে।

এরূপ প্রতিবিপ্লবী আবিষ্কারের পরিপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতামূলক অর্থটা বোঝা সহজ। সংকট পুঁজিবাদের সকল দ্বন্দ্বকেই চরমভাবে তীব্র করে তোলে। আর ঠিক এরকম একটা পরিস্থিতিতেই সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা রুগ্ন পুঁজিবাদের শয্যা-পার্শ্বে "চিকিৎসক" হয়ে দেখা দেয়। তারা ঘোষণা করে, তাদের কাজটা হলো পুঁজিবাদকে "নিরাময়" করায় সাহায্য করা, কবর দেয়ায় সাহায্য করা নয়। শ্রমিকদের বিপ্লবী উদ্যমকে পঙ্গু করে দিয়ে এইভাবে তারা ফ্যাসিবাদের বিজয়ের জন্য দরজা দরাজ করে খুলে দেয়, জার্মানীতে যা সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

পুঁজিবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত উৎপাদিকা-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার সুগভীর দ্বন্দ্বকে সংকট জ্বলন্তভাবে তোলে ধরে, যে দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদকে তার অনিবার্য ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

"কারখানার অভ্যন্তরে উৎপাদনের সামাজিক সংগঠনটা বিকশিত হয়ে এমন একটা অবস্থায় পৌঁচেছে যেখানে তা সমাজে বিরাজমান উৎপাদনের নৈরাজ্য, যা তার পাশাপাশি ও তার উপরেই বিরাজ করে, তার সাথে সঙ্গতিহীন হয়ে পড়েছে – এই বাস্তব ঘটনাটি, সংকটের সময় বহু বড় বড় এবং এমনকি অধিক ছোট ছোট পুঁজিপতিদের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পুঁজির যে প্রচণ্ড কেন্দ্রীকরণ ঘটে তার দ্বারা, খোদ পুঁজিপতিদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে উৎপাদিকা-শক্তিকে পুঁজিবাদ নিজেই সৃষ্টি

করেছে, সেই উৎপাদিকা-শক্তির চাপে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির গোটা বিধি-ব্যবস্থাটিই ভেঙে পড়ে। উৎপাদনের উপকরণগুলির সমগ্র পরিমাণটাকে সে আর পুঁজিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয় না ; সেগুলো পড়ে থাকে নিশ্চল হয়ে, আর ঠিক এই কারণে শিল্পীয় মজুত বাহিনীও বসে থাকে বেকার হয়ে। উৎপাদনের উপায়-উপকরণ সমূহ, জীবন ধারণের উপকরণ সমূহ, কাজে লাগানোর মতো শ্রমিক – উৎপাদনের সকল উপাদান ও সাধারণ সম্পদের সকল উপাদানই রয়েছে প্রচুর। কিন্তু 'প্রাচুর্য পরিণত হয় দুরবস্থা ও অভাবের উৎসে' (ফরিয়ার), কারণ যথার্থভাবে এই প্রাচুর্যই উৎপাদনের উপকরণ ও ভোগের উপকরণকে পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে দেয় বাধা। কারণ, পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনের উপায়-উপকরণ সমূহ প্রথমতঃ পুঁজিতে রূপান্তরিত না হলে, মনুষ্য শ্রমশক্তি শোষণের উপায়ে রূপান্তরিত না হলে, কাজে লাগতে পারে না। উৎপাদনের ও জীবন-ধারণের উপায়-উপকরণগুলির পক্ষে পুঁজির রূপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তাদের ও শ্রমিকদের মধ্যে এক প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এই প্রয়োজনীয়তাটি একমাত্র উৎপাদনের বস্তুগত ও মানবীয় উপায়গুলিকে একত্রে মিলিত হতে বাধা দেয় ; একমাত্র এটাই উৎপাদনের উপকরণগুলোকে কাজ করতে বাধা দেয়, শ্রমিকদের বাধা দেয় কাজ করতে ও বেঁচে থাকতে। এভাবে, এক দিকে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি এই উৎপাদিকা-শক্তিগুলিকে আর বেশী নিয়ন্ত্রণে রাখায় তার নিজের অক্ষমতার দায়ে দায়ী হয়ে পড়েছে। আর অন্যদিকে, এই উৎপাদিকা-শক্তিগুলি নিজেরাই ক্রমবর্ধমান জোরের সাথে দ্বন্দ্বটির পরিসমাপ্তি ঘটাতে, পুঁজি-রূপের চরিত্র থেকে নিজেদের মুক্ত করতে, **সামাজিক উৎপাদিকা-শক্তি রূপের নিজেদের চরিত্রের প্রকৃত স্বীকৃতি লাভের দিকে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে চায়।**" [এঙ্গেলস্ "এ্যান্টি-ড্যুরিং", বিজ্ঞানে বিপ্লব]

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় সংকটের ভূমিকার নিম্নোক্ত সুস্পষ্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে ঃ

"যে বুর্জোয়া সমাজ ভেলকিবাজির মতোই উৎপাদনের ও বিনিময়ের এমন বিশাল উপায়-উপকরণগুলি গড়ে তুলেছে, নিজের উৎপাদন-সম্পর্ক, বিনিময়-সম্পর্ক আর সম্পত্তি-সম্পর্ক সহ সেই আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা সেই জাদুকরের মতোই যে মন্ত্রবলে পাতালপুরীর শক্তিসমূহকে জাগিয়ে তুলে আর সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। বিগত বহু দশক ধরেই শিল্প আর বাণিজ্যের ইতিহাসটি উৎপাদনের আধুনিক অবস্থা-পরিস্থিতির বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াশ্রেণী আর তার শাসনের অস্তিত্বের শর্ত যে সম্পত্তি-সম্পর্ক তার বিরুদ্ধে, আধুনিক উৎপাদিকা শক্তির বিদ্রোহের ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। যে বাণিজ্য-সংকট পালা করে বারে বারে ফিরে এসে গোটা বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বটাকেই, প্রতি বারেই আরো ভয়াবহ রূপে, বিপন্ন করে তোলে তার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। এসব সংকটকালে বর্তমান উৎপন্ন-দ্রব্যের একটা বড় অংশই শুধু নয়, পূর্বতন সময়ে সৃষ্ট উৎপাদিকা-শক্তির বড় অংশও পর্যাবৃত্তিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এসব সংকটের কালে এমন এক মহামারী দেখা দেয় যা অতীতের সকল যুগেই অসম্ভবযোগ্য বলে মনে হত–তা হল অতি-উৎপাদনের মহামারী। সমাজ যেন অকস্মাৎই ফিরে যায় এক ক্ষণকালীন বর্বরতাজনিত পরিস্থিতিতে; মনে হয় যেন একটা দুর্ভিক্ষ, এক সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ জীবন ধারণের উপযোগী সমস্ত উপায়-উপকরণের যোগান বন্ধ করে দিয়েছে ; শিল্প আর বাণিজ্য যেন ধ্বংস হয়ে গেছে ; কিন্তু কেন ? কারণ সভ্যতা গড়ে উঠেছে বড় বেশী, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি হয়েছে অতিরিক্ত, অনেক বেশী হয়ে গেছে শিল্প, বাণিজ্যের প্রসার ঘটে গেছে অতিমাত্রায়। সমাজের হাতে যেসব উৎপাদিকা-শক্তি রয়েছে সেগুলি বুর্জোয়া সম্পত্তির শর্তাবস্থার আর বিকাশ সাধন করতে চাইছে না ; পক্ষান্তরে, সেগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব শর্তাবস্থার পক্ষে অতিরিক্ত শক্তিশালী, যেসব শর্তাবস্থা দ্বারা ঐগুলি হল শৃঙ্খলিত, আর যত শীঘ্র তারা এসব শৃঙ্খলকে ছিন্ন করতে চায়, ততই সেগুলি সমগ্র বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে নিয়ে আসে বিশৃঙ্খলা, বুর্জোয়া সম্পত্তির অস্তিত্বকেই করে তুলে বিপন্ন। বুর্জোয়া সমাজ যে সম্পদ সৃষ্টি করে সে সম্পদকে সে ধারণ করার জন্যে বুর্জোয়া সমাজের শর্তাবস্থাগুলি খুবই সংকীর্ণ। বুর্জোয়াশ্রেণী এই সংকট কাটিয়ে উঠে কিভাবে ? একদিকে, উৎপাদিকা শক্তির বিপুল অংশের বাধ্যতামূলক ধ্বংস সাধন করে ; অন্যদিকে, নতুন বাজার দখল করে, আর পুরানো বাজারকে আরো বেশী করে শোষণ করে। অর্থাৎ, আরো ব্যাপক ও আরো ধ্বংসাত্মক সংকটের জন্যে পথ প্রশস্ত করে, আর সংকট যে উপায়ের দ্বারা রোধ করা যায় সেই উপায়কে হ্রাস করে।" [**কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার,** "বুর্জোয়া বনাম সর্বহারা" শীর্ষক পরিচ্ছেদ, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৬০-৬১]

নিরীক্ষামুলক প্রশ্নাবলী

১। পুনরুৎপাদন কাকে বলে ?
২। সরল পুনরুৎপাদনের শর্তগুলি কি ?
৩। বর্ধিত পুনরুৎপাদনের শর্তগুলি কি ?
৪। পুঁজির কেন্দ্রীয়ভবন ও কেন্দ্রীয়করণ কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ?
৫। পুঁজির কেন্দ্রীয়ভবন ও কেন্দ্রীয়করণের মধ্যে পার্থক্য কি ?
৬। পুঁজিবাদী সংকটের কারণ সমূহ কি ?
৭। শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সংকটের তাৎপর্যটা কি ?
৮। সংকটের পর্যাবৃত্তিক পুনরাবির্ভাবটা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ?

সাম্রাজ্যবাদ - সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কাল

শিল্প-পুঁজিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ

বিগত ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়েই পুঁজিবাদ বিকাশ লাভ করে এবং দেশ থেকে দেশান্তরে বিস্তার লাভ করে – যে-পর্যন্ত-না তা সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়। পুঁজিবাদের বৃদ্ধি-বিকাশের সাথে সাথে তার যন্ত্রণাদায়ক দ্বন্দ্বগুলি ক্রমান্বয়েই অধিকতর প্রকট ও তীব্র হয়ে ওঠে। এই সময়কালে পুঁজিবাদী বিকাশের পুরোভাগে ছিল শিল্প পুঁজি। সে কারণেই আমরা এই আমলটাকে বলি শিল্প-পুঁজি বা **শিল্প-পুঁজিবাদের যুগ**।

শিল্প-পুঁজিবাদের মৌলিক দ্বন্দ্ব সমূহের বৃদ্ধি ও বিকাশ পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে নিয়ে আসে এক নতুন পর্যায় [stage] – তা হলো সাম্রাজ্যবাদ। পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন উচ্চতর পর্যায় হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব ঘটে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। সাম্রাজ্যবাদের অধীনে পুঁজিবাদের সমস্ত মৌলিক **দ্বন্দ্বগুলি** চরমভাবে **তীব্র হয়ে** ওঠে। সাম্রাজ্যবাদ হলো **মুমূর্ষু পুঁজিবাদ** [moribund capitalism]। সাম্রাজ্যবাদের অধীনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা সমাজের আরো অধিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের শিক্ষা

সমাজতন্ত্রের জন্য বিপ্লবী সংগ্রামে সর্বহারাশ্রেণীর হাতে লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত শিক্ষা হলো এক সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার। লেনিন দেখিয়ে দেন যে, সাম্রাজ্যবাদ হলো মুমূর্ষু পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ হলো **সর্বহারাশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কাল**।

"লেনিনবাদের ভিত্তি" শীর্ষক তাঁর রচনায়, স্তালিন দেখিয়ে দিয়েছেন যে, মার্কস ও এঙ্গেলস্ যে সময়ে বেঁচে ছিলেন ও লড়াই করেছিলেন সে সময় সাম্রাজ্যবাদ তখনও বিকাশ লাভ করে নি, তখনও বিপ্লবের জন্য সর্বহারাশ্রেণীর প্রস্তুতি-পর্ব চলছিল। অন্যদিকে লেনিনের বিপ্লবী কার্যকলাপ পরিচালিত হয়েছিল বিকশিত সাম্রাজ্যবাদের যুগে, যে যুগে সর্বহারা বিপ্লবের প্রকাশ ঘটছিল। লেনিনবাদ হলো নতুন পরিস্থিতিতে, **সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের** পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের উন্নততর বিকাশ। সুতরাং, এ থেকে বেরিয়ে আসে যে, বর্তমানে লেনিনবাদী না হয়ে কেউই মার্কসবাদী হতে পারে না। এ থেকে, এটাও প্রতিপন্ন হয় যে, সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত লেনিনবাদী তত্ত্বকে অস্বীকার করার অর্থ হলো মার্কসবাদ থেকে সম্পূর্ণভাবেই সরে যাওয়া। এ থেকে এ কথাটাও পরিষ্কার যে, সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত তত্ত্বের ক্ষেত্রে যেকোন বিকৃতি বা ভ্রান্তির অনিবার্য অর্থ হলো বিপ্লবী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ।

লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে বিশ্লেষণ করেছেন পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে **বিশেষ পর্যায়** হিসেবে, পুঁজিবাদী বিকাশের এক নতুন পর্যায়রূপে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের দ্বারা নির্ধারিত এক স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক যুগ রূপে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে এবং পূর্বতন শিল্প-পুঁজিবাদের যুগ থেকে সাম্রাজ্যবাদের যুগকে যেগুলো পার্থক্যপূর্ণ করেছে, লেনিন সেই সমস্ত পরিবর্তনগুলোকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। এই ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিকাশের যে নিয়মগুলি মার্কস আবিষ্কার করেছিলেন লেনিন সেগুলির উপরই নিজেকে দাঁড় করান এবং নতুন যুগটিতে সেসব নিয়ম কিভাবে কাজ করছে তা দেখিয়ে দেন।

যে বৈশিষ্ট্যাবলী এই নতুন যুগকে পার্থক্যপূর্ণ করে লেনিন সেগুলো দেখিয়ে দেন, আর এই যুগ হলো ক্ষয়িষ্ণু ও মুমূর্ষু পুঁজিবাদের যুগ, এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কাল। সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্যভাবে নিয়ে আসে বিপর্যয়কারী যুদ্ধ এবং গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সংকট।

"সাধারণভাবে পুঁজিবাদের মৌলিক গুণাবলীর বিকাশ ও প্রত্যক্ষ ধারাবাহিকতা হিসেবেই সাম্রাজ্যবাদ আবির্ভূত হয়েছে"। [লেনিন, "সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়"]

সাম্রাজ্যবাদ হলো পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন পর্যায়, কিন্তু এই নতুন পর্যায় হলো পূর্বতন পর্যায় – শিল্প-পুঁজিবাদের পর্যায়েরই **প্রত্যক্ষ ধরাবাহিকতা**। শিল্প-পুঁজিবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত মৌলিক ও নির্ধারক দ্বন্দ্ব সমূহ – বুর্জোয়া শ্রেণী ও সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, পুঁজিবাদী শিবিরের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, উৎপাদনের নৈরাজ্য, সংকট – সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবে অন্তর্হিত তো হয় না, বরং বিপরীত পক্ষে সেগুলো চরম তীব্রতা লাভ করে।

শিল্প-পুঁজিবাদের পূর্বতন যুগের সাথে সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্তভাবেই কোন মিল নেই – এই মতামত হলো এক নির্জলা ভ্রান্তি। এরূপ এক মতামত (তথাকথিত "বিশুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের" তত্ত্ব) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বছরগুলিতে বুখারিন ও তাঁর কিছু অনুসারীদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল। এই তত্ত্বের (সাম্রাজ্যবাদের অদ্ভুত প্রকৃতির উপর খুব বেশী মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল) আপাত "বাম মতবাদ" সত্ত্বেও, তা বাস্তবে আধুনিক পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণ উভয়টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ সুবিধাবাদী সিদ্ধান্তেই পৌঁছায়।

সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্ন সম্পর্কে সব ধরণের বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া মতামতের বিরুদ্ধে বিরামহীন ও কঠোর **সংগ্রামের** প্রক্রিয়ায়, সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নে মার্কসবাদের সব ধরণের সুবিধাবাদী বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রামের মধ্য দিয়েই লেনিন তাঁর সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত তত্ত্বমতকে বিবর্ধন করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত লেনিনবাদী তত্ত্ব সর্বহারা বিপ্লব প্রসঙ্গে লেনিনবাদী শিক্ষার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্ন সম্পর্কে লেনিনবাদ-বিরোধী মতামতগুলো প্রতিবিপ্লবী রাজনৈতিক অবস্থানের সাথে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত লেনিনবাদী-তত্ত্বের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সকল বিকৃতি ও ভ্রান্তি অনিবার্যভাবেই সুবিধাবাদী মতামতের দিকে চালিত করে।

যে **উৎপাদনের কেন্দ্রীভূতকরণ** তার সাথে নিয়ে আসে **একচেটেবাদের শাসন**, সেই কেন্দ্রীভূতকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধান সহকারেই লেনিন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত তাঁর বিশ্লেষণ শুরু করেছেন। বিগত যুগের পুঁজিবাদী বিকাশের পদক্ষেপগুলিকে সযত্নে খুঁজে বের করে, লেনিন এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, পূর্বে প্রচলিত অবাধ প্রতিযোগিতার স্থান দখল করেছে পুঁজিবাদী একচেটেবাদ এবং তা পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব সমূহকে চূড়ান্তভাবেই তীক্ষ্ণ করে তুলেছে – এই বাস্তব ঘটনা দ্বারাই, প্রাথমিকভাবে, এই যুগের চরিত্রকে বর্ণনা করা যায়।

সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য

যে একচেটে শাসন পুঁজিবাদী দেশ সমূহের সমগ্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে সেই একচেটে শাসনই হলো সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। একচেটেবাদের এই আধিপত্যই সাম্রাজ্যবাদের যুগে অর্থনৈতিক বিকাশের সমস্ত পর্বে তার অনপনেয় মোহর অঙ্কিত করে দেয়। সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়ে লেনিন এর নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ঃ

"১। উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীভূতকরণ এমন একটা পর্যায়ে বিকাশ লাভ করেছে যে তা সৃষ্টি করেছে একচেটেবাদের, যা অর্থনৈতিক জীবনে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে;

"২। শিল্প-পুঁজির সাথে ব্যাংক-পুঁজির সম্মিলন, 'লগ্নী পুঁজির' [finance capital] ভিত্তিতে এক 'লগ্নীকারী ক্ষুদে গোষ্ঠীর' [financial oligarchy] সৃষ্টি;

"৩। পুঁজির রপ্তানী, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, পণ্য-রপ্তানী থেকে যা আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ;

"৪। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী একচেটেবাদের উৎপত্তি, যারা দুনিয়াটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছে।

"৫। সবচেয়ে বৃহৎ পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে সমগ্র বিশ্বের আঞ্চলিক ভাগ-বন্টন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

"সাম্রাজ্যবাদ হলো বিকাশের সেই পর্যায়ের পুঁজিবাদ যেখানে একচেটেবাদ ও লগ্নী পুঁজির আধিপত্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ; যেখানে পুঁজির রপ্তানী সুস্পষ্ট গুরুত্ব অর্জন করেছে ; যেখানে আন্তর্জাতিক ট্রাস্টগুলোর মধ্যে বিশ্বের বিভাজন শুরু হয়েছে ; যেখানে বৃহৎ পুঁজিবাদী শক্তিগুলির মধ্যে পৃথিবীর সকল অঞ্চলেরই ভাগাভাগি সম্পূর্ণ হয়েছে।" [ঐ]

সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রে ভাঙ্গন নামক আরেকটি রচনায় লেনিন সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলীর একই তালিকা প্রদান করেছেন। যতটা সম্ভব যথার্থ ও পুরোপুরিভাবে সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে লেনিন এই গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"সাম্রাজ্যবাদ হলো পুঁজিবাদের এক বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়। এর বিশেষ চরিত্রটি হলো ত্রিবিধ ঃ সাম্রাজ্যবাদ হলো (১) একচেটে পুঁজিবাদ ; (২) পরজীবি, বা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ ; (৩) মুমূর্ষু পুঁজিবাদ। অবাধ প্রতিযোগিতার স্থলে একচেটেপনা হলো সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, তার **সারমর্ম**। একচেটেবাদ নিজেকে অভিব্যক্ত করে পাঁচটি মূল রূপে ঃ (১) কার্টেল (দাম-নিয়ন্ত্রণকারী কারবারী জোট – অনুঃ), সিণ্ডিকেট (ব্যবসায়ী জোট – অনুঃ) ও ট্রাস্ট (নানা কারবারের একত্রিত মালিকানার জোট – অনুঃ) ; উৎপাদনের কেন্দ্রীভূতকরণ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায়, যেখানে তা পুঁজিপতিদের এসব একচেটে কারবারী জোটের (combinations) জন্ম দেয় ; (২) বৃহৎ ব্যাংকগুলোর একচেটে সুলভ অবস্থান ঃ তিন থেকে পাঁচটি সুবৃহৎ ব্যাংক আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানীর সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনকে নিজেদের সুবিধামত পরিচালনা করে ; (৩) ট্রাস্ট ও পুঁজি লগ্নীকারী ক্ষুদে গোষ্ঠী কর্তৃক কাঁচামালের উৎস সমূহ দখল (লগ্নী পুঁজি হলো ব্যাংক-পুঁজির সাথে সম্মিলিত একচেটেবাদী শিল্প-পুঁজি) ; (৪) আন্তর্জাতিক কার্টেলগুলোর মধ্যে বিশ্বের (অর্থনৈতিক) ভাগ-বাটোয়ারা শুরু হয়েছে। যে আন্তর্জাতিক 'কার্টেল'গুলি 'আপোষে' নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে সমগ্র বিশ্ব বাজারের উপর আধিপত্য করেছে – যুদ্ধের মাধ্যমে **পুনর্বন্টন** না হওয়া পর্যন্ত – সেই 'কার্টেল'গুলির সংখ্যা ইতিমধ্যে এক শতের উপর হয়েছে । একচেটেবাদ বিহীন পুঁজিবাদের অধীনস্থ পণ্যের রপ্তানী থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিষয় পুঁজির রপ্তানী বিশ্বের অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক ভাগ-বাটোয়ারার সাথে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে ; (৫) দুনিয়ার আঞ্চলিক ভাগ-বাটোয়ারা (উপনিবেশসমূহ) সম্পূর্ণ হয়েছে।" [লেনিন, সঃ রঃ, ২৩শ খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৪ "সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রে ভাঙন", পৃঃ ১০৫-৬]

একচেটেবাদের আধিপত্য

আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি যে, পুঁজিবাদের অন্যতম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হলো **পুঁজির কেন্দ্রীভূতকরণ ও কেন্দ্রীয়করণের** (concentration and centralization) নিয়ম ; পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে ঘটে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের ধ্বংস আর বড় বড় প্রতিষ্ঠানের জয়-জয়কার। প্রতিযোগিতার প্রক্রিয়ায় প্রবল চূর্ণ করে দেয় দুর্বলকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াইয়ে সব সুবিধাগুলিই যায় বড় বড় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে। তারা লাভ করে

প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সকল সাফল্যেরই সুযোগ-সুবিধা, যা তাদের দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাধ্যের বাইরেই থাকে।

বৃহদায়তন উৎপাদনের বিজয়, আর পুঁজির কেন্দ্রীভূতকরণ ও কেন্দ্রীয়করণ, বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে, অনিবার্যভাবেই জন্ম দেয় **একচেটেবাদ**। নির্দিষ্ট পণ্য-সামগ্রীর উৎপাদনের বেশীর ভাগ অংশই যে পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, সেই পুঁজিপতিদের মধ্যেকার ঐকমত্য কিংবা তাদের 'ইউনিয়ন' বা সম্মিলনই হলো একচেটেবাদ। পুঁজিপতিদের পক্ষে এরূপ কারবারী জোটের [combination] **সুবিধাবলী** কি বিরাট তা সহজেই বোঝা যায়। কোন নির্দিষ্ট পণ্যের গোটা উৎপাদন (বা মোট উৎপাদনের বেশীর ভাগ) এককভাবেই তাদের হাতে থাকায় এই পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে তারা **বিপুল মাত্রায়ই** তাদের মুনাফা বৃদ্ধি করতে পারে। এটা বোধগম্য যে, উৎপাদনের বৃহত্তর অংশ যখন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পুঁজিপতিদের অল্প কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে একমাত্র তখনই এরূপ কারবারী জোট গঠন করা সম্ভব।

বিংশ শতাব্দীর খোদ গোড়াতেই, অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্প কয়েকটি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই উৎপাদনের কেন্দ্রীভূতকরণ বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য, প্রত্যেক দেশেই খোদ আজ অবধি মাঝারী ও ক্ষুদে প্রতিষ্ঠানসমূহও রয়েছে, যেগুলো স্বল্প সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ এবং স্বল্প পরিমাণে দ্রব্য-সামগ্রীই উৎপাদন করে। কিন্তু নির্ধারক ভূমিকা পালন করে **বৃহত্তম সব কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরী সমূহ,** যেগুলো হাজার হাজার শ্রমিককে শোষণ করে, যন্ত্র-শক্তির বৃহত্তর অংশই থাকে যাদের দখলে, এবং যেগুলো ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি। এসব বিশালাকৃতির প্রতিষ্ঠান কিন্তু সংখ্যার দিক দিয়ে সমগ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের মোট সংখ্যার মাত্র একশত ভাগের এক অংশই ছিল। এটা সুস্পষ্ট যে, বাকী শতকরা নিরানব্বইটিই ছিলো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান, যেগুলো অল্প-সংখ্যক বিশাল প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ছিল অপরাগ।

যৌথ-মূলধনী কোম্পানী [Joint Stock Company] **রূপের প্রতিষ্ঠান বৃহৎ** পুঁজির বিজয়ী অগ্রগতিতে বিপুল মাত্রায় সহায়তা করে। আগে, কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হতো স্বতন্ত্র উদ্যোক্তাদের দ্বারা। স্বতন্ত্র পুঁজিপতিরা তাদের প্রতিষ্ঠানের মালিক হতো, সেগুলো পরিচালনা করতো এবং মুনাফার সবটা নিজের পকেটে নিত। কিন্তু কিছু কিছু উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিপুল পরিমাণ পুঁজির দরকার পড়তো, যেমন রেলপথ তৈরীর কাজ – কোন একজন স্বতন্ত্র পুঁজিপতির পক্ষে যার ব্যবস্থা করা ছিল সাধ্যের অতীত, এ জাতীয় কাজের জন্য তাই যৌথ-মূলধনী কোম্পানী গঠিত হলো। একটি যৌথ-মূলধনী কোম্পানীতে অনেক মালিকের পুঁজি একত্রিত হয়। প্রত্যেক পুঁজিপতি যে-পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করে তার সাথে সঙ্গতিশীল নির্দিষ্ট মালিকানার অংশ [stock, share] সে লাভ করে। আনুষ্ঠানিকভাবে অংশীদার মালিকদের [share holder] সাধারণ সভাই কোম্পানীর সকল মৌলিক প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু বাস্তবে সবচেয়ে বড় অংশীদার-মালিকদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীরই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাতে বজায় থাকে। যেহেতু সাধারণ সভায় ভোটের সংখ্যাটি নির্ধারিত হয় মালিকানার অংশের পরিমাণের উপর, সেহেতু ক্ষুদে অংশীদার-মালিকরা ব্যবসার পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব খাটাতে পারে না। যৌথ-মুলধনী কোম্পানীকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে 'স্টকের' বা মোট পরিশোধিত মালিকানার অংশের শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ মালিকানাই যথেষ্ট। সুতরাং যৌথ-মূলধনী কোম্পানী হলো এমন এক সাংগঠনিক রূপ যাতে ক্ষুদে ও মাজারী পুঁজিপতিদের জমানো পুঁজিকে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে এমনকি উপরের স্তরের

অফিস কর্মচারী ও শ্রমিকদের সঞ্চয়কে বৃহৎ পুঁজি তার নিজের অধীনে নিয়ে আসে এবং নিজের স্বার্থেই ব্যবহার করে।

আধুনিক পুঁজিবাদী দেশসমূহে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সমূহের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠই হলো যৌথ-মূলধনী কোম্পানী বা 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানী'। স্টক কোম্পানীগুলো পুঁজির দ্রুত কেন্দ্রীয়করণ এবং প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্প্রসারণকে উদ্দীপনা দান করে। স্টক কোম্পানীগুলো এমন সব বিশালাকৃতির প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে যা স্বতন্ত্র পুঁজিপতিদের দ্বারা সম্ভব হতো না। আধুনিক রেলপথ, খনি, ধাতুশিল্পের কারখানা, মোটর গাড়ী তৈরীর বড় বড় কারখানা, জাহাজ পরিবহন কোম্পানী – এসব কোন কিছুই স্টক কোম্পানী ছাড়া সম্ভব হতো না।

শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্প্রসারণের কাজকে সহায়তা দান করে, স্টক কোম্পানীগুলো একচেটে 'কর্পোরেশন' গঠনের পথ তৈরী করে দেয়। নির্ধারক ও মৌলিক শিল্প – **ভারী শিল্পেই** একচেটে সংগঠনগুলো প্রথম দেখা দেয়। শিল্পের এই ক্ষেত্রেই বৃহদায়তন উৎপাদনের অগ্রগতি বিশেষভাবে দ্রুত, আর এখানে কেন্দ্রীভূতকরণও এগোয় ক্ষিপ্র গতিতে। তৈল কূপ, কয়লা খনি, লৌহ খনি, লোহা ও ইস্পাত ঢালাইয়ের কারখানাগুলি প্রত্যেক দেশেই মুষ্টিমেয় সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের হাতে কেন্দ্রীভূত। এসব দৈত্যাকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষভাবে হিংস্র চরিত্র ধারণ করে। এসব ক্ষেত্র থেকে পুঁজির অবাধে চলে যাওয়াটা অত্যন্ত কঠিন। এরূপ প্রত্যেকটি উদ্যোগে ইমরাত, সাজ-সরঞ্জাম, বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতির জন্যে বিপুল পরিমাণ পুঁজির খরচা দরকার পড়ে। অসুবিধাজনক দামে অন্যান্য পণ্যের উৎপাদনের জন্যও এই পুঁজির ব্যবহার অসম্ভব। ভারী শিল্পেই সংকটের আঘাত অনুভূত হয় সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে। সংকটের সময় যন্ত্রপাতি, লোহা ও কয়লার চাহিদা ভোগ্য-দ্রব্যের চাহিদার চেয়ে দ্রুত গতিতে হ্রাস পায়। উৎপাদনের প্রতিটি হ্রাসকরণ ভারী শিল্পকে আঘাত হানে কঠিনভাবে ঃ ফরমাশের অভাবে লক্ষ-কোটি টাকা দামের কল-কারখানা অচল হয়ে পড়ে থাকে, উৎপাদনের খরচ বেড়ে যায় প্রচণ্ডভাবে। ভারী শিল্পই সবার আগে একচেটেবাদের কবলে পড়ে। একই সাথে, ভারী শিল্পগুলিকে গ্রাস করে একচেটেবাদ হাত বাড়ায় হালকা শিল্পের দিকেও, একের পর এক সেগুলোকেও পদতলে নিতে থাকে।

কার্টেল, সিণ্ডিকেট ও ট্রাস্ট

পুঁজিবাদী সংঘগুলো [Association] রূপের দিক থেকে বিভিন্ন রকমের হয়। প্রথম দিকে দাম সংক্রান্ত আকস্মিক-প্রকৃতির স্বল্পকাল স্থায়ী চুক্তি হয়। এই চুক্তিগুলি সব ধরণের দীর্ঘকাল স্থায়ী চুক্তির পথই কেবল সুগম করে দেয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে আলাদা প্রতিষ্ঠানগুলো পণ্যের দাম একটি নির্দিষ্ট স্তরে বজায় রাখার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়। এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান থাকে পুরোপুরিভাবেই স্বাধীন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন একই শিল্প ক্ষেত্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে উদ্দেশ্যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কেবল এক নির্দিষ্ট সীমার নীচে দাম না কমানোর প্রতিশ্রুতি দেয় মাত্র। এ ধরনের সংঘকে বলে **কার্টেল** [Cartel]।

যখন প্রতিষ্ঠানগুলো **সিণ্ডিকেটে** [Syndicate] একত্রিত হয় তখন তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বাণিজ্যিক স্বাধীনতা হারায় ঃ তৈরী পণ্য বিক্রয়ের এবং কোন কোন সময় এমনকি কাঁচামালের ক্রয়ের কাজও সিণ্ডিকেটের সাধারণ কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবেই তার উৎপাদন-কর্ম চালায়, তবে এখন প্রত্যেকেরই থাকে এক নির্ধারিত কোটা, তার চেয়ে বেশী পরিমাণ পণ্য কেউ উৎপাদন করতে পারে না। এই কোটা 'সিণ্ডিকেট' দ্বারা স্থির করে দেয়া হয়।

ট্রাস্টে [Trust] সংযোগটা হয় আরো বেশী ঘনিষ্ঠ। এখানে পৃথক প্রতিষ্ঠান সমূহ **পুরোপুরিভাবেই একত্রিত হয়ে যায়** [merge]। স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান সমূহের মালিকরা ট্রাস্টের মধ্যে শেয়ার হোল্ডার-এ পরিণত হয়। ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানে থাকে একই সাধারণ ব্যবস্থাপনা।

নিকট-শিল্পের জোট

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন না কোন ভাবে সংযুক্ত স্বতন্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের একত্রীকরণ ক্রমান্বেয়ই একটা বড় ভূমিকা নেয়। উদাহরণ স্বরূপ, একটি ধাতু-নিষ্কাশন কারখানা একত্রিত হয়ে যায় একটা কয়লা-খনি প্রতিষ্ঠানের সাথে, যা তাকে যোগান দেয় কয়লা ও কোক। আবার এই ধাতু-নিষ্কাশন ও কয়লা খনি প্রতিষ্ঠানটি প্রায়শই একত্রিত হয়ে যায় যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে, যেখানে তৈরী হয় রেল-ইঞ্জিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। এ ধরণের একত্রীকরণকে বলা হয় **নিকট-শিল্পের জোট** [Vertical combination]।

একচেটেবাদের বিকাশ বহু পুঁজিপতিকেই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান গঠনে উৎসাহিত করে। ধরা যাক, কয়লা-খনি কোম্পানীগুলো একটা সিণ্ডিকেট গঠন করেছে এবং কয়লা ও কোকের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। ধাতু-নিষ্কাশন শিল্পে এই উভয় ধরণের বস্তুরই যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে, ধাতু-নিষ্কাশন কারখানার বহু মালিক তাদের নিজস্ব কয়লা খনি ও কোক তৈরীর চুল্লী পাওয়ার চেষ্টা করবে। এভাবে সিণ্ডিকেটে যুক্ত কয়লা-শিল্পকে উচ্চমূল্য পরিশোধ করা তারা পরিহার করে এবং বিপুল পরিমাণ অতি-মুনাফা অর্জনের সুযোগ লাভ করে

কর্পোরেশন

যৌথ-মূলধনী মালিকানা [stock holders] রূপের প্রতিষ্ঠান সমূহের বিস্তৃতি প্রায়শঃই আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের একটা জটিল একত্র-সংঘবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠান কোন-না-কোন সূত্রে অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে, যা আবার পালাক্রমে তৃতীয় আরেকটি প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয় এবং চলতে থাকে। শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও হস্তক্ষেপ প্রতিষ্ঠান সমূহের সকল গ্রুপগুলির মধ্যে এ ধরণের আর্থিক যোগাযোগের বিস্তারকে বিপুলভাবে জোরদার করে।

পুঁজিপতিদের কিছু কিছু শক্তিশালী গোষ্ঠীর দ্বারা কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত শেয়ারের [stock] বড় অংশ কিনে নেওয়ার ঘটনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। আমরা পূর্বে দেখিয়ে দিয়েছি যে, কোন কোম্পানীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পেতে হলে তার 'স্টকের' বা পরিশোধিত শেয়ারের এক-তৃতীয়াংশের মালিক হওয়াই যথেষ্ট। এরূপ সংখ্যক শেয়ার মালিকানা [বা, কোন সময় বলা হয় – **নিয়ন্ত্রণকারী অংশ** বা controlling interest] কিনে নিয়ে পুঁজিবাদী গোষ্ঠীগুলি একের পর এক স্টক কোম্পানীকে তাদের নিজস্ব প্রভাবের অধীনে নিয়ে আসে। বৃহৎ পুঁজির রাজাদের প্রভাব ও কর্মের বলয়ের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান সমূহের এরূপ গিলে ফেলাটা সর্বত্রই ঘটে, আর এই প্রক্রিয়া যেসব রূপ গ্রহণ করে সেগুলোও হয় সবচেয়ে বিভিন্নমুখী।

সাধারণত, **আর্থিক** পরস্পর-নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে পৃথক প্রতিষ্ঠান সমূহকে একত্রে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করার এ ধরণের রূপকে বলে **'ইনকর্পোরেশন'** [incorporation-একদেহ ভুক্তকরণ] আর এভাবে গঠিত গোষ্ঠিকে বলে **'কর্পোরেশন'** [corporation]।

একচেটেবাদ ও প্রতিযোগিতা

অবাধ প্রতিযোগিতার স্থলে পুঁজিবাদী একচেটেবাদের অধিষ্ঠান হলো সাম্রাজ্যবাদী যুগের এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য। মার্কস এমনকি তাঁর নিজের কালেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, অবাধ প্রতিযোগিতা অনিবার্যভাবেই একচেটেবাদের উত্থান ও আধিপত্যের দিকে চালিত করে। কিন্তু একচেটেবাদ অবাধ প্রতিযোগিতাকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে। একচেটেবাদীরা কোন নির্দিষ্ট পণ্যের সমগ্র উৎপাদনের উপরই নিয়ন্ত্রণ অর্জনের চেষ্টা করে। একচেটেবাদের পরিস্থিতি, বিপুল ব্যাপক শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান শোষণের বদৌলতে, পুঁজিবাদের সমৃদ্ধি অর্জনের অবাঞ্ছিত সুযোগই সৃষ্টি করে দেয়।

একচেটেবাদের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি-বিকাশ কিন্তু পুঁজিপতিদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতাকে বিলুপ্ত করে দেয় না, বরং বিপরীত পক্ষে, তা আরো তীক্ষ্ণ ও হিংস্র করে তোলে। আগে, অবাধ প্রতিযোগিতার সময় যেখানে বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র পুঁজিপতি পরস্পরের মধ্যে লড়াই করতো, সেক্ষেত্রে এখন লড়াই চলে পুঁজিপতিদের শক্তিশালী জোটগুলির মধ্যে – এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আরেক গোষ্ঠীর। যেসব প্রতিষ্ঠান (তথাকথিত "অবাধ্য" প্রতিষ্ঠান) একচেটেবাদীদের সাথে মৈত্রীতে আবদ্ধ হতে চায় না, সেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তারা প্রচণ্ড লড়াই পরিচালনা করে। এই সংগ্রামে সব ধরণের হীন পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়, এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়াও বাদ যায় না। অধিকন্তু, যখন একচেটেবাদীরা তাদের পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে তখন শিল্পের যেসব শাখা এই পণ্যের ব্যবহারকারী ও ক্রেতা সেসব ক্ষেত্র থেকে আসে প্রবল প্রতিরোধ। কয়লা খনির সিণ্ডিকেট যখন কয়লার দাম বাড়িয়ে দেয়, তখন যেসব কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরীর মালিক তাদের কারবারের ক্ষেত্রে কয়লা ব্যবহার করে সেসব মালিকদের মধ্যে তা সৃষ্টি করে প্রতিরোধ। অনেকে কয়লার বদলে অন্যান্য জ্বালানী ব্যবহারের চেষ্টা চালায়, যেমন পিট কয়লা কিংবা খনিজ তেল, কিংবা বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারে তারা চলে যায়। যে ধাতু-নিষ্কাশন শিল্প বিশেষভাবে বিপুল পরিমাণ কয়লা ও কোক ব্যবহার করে, তারা তাদের নিজস্ব কয়লা খনি পাওয়ার চেষ্টা করে। শিল্পের সকল শাখার মধ্যে মরনপণ লড়াই দেখা দেয়। যে শিল্পে কেন্দ্রীভূতকরণের মাত্রা যত বেশী, একচেটেবাদের ভূমিকা যত বেশী – সেই শিল্পে এই লড়াই তত বেশী।

একচেটেবাদী জোটগুলোর মধ্যে তিক্ত সংগ্রাম দেখা দেয়। আগে যারা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগী, এখন তারা কার্টেল, সিণ্ডিকেট কিংবা ট্রাস্টে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অন্য উপায়ে নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। প্রত্যেকেই চেষ্টা করে অভিন্ন একচেটেবাদী মুনাফার বড় অংশটি নিজেই আত্মসাৎ করতে। একচেটেবাদীদের অভ্যন্তরীণ লড়াইটা চলে প্রায়শই অত্যন্ত গোপনে; কেবল বিশেষভাবে তীব্র লড়াইয়ের ক্ষেত্রেই তা বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

এভাবে আমরা দেখতে পারছি যে, প্রতিযোগিতাই কেবল একচেটেবাদের জন্ম দেয় না, বরং পালাক্রমে, একচেটেবাদও **প্রতিযোগিতার জন্ম দেয়**, চরম সীমা পর্যন্ত তাকে **শক্তিশালী ও তীব্র** করে তোলে।

"অবাধ প্রতিযোগিতা হলো পুঁজিবাদ, আর সাধারণভাবে পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। একচেটেবাদ হলো অবাধ প্রতিযোগিতার ঠিক বিপরীত ; কিন্তু আমরা দেখেছি যে, অবাধ প্রতিযোগিতা আমাদের চোখের সামনেই একচেটেবাদে রূপান্তরিত হয়েছে, সৃষ্টি করেছে বৃহদায়তন শিল্প আর নির্মূল করছে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, বৃহদায়তন শিল্পের স্থানে নিয়ে আসছে অধিক বৃহদায়তন শিল্প, পরিণামে তা উৎপাদনের ও পুঁজির এমন এক কেন্দ্রীভূতকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যে

একচেটেবাদই হয়েছে এবং হচ্ছে তার ফলাফল ঃ কার্টেল, সিণ্ডিকেট ও ট্রাস্ট, আর সেগুলোর সাথে একীভূত হয়ে ডজনখানেক বা তার চেয়ে বেশী ব্যাঙ্ক কোটি কোটি মুদ্রা স্ব-স্বার্থ সাধনে ব্যবহার করছে ; একই সাথে, যে একচেটেবাদ অবাধ প্রতিযোগিতা থেকে জন্ম নিয়েছে, সেই অবাধ প্রতিযোগিতাকে তা নিশ্চিহ্ন করে না, বরং তারা পাশাপাশিই বিদ্যমান থাকে, এবং যেন তার চারপাশেই ঘোরাফেরা করে আর পরিণাম স্বরূপ, জন্ম দেয় বেশ কিছুসংখ্যক সুতীব্র বৈরীতা, সংঘর্ষ ও সংঘাত।" [লেনিন, "সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়']

একচেটে পুঁজিবাদ হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ

লেনিন বার বার জোর দিয়ে বলেছেন যে, একচেটেবাদের আধিপত্যের দ্বারা অবাধ প্রতিযোগিতার স্থান গ্রহণের অর্থ প্রতিযোগিতার অবসান নয়, বরং, বিপরীত পক্ষে, তা হলো তার চূড়ান্ত তীব্রতা লাভেরই শর্ত, তা হলো সাম্রাজ্যবাদের যুগের সবচেয়ে **গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য**। লেনিন নিয়তই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ হলো একচেটে পুঁজিবাদ। লেনিনের ভাষায়, পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বশেষ পর্বের শেষ কথাই হলো একচেটেবাদ। লেনিন বলেছেন, **অবাধ প্রতিযোগিতার বদলে একচেটেবাদের স্থান অধিগ্রহণটা** হলো সাম্রাজ্যবাদের মৌলিক অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, সাম্রাজ্যবাদের সারবস্তু। সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের এক বিশেষ পর্যায় রূপে বর্ণনা করতে গিয়ে লেনিন তাঁর সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত রচনায় লিখেছেন ঃ

"সাম্রাজ্যবাদের সম্ভাব্য সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়োজন হলে আমাদের বলা উচিৎ যে, সাম্রাজ্যবাদ হলো পুঁজিবাদের একচেটেবাদী পর্যায়। এরূপ এক সংজ্ঞায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই অন্তর্ভুক্ত হয় ; কারণ, একদিকে, লগ্নী পুঁজি হলো উৎপাদনকারীদের একচেটেবাদী কারবারী জোটগুলির [combines] পুঁজির সাথে মিলেমিশে একত্রীভূত হয়ে যাওয়া মুষ্টিমেয় বৃহৎ একচেটেবাদী ব্যাংকের ব্যাংক পুঁজি ; আর অপর দিকে, বিশ্বের বিভক্তিটা হলো, যে ঔপনিবেশিক কর্মনীতি কোন পুঁজিবাদী শক্তি কর্তৃক অনধিকৃত অঞ্চলগুলিতে কোনরূপ বাধা ছাড়াই বিস্তার লাভ করেছে, সেই কর্মনীতি থেকে এমন এক ঔপনিবেশিক কর্মনীতিতে রূপান্তর যা হলো সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত হয়ে যাওয়া বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের একচেটেবাদী অধিকার কায়েমের কর্মনীতি।" [ঐ]

অন্যত্র লেনিন বলেছেন ঃ

"সাম্রাজ্যবাদ (কিংবা লগ্নী পুঁজির 'যুগ' – শব্দ নিয়ে বিতর্ক আমরা করবো না) হলো, অর্থনৈতিকভাবে বলতে গেলে, পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়, অর্থাৎ, যে পর্যায়ে উৎপাদন এরূপ বৃহদায়তনে চলে যে, **একচেটেবাদ দখল করে নেয় অবাধ প্রতিযোগিতার স্থান**। এটাই হলো সাম্রাজ্যবাদের **অর্থনৈতিক** সারবস্তু। একচেটেবাদ নিজেকে অভিব্যক্ত করে ট্রাস্ট, সিণ্ডিকেট ইত্যাদিতে, বিশালাকৃতির ব্যাংকের অসীম শক্তির মধ্যে, কাঁচামালের উৎসগুলি করায়ত্তকরণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে, ব্যাংক পুঁজির কেন্দ্রীয়করণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। **সমস্ত বিষয়টার মূল** নিহিত রয়েছে অর্থনৈতিক একচেটেবাদের মধ্যে।" ["মার্কসবাদ নিয়ে তামাশা ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবাদ", সঃ রঃ, ২৩শ খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৪, পৃঃ ৪২]

এখানে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে একদিকে লেনিনের অধ্যয়নের দৃষ্টিভঙ্গী, আর অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক তাত্ত্বিক হিল্‌ফারডিঙের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে। সর্বাধুনিক পুঁজিবাদের শিল্প-কাঠামোর ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে হিলফারডিঙ সেগুলিকে সর্বপ্রধান বলে গণ্য না করে বরং সঞ্চলনের ক্ষেত্রে – সর্বপ্রথম, ঋণ-দান ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, ব্যাংক-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে – যেসব পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলিকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। হিলফারডিঙের দ্বারা মার্কস-এর অপব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য সূচক

বিনিময় ধারণাটা [exchange conception] এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। উৎপাদনকে প্রধান স্থান, অর্থাৎ প্রভূত্বশীল, নির্ধারক গুরুত্বের স্থান দেয়ার বদলে তিনি (উৎপাদিত-দ্রব্যের) সঞ্চলনকে প্রধান স্থান দিচ্ছেন। বিনিময়-ধারণটা হলো সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট তাত্ত্বিকদের প্রকৃত বিশেষত্ব। বিনিময়-ধারণা আর এর সাথে যুক্ত মূল্য, মুদ্রা ও সংকট সম্পর্কিত তত্ত্বের ক্ষেত্রে বেশ কতকগুলি ভ্রান্তি হিলফারডিঙ-কে এমনকি (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই সুবিধাবাদী সিদ্ধান্তে নিয়ে গিয়েছিল, যা লেনিন উল্লেখ করেছেন। বিশ্বযুদ্ধ-পূর্বকালীন সময়ে হিলফারডিঙ বিষয়গুলোকে এমনভাবে চিত্রিত করেছিলেন যেন সমগ্র দেশের কর্তা হওয়ার জন্য বার্লিন নগরীর ছয়টি বৃহত্তর ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ লাভ করাই যথেষ্ট। সমস্যাটিকে এভাবে উপস্থিত করার পদ্ধতিটি ক্ষমতা লাভের জন্য, নিজেদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ় করার জন্য, উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব কায়েমের জন্য, শিল্প ও কৃষি – উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদন সংগঠিত করার জন্য সর্বহারাশ্রেণীর দীর্ঘস্থায়ী বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা আড়াল করে দেয়। সমস্যাটিকে এইভাবে উপস্থিত করার পদ্ধতি প্রতি পদক্ষেপে বিজয়ী সর্বহারা শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণী যে প্রচণ্ড প্রতিরোধ সৃষ্টি করে তাকে মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয়তাও আড়াল করে দেয়। (প্রথম) মহাযুদ্ধের পর প্রতি-বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসির সর্বাপেক্ষা নির্লজ্জ নেতাদের একজন রূপে হিলফারডিঙ উদ্ভাবন করেন সংগঠিত পুঁজিবাদের বিশ্বাসঘাতকতা মূলক তত্ত্ব। সংগঠিত পুঁজিবাদের এই তত্ত্ব হলো আধুনিক সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসির সরকারী মতবাদ। বিনিময়-ধারণার মধ্যে যে ভাবধারা নিহিত ছিল সেই একই ভাবধারার আরো অধিক বিকাশকেই তা তুলে ধরছে। সংগঠিত পুঁজিবাদের এই তত্ত্ব সম্পর্কে পরে আমরা আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলিতে একচেটিয়া জোটসমূহ

একচেটে জোটগুলি সবচেয়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করে আমেরিকায় ; সেজন্যে আমেরিকাকে বলা হয় "ট্রাস্টের দেশ"। বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতেই, মার্কিন ট্রাস্টগুলোর হাতে উৎপাদনের বৃহত্তর অংশই ইতোমধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়। এভাবে তেল ট্রাস্টের হাতে ছিল সমগ্র খনিজ তেল উৎপাদনের শতকরা ৯৫ ভাগ ; নিজের একচেটে অবস্থানকে ব্যবহার করে তেল ট্রাস্ট তার মুনাফা ১৮৮২ সালে শতকরা ৫ ভাগ থেকে বাড়িয়ে এ শতাব্দীর শুরুতে শতকরা ৪২ ভাগে পরিণত করে। রাসায়নিক ট্রাস্টের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় রাসায়নিক শিল্পের উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ, সীসা ট্রাস্টের হাতে শতকরা ৮৫ ভাগ, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পুঁজিবাদী সংগঠন সমূহের অন্যতম একটি হলো 'ইউনাইটেড স্টেটস্ স্টীল কর্পোরেশন'। ১৯০২ সালে এর পুঁজি ছিল ১৫০ কোটি ডলার, ১৯২৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫০ কোটি ডলারে, আর এর কারখানার সংখ্যা হলো ১৪৭টি। সংকটের সময় পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান ১ কোটি ৬০ লক্ষ টন লৌহ পিণ্ড এবং ২ কোটি টন ইস্পাত উৎপাদন করেছে, যা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট লৌহ পিণ্ড ও ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ। এই 'কর্পোরেশনের' প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত লোকের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৭৬ হাজার। প্রায় একই সংখ্যক লোক নিযুক্ত ছিল আরেকটি ট্রাস্ট – 'এ্যামেরিকান টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন কোম্পানীতে', যে ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সে দেশের সমগ্র টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন যোগাযোগের শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত উৎপাদনের তিন-চতুর্থাংশ কেন্দ্রীভূত হলো তিনটি বিশালাকৃতির ট্রাস্টের হাতে। বিদ্যুৎ শিল্পে একটি ট্রাস্টই (জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী-জিইসি) আধিপত্য কায়েম করে রেখেছে। চিনি ও তামাক শিল্পের ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ ভাগ উৎপাদনই কেন্দ্রীভূত রয়েছে সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টগুলির হাতে।

মার্কিন তেল ট্রাস্টের অধিকারে রয়েছে ১০০ কোটি ডলারের উপর পুঁজি। মটর গাড়ী শিল্পে সর্বমোট কুড়ি খানেক কোম্পানী রয়েছে, কিন্তু এ শিল্পে উৎপাদনের তিন-চতুর্থাংশই নিয়ন্ত্রণ করে পাঁচটি সর্ববৃহৎ কোম্পানী।

এদের মধ্যে আবার দুটি প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সাথে ভয়ঙ্কর লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে। এগুলো হলো সুবিখ্যাত 'ফোর্ড কোম্পানী' আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী 'জেনারেল মোটরস্ কর্পোরেশন'। ফোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন পুঁজি হলো ১০০ কোটি ডলার ; জেনারেল মোটরস্-এর ১৫০ কোটি ডলার। ১৯২৬ সালে মোটর গাড়ী বিক্রী থেকে অর্জিত জেনারেল মোটরস্-এর মোট আয় হয়েছিল ১০০ কোটি ডলার, আর ফোর্ডের ৭৫ কোটি ডলার। জেনারেল মোটরস্-এর 'নিট' মুনাফা হয়েছিল ১৮ কোটি ডলার আর ফোর্ডের ১০ কোটি ডলার।

বিরাট জালের মতো বিস্তৃত আমেরিকার রেলপথগুলির মালিক হলো কোটিপতিদের এক ক্ষুদে গোষ্ঠী। ১৯২৭ সালে মোরগ্যান ব্যাঙ্কিং গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে ছিল ৩৫,০০০ কিলোমিটার রেলপথ, যার মূল্য ছিল ৩৫০ কোটি ডলার।

মার্কিন ব্যাঙ্কগুলি শিল্পের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ব্যাঙ্কগুলির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে রয়েছে অত্যন্ত বিপুল সংখ্যক শিল্প-প্রতিষ্ঠান। মোরগ্যান ব্যাংকিং গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে যেসব শিল্প-প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের মোট পুঁজি ৭,৪০০ কোটি ডলার বলে অনুমিত হয়।

সংকটের আঘাতে এমনকি সবচেয়ে বিশালাকৃতির একচেটেবাদী সংস্থায়ও ফাটল ধরে। এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, ফোর্ডের যে কারখানাগুলিতে সংকটের পূর্বে ১ লক্ষ ২০ হাজার লোক কাজ করতো সেখানে ১৯৩২ সালের শরৎ কালে কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ১৫ হাজারের বেশী ছিল না। অন্যান্য দৈত্যাকৃতির একচেটে পুঁজির ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা বিরাজ করছিল। 'ক্রুগার ম্যাচ ট্রাস্টের' মতো সবচেয়ে বৃহৎ কতকগুলি ট্রাস্ট একেবারে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। যে বৃটিশ তেল-সম্রাট ডেটারডিং সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই হস্তক্ষেপের উস্কানি দেয়ার চেষ্টা করছিল, তাকেও সংকটের দরুন বিপুল বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

(প্রথম) মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীতে, মোট ইস্পাত উৎপাদনের দশ ভাগের নয় ভাগ ছিল 'স্টীল ইউনিয়নের' নিয়ন্ত্রণে ; কয়লা শিল্পের ক্ষেত্রে, 'রেনিশ ওয়েস্টফেলিয়ান কোল সিণ্ডিকেট' তার গড়ে ওঠার কালে, কয়লা সম্পদের ক্ষেত্রে জার্মানীতে সবচেয়ে সমৃদ্ধ রেনিশ কয়লা অঞ্চলের, কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৮৭ ভাগ (এবং পরবর্তীকালে শতকরা ৯৫ ভাগ) নিয়ন্ত্রণ করতো।

(প্রথম) মহাযুদ্ধোত্তর কালে, জার্মানীর 'স্টিনস্ কর্পোরেশন'-এর নাম খুব শোনা যেত। যুদ্ধের সময় সামরিক সরবরাহের যোগান দিয়ে 'স্টিনস্' বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠে ; জার্মান মুদ্রা 'মার্ক'-এর মুদ্রা-স্ফীতির সুযোগ নিয়ে, স্টিনস্ প্রায় পানির দরে কয়লা খনি, বৈদ্যুতিক সামগ্রী সরবরাহ কারখানা, টেলিগ্রাফ এজেন্সী ও ব্যাংক, কাগজের কল ও জাহাজ কোম্পানী, ধাতু-নিষ্কাশন কারখানা ও সংবাদপত্র, ইত্যাদি সব ধরণের প্রতিষ্ঠান ক্রয় করেছিল। কিন্তু 'মার্ক'-এর মূল্যমান স্থিতিশীল হওয়া মাত্র লক্ষ লক্ষ শ্রমিক নিয়োগকারী এই বিশালাকৃতির কারবারী সংস্থাটি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লো।

(প্রথম) মহাযুদ্ধোত্তরকালে জার্মানীতে, কেন্দ্রীভূতকরণ ও বিশালাকৃতির একচেটে জোট গঠনের এক নতুন ঢেউ দেখা দিল। ১৯২৮ সালের শেষ নাগাদ সমস্ত স্টক কোম্পানীর তিন ভাগের দুই ভাগ (বিনিয়োগকৃত পুঁজি অনুযায়ী) জোটবদ্ধ হলো কর্পোরেশনে। প্রায় একই সময়েই, সমসাময়িক জার্মানীর দুটি সর্ববৃহৎ ট্রাস্ট – কেমিক্যাল ও স্টীল ট্রাস্ট – জোট-গঠনকারী পুঁজিপতিদের দ্বারা গঠিত হয়। কেমিক্যাল ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণে ছিল ১২০০ কোটি

মার্ক-এর পুঁজি। রঙ উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ এবং নাইট্রোজেন উৎপাদনের শতকরা ৭৫ ভাগ ছিল এদের হাতে কেন্দ্রীভূত। জার্মান স্টিল ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণে ছিল ৮০ কোটি মার্ক-এর পুঁজি এবং (সংকটের সময় পর্যন্ত) ১৫ হাজার শ্রমিক ছিল সেখানে নিযুক্ত, তারা উৎপাদন করতো জার্মানীর মোট লৌহ পিণ্ড ও ইস্পাত উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক।

অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশেও একই জিনিস লক্ষ্য করা যায়। ইংল্যাণ্ড, জাপান, ফ্রান্স, ইটালী, এমনকি বেলজিয়াম ও সুইডেনের মতো ক্ষুদ্র দেশ – সর্বত্রই, কর্তৃত্বটা রয়েছে অতিশয় অল্প-সংখ্যক বিশাল একচেটে প্রতিষ্ঠানেরই হাতে, যেগুলো পরিচালিত হয় মুষ্টিমেয় ট্রাস্ট পরিচালকদের দ্বারা।

জারতান্ত্রিক রাশিয়াতেও পুঁজিপতিদের বেশ কয়েকটি বৃহৎ একচেটে কারবারী জোট (combines) ছিল। 'প্রোদুগল সিণ্ডিকেট' নিয়ন্ত্রণ করতো দনেৎস্ অববাহিকা অঞ্চলে উৎপাদিত কয়লার অর্ধেকেরও বেশী। 'পোদামেৎ' নামের আরেকটি সিণ্ডিকেট বাজারে যত লোহা বিক্রী হতো তার শতকরা ৯৫ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো। সবচেয়ে পুরানো সিণ্ডিকেটগুলোর অন্যতম একটি ছিল চিনির সিণ্ডিকেটটি।

লগ্নী পুঁজি

সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাধীনে **ব্যাংকগুলি** যে নতুন ভূমিকা পালন করে তার দ্বারা একচেটেবাদের শক্তি ও তাৎপর্য বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়।

ব্যাংকগুলি প্রথমে ছিল আর্থিক লেন-দেনের মধ্যস্থতাকারী। পুঁজিবাদ যতই বিকাশ লাভ করতে থাকে ব্যাংকসমূহের ঋণদান সম্পর্কিত তৎপরতাও ততই বেড়ে যেতে থাকে। ব্যাংকের কাজ-কারবার হলো পুঁজি নিয়ে। যেসব পুঁজিপতি তাৎক্ষণিক তাদের পুঁজি নিজেরা ব্যবহার করতে পারছে না, সেসব পুঁজিপতিদের কাছ থেকে ব্যাংক পুঁজি গ্রহণ করে এবং ঐ মুহূর্তে যেসব পুঁজিপতির পুঁজি দরকার হয় তাদেরকে তা দেয়। সব ধরণের আয়ই ব্যাংক সংগ্রহ করে এবং তা পুঁজিপতিদের সেবায় নিয়োগ করে।

পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে ঠিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের মতোই, ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলোও একত্রিত হয়, তাদের আয়তন ও পুঁজির আবর্তন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পায় এবং বিপুল পরিমাণ পুঁজি পুঞ্জীভূত করে। এই পুঁজির বৃহত্তর অংশই হলো অন্যের মালিকানাধীন, কিন্তু ব্যাংকের নিজের পুঁজিও ক্ষিপ্রগতিতে বাড়তে থাকে। ব্যাংকগুলির সংখ্যাও ক্রমেই কমতে থাকে, ছোট ছোট ব্যাংকগুলি বন্ধ হয়ে যায় কিংবা বৃহৎ ব্যাংকগুলির পেটে চলে যায়। কিন্তু ব্যাংকগুলির আয়তন, তাদের পুঁজির মাত্রা-পরিমাণ বাড়তে থাকে। এ বিষয়ে নীচের উদাহরণটাই যথেষ্ট হবে। ১৮৯০ সাল থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে ব্যাংকের সংখ্যা ১০৪ থেকে কমে ৪৪ হয়, কিন্তু তাদের পুঁজি বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩ কোটি পাউন্ড থেকে ৮৫ কোটি পাউণ্ডে। প্রয়োজনের সময় শিল্পপতিদের কেবল স্বল্পমেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করার মধ্যেই কোন ব্যাংক এখন আর তার কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখে না। বিপুল পরিমাণে পুঞ্জীভূত পুঁজিকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে **ব্যাংকগুলি শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে গড়ে তুলে**। উৎপাদন সম্প্রসারণ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ইত্যাদি মঞ্জুর করে ব্যাংক এখন তার আমানতী জমার (deposit) একটি নির্দিষ্ট অংশ সরাসরি শিল্পে বিনিয়োগ করে।

যৌথ-মূলধনী মালিকানাধীন [stock-holding] কোম্পানীগুলো শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের সবচেয়ে সুবিধাজনক রূপ ব্যাংকগুলিকে প্রদান করে। এ জন্যে ব্যাংকের যা করতে হবে তা হলো ঐ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কিছু শেয়ার খরিদ করা। মোট শেয়ারের এমনকি মাত্র এক-তৃতীয়াংশের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করেই ব্যাংক গোটা প্রতিষ্ঠানের উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও অপরিমেয় ক্ষমতা অর্জন করে।

এভাবে যৌথ-মূলধনী মালিকানাধীন কোম্পানীগুলো ব্যাংক ও শিল্পের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র রূপে কাজ করে। পালাক্রমে, ব্যাংকগুলিও যৌথ-মূলধনী মালিকাধীন কোম্পানীগুলোর বৃদ্ধি-বিকাশকে সহায়তা করে, ব্যক্তি-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহকে যৌথ-মূলধনী মালিকানাধীন কোম্পানীতে পুনর্গঠিত করার (নতুন নীতিমালা অনুযায়ী পুনর্গঠন করার) এবং নতুন যৌথ-মূলধনী মালিকানাধীন কোম্পানী প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে শেয়ার বেচা-কেনার পরিমাণ বাড়তে থাকে।

ব্যাংক-ব্যবসার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূতকরণ ও কেন্দ্রীয়করণের নিয়ম বিশেষ জোরের সাথে অভিব্যক্ত হয়। সবচেয়ে বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে তিন থেকে পাঁচটি **সর্ববৃহৎ** ব্যাংকই গোটা ব্যাংক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যান্য ব্যাংকগুলো বাস্তবতঃ হয় এসব দৈত্যাকৃতি ব্যাংকের অধীন-সংস্থা (subsidiary) হয়ে দাঁড়ায়, যাদের স্বাধীনতাটা হলো কেবল লোক দেখানো ব্যাপার মাত্র, আর নাহয় পুরোপুরিভাবেই এক তাৎপর্যহীন ভূমিকাই পালন করে। এসব বিশালাকার ব্যাংকগুলি ঘনিষ্ঠভাবেই একচেটেবাদী শিল্প-জোটগুলির সাথে যুক্ত। **ব্যাংক-পুঁজি ও শিল্প-পুঁজি মিলে-মিশে একত্রীভূত বা একীভূত** (merging or fusion) হয়ে যাচ্ছে। শিল্প-পুঁজির সাথে মিলে-মিশে একীভূত হয়ে যাওয়া ব্যাংক-পুঁজিকে বলে **লগ্নী পুঁজি** (finance capital)। একচেটে শিল্প-সংস্থাগুলির সাথে ব্যাংক পুঁজির এই পরিপূর্ণ মিলনটা হলো সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য।

একচেটেবাদের বিকাশ আর লগ্নী-পুঁজির বিকাশ পুঁজিবাদী বিশ্বের গোটা ভাগ্যটাই **সবচেয়ে বৃহৎ পুঁজিপতিদের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর** হাতে তুলে দিয়েছে। শিল্প-পুঁজির সাথে ব্যাংক-পুঁজির পরিপূর্ণ মিলন এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে সবচেয়ে বড় ব্যাংক-মালিকরা শুরু করে শিল্প পরিচালনা করতে, আর সবচেয়ে বড় শিল্পপতিরা স্থান পায় ব্যাংকগুলির পরিচালক-মণ্ডলীতে। প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশের গোটা অর্থনৈতিক জীবনের ভাগ্যই অবস্থান করে ব্যাংক-মালিক ও একচেটেবাদী শিল্প-মালিকদের নিরতিশয় ক্ষুদ্র-সংখ্যক গোষ্ঠীর হাতে। আর অর্থনৈতিক জীবনের ভাগ্য-নিয়ন্তা যে, দেশের ভাগ্যনিয়ন্তাও সে-ই। সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়া দেশগুলিতে সরকারের রূপ যাই হোক না কেন, কার্য্যতঃ, লগ্নী-পুঁজির মুষ্টিমেয় মুকুটহীন রাজাদের হাতেই থাকে **সর্বময় ক্ষমতা**। সরকারী রাষ্ট্রটা হলো কেবল এসব পুঁজিবাদী ক্ষমতাবানদের ভৃত্য মাত্র। সকল পুঁজিবাদী দেশেই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর সমাধান নির্ভর করে সবচেয়ে বৃহৎ পুঁজিপতিদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর উপর। নিজেদের লোভাতুর স্বার্থে এসব পুঁজিবাদী ক্ষমতাবানরা বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাধিয়ে দেয় বড় বড় বিবাদ-বিসম্বাদ, উস্কানি দেয় যুদ্ধের, দমন করে শ্রমিক আন্দোলন এবং পিষে মারে উপনিবেশসমূহের অভ্যুত্থানগুলোকে।

একচেটেবাদের আধিপত্যশীল হয়ে ওঠার সাথে সাথেই মুষ্টিমেয় কিছু লোক সমগ্র জনগণের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। পুঁজিবাদী জার্মানীর অন্যতম এক নেতা-এ,ই,জি'র (জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী) পরিচালক র‍্যাথেনু একদা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন ঃ

"পরস্পরের নিকট পরিচিত তিন শত ব্যক্তি হলো বিশ্বের অর্থনৈতিক ভাগ্যের নিয়ন্তা আর তারা তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তাদের উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে।"

উদাহরণ স্বরূপ, এটা অনুমান করা হয় যে, ফ্রান্সে ৫০-৬০ জন বড় ধনিক হলো ১০৮টি ব্যাংকের, ভারী শিল্পের (অর্থাৎ কয়লা, লোহা ইত্যাদির) ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়

প্রতিষ্ঠান সমূহের ১০৫টির এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্য ১০৭টি প্রতিষ্ঠানের – সর্বমোট ৪২১টি প্রতিষ্ঠানের মালিক, যেগুলোর প্রত্যেকটিতেই জড়িত রয়েছে কোটি কোটি 'ফ্রাঁ' [Franc- ফরাসী মুদ্রা]। অতিশয় ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীর হাতে সমগ্র সম্পদের প্রভূত পরিমাণ অংশের কেন্দ্রীভবন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাড়ছে। এভাবে ইংল্যাণ্ডে দেশের গোটা সম্পদের শতকরা ৩৮ ভাগ ব্যক্তি-মালিকদের শতকরা ০.১২ ভাগের হাতে চলে গেছে, আর শতকরা ২ ভাগেরও কম লোক দেশের সম্পদের শতকরা ৬৪ ভাগের মালিক হয়ে বসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ১ ভাগ লোক দেশের সর্বমোট সম্পদের শতকরা ৫৯ ভাগের মালিক।

পুঁজি রপ্তানী

অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে বিশ্ব বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে সামুদ্রিক জাহাজ যোগে বিপুল পরিমাণ পণ্য সম্ভার রপ্তানী হয়। কিন্তু একচেটে পুঁজিবাদের যুগে পুঁজির রপ্তানী অর্জন করে বিপুল গুরুত্ব।

পুঁজির রপ্তানী সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য – এই বাস্তব ঘটনাটি একচেটেবাদের রাজত্বের সাথে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। যেসব দেশে দীর্ঘকাল ধরে পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটেছে সেসব পুরানো পুঁজিবাদী দেশের একেচেটেবাদ বিপুল পরিমাণের "উদ্বৃত্ত" পুঁজি সৃষ্টি করে। একচেটেবাদ আবার নিজ দেশে পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা কমিয়ে দেয়ার কারণ হয়ে ওঠে। পুঞ্জীভূত একচেটেবাদী মুনাফা তাই লাভজনক বিনিয়োগের সন্ধানে দেশের সীমানা পেরিয়ে বের হয়ে যাওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন করে। লাভজনক বিনিয়োগের এই সুবিধা পাওয়া যায় অধিক পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলিতে। সেখানে মজুরী খুবই কম, আর শ্রম দিবস হলো অত্যন্ত দীর্ঘ। কাঁচামালের উৎসগুলি পুঁজিপতিদের দ্বারা তখন পুরোপুরি লুণ্ঠিত হয়নি। বাজারের সম্ভাবনাটা হলো বিরাট – পুঁজিবাদী পণ্য-সম্ভার ক্ষুদে কারিকর সংস্থাগুলির উৎপাদিত দ্রব্যকে ঠেলে ফেলে দেয়, লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে-উৎপাদককে বুভুক্ষা আর অনশনের মধ্যে নিক্ষেপ করে। অন্যদিকে একচেটেবাদ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার পুরোপুরি দখল করে নেয়, এবং বিদেশী পুঁজিপতিরা সেখানে তাঁদের পণ্য বিক্রী করতে গিয়ে অব্যাহতভাবেই অধিকতর বাধার সম্মুখীন হয়। চড়া আমদানী শুল্কের দরুন পণ্যের আমদানী বাধার সম্মুখীন হয়। একই সাথে একচেটেবাদী সংস্থাগুলো এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে উন্নত পুঁজিবাদী দেশ সমূহের অভ্যন্তরীণ বাজারগুলি বিশালাকৃতির প্রতিষ্ঠানগুলোর পণ্য-সম্ভার বিক্রয়ের চাহিদা পূরণ করতে ক্রমান্বয়েই অপারগ হয়ে উঠে। একচেটেবাদ পণ্যের দাম চড়িয়ে দেয়, যার ফলে অভ্যন্তরীণ বাজার হয়ে উঠে সঙ্কোচিত। তখন তাদেরকে অতি-অবশ্যই অধিকতর পণ্য-সামগ্রী বৈদেশিক বাজারে অব্যাহতভাবে নিক্ষেপ করতে হয়। কিন্তু এসব বাজারগুলো যখন চড়া শুল্কের চার দেয়ালে ঘেরা, তখন কীভাবে তারা সেগুলো ওখানে বিক্রী করবে ?

এখানে পুঁজির রপ্তানী তাদের সহায়তা করে। সবচেয়ে বড় পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পুঁজির একাংশ তখন রপ্তানী করে। বিদেশে তারা তাদের শাখা স্থাপন করে। তারা সেখানে কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরী গড়ে তোলে, আর এভাবে সেই দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তাদের পণ্য বিক্রী করে।

কিন্তু, শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্যেই যে কেবল পুঁজি রপ্তানী করা হয় তা নয়। বিভিন্ন ধরণের ঋণের আকারেও পুঁজি রপ্তানী করা হয়, যার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত ধনী দেশগুলো পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলিকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং তাদের পদানত করে।

(প্রথম) বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে, তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় দেশের (ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ও জার্মানী) বৈদেশিক বিনিয়োগ সুবিপুল আকার ধারণ করেছিল ঃ প্রায় ১০,০০০ কোটি ফ্রাঁ [Franc – ফরাসী মুদ্রা]। এই বিনিয়োগকৃত পুঁজি থেকে বৎসরে আয় দাঁড়িয়েছিল ৮০০-১০০০ কোটি ফ্রাঁ।

সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর নিকট পুঁজি রপ্তানীর তাৎপর্যটা কী তা নিম্নলিখিত তথ্য দ্বারা প্রদর্শিত হলো। ১৯২৫ সালে বৃটিশ পণ্যের – অর্থাৎ, বৃটিশ শিল্পগুলোর উৎপন্ন-দ্রব্যের – রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি পাউণ্ড, আর এই রপ্তানী থেকে মুনাফা হয়েছিল ১০ কোটি পাউণ্ড। একই ১৯২৫ সালে, গ্রেট ব্রিটেন তার বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে সুদ বাবদ পেয়েছিল ৪২ কোটি পাউণ্ড। পণ্য রপ্তানী থেকে প্রাপ্ত মুনাফার চেয়ে এটা ছিল চার গুণেরও বেশী।

পুঁজির প্রবণতা হলো পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলিতে যাওয়া, যেখানে শ্রম-শক্তি হলো সস্তা, শিল্প দুর্বল আর, সে কারণে, পণ্যের বাজারও বেশ বড়। উদাহরণস্বরূপ, (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকালে, রাশিয়ার শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি রুবলেরও উপর। রুশ কয়লা শিল্পে এত পরিমাণ ফরাসী ও বেলজিয়ামের পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছিল যে, রাশিয়ার সবচেয়ে বড় কয়লা উৎপাদনকারী (শতকরা ৬৫ ভাগ) সংস্থা প্রোদুগল সিণ্ডিকেটের প্রধান কার্যালয় স্থানীয়ভাবেই প্যারিসে স্থাপিত ছিল। রাশিয়ার বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম শিল্পের উপর ছিল জার্মান এ, ই, জি (জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী) ও সিয়েমেনস্ শুকার্ট-এর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। রাশিয়ার তেল শিল্পে ব্রিটেন, আমেরিকা ও হল্যাণ্ডের বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োজিত ছিল।

পুঁজি রপ্তানীর সাথে সাথে পুঁজি রপ্তানীকারী ও পুঁজি আমদানীকারী দেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পুঁজি রপ্তানীকারী দেশের স্বার্থ হলো যে দেশে পুঁজি যাচ্ছে সে দেশের বিরাজমান অবস্থা বহাল থাকা। উদাহরণ স্বরূপ, ফরাসী পুঁজিপতিরা রাশিয়ায় জারতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল থাকার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল, যে কারণে ১৯০৬ সালে তারা 'জার'কে ঋণ প্রদান করে এবং এভাবে প্রথম রুশ বিপ্লবকে চূর্ণ করায় বৈষয়িক ভাবে সাহায্য প্রদান করে।

একচেটে পুঁজিবাদীদের বিকাশের সাথে সাথে পুঁজি রপ্তানীর অনুপাতটাও ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর হতে থাকে এবং অধিকতর তাৎপর্য অর্জন করতে থাকে।

"পুরানো ধরণের পুঁজিবাদের অধীনে যখন অবাধ প্রতিযোগিতাই ছিল প্রভূত্বশীল, তখন দ্রব্য-সামগ্রী রপ্তানীটি ছিল সবচেয়ে প্রতীকি বৈশিষ্ট্য। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে যেখানে একচেটেবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে আধিপত্যশীল সেখানে পুঁজির রপ্তানীই হয়ে উঠেছে প্রতীকি বৈশিষ্ট্য।" [লেনিন, "সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়"]

সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাধীনে, পুঁজির রপ্তানীটাই সর্বাগ্রে চলে আসে। অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, পণ্য-দ্রব্য রপ্তানী কমে যায় কিংবা তার গুরুত্ব আর থাকে না। প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, বিপুল পরিমাণ পণ্য-দ্রব্যের জাহাজ-যোগে রপ্তানীর সাথে পুঁজির রপ্তানীটা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ, যদি গ্রেট ব্রিটেন আর্জেন্টিনায় পুঁজি রপ্তানী করে, তবে তার অর্থ হলো এই যে, বৃটিশ পুঁজিপতিদের দ্বারা যেসব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্টক বা শেয়ার খরিদ করা হলো সেগুলো আর্জেন্টিনায়ই অবস্থিত। এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যায় যে, এসব প্রতিষ্ঠানের সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির বৃহত্তর অংশই ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী করা হবে। কিংবা পুঁজির রপ্তানী নিম্নলিখিত রূপও নিতে পারে। ধরুন, গ্রেট ব্রিটেন কোন দেশকে একটা ঋণ মঞ্জুর করলো, এভাবে প্রাপ্ত মুদ্রা দ্বারা গ্রহীতা দেশটি ইংল্যাণ্ড থেকে জিনিসপত্র খরিদ করলো ঃ রেলপথের বস্তু-সামগ্রী, সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি। সুতরাং আমরা দেখতে পারছি যে, পুঁজির রপ্তানী কেবল যে পণ্যের রপ্তানী কমায় না, শুধু তাই নয়, বরং বিপরীতক্রমে, বৈদেশিক বাজারের জন্য সংগ্রামে, পণ্য-দ্রব্যের বিক্রী সম্প্রসারণের সংগ্রামে তা এক নতুন হাতিয়ারেও পরিণত হয়।

পুঁজিপতিদের জোটগুলির মধ্যে বিশ্বের ভাগ-বন্টন

সিণ্ডিকেট ও ট্রাস্ট সমূহ কৃত্রিমভাবে পণ্যের দাম চড়িয়ে রাখে, নিজেদের জন্যে পর্বত-প্রমাণ অতি মুনাফা নিশ্চিত করে। চড়া দাম বজায় রাখার জন্য একচেটে সংস্থাগুলো নিজেদের দেশকে বৈদেশিক প্রতিযোগীদের হাত থেকে দেয়াল দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলো আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর চড়া হারে শুল্ক বসায়। শুল্কের পরিমাণ প্রায়শঃ এমন হয় যে পণ্যের মূল্যর চেয়ে তা বহুগুণ অধিক হয়ে দাঁড়ায়।

১৯২৭ সালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের পরিমাণ গড়পড়তা (মূল্যের শতকরা হিসাবে) ৩৭ ভাগ, জার্মানীতে শতকরা ২০ ভাগ, ফ্রান্সের শতকরা ২১ ভাগ, বেলজিয়ামে শতকরা ১৫ ভাগ, আর্জেন্টিনায় শতকরা ২৯ ভাগ, স্পেনে শতকরা ৪১ ভাগ, অস্ট্রিয়ায় শতকরা ১৬ ভাগ, চেকোশ্লোভাকিয়ায় শতকরা ২৭ ভাগ, যুগোশ্লাভিয়ায় শতকরা ২৩ ভাগ, হাঙ্গেরীতে শতকরা ২৭ ভাগ, পোল্যাণ্ডে শতকরা ৩২ ভাগ, ইতালীতে শতকরা ২২ ভাগ, সুইডেনে শতকরা ১৬ ভাগ। এ হলো গড়পড়তা শতকরা হিসাব। যেহেতু কতকগুলি জিনিসের উপর (যেমন, যেসব কাঁচামাল দেশে পাওয়া যায় না) অতি চড়া হারে শুল্ক বসানো যায় না, সেহেতু অন্য জিনিসের উপর (মুখ্যত শিল্পজাত দ্রব্য, অংশতঃ খাদ্য দ্রব্য) শুল্কের হার অত্যন্ত চড়া হতে বাধ্য। গত কয়েক বৎসর ধরে অধিকাংশ দেশেই নতুন চড়া হারে শুল্ক ধার্য করা হয়েছে। ১৯৩০ সালের গ্রীষ্মকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন শুল্ক বিধি জারী হয়েছে, যা বাস্তবতঃ অনেকগুলি পণ্যের আমদানী নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ঐ একই বৎসর জার্মানী কৃষিজাত পণ্যের উপর নজীরবিহীন মাত্রায় শুল্ক বাড়িয়ে দেয়। একই ভাবে পূর্ব প্রুশিয়ান জমিদাররা তাদের উৎপন্ন-দ্রব্যগুলির দাম বাড়িয়ে দেয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীকেই এই সব কিছুর বোঝা বইতে হয়, কারণ ভোগ-ব্যবহারকারী জনগণের মৌলিক অংশ তারাই তো গঠন করছে।

এভাবে, দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারটা পুরোপুরিভাবেই একচেটেবাদীদের উপর নির্ভরশীল করে ফেলা হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাজার হলো সীমাবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাধীনে শ্রেণী দ্বন্দ্বসমূহ আরো তীব্র হয়ে উঠে এবং জনসাধারণের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠানগুলো যে বিপুল পরিমাণ পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে অভ্যন্তরীণ বাজারে তার পুরো কাটতি সম্ভব হয় না। বৈদেশিক বাজারের জন্যে সংগ্রাম তখন সামনা-সামনি চলে আসে। একচেটে পুঁজির সশস্ত্র রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে তখন সংগ্রাম শুরু হয়। দৈত্যের মতো মহাশক্তিশালী একচেটেবাদী সংগঠনগুলো এ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। এটা সুস্পষ্ট যে, এই সংগ্রাম ক্রমান্বয়েই অধিক তীক্ষ্ণ ও হিংস্র হতে থাকে। এটা সুস্পষ্ট যে, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাধীনে, কাঁচামালের উৎসসমূহের জন্য, রপ্তানী পুঁজির বাজারের জন্য, বিশ্বকে ভাগ বন্টনের জন্য সংগ্রামের সাথে সাথে বাজারের জন্য সংগ্রামই হয়ে দাঁড়ায় অনিবার্য সশস্ত্র সংঘাত ও সর্বনাশা যুদ্ধের কারণ।

একচেটেবাদের বৃদ্ধি-বিকাশের ফলে, বিভিন্ন দেশের একচেটেবাদী সংস্থাগুলি বাজারের ভাগ-বন্টনের প্রশ্নে একটা আপোষ-রফায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে। যখন বিভিন্ন দেশের দুটি বা তিনটি সর্ববৃহৎ ট্রাস্ট কোন নির্দিষ্ট পণ্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বের বুকে নির্ধারক ভূমিকা পালন করতে শুরু করে, তখন তাদের মধ্যেকার সংগ্রাম বিশেষ করেই বিপর্যয়কর হয়ে ওঠে। তখন আপোষ-রফার একটা প্রচেষ্টা অনিবার্য হয়ে পড়ে। সে আপোষ-রফায় সাধারণতঃ বাজারগুলি ভাগ-বাটোয়ারা করা হয়, আপোষ-রফার প্রত্যেক অংশীদারকেই কয়েকটি দেশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, যেখানে আপোষ-রফার অন্যান্য অংশীদারদের কোন

প্রকার প্রতিযোগিতার মোকাবেলা না করেই সে তার পণ্য বিক্রয় করতে পারবে। এমনকি (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই শিল্পের বেশ কয়েকটি শাখার ক্ষেত্রে এরূপ আন্তর্জাতিক কার্টেল বিদ্যমান ছিল। সে সময়ে বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জামের উৎপাদন – একটি মার্কিন ও অপরটি জার্মান – এই দুটি বিশালাকৃতির ট্রাস্টের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল, যারা আবার ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল ব্যাংকের সাথে। ১৯০৭ সালে বিশ্বের ভাগ-বন্টনের প্রশ্নে তারা একটি আপোষ-রফায় পৌঁছায় ঃ তাতে "প্রত্যেকের ভাগেই" কয়েকটি করে দেশ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মার্কিন ও জার্মান জাহাজ কোম্পানীগুলোর মধ্যেও এমন একটা আপোষ-রফা হয়েছিল; এরূপ ছিল রেলপথ ও দস্তার সিণ্ডিকেট। তৈল ট্রাস্টগুলির মধ্যেও চলছিল তখন একটা আপোষ রফার কথাবার্তা।

(প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের পর, ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ নিয়ে গঠিত হয় কিছু-সংখ্যক কার্টেল। এগুলো ছিল ঃ ইস্পাত কার্টেল, পাথর, রাসায়নিক দ্রব্য, তামা, এলুমিনিয়াম, রেডিও, তার, কৃত্রিম রেশম, দস্তা, সূতীবস্ত্র, এনামেলের বাসনপত্র প্রভৃতি উৎপাদনের কার্টেল। এসব অধিকাংশ কার্টেলগুলিতে ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া ও অষ্ট্রিয়া যোগদান করে। কোন কোনটিতে অন্তর্ভূক্ত ছিল পোল্যাণ্ড, সুইজারল্যণ্ড, হাঙ্গেরী, স্পেন ও স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশসমূহ। ১৯২৯ সালে যে বিশ্ব-সংকট শুরু হয়, এসব কার্টেলের অধিকাংশের উপর সে সংকটের অত্যন্ত মারাত্মক প্রভাব পড়ে। এসব কার্টেলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায় এবং তাদের অনেকগুলোই ইতোমধ্যে হয় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে, না হয় ভাঙনের মুখোমুখী পড়েছে।

এটা মনে করা ভুল হবে যে, এসব আন্তর্জাতিক একচেটে আপোষ-রফাগুলি দ্বন্দ্ব-বিরোধের মীমাংসার এক শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিকেই তুলে ধরে। ব্যাপারটা হলো তার বিপরীত।

"আন্তর্জাতিক কার্টেলগুলি দেখিয়ে দেয় পুঁজিবাদী একচেটেবাদ কোন পর্যন্ত বিকাশ লাভ করেছে, এবং বিভিন্ন পুঁজিবাদী গ্রুপের মধ্যেকার সংগ্রামের লক্ষ্যবস্তুকে তারা উদ্‌ঘাটিত করে দেয়।" ["লেনিন, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়"]

আন্তর্জাতিক আপোষ-রফার বৈশিষ্ট্য হলো সেগুলোর অস্থায়িত্ব, আর নিজেদের অভ্যন্তরেই তারা ধারণ করে হিংস্রতম সংঘাতের বীজ। বাজারের ভাগ-বন্টনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই তার নিজের শক্তি ও ক্ষমতার অনুপাতে নিজেদের ভাগটা পেয়ে থাকে। কিন্তু প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ট্রাস্টের ক্ষমতায় আবার পরিবর্তনও ঘটে। প্রত্যেকেই আরো বড় ভাগ পাওয়ার জন্য অব্যাহতভাবেই এক নীরব সংগ্রাম চালিয়ে যায়। নিজেদের মধ্যেকার আপেক্ষিক শক্তির পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই বাজারের পুনর্বন্টনের প্রয়োজন উপস্থিত করে, আর প্রত্যেকটি পুনর্বন্টনই হিংস্রতম সংগ্রামের দিকে ঠেলে দেয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক একচেটেবাদীরা সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলোকে দুর্বল তো করেই না, বরং বিপরীতে, সেগুলোর চূড়ান্ত তীব্রতা লাভের জন্য হচ্ছে সহায়ক।

উপনিবেশ দখল ও বিশ্বের ভাগ-বন্টন

একচেটেবাদ ও লগ্নী-পুঁজির যুগে পুঁজিবাদী দেশসমূহ দ্বারা উপনিবেশ দখল বিপুলভাবে বেড়ে যায়।

বহু যুগ আগ থেকেই ইউরোপের অধিবাসীরা উপনিবেশ ও পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলিতে তাদের পণ্য-সম্ভার নিয়ে আসে, সব ধরণের বাজে মালের জন্য তিন গুণ বেশী দাম আদায় করে এবং উপনিবেশসমূহ থেকে নিজেরা প্রায় সমস্ত মূল্যবান জিনিস-পত্রাদি নিয়ে যায়। শক্তিশালী দেশসমূহ ক্রমে ক্রমে বিপুল জনসংখ্যা বহুল বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলো দখল করে নেয়।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দম্ভ ভরে বলতো ... না", আর বাস্তবিক পক্ষেই, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধিকৃত দেশগুলি সারা পৃথিবী জুড়ে এমন ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে তাদের কোন কোন-না-কোন অংশে সূর্য উদীত থাকে। ভূ-মণ্ডলের ১৭৫ কোটি অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৬০ কোটিই বাস করে নিপীড়িত দেশসমূহে আর ৪০ কোটি বাস করে আধা-উপনিবেশগুলিতে (চীন, পারস্য প্রভৃতিতে)। সুতরাং মানব-জাতির অর্ধেকের বেশী, প্রায় ১০০ কোটি লোক, বড় বড় দস্যু জাতির অধীনে রয়েছে।

(প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কয়েক দশকে বিশ্বের ভাগ-বন্টন ঘটেছিলো বিশেষ দ্রুত গতিতে। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে তথাকথিত "বৃহৎ শক্তিগুলি" প্রায় ১ কোটি ৫৬ লক্ষ বর্গমাইল অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। এভাবে তারা গোটা ইউরোপের মোট আয়তনের দ্বিগুণ পরিমাণ বৈদেশিক ভূমি গ্রাস করেছিল। অধিকাংশ ভূ-ভাগই পড়েছিল বনেদী দস্যু – গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্সের ভাগে। জার্মানী, ইতালীর মতো নবীন দস্যুরা পেয়েছিল কেবল উচ্ছিষ্টটুকু। যেকোন ভাবেই যেসব দেশ ছিল শোষণ করার পক্ষে উপযুক্ত সেসব সকল দেশই ইতোমধ্যে অন্যদের দখলে চলে গিয়েছিল ; ভোজ-সভায় যারা দেরীতে এসেছিল তাদের ভাগ্যে জুটেছিল টেবিল থেকে ছিটকে পড়া উচ্ছিষ্ট, কিংবা তাদের করতে হয়েছিল অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়ার চেষ্টা।

পণ্য-বিক্রয়ের বাজার, কাঁচামাল ও পুঁজি বিনিয়োগের বাজার নিয়ে হিংস্র সংগ্রামের ফলে কয়েকজন ডাকাতের মধ্যে গোটা বিশ্বই ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে পড়ে।

পৃথিবীতে আর থাকে না কোন "স্বাধীন ভূখণ্ড"। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এখন নতুন ভূ-ভাগ পেতে পারে কেবলমাত্র একটি পন্থায় ঃ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে লুণ্ঠিত অঞ্চলের খানিকটা কেড়ে নিয়ে। বিশ্বের বিভক্তিটা হয়ে যায় **সম্পূর্ণ**। দুনিয়াটা পুনর্বন্টনের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার লড়াই এখন হয়ে ওঠে অনিবার্য। আর এরূপ সংগ্রাম অনিবার্যভাবেই ঠেলে দেয় সশস্ত্র সংঘাতের দিকে, অর্থাৎ **যুদ্ধের** দিকে।

ডাম্পিং

বৈদেশিক বাজার দখলের জন্যে একচেটেবাদী সংস্থাগুলো প্রায়শ ব্যাপকভাবে 'ডাম্পিং'-এর [Dumping]পদ্ধতি গ্রহণ করে। 'ডাম্পিং' হলো দেশীয় বাজারে যে দামে একটা পণ্য বিক্রী করা হয় তার চেয়ে অনেক কম দামে, কোন কোন সময় উৎপাদন খরচের চেয়েও কম দামে, বিদেশের বাজারে সে-পণ্যটি বিক্রী করা। বেশ কয়েকটি কারণে বিদেশের বাজারে 'ডাম্পিং' দরে পণ্যের বিক্রয় ট্রাস্টগুলোর জন্যে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ 'ডাম্পিং'-এর ফলে বিদেশী বাজার করায়ত্ত হয়। তারপর বিদেশের বাজারে পণ্যের বিক্রয় দেশের অভ্যন্তরে ঐ পণ্যের সরবরাহ কমিয়ে আনাটা সম্ভব করে তোলে, পণ্যের দর বৃদ্ধি এবং একচেটে চড়া দাম বজায় রাখার জন্য যা দরকারী। বিদেশের বাজারে 'ডাম্পিং' স্বদেশের বাজারে পণ্যের বিক্রয় হ্রাস করা সম্ভব করে তোলে, আর সে অনুপাতে উৎপাদন হ্রাস না করেই তা করা যায়, কারণ উৎপাদন হ্রাস পেলে পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে।

সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাধীনে 'ডাম্পিং' হলো নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। জার্মানীতে প্রতি মাসেই ইস্পাত ট্রাস্ট সংবাদপত্রে তার দামের তালিকা প্রকাশ করে ; প্রতিটি পণ্যের দু'রকমের দাম সেখানে দেয়া হয় – এটা হলো অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য আর অন্যটা রপ্তানীর, অর্থাৎ বিদেশী বাজারের জন্য, এবং তা হয় (পূর্বেরটির তুলনায়) এক-তৃতীয়াংশ কম।

বর্তমানে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ যে 'ডাম্পিং' চালাচ্ছে তা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ-বিহীন। নিজেদের শ্রমিকদের নির্মম শোষণের সুযোগ নিয়ে, জাপানী পুঁজিপতিরা বিশ্ব বাজারকে পণ্যে পণ্যে ছেয়ে ফেলেছে, যেসব পণ্য তারা নাম-মাত্র দরে বিক্রী করছে। তারা যে কেবল চীনের বাজার থেকেই ইউরোপীয় ও মার্কিন পণ্যকে হঠিয়ে দিচ্ছে তাই নয়, বরং শিল্প প্রধান দেশগুলিকেও তারা জাপানী পণ্যের বন্যায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। এভাবে তারা মোটরগাড়ী চালান দেয় আমেরিকায়, অবিশ্বাস্য কম দামে সাইকেল বিক্রী করে জার্মানীতে, ফরাসী রেশম-শিল্পের কেন্দ্র লিয়ঁ-তে রপ্তানী করে রেশমী জামা।

সাবেক জার-শাসিত রাশিয়ায় চিনি সিণ্ডিকেট সবচেয়ে প্রকৃত 'ডাম্পিং' অনুশীলন করতো। সে সময়ে কোন একটি পুঁজিবাদী দেশও এই 'ডাম্পিং'-এর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি, অথচ তার পর থেকে পুঁজিপতিরা ও তাদের সংবাদ-পত্রগুলো প্রায়শই "সোভিয়েত ডাম্পিং"-এর ধুয়া তুলে হৈ-চৈ করছে। এই চীৎকারটা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে জ্বালাতন করার চেষ্টার অঙ্গ, আর এর উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার বুকে প্রথম সমাজতন্ত্র নির্মাণকারী দেশের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ থেকে নতুন আক্রমণের ভিত্তি গড়ে তোলা। "সোভিয়েত ডাম্পিং" পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সংকট বাড়িয়ে তুলছে – এই আর্তনাদটি বিশেষভাবেই হাস্যকর। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে, খুব কম সোভিয়েত দ্রব্যই পুঁজিবাদী দেশসমূহে রপ্তানী করা হয়। সোভিয়েত রপ্তানী এখনও তার যুদ্ধ-পূর্ববর্তী মাত্রায় পৌঁছায় নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন 'ডাম্পিং' দামে বিদেশে পণ্য বিক্রী করে না। বৈদেশিক বাজার দখল করার উদ্দেশ্যে সে পণ্য রপ্তানী করে না, বরং নিজের জন্যে প্রয়োজনীয় আমদানীকৃত দ্রব্যের দাম-পরিশোধের জন্যই সে তা করে। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সুবিধাবলী সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে বেশ কয়েকটি পণ্যদ্রব্য পুঁজিপতিদের চেয়ে সস্তায় উৎপাদন করা সম্ভব করে তুলেছে। অক্টোবর বিপ্লব পরগাছা জমিদার ও পুঁজিপতিদের ধ্বংস করেছে, আর একই সাথে নির্মূল করেছে তাদেরকে প্রতিপালনের ব্যয়ভার – ভূমি-খাজনা ও পুঁজিবাদী মুনাফা। সুতরাং এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সোভিয়েত 'ডাম্পিং' সম্পর্কিত সমস্ত কথাবার্তা হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রুদের উদ্ভাবন মাত্র এবং তা সম্পূর্ণভাবেই অবিশ্বাস্য ; কারণ পুঁজিবাদী পথ পরিত্যাগ করার ফলাফল হিসেবে সোভিয়েত-অর্থনীতি পুঁজিবাদের সাথে যুক্ত সংগ্রামের পদ্ধতি থেকেও নিজেকে মুক্ত করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় অসম বিকাশের নিয়ম

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান, শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন শাখা এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিকাশ ঘটে **অসমভাবে ও অকস্মাৎ করে** (unevenly and spasmodically)। এটা স্পষ্ট যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিরাজমান উৎপাদনের নৈরাজ্য এবং মুনাফার জন্যে পুঁজিপতিদের মধ্যেকার উন্মত্ত সংগ্রাম চলতে থাকার কারণে এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

বিকাশের এই অসমতা **সাম্রাজ্যবাদের যুগে সবিশেষ তীব্রতা** নিয়ে প্রকাশ পায়, এবং **এক নির্ধারক শক্তিতে, এক নির্ধারক নিয়মে পরিণত হয়।**

"লগ্নী পুঁজি ও ট্রাস্টগুলি বিশ্ব অর্থনীতির বিভিন্ন অংশগুলির বিকাশের হারের ক্ষেত্রে পার্থক্য দূর করার পরিবর্তে বরং সেগুলিকে আরো সুগভীর করে"। [লেনিন, "সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়"]।

সাম্রাজ্যবাদ হলো একচেটে পুঁজিবাদ। একচেটেবাদের শাসন স্বতন্ত্র দেশসমূহের অসম ও আকস্মিক বিকাশকে বাড়িয়ে তোলে। একচেটে জোটগুলি, একদিকে, নবীন দেশগুলির পক্ষে বনেদী পুঁজিবাদী দেশগুলির সমকক্ষতা অর্জন ও তাদের ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি

করে দেয়, আর, অন্যদিকে, একচেটেবাদের নিজের মধ্যেই নিহিত রয়েছে পরগাছাবৃত্তি, অবক্ষয় ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে পেছনে টানার প্রবণতা ঃ কোন নির্দিষ্ট অবস্থায় একচেটেবাদ কোন কোন দেশের বিকাশকে বিলম্বিত করে আর এভাবে অন্যান্য দেশগুলির পক্ষে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে।

".....পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে বিভিন্ন কারবার, ট্রাস্ট, শিল্পের শাখা বা দেশের বিকাশ সুষম হতে পারে না। অর্ধ শতাব্দী আগে, জার্মানী ছিল এক তুচ্ছ হতভাগ্য দেশ। রাশিয়ার তুলনায় জাপানও ছিল অনুরূপভাবে তুচ্ছ। এটা কি 'কল্পনাযোগ্য' যে দশ বা বিশ বছর পরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর তুলনামূলক শক্তি অপরিবর্তিত থেকে যাবে ? একেবারেই অকল্পনীয়।" [লেনিন, "সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়", ৯ম পরিচ্ছেদ]

পুঁজির রপ্তানী কোন কোন দেশের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে, আবার অন্য কতকগুলি দেশের বৃদ্ধি-বিকাশকে মন্থর করে দেয়। আধুনিক প্রযুক্তি-কৌশল, উৎপাদিকা-শক্তি সমূহের বিকাশের আধুনিক পর্যায় নবীন দেশগুলোর সামনে সুযোগ-সুবিধার দ্বার দরাজ করে খোলে দেয় ঃ তারা তাদের পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়, সুযোগ পায় প্রযুক্তিগত বিকাশের যেসব পর্যায়ক্রমিক স্তর পার হতে পুরানো দেশগুলির দশকের পর দশক লেগেছিল, স্বল্প সময়ে লাফিয়ে সেসব স্তর পার হওয়ার।

সাম্রাজ্যবাদী অবস্থাধীনে বিশ্বের বিভক্তিটা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। পুনর্বন্টনের জন্যে লড়াইটা আসন্ন হয়ে পড়েছে। এই ঘটনা প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে উন্মত্ত গতিতে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে বাধ্য করছে। প্রতিটি দেশই তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছে।

স্বতন্ত্র দেশসমূহের অসম ও আকস্মিক বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে আরো বেশী প্রকট হয়ে ওঠে, বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার বৈরীতাকে তা তীব্র করে তোলে। অসম বিকাশের নিয়ম সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দৃঢ় ও স্থায়ী আন্তর্জাতিক মৈত্রীকে অসম্ভব করে তোলে। বিভিন্ন দেশের **আপেক্ষিক শক্তি** নিয়তই **পরিবর্তনের** সম্মুখীন হচ্ছে, আর আপেক্ষিক শক্তির ক্ষেত্রে এইসব পরিবর্তন অনিবার্যভাবেই সব ধরণের **সংঘাত-সংঘর্ষের** দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী অবস্থাধীনে লেনিনীয় অসম বিকাশের নিয়মটি স্তালিনের বেশ কয়েকটি রচনায় চমৎকার ভাবে বিকশিত করা হয়েছে। লেনিনীয় অসম বিকাশের নিয়মটিকে যে ট্রটস্কিবাদ অস্বীকার করে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে লেনিনের শিক্ষাকে স্তালিন আরো বিকশিত করেছেন। স্তালিন এই সমস্যাটিকে এভাবে সংক্ষেপে উপস্থিত করেছেন ঃ

"সাম্রাজ্যবাদের আমলে অসম বিকাশের নিয়মের অর্থ হলো এক দেশের তুলনায় অন্য দেশের আকস্মিক বিকাশ, বিশ্ব বাজারে কিছু কিছু দেশ কর্তৃক অন্য কিছু দেশকে প্রবেশে দ্রুত বাধা দান, সামরিক সংঘর্ষ ও সামরিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে **ইতিমধ্যেই ভাগ-বাটোয়ারা করা বিশ্বে** কিছু দিন অন্তর অন্তর পুনর্বিভাজন, সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে দ্বন্দ্ব-সংঘাতগুলোর তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি, বিশ্ব পুঁজিবাদের ফ্রন্টে শক্তিহীনতা, ভিন্ন ভিন্ন দেশের সর্বহারাশ্রেণী কর্তৃক এই ফ্রন্টকে ভেঙে দেয়ার সম্ভাবনা, ভিন্ন ভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা।

"সাম্রাজ্যবাদের অবস্থাধীনে অসম বিকাশের নিয়মটির মৌলিক উপাদানগুলো কি কি ?

"প্রথমতঃ, ব্যাপারটি হলো এই যে, বিশ্ব ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে গিয়েছে, বিশ্বে আর কোন 'স্বাধীন', অনধিকৃত অঞ্চল নেই, এবং নতুন বাজার ও কাঁচামালের উৎস দখল করতে হলে, সম্প্রসারণ ঘটাতে হলে, অন্যের কাছ থেকে শক্তির জোরে সে রকম অঞ্চল কেড়ে নেয়া দরকার।

"দ্বিতীয়তঃ, ব্যাপারটি হলো এই যে, পুঁজিবাদী দেশ সমূহে প্রযুক্তি-কৌশলের অভূতপূর্ব বিকাশ ও বিকাশের মাত্রার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সাদৃশ্য কোন কোন দেশকে আকস্মিকভাবে অন্যান্য দেশকে

ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম ও সাহায্য করেছে, কম শক্তিশালী কিন্তু দ্রুত বিকাশমান দেশগুলিকে সক্ষম করেছে অধিক শক্তিশালী দেশগুলিকে হঠিয়ে দিতে।

"তৃতীয়তঃ, ব্যাপারটি হলো এই যে, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রভাবাধীন এলাকার পুরানো ভাগ-বাটোয়ারাটি বিশ্ব বাজারের নতুন শক্তি-সম্পর্কের সাথে অব্যাহতভাবেই সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে, প্রভাবাধীন এলাকার পুরানো ভাগ-বাটোয়ারা ও নতুন শক্তি-সম্পর্কের মধ্যে 'ভারসাম্য' প্রতিষ্ঠার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মাধ্যমে কিছুকাল অন্তর অন্তর বিশ্বের পুনর্বিভাজন দরকার হয়ে পড়ে।" ["সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি সম্পর্কে আরো কিছু"]।

সাম্রাজ্যবাদের অবস্থাধীনে অনিবার্য পররাজ্য গ্রাসের যুদ্ধ বিভিন্ন জাতির মধ্যে শক্তি-সম্পর্কের বিপুল পরিবর্তন নিয়ে আসে। ১৯১৪-১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নিয়ে এসেছিল জার্মানীর ধ্বংস, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর খণ্ডে খণ্ডে বিভক্তি এবং তার ধ্বংসস্তূপের উপর বেশ কয়েকটি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন দেশের বিকাশের অসমতা (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সবিশেষ স্পষ্টতা ও নির্দিষ্টতা সহকারে প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধের দ্বারা সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অন্যান্যদের মধ্যেকার লড়াই থেকে মুনাফা কুড়িয়েছিল সে-ই বেশী। আগে, অন্যান্য দেশের কাছে, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের কাছে তার ছিল দেনা। এখন, ইংল্যাণ্ড সহ গোটা দুনিয়ার কাছে সে হলো পাওনাদার। (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পের বেশ কয়েকটি শাখার উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন হলো পৃথিবীর ভূ-ভাগের শতকরা প্রায় ৬ ভাগ, কিন্তু বিশ্ব জনসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগেরও কম সেখানে কেন্দ্রীভূত। একই সময়ে বর্তমান সংকট (১৯২৯-৩৫) পর্যন্ত, বিশ্বের কয়লা-খনিগুলির শতকরা ৪০ ভাগ, জলবিদ্যুৎ শক্তির ৩৫ ভাগ, খনিজ তৈলের ৭০ ভাগ, বিশ্বের গম ও তুলা উৎপাদনের ৬০ ভাগ, নির্মাণ কর্মের জন্যে দরকারী কাঠের ৫৫ ভাগ, লোহা ও তামার প্রায় ৫০ ভাগ, সীসা ও ফসফেটের প্রায় ৪০ ভাগ উৎপন্ন হতো সেখানে। সংকটের সময় পর্যন্ত, বিশ্বের মোট লৌহ-উৎপাদনের শতকরা ৪২ ভাগ, তামার ৪৭ ভাগ, খনিজ তেলের ৬৯ ভাগ, রাবারের ৫৬ ভাগ, টিনের ৫৩ ভাগ, কফির ৪৮ ভাগ, চিনির ২১ ভাগ, রেশমের ৭২ ভাগ, এবং মোটর-গাড়ীর ৮০ ভাগ ব্যবহৃত হতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

অন্যদিকে, যে ইংল্যাণ্ড (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রথম স্থানের অধিকারী ছিল, সেই ইংল্যাণ্ডের ঘটে দ্রুত অবনতি। যুদ্ধের পর ইংল্যাণ্ড হয়ে দাঁড়ায় এক সুদখোর-দেশে, আর শিল্পের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, বিশেষ করে কয়লা শিল্প থেকে যায় একই স্তরে, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলি এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

বর্তমান সংকট বিভিন্ন পুঁজিবাদী দস্যু জাতির মধ্যে শক্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশকে তা বিভিন্ন মাত্রায় আঘাত হেনেছে। এভাবে বিকাশের অসমতা তা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সংকট সবচেয়ে নিদারুণ ভাবে আঘাত হেনেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই। সে কারণে কয়েক বছর পূর্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে স্থানে অবস্থান করছিল আজ আর সেই একই স্থানে সে নেই। তখন, আমেরিকাই ছিল ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাদের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক ভৃত্যদের একমাত্র "মতাদর্শগত কর্তা"। এখন, সংকট মার্কিন পুঁজিবাদের সমস্ত সুগভীর দ্বন্দ্বকেই উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। বহুল প্রশংসিত মার্কিন "সমৃদ্ধির" কোন চিহ্নই আর এখন নেই। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও হলো সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশ। কিন্তু যেসব দ্বন্দ্ব-বিরোধ পুঁজিবাদী বিশ্বকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে, সেই দ্বন্দ্বগুলিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বল হয়ে পড়ার ঘটনা তীব্র করে তুলছে।

অসম বিকাশের নিয়ম ও সর্বহারা বিপ্লব

সাম্রাজ্যবাদী যুগের দ্বারা তীব্র হয়ে ওঠা অসম বিকাশের নিয়মটি বিভিন্ন দেশের একচেটেবাদীদের মধ্যে স্থায়ী শান্তিপূর্ণ আপোষ-রফার সম্ভাবনা সম্পর্কিত সকল কল্পলৌকিক তত্ত্বকে চুরমার করে দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলির বৃদ্ধি এবং সামরিক সংঘাতের অনিবার্যতা সাম্রাজ্যবাদীদের পারস্পরিকভাবে দুর্বল করে ফেলে, নিয়ে আসে এমন একটা পরিস্থিতি যেখানে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বফ্রন্টটি সর্বহারা বিপ্লবের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে সবচেয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের শৃঙ্খলটি যেখানে সবচেয়ে দুর্বল, যেখানে সর্বহারাশ্রেণীর বিজয়ের জন্য অবস্থাটা সবচেয়ে অনুকূল, সেখানেই **এই ফ্রন্টের মধ্যে একটা ফাটল** দেখা দেয়। সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদের অসম বিকাশের যে নিয়মটি সবচেয়ে তীব্রতার বিন্দুতে পৌঁছায়, সেই নিয়মটির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রয়েছে সর্বহারা বিপ্লবের বিজয় ও একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্পর্কিত লেনিনবাদী শিক্ষা – আর এই শিক্ষাই ট্রটস্কীবাদের তরফ থেকে সবচেয়ে কঠোর আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল। এ সম্পর্কে লেনিন নিম্নোক্তভাবে লিখেছেন ঃ

"অসম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ হলো পুঁজিবাদের এক চূড়ান্ত নিয়ম। সুতরাং, সমাজতন্ত্রের বিজয় প্রথমতঃ কয়েকটি মাত্র দেশে কিংবা এমন কি একটিমাত্র পুঁজিবাদী দেশেও পৃথকভাবে সম্ভব। পুঁজিবাদীদের সম্পত্তিচ্যুত করা এবং নিজেদের সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সংগঠিত করার পর, ঐ দেশের বিজয়ী সর্বহারাশ্রেণী অবশিষ্ট বিশ্বের – পুঁজিবাদী বিশ্বের – বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে, অন্যান্য দেশের নিপীড়িত শ্রেণী সমূহকে তার লক্ষ্যের দিকে আকর্ষণ করবে, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ঐসব দেশে অভ্যুত্থান জাগিয়ে তুলবে, আর প্রয়োজন হলে শোষক শ্রেণীগুলি ও তাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমনকি, সশস্ত্র শক্তি নিয়েও এগিয়ে আসবে। ["ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে শ্লোগান প্রসঙ্গে", সঃ রঃ, ২১শ খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৪, ইং সং, পৃঃ ৩৪২]

সুতরাং লেনিনবাদী অসম বিকাশের নিয়মটি **বৈপ্লবিক অনুশীলনের** জন্যে হলো বিপুল তাৎপর্য সম্পন্ন। স্তালিন দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এমনকি (প্রথম) মহাযুদ্ধের সময় কালেই, সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের অসম বিকাশের নিয়মটির উপর নিজেকে দাঁড় করিয়ে সুবিধাবাদীদের তত্ত্বের বিরুদ্ধে লেনিন তাঁর সর্বহারা বিপ্লবের তত্ত্বটি – "এমনকি পুঁজিবাদী বিকাশের দিক থেকে কম অগ্রসর হলেও" একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্পর্কিত শিক্ষাটি – উপস্থিত করেছিলেন।

একই সময়ে, সকল দেশের সুবিধাবাদীরাই বিপ্লবের প্রতি তাদের বিশ্বাসঘাতকতাকে আড়াল করার জন্য একথা জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করে যে, সর্বহারা বিপ্লব সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যুগপৎ অবশ্যই শুরু হবে। বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকরা এমনি করেই নিজেদের জন্যে এক ধরণের **পারস্পরিক দায়িত্ববোধের** সৃষ্টি করে। অসম বিকাশের তত্ত্বমতটি সর্বহারা বিপ্লবের সেইসব জানী দুশমন – সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের, আর প্রাথমিকভাবে, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসীর সবচেয়ে ঘৃণ্য বাহিনী ও প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী প্রতিবিপ্লবী ট্রটস্কীবাদের – হিংস্র আক্রমণের সম্মুখীন হয়। ট্রটস্কী ও তার চেলা-চামুণ্ডারা দাবী করে যে, সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিকাশের অসমতা বৃদ্ধি পায় না, বরং হ্রাস পায়। সাম্রাজ্যবাদের যুগে যেসব দ্বন্দ্ব অসমতার বৃদ্ধি-বিকাশ পূর্বাহ্নেই নির্ধারণ করে দেয়, সেসব নির্ধারক দ্বন্দ্বকে ট্রটস্কীবাদ দেখতে পায় না। লেনিনবাদী অসম বিকাশের নিয়মটির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ট্রটস্কীবাদ এই সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণ করা অসম্ভব। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনার প্রতি ট্রটস্কীবাদীদের অস্বীকৃতিটি ঘনিষ্ঠভাবেই ট্রটস্কীবাদী "চিরস্থায়ী বিপ্লবের তত্ত্বের" সাথে, সর্বহারাশ্রেণী ও ব্যাপক মধ্য-কৃষক জনগণের মধ্যেকার দৃঢ় ঐক্যের সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাসহীনতার সাথে, সমাজতন্ত্র বিনির্মাণে সর্বহারাশ্রেণীর সামর্থ্য ও সৃজনশীল ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসহীনতার সাথে যুক্ত।

যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেই সোভিয়েত পার্টির লেনিনবাদী কর্মনীতির বিরুদ্ধে ট্রটস্কীবাদ এক মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রটস্কীবাদের প্রতিবিপ্লবী চরিত্রকে উদ্‌ঘাটন করার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন স্তালিন। ট্রটস্কীবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত পার্টি বহু বছর ধরে যে সংগ্রাম চালাচ্ছিল, সে সংগ্রামে স্তালিন চমৎকারভাবেই উদ্‌ঘাটন দিয়েছিলেন ট্রটস্কীবাদী ভূমিকার প্রতিবিপ্লবী মেনশেভিক সারবস্তুকে, 'বামপন্থী' বুলির আড়ালে তা যতই প্রচ্ছন্ন থাকুক না কেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিশ্বজনীন, ঐতিহাসিক সাফল্য দ্বারা ট্রটস্কীবাদী অবস্থানের পরিপূর্ণ বিপর্যয় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফলের সার-সংকলন করে স্তালিন বলেছেন ঃ

"আলাদাভাবে একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণ করা অসম্ভব – এই সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক তত্ত্বকে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল দেখিয়ে দিয়েছে যে, একটিমাত্র দেশেও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা সম্পূর্ণই সম্ভব, কারণ এরূপ এক সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ইতোমধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" [স্তালিন, "প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল", "প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা" – শীর্ষক সিম্পোজিয়াম, পৃঃ ৫৯]

অতি-সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত লেনিনবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা সূত্রায়িত করেছে অতি-সাম্রাজ্যবাদের [ultra-imperialism] বিশ্বাসঘাতকতামূলক ও ভূয়া তত্ত্ব, যার প্রবর্তক হলেন কাউৎস্কী। মার্কসবাদের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যায় কাউৎস্কীর রয়েছে বিপুল অভিজ্ঞতা, আর এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সবচেয়ে নির্লজ্জ কুৎসা রটনাকারী ও হস্তক্ষেপের জন্যে আন্দোলনকারীদের অন্যতম একজন হিসাবে তিনি হাজির হয়েছেন।

কাউৎস্কীর যে মতামতগুলির বিরুদ্ধে লেনিন দৃঢ়তার সাথে সংগ্রাম করেছেন, তার সারবস্তু হলো নিম্নরূপ ঃ সাম্রাজ্যবাদ যে পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে একটা সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র পর্যায়, স্তর বা নতুন ধাপ, মুখ্যতঃ সুগভীর অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যাবলীর দ্বারাই যে তা পার্থক্যপূর্ণ কাউৎস্কী এটা অস্বীকার করেন। কাউৎস্কীর মতে, সাম্রাজবাদ কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়, বরং তা হলো কতকগুলি দেশের পুঁজিপতিদের নিছক একটা কর্মনীতি মাত্র। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে কাউৎস্কীর যে প্রধান সংজ্ঞাটির বিরুদ্ধে লেনিন দৃঢ়তার সাথে সংগ্রাম করেছেন তাতে বলা হয়েছে ঃ

"সাম্রাজ্যবাদ হলো অতি বিকশিত শিল্প-পুঁজিবাদের ফল। শিল্প-পুঁজিবাদী প্রতিটি দেশের পক্ষ থেকে ক্রমবর্ধমানভাবে বৃহৎ কৃষি-প্রধান অঞ্চলকে, তা সে অঞ্চল যে জাতির দ্বারাই অধ্যুষিত হোক না কেন, তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা ও গ্রাস করার প্রয়াসের মধ্যেই তা নিহিত।" ["সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়" গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে লেনিন কর্তৃক উদ্ধৃত]

লেনিন বলেন, "তত্ত্বের দিক থেকে এই সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণই ভ্রান্ত"। এই সংজ্ঞাটির ভ্রান্তি কোথায় ? লেনিন নিম্নোক্তভাবেই কাউৎস্কীর স্বরূপ প্রকাশ করেছেন ঃ

"সাম্রাজ্যবাদকে যা পার্থক্যপূর্ণ করে তোলে তা শিল্প-পুঁজির নয়, বরং লগ্নী পুঁজির শাসন, বিশেষ করে কৃষি-প্রধান দেশগুলিকেই নয়, বরং সব ধরনের দেশকেই দখল করে নেয়ার প্রয়াস। কাউৎস্কী সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি থেকে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকে আলাদা করছেন, 'নিরস্ত্রীকরণ', 'অতি-সাম্রাজ্যবাদ' এবং অনুরূপ ধরনের জঞ্জাল-এর মতো তার হীন বুর্জোয়া সংস্কারবাদের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রের একচেটেবাদকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের একচেটেবাদ থেকে আলাদা করেছেন। এই তাত্ত্বিক মিথ্যাচারের সামগ্রিক উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য হলো সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে সুগভীর দ্বন্দ্বগুলিকে মুছে ফেলা আর এভাবে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকদের সাথে, পুরাদস্তুর সামাজিক-জাত্যাভিমানী ও সুবিধাবাদীদের সাথে 'ঐক্যের' তত্ত্বকে সপ্রমাণিত করা।" ["সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রে ভাঙন", সঃ রঃ, ২৩শ খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৪, পৃঃ ১০৭]

লেনিন জোরের সাথেই বলেছেন যে, কাউৎস্কীর সংজ্ঞাটি হলো ভুল এবং অ-মার্কসীয়। যে মতামতের ধারা-পদ্ধতি উভয়ত তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ থেকে পরিপূর্ণভাবে বিচ্যুত হয়েছে, এই সংজ্ঞাটি হলো সেইসব মতামতের ভিত্তি। অর্থনীতি থেকে রাজনীতিকে আলাদা করে নিয়ে, সাম্রাজ্যবাদকে কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশের নিছক পছন্দ করা কর্মনীতি হিসেবে বর্ণনা করে, কাউৎস্কী সর্বোতভাবে সেইসব বুর্জোয়া সংস্কারবাদীদের অবস্থানই গ্রহণ করেছেন যারা মনে করে যে, সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অলঙ্ঘনীয়তাকে ক্ষুণ্ন না করেই অধিকতর "শান্তিপূর্ণ" কর্মনীতি প্রবর্তন করা সম্ভবপর। লেনিন স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কাউৎস্কীর পক্ষে

"এর পরিণতি হলো পুঁজিবাদের সর্বশেষ পর্যায়ের দ্বন্দ্বসমূহকে গভীরভাবে উদ্ঘাটন করার স্থলে সেইসব সবচেয়ে সুগভীর দ্বন্দ্বসমূহকে উপেক্ষা ও আড়াল করা। এর পরিণতি হলো মার্কসবাদের স্থলে বুর্জোয়া সংস্কারবাদ।" ["সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়"]

কাউৎস্কীর প্রতিবিপ্লবী তথা সম্পূর্ণভাবেই বুর্জোয়া অবস্থান বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর তথাকথিত "অতি-সাম্রাজ্যবাদ" সম্পর্কিত যুক্তিতর্কের মধ্যে, যা তাঁর সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত মৌলিকভাবে মার্কসবাদ-বিরোধী সংজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত।

অতি-সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব জোর দিয়ে বলে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে একচেটেবাদী জোটগুলির বৃদ্ধি-বিকাশের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম তিরোহিত হয়ে যায়, এসব বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিরা নিজেদের মধ্যেকার জোট গড়ে তোলে ; সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, দেখা দেয় এক ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতি। এই "শান্তি-পূর্ণ" অতি-সাম্রাজ্যবাদের মতবাদটি হলো পুরোপুরিভাবেই বিপ্লবী মার্কসবাদের শত্রু। সাম্রাজ্যবাদী বাস্তবতার চিত্রকে তা পুরোপুরিভাবেই বিকৃত করে। কাউৎস্কীর এই আবিষ্কারকে খণ্ডন করে লেনিন লিখেছেন ঃ

"অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিপুল বৈচিত্র্য, বিভিন্ন দেশের বিকাশের হারের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বৈষম্য, আর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেকার হিংসাত্মক সংগ্রাম – এই বাস্তবতার সাথে তুলনা করুন কাউৎস্কীয় 'শান্তিপূর্ণ' অতি-সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত নির্বোধ রূপকথাটির। কঠিন-কঠোর বাস্তবতা থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত কূপমণ্ডুকের পালিয়ে যাওয়ার এক প্রতিক্রিয়াশীল প্রয়াসই কি এটা নয় ? যে আন্তর্জাতিক কার্টেলগুলোকে কাউৎস্কী ভেবেছেন 'অতি-সাম্রাজ্যবাদের' ভ্রূণ রূপে ..... সেগুলি কি বিশ্বের ভাগ-বন্টন ও **পুনর্বন্টনের**, শান্তিপূর্ণ ভাগ-বন্টন থেকে **অশান্তিপূর্ণ ভাগ বন্টনের** আর **অশান্তিপূর্ণ ভাগ-বন্টন** থেকে শান্তিপূর্ণ ভাগ-বন্টনে উত্তরণের দৃষ্টান্ত নয় ? উদাহরণ স্বরূপ, আন্তর্জাতিক রেল সিন্ডিকেট কিংবা আন্তর্জাতিক সওদাগরী জাহাজ ট্রাস্টে জার্মানীর অংশ গ্রহণ সহ, সমগ্র বিশ্বকে যারা ভাগ-বন্টন করে নিয়েছিল, সেই মার্কিন ও অন্যান্য লগ্নী পুঁজিগুলিই কি এখন আবার নতুন শক্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে বিশ্বকে পুনর্বন্টনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করছে না, যে শক্তি-সম্পর্কটা কোন ক্রমেই শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হয়নি ?" [পূর্বোক্ত]

বিভিন্ন দেশের যে অসম বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের অবস্থাধীনে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা **পুরোপুরিভাবেই খণ্ডন** করে দিচ্ছে অতি-সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বকে। এ প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছেন ঃ

"অতি-সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে কাউৎস্কীর অর্থহীন কথাবার্তা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকদের পক্ষে সুবিধাজনক এই সুগভীর ভ্রান্ত ধারণাকেই উৎসাহ যোগায় যে, লগ্নী পুঁজির আধিপত্য বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত অসমতা ও দ্বন্দ্ব-বিরোধকে হ্রাস করে, যেখানে বাস্তবতঃ তা সেগুলোকে **বৃদ্ধিপ্রাপ্তই** করে।" [পূর্বোক্ত]

বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ও সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক হওয়ার কারণে, কাউৎস্কী সাম্রাজ্যবাদের তীব্রতম দ্বন্দ্বগুলিকে চাপা দিতে চেষ্টা করেন। পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ যে একটা আলাদা স্তর – এই প্রস্তাবনাকে তিনি অস্বীকার করেন। এই নতুনতম স্তরের সকল মৌলিক বিশেষত্বের কারণে সাম্রাজ্যবাদ যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কালে পরিণত হয়েছে তা চাপা দেয়ার উদ্দ্যেশ্যেই তাঁর এই অস্বীকৃতিটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অতি-সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বটি, তার পরবর্তী কয়েকটি রকম ফেরের মতোই, যে অসম বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে চরম বিন্দুতে পৌঁছায় সেই লেনিনীয় অসম বিকাশের নিয়মটির বিরুদ্ধেই হলো পরিচালিত। অতি-সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বটি সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অসমতাকে অস্বীকার করে এবং যে সুস্পষ্ট বাস্তব ঘটনাবলী এই অসমতার পরিষ্কার প্রমাণ উপস্থিত করে সেগুলোর দিকে চোখ বন্ধ করে থাকে। পুঁজিবাদের বিকাশের নতুন যুগের মৌলিক পার্থক্য সূচক বৈশিষ্ট্য হিসেবে একচেটেবাদী আধিপত্যের তাৎপর্যকে কাউৎস্কী অস্বীকার করেন। একচেটেবাদের সাথে অবক্ষয়ের প্রবণতাটি তিনি অস্বীকার করেন। সাম্রাজ্যবাদের পরগাছা সুলভ চরিত্রকে তিনি সযত্নে চাপা দিতে চান। সাম্রাজ্যবাদ হলো মুমূর্ষু পুঁজিবাদ – এই প্রস্তাবনাকে তিনি অস্বীকার করেন। বিপরীত পক্ষে, সাম্রাজ্যবাদ আদৌ পুঁজিবাদের শেষ পর্যায় নয়, সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদের সমস্ত সঙ্গতি নিঃশেষ হয়ে যায় না – এই সূত্র থেকেই তাঁর অতি-সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বটি বেরিয়ে এসেছে। এখানে কাউৎস্কী বুর্জোয়াশ্রেণীর সেইসব বিজ্ঞ অনুচরদের দলেই নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যারা সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে, পুঁজিবাদ এখনও বহু যুগ ধরে টিকে থাকবে এবং তা এখন কেবলমাত্র পরিণত হয়েই উঠছে।

সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নে কাউৎস্কীর অবস্থান আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসীর মতাদর্শেরই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নে রোজা লুক্সেমবার্গ পরিষ্কারভাবেই কাউৎস্কীর ধরণের ভুল করেছিলেন, আর লুক্সেমবার্গের গুণ-কীর্তনের ছদ্মাবরণে বিশ্বের বুকে নিজেদের মতামতকে প্রচার করার সময় ট্রটস্কবাদী চোরাই-চালানকারীরা ওই ভুলগুলিই গ্রহণ করেছিল। লুক্সেমবার্গ সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে এক আলাদা স্তর বলে বিবেচনা করেন নি, বরং নতুন আমলের সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি মনে করেছেন। "পুঁজির পুঞ্জীভবন" নামক তাঁর প্রধান তত্ত্বগত রচনায়, লুক্সেমবার্গ পুঁজিবাদের ধ্বংসের অনিবার্যতা প্রমাণ করেছেন, কিন্তু তা সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সমূহ চূড়ান্তভাবেই তীব্র হওয়ার কারণে নয়, বরং তা হলো পুঁজিবাদের সঙ্গে তার বহিঃস্থ পরিবেশের সংঘাতের কারণে, তথাকথিত "বিশুদ্ধ" পুঁজিবাদের অধীনে উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের অসম্ভাব্যতার কারণে বিশুদ্ধ পুঁজিবাদ মানে এমন এক পুঁজিবাদী সমাজ যেখানে পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণী ছাড়া ক্ষুদে-উৎপাদক রূপে কোন "অ-পুঁজিবাদী জনসাধারণ" নেই)। এভাবে আধা-মেনশেভিক অবস্থানের উপর নিজেকে দাঁড় করানোর কারণে, লুক্সেমবার্গ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত লেনিনবাদী ধারণাকে আত্মস্থ করতে পারেন নি, আয়ত্ত করতে পারেন নি সাম্রাজ্যবাদের

বিশেষত্ব সমূহ ও পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যাবলীর নির্ভুল উপলব্ধি। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে লুক্সেমবার্গের ভ্রান্তিগুলো বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে তাঁর ভ্রান্তিগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, আর তা হলো ঃ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক আন্দোলনে ভাঙন-বিভেদের প্রশ্ন, কৃষি ও জাতীয় প্রশ্ন, আন্দোলনের ক্ষেত্রে পার্টি ও স্বতঃস্ফূর্ত উপাদানগুলির ভূমিকা ইত্যাদি। লুক্সেমবার্গের পুনরুৎপাদন সম্পর্কিত ভ্রান্ত তত্ত্ব থেকে জাত পুঁজিবাদের স্বয়ংক্রিয় ধ্বংসপ্রাপ্তির তত্ত্ব কার্যত শ্রমিক শ্রেণীকে নিরস্ত্র করে দেয়, তাদের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তার মনোভাব ও অদৃষ্টবাদ ছড়িয়ে দেয়, পরস্পরবিরোধী কথাবার্তার দ্বারা তাদের সংগ্রামের আকাংখাকে বিনষ্ট করে দেয়, আর এই তত্ত্বটা এখন "বামপন্থী" সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা খুব খুশী হয়েই, বিপ্লবী বুলির সাহায্যে শ্রমিক শ্রেণীকে বিপ্লবী কার্যকলাপ থেকে নিরস্ত করে রাখার কাজে, ব্যবহার করছে। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত প্রশ্নে লুক্সেমবার্গের কাউৎস্কীপন্থী ভ্রান্তিই তাঁকে কাউৎস্কী ও কাউৎস্কীবাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত রেখেছে ; আর এমনকি (প্রথম) সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলাকালে যখন কাউৎস্কীর চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতিবিপ্লবী শিবিরে তাঁর পরিপূর্ণ আশ্রয় গ্রহণটা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেলো তখনও লুক্সেমবার্গের এই ভ্রান্তিটিই কাউৎস্কীপন্থী কেন্দ্রের সাথে তাঁর এক ধরণের যোগসূত্রের কাজ করেছে।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রশ্নে ট্রটস্কীবাদী মতামতটি হলো কাউৎস্কীবাদেরই বিভিন্ন রূপের অন্যতম একটি মাত্র। (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধ কালে লেনিন বারবার এই সত্য ঘটনাটি প্রমাণ করেছেন যে, ট্রটস্কী হলেন একজন কাউৎস্কীবাদী, তিনি হলেন কাউৎস্কীরই মতানুসারী, মার্কসবাদের ব্যাপারে কাউৎস্কীর বিকৃতিকে তিনি সমর্থন করেন এবং তার দোষ-ক্রটি ঢাকা দেন। কাউৎস্কীবাদী মতামতকে সমর্থন করতে গিয়ে ট্রটস্কীবাদ লেনিনীয় অসম বিকাশের নিয়মটির বিরুদ্ধে বিষাক্ত ছোবল সহকারেই ফণা তুলে। আর এটা প্রকৃতই আশ্চর্যজনক কিছু নয়। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে, "অতি-সাম্রাজ্যবাদের" সামগ্রিক বিশ্বাসঘাতকতা মূলক ও প্রতিবিপ্লবী কাউৎস্কীবাদী সৌধ-কাঠামোর কোন অংশই অসম বিকাশের নিয়মটি পরীক্ষা করতে বাদ দেয়নি। আর লেনিনীয় অসম বিকাশের নিয়মটির অস্বীকৃতির উপরই ট্রটস্কীবাদ দাঁড় করিয়েছে তার একটিমাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার অসম্ভাব্যতার প্রতিবিপ্লবী তত্ত্ব।

সংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্ব

সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শিবির থেকে যারা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেইসব বিশ্বাসঘাতকরা ঘটনাটিকে এমনভাবে উপস্থিত করে যেন একচেটেবাদের বিকাশের ফলে পুঁজিবাদী নৈরাজ্য এক নতুন ব্যবস্থা – সংগঠিত পুঁজিবাদ – দ্বারা স্থলাভিষিক্ত হবে।

বিশেষ করে আংশিক স্থিতিশীলতার যুদ্ধ-পরবর্তী বছরগুলিতে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা সংগঠিত পুঁজিবাদের রূপকথা ছড়াতে শুরু করে। এই তত্ত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচারক হলেন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসির সর্বাপেক্ষা নির্লজ্জ নেতাদের অন্যতম হিল্‌ফারডিঙ। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা বলার চেষ্টা করে যে, একচেটেবাদের বৃদ্ধি-বিকাশের ফলে বাজারের অন্ধ শক্তিগুলোর অবসান ঘটেছে। এদের কথা অনুযায়ী, পুঁজিবাদ নিজেই নিজেকে সংগঠিত করে, প্রতিযোগিতা লোপ পেয়ে যায়, উৎপাদনের নৈরাজ্য নির্মূল হয়ে যায়, সংকট হয়ে দাঁড়ায় অতীতেরই ব্যাপার, পরিকল্পিত, সচেতন সংগঠন প্রাধান্য লাভ করে। এ থেকে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, ট্রাস্ট ও কার্টেলগুলি শান্তিপূর্ণভাবেই পরিকল্পিত, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিকশিত হয় ; অতএব, ধরে নেয়া যায় যে, ব্যাংক মালিক ও ট্রাস্টগুলিকে তাদের সমস্যা সমাধানে একজনের কেবল সাহায্য করাই উচিৎ, আর তারপর কোন রকম সংগ্রাম বা বিপ্লব ছাড়াই পুঁজিবাদ নিজে থেকে, লোকচক্ষুর অগোচরেই সমাজতন্ত্রে "বিকশিত" হবে !

একথা খুবই স্পষ্ট যে, সংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্ব হলো কাউৎস্কীর অতি-সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বের আরো বিকশিত রূপ। যথার্থভাবে কাউৎস্কীর অতি-সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বের মতোই, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের 'সংগঠিত পুঁজিবাদের' তত্ত্বও সাম্রাজ্যবাদের জ্বলন্ত দ্বন্দ্বগুলোকে ধামাচাপা দেয় এবং কুয়াশাচ্ছন্ন করে রাখে ; সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শিবির থেকে যারা শ্রমিক শ্রেণীর সাথে বেঈমানী করেছে সেইসব বিশ্বাসঘাতকরা প্রত্যেক উপায়েই এই বাস্তব ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে চায় যে, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাধীনে পুঁজিবাদ পরিণত হয় এক ক্ষয়িষ্ণু, পরগাছা ব্যবস্থায়। লেনিন দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এমনকি বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই, সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরগাছাবৃত্তি ও ক্ষয়িষ্ণুতাকে অস্বীকার করতে গিয়ে, হিলফারডিঙ সেইসব কিছু সংখ্যক বুর্জোয়া বিজ্ঞানীদের চেয়েও নিম্ন স্তরে নেমে গিয়েছিলেন, যাঁরা সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে, এইসব জ্বাজ্বল্যমান হয়ে ওঠা বিষয়াবলীকে লক্ষ্য না করে পারেন নি।

সাম্রাজ্যবাদের ক্ষয়িষ্ণু, পরগাছাসুলভ প্রকৃতিকে অস্বীকার করে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা সর্বোত উপায়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সমর্থনের ভূমিকা গ্রহণ করে। আর প্রকৃতপক্ষেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রামকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার অপচেষ্টায় তারা কোন কিছুই বাদ দেয় না। শান্তিপূর্ণ ও বেদনাহীন পন্থায় সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রতিশ্রুতি দান করে সংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্বটি শ্রমিকশ্রেণীর অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্‌পদ অংশকে ধাপ্পা দেয়ার, বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার উপায় হিসাবে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের হস্তকে সহায়তা করে।

সমসাময়িক পুঁজিবাদী বাস্তবতা প্রতি পদক্ষেপেই এই প্রতিবিপ্লবী তত্ত্বকে খণ্ডন করছে। লেনিন প্রদত্ত সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত বিশ্লেষণের আলোকে বিচার করলেই এই তত্ত্বটা সম্পূর্ণ ধরাশায়ী হয়ে যায়।

আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে, সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সকল মৌলিক দ্বন্দ্বকে দূর তো করেই না, বরং, বিপরীতপক্ষে, সেগুলিকে আরো প্রবল ও তীক্ষ্ণ করে তোলে। উৎপাদনের নৈরাজ্য দূর তো হয়ই না, বরং বিপরীত পক্ষে, তা বিরাট আকার ধারণ করে এবং বিশেষভাবে সর্বনাশা পরিণাম ডেকে আনে। আগের যুগে বিভিন্ন পুঁজিপতিদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার চেয়ে একচেটে জোটগুলোর মধ্যেকার প্রতিযোগিতা অনেক বেশী হিংস্র। সাম্রাজ্যবাদী অবস্থাধীনে সংকট হয়ে ওঠে আরো প্রচণ্ড ও আরো বিপর্যয়কর, আর সংকটের পরিণতি আরো কঠোরভাবে শ্রমিক শ্রেণীকে আঘাত করে। ১৯০৭ সালের সংকট ইতোমধ্যে তার সাক্ষী হয়ে রয়েছে, কারণ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একচেটেবাদ সবচেয়ে বেশী বিকাশ লাভ করেছে, সে দেশকেই এই সংকট বিশেষ জোরের সাথে আঘাত হেনেছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর পদলেহীরা 'সংগঠিত পুঁজিবাদ' সম্পর্কে যেসব রূপকথা ছড়িয়েছিল পুঁজিবাদের বর্তমান বিশ্ব সংকট সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ও পুরোপুরিভাবে সেসবের অসারতা উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে।

'সংগঠিত পুঁজিবাদ' সম্পর্কিত রূপকথাটি সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের কাজে লাগে কেবল শ্রমিক শ্রেণীকে ধাপ্পা দেয়ার জন্যে, আপোষহীন শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে তাদের মনোযোগ অন্যত্র নিবদ্ধ করার জন্যে, বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে তাদের শ্রেণী-শান্তির বিশ্বাসঘাতকতামূলক রণকৌশল ও বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামকে সঙ্গত প্রমাণ করার জন্যে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য পার্টির সারিতে অবস্থিত দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা 'সংগঠিত পুঁজিবাদের' রূপকথাটি লুফে নিয়েছিল। কমরেড বুখারিন দাবী করেছিলেন যে, "বাজার, দাম, প্রতিযোগিতা ও সংকটের সমস্যাগুলি ক্রমেই বেশী করে হয়ে ওঠে বিশ্ব অর্থনীতির সমস্যা, এবং দেশের ভেতরে এই সব সমস্যার স্থলে দেখা দেয় সংগঠনের সমস্যা।"

এ থেকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা এই সিদ্ধান্ত টেনেছিল যে, পুঁজিবাদী দেশসমূহে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলো প্রশমিত হয়ে যাচ্ছে, পুঁজিবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠছে এবং কেবলমাত্র নতুন একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরই বিপ্লবী জোয়ারের উত্থানের কথা উঠতে পারে।

সংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্ব সম্পর্কে এই স্থূল ভ্রান্তিটা কিন্তু কমরেড বুখারিনের জন্য আকস্মিক নয়। এই লেনিনবাদ-বিরোধী অবস্থানটি মহাযুদ্ধ শুরুর সময় থেকে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত তত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি যেসব ভুল করেছেন সেসব পর্যায়ক্রমিক ভুলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বুখারিনের ভ্রান্তিগুলোর বিরুদ্ধে লেনিন দীর্ঘ সময় ধরে (১৯১৫-২০) সংগ্রাম করেছিলেন। লেনিনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে বুখারিন উপস্থাপন করেন তথাকথিত "বিশুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ" সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব। "বামপন্থী" বুলি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এবং সেসব বুলি দ্বারা নিজেদের আড়াল করে এই তত্ত্বের অনুসারীরা সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্নে কার্যতঃ সুবিধাবাদী সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক মতামতের সাথে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে।

বুখারিনের "বিশুদ্ধ" সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রধান ত্রুটি নিহিত রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী বাস্তবতার চূড়ান্ত সরলীকরণ এবং বেঠিক উপস্থাপনার মধ্যে। এই তত্ত্বের অনুসারীরা সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত সুগভীর দ্বন্দ্বগুলোকে ধামাচাপা দেয়। তারা এই বাস্তব ঘটনার প্রতি চোখ বুজে থাকে যে, পুরানো পুঁজিবাদের ভিত্তিতেই সাম্রাজ্যবাদ জন্ম নেয় ও বিকাশ লাভ করে, আর এ কারণে পুঁজিবাদের মৌলিক দ্বন্দ্ব সমূহকে সাম্রাজ্যবাদ বিদূরিত তো করেই না, বরং, উল্টো দিক দিয়ে, সেগুলোকে চূড়ান্তভাবে তীক্ষ্ণই করে তোলে।

১৯১৯ সালে বলশেভিক পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে পার্টি কর্মসূচী সম্পর্কিত রিপোর্টে, বুখারিনের সাথে তাঁর মতভেদের ব্যাপারে বলতে গিয়ে লেনিন দেখিয়ে দেন যে,

"·····পুঁজিবাদের মৌলিক ভিত্তিকে বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ কোন দিন বিদ্যমান ছিল না, কোথাও বিদ্যমান নেই এবং কখনো থাকবেও না" [সঃ রঃ, ২৯শ খণ্ড, "পার্টি কর্মসূচী সম্পর্কিত রিপোর্ট", পৃঃ ১৬৫]।

এই একই বক্তৃতায় লেনিন আরো বলেছেন ঃ

"বুখারিনের সুনির্দিষ্ট বাস্তবতা (concreteness) হলো লগ্নি পুঁজি সম্পর্কে এক কেতাবী বর্ণনা। দুনিয়ার কোথাও কয়েকটি ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা ছাড়া একচেটে পুঁজি বিদ্যমান থাকতে পারে না, কিংবা ভবিষ্যতেও টিকে থাকতে পারে না।" লেনিন আরো বলেছেন ঃ

"যদি আমাদেরকে এক অখণ্ড সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে হতো যা পুঁজিবাদকে পুরোপুরিভাবেই পুনর্গঠিত করেছে তাহলে আমাদের সমস্যা সহস্র গুণ সহজতর হয়ে যেতো। আমরা তখন এমন একটা ব্যবস্থাই দেখতে পেতাম যেখানে সবকিছুই কেবল লগ্নি পুঁজির অধীন। তখন আমাদের কেবল এই নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটাতে হতো আর বাকিটা সর্বহারাদের হাতে ছেড়ে দিলেই হতো। ব্যাপারটি তাহলে খুবই মনোরম হতো, কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রকৃত বাস্তব তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, বিকাশ-ধারা হলো এমনই যে, আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্নভাবেই কাজ করতে হয়। সাম্রাজ্যবাদ হলো পুঁজিবাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এক উপরি-কাঠামো। ····· সেই পুরানো পুঁজিবাদই বর্তমান রয়েছে, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রেই যা আবার সাম্রাজ্যবাদে বিকাশ লাভ করেছে।" [পূর্বোক্ত]

বুখারিন যখন তথাকথিত "বাম কমিউনিস্ট" গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা ছিলেন, তখনই তাঁর দ্বারা সমর্থিত 'বিশুদ্ধ' সাম্রাজ্যবাদের ভ্রান্ত তত্ত্বটি 'সংগঠিত পুঁজিবাদের' তত্ত্বের প্রত্যক্ষ ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে।

পুঁজিবাদের বর্তমান সংকটটি পরিষ্কারভাবেই এই তত্ত্বের চূড়ান্ত অসারতা উদ্ঘাটন করে দিয়েছে। এটা সম্পূর্ণই স্পষ্ট যে, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের কাছ থেকে ধার করা 'সংগঠিত পুঁজিবাদ' সম্পর্কিত এই সুবিধাবাদী গাল-গল্পের সাথে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কোন সম্পর্কই নেই। লেনিন বার বার জোর দিয়ে বলেছেন যে, প্রতিযোগিতা থেকে জন্ম নিলেও, একচেটেবাদ কিন্তু প্রতিযোগিতার অবসান ঘটায় না, বরং তার ওপরে ও তার পাশাপাশি সে প্রতিযোগিতা বিরাজমান থাকে, আর এভাবে সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সবিশেষ তীব্রতার জন্ম দেয়। লেনিন লিখেছেন ঃ

"পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বসমূহকে সাম্রাজ্যবাদ তীব্র ও তীক্ষ্ণ করে তোলে, অবাধ প্রতিযোগিতার সাথে একচেটেবাদকে একত্রে পাকিয়ে ফেলে (intertwine), কিন্তু বিনিময়, বাজার, প্রতিযোগিতা, সংকট ইত্যাদির অবসান ঘটাতে পারে না।

"সাম্রাজ্যবাদ হলো বিলীয়মান পুঁজিবাদ, কিন্তু বিলুপ্ত পুঁজিবাদ নয় ··· মুমূর্ষু, কিন্তু মৃত নয়। বিশুদ্ধ একচেটেবাদ নয়, বরং প্রতিযোগিতা, বিনিময়, বাজার ও সংকটের পাশাপাশি বিরাজমান একচেটেবাদ – সাধারণভাবে এটাই হলো সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।" [সঃ রঃ, ২০শ খণ্ড, ১ম অংশ, পৃঃ ৩৩১, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯২৯]

এ কারণেই লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন ঃ

"যথার্থভাবে এই বিরোধী মূল উপাদানগুলি তথা প্রতিযোগিতা ও একচেটেবাদই হলো সাম্রাজ্যবাদের সারবস্তু, খোদ এটাই ঠেলে দেয় চূড়ান্ত পতনের দিকে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে"। [ঐ]

পরগাছাবৃত্তি ও পুঁজিবাদের অবক্ষয়

সাম্রাজ্যবাদ হলো **পরগাছাসুলভ বা ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ**। পুঁজিবাদী একচেটেবাদ অনিবার্যভাবেই বন্ধ্যাত্ব ও অবক্ষয়মুখী প্রবণতার জন্ম দেয়। তারা একচেটিয়া দাম ধার্যের এবং এক উচ্চ স্তরে তা বেঁধে রাখার চেষ্টা করে। অবাধ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক পুঁজিপতিই উৎপাদনের ক্ষেত্রে খরচ কমিয়ে তার মুনাফা বৃদ্ধি করতে চায়, আর উৎপাদনের খরচ কমাবার উদ্দেশ্যে সব ধরনের কারিগরী উন্নতির প্রবর্তন করে। চড়া একচেটে দাম বজায় রাখতে পারে বলে একচেটেবাদীরা কারিগরী উদ্ভাবনগুলির প্রবর্তনের ব্যাপারে উৎসাহী নয়। বিপরীতপক্ষে, তারা কারিগরী উদ্ভাবনকে অন্য যেকোন কিছুর চেয়ে প্রায়শঃ বেশী ভয় করে, কারণ এইরূপ উদ্ভাবনগুলি উৎপাদনের উপর তাদের একচেটে অধিকারকে ক্ষুন্ন করার কিংবা তাদের বিপুল পুঁজি বিনিয়োগকে মূল্যহীন করে তোলার বিপদ সৃষ্টি করে। সুতরাং একচেটেবাদ প্রায়শঃই কৃত্রিমভাবে **কারিগরী উন্নতিকে বিলম্বিত করে**। সাম্রাজ্যবাদের যুগে এর অসংখ্য উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থে লেনিন ওয়েন্‌সের বোতলজাতকরণ যন্ত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন, যে যন্ত্র বিশ্বযুদ্ধের আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভাবিত হয়। একটি জার্মান কার্টেল ওয়েন্‌সের এই প্যাটেন্টটি ক্রয় করে নেয় এবং তার ব্যবহার-প্রয়োগ বন্ধ করে রাখে। (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কালেও এরূপ ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। খুব বেশী দিন আগের কথা নয়, এমন বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কৃত হয় যা জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায় না, অর্থাৎ, "চিরস্থায়ী বাতি"। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির একচেটেবাদী ট্রাস্টগুলির বৈদ্যুতিক বাতি বিক্রী কমে

যাবে এই কারণে আজ পর্যন্ত এই আবিষ্কারটি বাজারে ছাড়া হয় নি। সুইডেনের ক্রুগার ম্যাচ ট্রাস্টের কারবার ছিল বস্তুতঃ সারা পৃথিবী জুড়ে এবং মার্কিন ব্যাংকের সহায়তায় কারবার করতো ঃ ভিয়েনাবাসী জনৈক রসায়নবিদের উদ্ভাবিত "চিরস্থায়ী" দিয়াশলাই আবিষ্কারের ফলে তারাও কম বিচলিত হয়ে ওঠেনি। জার্মানীর অধ্যাপক বার্জিয়াস কর্তৃক আবিষ্কৃত কয়লা থেকে তেল পাওয়ার পদ্ধতিটি আমেরিকান অয়েল ট্রাস্ট কিনে নেয়, যার ব্যবহার তারা বন্ধ করে রেখেছে। একচেটেবাদীদের জন্যে অসুবিধাজনক হবে বলে মার্কিন রেলপথগুলির বৈদ্যুতিকীকরণ আজও সম্পন্ন হয়নি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে রাখতে হবে যে, কারিগরী উন্নতির সহায়তায় মুনাফা বৃদ্ধি করার ঝোঁকটি নির্দিষ্ট পরিমাণে থেকেই যায়। সে কারণেই সবচেয়ে বড় বড় ট্রাস্টগুলি চমৎকার চমৎকার গবেষণাগার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থা স্থাপন করে, যেখানে হাজার হাজার ইঞ্জিনিয়ার, রসায়নবিদ ও পদার্থবিদরা কাজ করেন। কিন্তু একচেটেবাদের অবস্থিতির কারণে উদ্ভাবন-আবিষ্কারের এক ক্ষুদ্র অংশই কেবল ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট অবস্থায়, এখন এক প্রবণতা আবার আরেক সময় অন্য প্রবণতা মাথা তোলে দাঁড়ায়, এক সময় দেখা যায় বন্ধ্যাত্বের প্রবণতা, আবার অন্য সময় কারিগরী উন্নতির প্রবণতা।

পরগাছাসুলভ ও ক্ষয়িষ্ণু এক ব্যবস্থা হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব সমূহের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে সামগ্রিক উপলব্ধির অভাবই হলো ট্রটস্কীবাদের বৈশিষ্ট্য। একদিকে উৎপাদিকা-শক্তি সমূহকে বিকশিত করার প্রবণতা, আবার অন্যদিকে কারিগরী অগ্রগতিকে রোধ করার প্রবণতা ঃ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাধীনে এই দুই প্রবণতার **সংগ্রাম** যে কার্যকরী রয়েছে ট্রটস্কীবাদ তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু এই **সংগ্রাম, এই দুই প্রবণতার অব্যাহত সংঘাতের ফলেই দ্বন্দ্বগুলো তীব্র হয়ে ওঠে,** আর এটাই হলো সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য। ট্রটস্কীবাদ ঘটনাবলীকে এমনভাবে দেখাতে চায় যেন সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাধীনে প্রযুক্তিগত উন্নতি একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়েছে, উৎপাদিকা-শক্তির বিকাশ সম্পূর্ণ 'বাক্সবন্দী' হয়ে পড়েছে। এরকম দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ ফলাফল হলো "পুঁজিবাদের স্বয়ংক্রিয় পতন"-এর বিশ্বাসঘাতকতামূলক তত্ত্ব, উপরে যার সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাধীনে লেনিনবাদী অসম বিকাশের নিয়মটির প্রতি ট্রটস্কীবাদী অস্বীকৃতির সাথেও তাদের উপরোক্ত ভূমিকার সম্পর্ক রয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে বুর্জোয়া শ্রেণীর পরগাছাসুলভ চরিত্রটি বিশেষ স্পষ্টতা সহকারে অভিব্যক্ত হয়। বুর্জোয়াশ্রেণীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেরই উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সাথে চূড়ান্তভাবেই কোন সম্পর্ক নেই। পুঁজিপতিদের অধিকাংশই হলো এমন লোক যারা জীবন ধারণ করে লভ্যাংশের কুপনগুলি ছিঁড়ে টাকা আদায় করেই (clipping coupons)। পুঁজিপতিরা নানা কোম্পানীর শেয়ার, বণ্ড, সরকারী ঋণ-পত্র ও অন্যান্য লগ্নিপত্রের (securities) মালিক হয়ে বসেছে, এগুলিই তাদের আয় যোগায়। প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয় ভাড়া-করা বিশেষজ্ঞদের (technical force) দ্বারা। যে লক্ষ-কোটি মানুষকে পুঁজি দাসে পরিণত করে, সেই ভাড়া-করা দাসদের কঠোর মেহনতের ফল ভোগ করে বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার অজস্র পদলেহীরা (রাজনীতিক, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী, পাণ্ডা-পুরোহিত ইত্যাদি)। সুইজারল্যাণ্ডের মতো গোটা দেশ কিংবা দক্ষিণ ফ্রান্স, ইটালী আর অংশত ইংল্যাণ্ডের মতো গোটা অঞ্চল আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হয়েছে, যেখানে তারা আসে উন্মত্ত ভোগ-বিলাসে তাদের অনুপার্জিত আয় ব্যয় করতে।

সাম্রাজ্যবাদের যুগ তার সাথে করে নিয়ে আসে পুঁজিবাদী সভ্যতার বিরাট **অধঃপতন** (decline)। রাজনীতি, নাগরিক জীবন, শিল্পকলা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি পায় ও

প্রবেশ করে **টাকার বদলে কেনা-বেচার নীতি** (venality)। সবচেয়ে বড় একচেটেবাদীরা খোলাখুলিভাবেই পার্লামেন্টের সদস্যদের নির্দিষ্ট গোষ্ঠী, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, ইত্যাদিকে টাকা দিয়ে কিনে রাখে। সরকারের প্রধানরা বড় বড় ব্যাংক, কর্পোরেশন ও ট্রাস্টের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের প্রদত্ত লক্ষ লক্ষ মুদ্রার 'ভেট' ব্যাংক ও ট্রাস্টগুলিকে দেশের ভেতরে তাদের খেয়াল-খুশী মতো যা-ইচ্ছা-তাই করাটা সম্ভব করে তোলে। সংবাদপত্র হয়ে দাঁড়ায় বৃহৎ পুঁজির ভাড়াটে চাকর। কোন নতুন মালিকের হাতে যাওয়া মাত্রই অতিশয় পুরোনো ও অতি 'গুণবান' বুর্জোয়া সংবাদপত্রও তার রাজনৈতিক ভোল পাল্টায়। বিপুল সংখ্যক সস্তা উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সাময়িকপত্র (yellow journals) একই কারবারীদের মালিকানাধীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে বিপুল সংখ্যক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সাময়িকপত্র আর এমনকি বহু 'ঐকান্তিক' (serious) সংবাদপত্রের মালিক ছিল বৃহৎ পুঁজিপতি স্টিনস্, যে লোকটি যুদ্ধের বাজারে ও বিশেষ করে তদ্‌পরবর্তীকালে লাগামহীন ফাটকা কারবারের কল্যাণে বিত্তবান হয়ে উঠেছিল। কয়লা ও আকরিক ধাতুখনি, সমুদ্রগামী জাহাজ কোম্পানী ও সিনেমা মালিক স্টিনস্ সংস্থাটি ভেঙে পড়ার পর সংবাদপত্র ব্যবসায়ে নিযুক্ত তার সম্পদের বিরাট অংশ ভারী শিল্পের মালিক অন্য এক পুঁজিপতির হাতে চলে যায় যার নাম হিউগেনবার্গ (জার্মান বুর্জোয়াশ্রেণীর অন্যতম এই নেতাটি হিটলারের রক্তপিপাসু ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের ক্ষমতারোহণে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করেছিল)।

নির্জলা জোচ্চুরি, জালিয়াতি, প্রতারণা ও শঠতা উত্তরোত্তর হয়ে দাঁড়ায় বৃহৎ পুঁজিপতি ও বুর্জোয়া রাজনীতিকদের উন্নতির প্রথাসিদ্ধ উপায়। এসব হীন অপরাধ কালে-ভাদ্রে ধরা পড়ে – ধরা পড়ে কেবল চরম ব্যর্থতার কালেই, যখন কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যায়। এইভাবে ১৯৩২ সালে সারা দুনিয়ার সামনে ফাঁস হয়ে যায় আইভার ক্রুগারের অপকীর্তি, যে ক্রুগার ছিল সুইডেনের দিয়াশলাই ট্রাস্টের প্রধান এবং সোভিয়েত-বিরোধী হস্তক্ষেপকারীদের সবচেয়ে হিংস্র প্ররোচকদের অন্যতম। দেউলিয়া হওয়ার মুখে পড়ে ক্রুগার আত্মহত্যা করে। সংকটের পরিস্থিতিতে তার সামনে পতনের যে বিপদ উপস্থিত হয় তা থেকে যেসব রাশি রাশি জালিয়াতি ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে সে নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল, তার আত্মহত্যায় সেগুলি উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। ঐ ১৯৩২ সালেই, ফ্রান্সে ধরা পড়ে আউস্ট্রিক ষ্টক কোম্পানীর বিরাট কেলেঙ্কারি। এই অপকীর্তি অত্যন্ত প্রখ্যাত সরকারী রাজনীতিবিদ ও ব্যাংক মালিকদের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন ধড়িবাজ জুচ্চোরের কাজ বলে প্রমাণিত হয়। সব ধরনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদান করে এই চক্রটি সরলপ্রাণ পেটি-বুর্জোয়াদের পকেট থেকে লক্ষ লক্ষ ফ্রাঁ (ফরাসী মুদ্রা) মেরে দিতে কামিয়াব হয়। ১৯৩৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় পুঁজিপতি মরগ্যানের দ্বারা কৃত কয়েকটি সন্দেহজনক লেন-দেনের আবিষ্কার ঘটায় বেশ পরিমাণ শোরগোল সৃষ্টি হয়।

আমেরিকায় বেশ কয়েকটি সুসংগঠিত দুর্বৃত্ত দল রয়েছে, যারা বিশেষভাবেই কুখ্যাত অথচ সম্মানও পেয়ে থাকে। তাদের নিজস্ব ট্রাস্টও রয়েছে যারা পুলিশ ও সরকারের সাথে অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক বজায় রাখে।

সবচেয়ে উন্নত দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিকশ্রেণীর উপর স্তরের অংশকে ঘুষ দিয়ে **প্রভাবিত করে।** উপনিবেশসমূহ থেকে প্রাপ্ত বিপুল আয়-উপার্জন, পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলি থেকে নিংড়ে সংগৃহীত অতি-মুনাফা আর বিপুল ব্যাপক সর্বহারাশ্রেণীর অধিকতর নিপীড়ন ও দারিদ্র্যের বদৌলতে, ট্রাস্ট-স্তরে বিকশিত পুঁজি শ্রমিকদের মধ্যেকার এক ক্ষুদ্র, বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অংশকে অধিক মজুরী প্রদান করে এবং সাধারণভাবে তাদের অবস্থার উন্নতি

বিধান করে। সর্বহারাশ্রেণীর এই উৎকোচপ্রাপ্ত অংশই হয়ে দাঁড়ায় বুর্জোয়া-ব্যবস্থাকে রক্ষার এক উপায়ে। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটপন্থী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকও সর্বহারাশ্রেণীর এই উচ্চ স্তরের উপরই অবস্থান নেয়, যে উচ্চ স্তরটি যোগান দেয় সেইসব প্রতিবিপ্লবী ক্যাডার যারা সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে সংগ্রামরত শ্রমিকশ্রেণীর পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর এক নিরতিশয় ক্ষুদ্র অংশকেই কেবল সাম্রাজ্যবাদ উৎকোচ দিয়ে কিনতে পারে। শ্রমিক শ্রেণীর মৌলিক অংশের উপর অব্যাহতভাবে আরো অধিক শোষণের বদৌলতেই এই উৎকোচ প্রদান সম্ভব হয়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু এর ফলে শ্রেণী-দ্বন্দ্বসমূহের আরো অধিক বিকাশ ঘটে, শ্রেণীসমূহের মধ্যেকার বিচ্ছেদ হয় গভীরতর।

সাম্রাজ্যবাদ – পুঁজিবাদের ধ্বংসের যুগ

সাম্রাজ্যবাদ হলো পুঁজিবাদের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঐতিহাসিক পর্যায়। আমরা দেখেছি, এই বিশিষ্টতা হলো ত্রিবিধ ঃ প্রথমতঃ, সাম্রাজ্যবাদ হলো **একচেটে** পুঁজিবাদ ; দ্বিতীয়তঃ, তা হলো **পরগাছাসুলভ** বা ক্ষয়িষ্ণু-পুঁজিবাদ ; আর তৃতীয়তঃ, তা হলো **মুমূর্ষু** পুঁজিবাদ। সাম্রাজ্যবাদের যুগটিকে, একচেটেবাদের যুগটিকে পরগাছাসুলভ, ক্ষয়িষ্ণু, মুমূর্ষু পুঁজিবাদ হিসাবে যে চরিত্রায়িত করা হয়েছে, এ চরিত্রায়নই হলো মার্কসবাদের সকল প্রকার বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা থেকে বিপ্লবী মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে পৃথক করার পার্থক্যসূচক সীমারেখা। সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদের সকল মৌলিক দ্বন্দ্বই তাদের শেষ সীমায় পৌছায়, চরম মাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। "লেনিনবাদের ভিত্তি" শীর্ষক পুস্তকে স্তালিনের বক্তব্য অনুযায়ী, এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তিনটি বিরোধ।

সেগুলি হলো ঃ প্রথমতঃ, শ্রম ও পুঁজির মধ্যেকার বিরোধ। সাম্রাজ্যবাদের অর্থ হলো একচেটেবাদী সংস্থা ও ব্যাংকগুলিতে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির সর্বময় ক্ষমতা। 'পুঁজি লগ্নিকারী ক্ষুদে গোষ্ঠীর' (financial oligarchy) নিপীড়ন এত বেশী যে, পুরানো ধাঁচের শ্রমিক ইউনিয়ন, পার্লামেন্টারী পার্টির মতো শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের পুরানো পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণভাবে অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয়। নজিরবিহীন মাত্রায় শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে, একচেটেবাদীদের ও ব্যাংক-মালিক হাঙ্গরদের ক্ষুদে গোষ্ঠীর দ্বারা শ্রমিকদের শোষণ বৃদ্ধি করে, সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিকদের সামনে নতুন, বিপ্লবী পদ্ধতির সংগ্রামের সমস্যা পরিপূর্ণ গুরুত্বের সাথেই উপস্থিত করে। সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবের মুখোমুখী দাঁড় করায়।

দ্বিতীয়তঃ, নতুন নতুন ভূভাগ, কাঁচামালের উৎস আর পণ্য বিক্রয় ও পুঁজি বিনিয়োগের বাজার দখলের অবিরাম সংগ্রামে মত্ত লগ্নিকারী হাঙ্গরদের **বিভিন্ন চক্রের মধ্যেকার** ও **সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যেকার বিরোধ**। স্বতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলির মধ্যেকার এই উন্মত্ত সংগ্রাম অনিবার্যভাবেই ডেকে আনে যুদ্ধ, আর সেই যুদ্ধে আগেই ভাগ হয়ে যাওয়া বিশ্বকে পুনর্বন্টনের সংগ্রামে, মুষ্টিমেয় কোটিপতির আরো সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে নতুন উৎসগুলিকে গ্রাস করার সংগ্রামে সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়, গড়ে তোলে মৃতদেহের পাহাড়। সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার লড়াই অনিবার্যভাবেই পারস্পরিক সকল পক্ষকে দুর্বল করে তোলে, দুর্বল করে ফেলে সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদী অবস্থানগুলিকে, আর এভাবে এগিয়ে নিয়ে আসে সর্বহারা বিপ্লবের দিনটিকে, সমগ্রভাবে ধ্বংসের হাত থেকে সমাজকে বাঁচানোর জন্যে বিপ্লবকে করে তোলে চূড়ান্তভাবেই প্রয়োজনীয়।

তৃতীয়তঃ, **স্বল্প সংখ্যক** তথাকথিত 'সুসভ্য' জাতি আর ঔপনিবেশিক ও পরাধীন **দেশগুলির** বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের মধ্যেকার বিরোধ। সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের শাসনাধীনে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ উৎসন্নে যায়।

"সাম্রাজ্যবাদের অর্থ হলো সুবিশাল উপনিবেশ সমূহ ও পরাধীন দেশগুলোর কোটি কোটি জনসাধারণের উপর সবচেয়ে নির্লজ্জ শোষণ ও সবচেয়ে অমানবিক নিপীড়ন।" ["লেনিনবাদের ভিত্তি"]

অতি-মুনাফার সন্ধানে সাম্রাজ্যবাদীরা ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশসমূহে কল-কারখানা স্থাপন করে, রেলপথ বসায়, পুরানো বিধি-ব্যবস্থা ভেঙে দেয়, নতুন পুঁজিবাদী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্যে গুলি-গোলা ও হত্যাকান্ডের দ্বারা পথ উন্মুক্ত করে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বৃদ্ধির ফলে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহে মুক্তি আন্দোলন জোরদার হয়, তার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়, এবং স্তালিনের ভাষায়, এসব দেশ "সাম্রাজ্যবাদের মজুত বাহিনী থেকে সর্বহারা বিপ্লবের মজুত বাহিনীতে" রূপান্তরিত হয়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সমূহ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, পরিণত হয় বিপ্লবী সর্বহারার সমর্থকে।

সমস্ত দ্বন্দ্বগুলির চূড়ান্ত তীব্রতা-প্রাপ্তি এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে **সাম্রাজ্যবাদ হয়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাক্কাল**। পুঁজিবাদী দ্বন্দ্ব সমূহ এমন একটা মাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে যে পুঁজিবাদী সম্পর্ক সমূহ আর বহাল রাখাটা মানব সমাজের আরো অধিক বিকাশের পথে একটি অসহনীয় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদী সম্পর্ক সমূহ উৎপাদিকা-শক্তির আরো অধিক অগ্রগতি রুদ্ধ করে ফেলে ; এর ফলশ্রুতি স্বরূপ পুঁজিবাদ অবক্ষয় লাভ করতে থাকে এবং জীবিত থাকা সত্ত্বেও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়তে থাকে। এই অবক্ষয়ী প্রবণতা কিন্তু এমনকি সাধারণ পুঁজিবাদী সংকটের কালেও বিশেষ বিশেষ কোন দেশের বা শিল্প-শাখার বিকাশের পথ রুদ্ধ করে না। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাধীনে বিপুল পরিমাণে সৃষ্ট মূল্য (অর্থাৎ পুঁজি) কোন কাজে না লেগে নষ্ট হয় ; পুঁজিপতি শ্রেণী তার সমস্ত পদলেহী অনুচরবর্গ সহ শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় সবচেয়ে অপ্রতিরোধ্য পরগাছাসুলভ ক্যান্সারে, যা ক্রমেই আরো অসহনীয়ভাবে চেপে বসে বিপুল-ব্যাপক বিত্ত-বৈভবহীন শ্রমজীবী জনসাধারণের ওপর। একই সাথে একচেটে পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সকল প্রয়োজনীয় অবস্থাগুলো সৃষ্টি করতে থাকে।

"সাধারণভাবে বিশ্ব পুঁজিবাদের বিকাশের অত্যন্ত উচ্চ মাত্রা আর রাষ্ট্রীয় একচেটে পুঁজিবাদ দ্বারা অবাধ প্রতিযোগিতার স্থান দখল, ব্যাংক আর কর্পোরেশনগুলো যে পণ্যের উৎপাদন ও বন্টনের প্রক্রিয়ার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটা যন্ত্র সৃষ্টি করছে – এই বাস্তব ঘটনা, দাম-দরের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি আর পুঁজিবাদী একচেটেবাদের বৃদ্ধির কারণে একচেটেবাদী জোটগুলোর [syndicate] দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর উপর বর্ধিত নিপীড়ন, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সমূহ দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর উপর আরোপিত দাসত্ব, সর্বহারাশ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের উপর বিপুলাকারের বাধা সৃষ্টি, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট বিভীষিকা, নিদারুণ দুর্বিপাক ও ধ্বংস – এই সমস্ত কিছুই পুঁজিবাদের পতন আর উন্নত ধরণের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণকে অনিবার্য করে তোলে।" ["সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির কর্মসূচী ও নিয়মাবলী", পৃঃ ৬, মস্কো, ১৯৩২]

সাম্রাজ্যবাদ অনিবার্যভাবেই সর্ববিধ্বংসী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ডেকে আনে। ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধ গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই নিক্ষেপ করেছিল এক সাধারণ সংকটের মধ্যে, যে সংকটের বৈশিষ্ট্য হলো সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত দ্বন্দ্বগুলোর চূড়ান্ত তীব্রতা ও প্রখরতা লাভ। পুঁজিবাদের যে সাধারণ সংকটের অর্থ পুঁজিবাদের ভাঙ্গন ও পতনের কাল, সেই সাধারণ

সংকটের প্রশ্নে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের' [Comintern] দ্বারা প্রণীত নীতিমালা সরাসরিভাবেই সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত লেনিনবাদী তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত আর সেই তত্ত্বের এক অপরিহার্য অংশ তথা অপরিহার্য যোগসূত্র। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট সম্পর্কে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক'-এর প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা অস্বীকার পূর্বক সকল ধরণের ট্রটস্কীবাদী চোরাই-চালানকারীরা যেসব কথাবার্তা বলছে তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে তাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা, সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত লেনিনবাদী তত্ত্বের সাথে তাদের পরিপূর্ণ বিচ্ছেদকেই তুলে ধরছে।

সাম্রাজ্যবাদ হলো পুঁজিবাদের পতন ও ধ্বংসের যুগ, বিজয়ী সর্বহারা বিপ্লবের যুগ। লেনিন একাধিকবার দেখিয়ে দিয়েছেন যে ঃ

"সাম্রাজ্যবাদ হলো পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায়। উন্নত দেশগুলিতে পুঁজি অতিক্রম করেছে জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা এবং প্রতিযোগিতার স্থলে তা প্রতিষ্ঠিত করেছে একচেটেবাদ, আর এভাবে সৃষ্টি করেছে সমাজতন্ত্রের বিজয় অর্জনের সমস্ত বস্তুগত পূর্বশর্ত ।" [লেনিন, "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার", সঃ রঃ, ২২শ খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৪, ইং সং, পৃঃ ১৪৩]

অন্যত্র লেনিন বলেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদের যুগ হলো পরিণত তথা অতি পরিণত পুঁজিবাদের যুগ, যে পুঁজিবাদ তার পতনের প্রাক্কালেই রয়েছে, তা এমন মাত্রায় পরিপক্ক হয়ে ওঠেছে যে, সমাজতন্ত্রের জন্য তার নিজের আসন তাকে অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে।

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের যুগ হলো পুঁজিবাদের পতন ও ধ্বংসের যুগ, সর্বহারা বিপ্লবের যুগ।

নিরীক্ষামূলক প্রশ্নাবলী

১। প্রতিযোগিতা কেমন করে একচেটেবাদের গঠনের দিকে চালিত করে ?

২। একচেটেবাদ কি প্রতিযোগিতার অবসান ঘটায় ?

৩। একচেটেবাদীদের মুনাফার উৎস কি ?

৪। সাম্রাজ্যবাদের যুগে ব্যাংকগুলোর ভূমিকা কিভাবে বদলায় ?

৫। পুঁজির রপ্তানী জন্ম নেয় কোথা থেকে ?

৬। শুল্কের কাজ কি ?

৭। অসম বিকাশের নিয়মটি কি ?

৮। সংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্বটির অপরিহার্য বিশ্বাসঘাতী প্রকৃতি কি ?

৯। সংগঠিত পুঁজিবাদের তত্ত্বটি অতি-সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বের সাথে কিভাবে সংযুক্ত ?

১০। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাধীনে পুঁজিবাদের অবক্ষয় কিভাবে নিজেকে অভিব্যক্ত করে ?

১১। সাম্রাজ্যবাদের পাঁচটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য কি কি ?

Lalsalamml.wordpress.com

যুদ্ধ ও পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট

সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের পতন

সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক দ্বন্দ্বসমূহ বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। একদিকে থাকে মুষ্টিমেয় অধঃপতিত পুঁজিবাদী ক্ষমতাবানরা ; আর অন্যদিকে থাকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বঞ্চিত মানুষ। সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের অধীনে এই হলো পুঁজিবাদী সমাজের চিত্র।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে ঘটে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবক্ষয় ও পতন। বিদ্যমান ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ বিকাশের পথে হয়ে ওঠে বাধা। মানব-চিন্তা, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল-বিদ্যা ঘোষণা করতে থাকে প্রকৃতির ওপর নব নব বিজয়বার্তা। প্রকৃতির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শক্তিগুলিকে মানুষ একের পর এক তার বশীভূত করতে থাকে। কিন্তু, এই বিজয়ের ফসলগুলিকে ভোগ করতে থাকে মুষ্টিমেয় কিছু বাছাই-করা ব্যক্তি। অধিকন্তু, পুঁজিবাদী সম্পর্কসমূহ সবচেয়ে চমকপ্রদ বহু আবিষ্কার ও উদ্ভাবনগুলির ব্যবহারের সম্ভাবনাকে সীমিত করেই রাখে।

সামগ্রিকভাবে মানবজাতি আজ এমন সম্পদ-সমৃদ্ধি অর্জন করেছে যে প্রত্যেকের জন্য এক সুষ্ঠু জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে বাধ সাথে সেই একই পুঁজিবাদী সম্পর্কসমূহ। ব্যাপক জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য নয়, বরং তাদের অনিষ্ট সাধনের জন্যেই বিপুল সম্পদরাজি ব্যবহার করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাধীনে অনিবার্য ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের বলি হয়ে দাঁড়ায় অসংখ্য মানুষ, বহু প্রজন্মের কঠোর পরিশ্রমের ফসল ধ্বংস হয়ে যায়।

সমাজতন্ত্র, না ধ্বংস, সমাজতন্ত্র, না অনিবার্য অধঃপতন – সাম্রাজ্যবাদের যুগে প্রশ্নটি দেখা দেয় এভাবেই। বিশ্ব সর্বহারাশ্রেণীকে একটি চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য অবশ্যই পালন করতে হবে – সাম্রাজ্যবাদের রাজত্বের উচ্ছেদ সাধনের সংগ্রামে সর্বহারাশ্রেণী বিশ্বের বঞ্চিত মানুষের মধ্য থেকে মিত্র খুঁজে পায় অনেক। ঔপনিবেশিক দেশসমূহের যে শ্রমজীবী জনতা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পূর্ণ 'আনন্দ' নিজেদের জীবনে অনুভব করে, সেই শ্রমজীবী জনতা আর ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষক জনগণ ও শ্রমজীবী জনগণের মধ্যবর্তী স্তর হলো পুঁজিবাদের উচ্ছেদের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্যের উৎস। এক বা অন্য দেশে সাময়িক পরাজয় সত্ত্বেও সর্বহারাশ্রেণীর চূড়ান্ত বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

এভাবে, সাম্রাজ্যবাদ শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী-সংগ্রামকে চূড়ান্ত তীব্রতার মধ্যে ঠেলে দেয়। এই সংগ্রাম হলো এক অত্যন্ত কঠিন সংগ্রাম।

সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদী বিকাশের যে অসমতা বৃদ্ধি পায়, বিকাশের ক্ষেত্রে এই অসমতা বিভিন্ন দেশে সর্বহারাশ্রেণীর বিজয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি করে। স্বভাবতঃই – যেসব দেশে আর যখন অবস্থা হচ্ছে সবচেয়ে বেশী অনুকূল – সেসব দেশে এবং তখনই – সর্বহারাশ্রেণী সর্বপ্রথম ক্ষমতা দখল করে এবং সমাজতন্ত্র গঠনের পথে অগ্রসর হয়।

"সাধারণভাবে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের, আর বিশেষভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিপুল অগ্রগতি, এবং পুঁজি ও ব্যাংকের প্রচণ্ড বৃদ্ধির ফলে পুঁজিবাদ হয়ে উঠেছে পরিপক্ক এবং অতি-পরিপক্ক। যতদিন বেঁচে থাকার কথা তার চেয়ে বেশী দিন সে টিকে রয়েছে। মানব-প্রগতির পথে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বাধা। মুষ্টিমেয় কোটিপতি ও শত কোটিপতির চূড়ান্ত ক্ষমতার অধীনে তা নিজেকে

অবনমিত করেছে, যে কোটিপতিরা, সাম্রাজ্যবাদী লুটের মাল, উপনিবেশগুলির উপর অধিকার, লগ্নি পুঁজির 'প্রভাবাধীন এলাকা' কিংবা 'শাসন করার আইনগত অধিকার' ইত্যাদি – জার্মান অথবা ইঙ্গো-ফরাসী লুটেরার দলগুলির মধ্যে কে পাবে তা নিষ্পত্তি করার জন্য, জাতিসমূহকে রক্ত-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্ররোচিত করে।

"১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সময় এই কারণে এবং এই একটিমাত্র কারণেই কোটি কোটি মানুষকে খুন করা হয়েছিল কিংবা বিকলাঙ্গ করা হয়েছিল। সকল দেশের মেহনতী মানুষের মধ্যে দুর্দমনীয় শক্তি আর দ্রুততা সহকারে এই সত্যের অবহিতিটা আজ ছড়িয়ে পড়েছে, এটা আরো অধিকভাবেই হচ্ছে, কারণ যুদ্ধ সর্বত্রই অতুলনীয় ধ্বংস সাধন করেছে, কারণ **সর্বত্রই**, এমনকি 'বিজয়ী' জাতিসমূহকেও, যুদ্ধের কারণে কৃত ঋণের সুদ পরিশোধ করতে হচ্ছে। ……

"পুঁজিবাদের পতন অনিবার্য। জনগণের বিপ্লবী চেতনা সর্বত্রই বাড়ছে ; তার হাজার হাজার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। ……

"পুঁজিপতিরা, বুর্জোয়ারা, 'খুব বেশী হলে' এক বা অন্য দেশে শত-সহস্র শ্রমিক ও কৃষককে হত্যা করার বদলে সমাজতন্ত্রের বিজয়কে নির্বাপিত করতে পারে। কিন্তু পুঁজিবাদকে তারা রক্ষা করতে পারবে না। ……

"বিশ্ব সোভিয়েত রিপাবলিকের বিজয় সুনিশ্চিত।" [লেনিন ঃ "মার্কিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে," সঃ রঃ, ২৯শ খণ্ড, মস্কো, ১৯৬৪, ইং সং, পৃঃ ৫১৭]

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ

দুনিয়াকে পুনর্বন্টনের জন্যে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার সংগ্রামের পরিণতিতে ঘটেছিল ১৯১৭-১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে খোদ ভিত্তিমূলেই নাড়া দিয়েছিল এবং ব্যাপক জনগণের জন্যে ডেকে এনেছিল অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা। যুধ্যমান দেশগুলির ৬ কোটি ২০ লক্ষ মানুষকে যুদ্ধে তলব করা হয়েছিল, আর সারা জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে পড়ে এমন আহত ও বিকলাঙ্গের সংখ্যা দাঁড়ায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ। দুনিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশগুলির বিপুল সম্পদ-রাজি নিতান্ত অর্থহীনভাবেই শূন্যে উড়িয়ে দেয়া হয়। হিসাব করে দেখা গিয়াছে যে, সে যুদ্ধে খরচ হয়েছিল ৩০ হাজার কোটি ডলার। এই হিসাবের অঙ্কটি সম্পর্কে ধারণা করার সুবিধার্থে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যুদ্ধের প্রাক্কালে যুধ্যমান সকল দেশের সমগ্র সম্পদের পরিমাণ ছিল ৬০ হাজার কোটি ডলার। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, বহু প্রজন্মের কঠোর দাসোচিত শ্রমের মূল্যে ইউরোপের জাতিসমূহ যে সম্পদ-সম্ভার সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়েছিল এই সম্পদের অর্ধেকই এই যুদ্ধ গ্রাস করে নিয়েছে।

বিশ্বযুদ্ধ পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির জন্যে বিপর্যয় নিয়ে আসে। কোন কোন রাষ্ট্রের মধ্যে যা-কিছু সম্পর্কসূত্র ছিল যুদ্ধ তা ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। কিছু কিছু দেশ হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন (যেমন জার্মানী)। আমদানীকৃত কাঁচামাল ও খাদ্যের সরবরাহ যায় কমে। উৎপাদন-কর্মে নিয়োজিত বিপুলসংখ্যক জনসাধারণকে, শ্রমিক ও কৃষকদেরকে, তাদের কাজ থেকে সরিয়ে এনে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কোন কোন দেশে শিল্প ও কৃষির সমস্ত শ্রমিকদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে সেনাবাহিনীতে ঢোকানো হয়। এ কথা অবশ্যই ভুললে চলবে না যে, যুদ্ধ জনসংখ্যার শ্রেষ্ঠ উৎপাদক-অংশকে – স্বাস্থ্যবান তরুণদেরই নিয়ে যায়। বৃদ্ধ ব্যক্তি, কিশোর ও নারী, যাদের শ্রম অনেক নীচের স্তরের, তারাই কেবল ঘরবাড়ীতে থেকে যায়।

সামরিক কার্যকলাপের প্রক্রিয়ায় বিপুল-ব্যাপক অঞ্চল বিধ্বস্ত ও ভস্মীভূত হয়।

বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গণগুলো কেবলমাত্র কৃষি-প্রধান অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং প্রায়শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-কেন্দ্রেও বিস্তৃত ছিল। বিধ্বংসী কামানের গোলায় কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরী সমূহ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। খনি সমূহকে ডুবিয়ে দেয়া হয় জলে। আস্ত আস্ত শহর, গোটা শিল্প অঞ্চল, নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ, উত্তর ফ্রান্সের কথা বলা যেতে পারে, যেখানে অবস্থিত ছিল বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গণ – পশ্চিম রণাঙ্গণ।

সর্বশেষে, যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ধ্বংসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো গোটা জাতীয় অর্থনীতির রূপান্তর সাধন, অর্থাৎ যুদ্ধের প্রয়োজনের তাগিদে উৎপাদনের চরিত্রের পরিবর্তন।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে উৎপাদনের চরিত্র বদলে যায় আমূলভাবে। উৎপাদনের উপায়-উপকরণ, ভোগ্য-দ্রব্য ও বিলাস দ্রব্য – যুদ্ধ-পূর্বকালীন উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই তিনটি মৌলিক শ্রেণীর পণ্য-দ্রব্যের সাথে চতুর্থ আরেকটি দ্রব্য যুক্ত হয়, যা ক্রমেই আরো অধিক বিশিষ্ট স্থান দখল করে, আর তা হলো ঃ ধ্বংসের ও নির্মূলীকরণের হাতিয়ার – কামান, গোলাবারুদ, বোমারু বিমান, ডুবোজাহাজ, রাইফেল, ট্যাঙ্ক, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি। যুধ্যমান দেশগুলির সকল সম্পদের মোট পরিমাণ যখন ছিল ৬০ হাজার কোটি ডলার তেমন এক সময়ে বিশ্বযুদ্ধের খরচের পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার কোটি ডলার। তখন এসব দেশের বাৎসরিক জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ৫ শত কোটি ডলার। যদি আমরা ধরে নিই যে, শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যায় সরিয়ে নেয়ার কারণে যুদ্ধের সময় প্রতিটি দেশের জাতীয় আয় কেবল এক-তৃতীয়াংশ কমে গিয়েছিল এবং তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৫ হাজার ৭ শত কোটি ডলার, এবং আমরা যদি আরো ধরে নিই যে, সমস্ত অসামরিক খরচের দরুণ এর শতকরা ৫৫ ভাগ খরচ হতো, তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাব যে, চলতি জাতীয় আয় থেকে যুদ্ধের জন্য মাত্র ২ হাজার ৫ শত কোটি ডলার খরচ সংকুলান হতো। যুদ্ধের চার বৎসরে এর মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ হাজার কোটি ডলার। তাহলে, (যুদ্ধের মোট খরচের) অবশিষ্ট ২০ হাজার কোটি ডলার যুধ্যমান জাতিগুলির স্থায়ী পুঁজি থেকে ব্যয় করতে হয়েছে। সুতরাং এ থেকে বেরিয়ে আসে যে, যুদ্ধের পরে ঐ জাতিগুলির মোট সম্পদের পরিমাণ ৬০ হাজার কোটি ডলার ছিল না, বরং তা ছিল কেবল ৪০ হাজার কোটি ডলার, অর্থাৎ, এক-তৃতীয়াংশ কম।

যুদ্ধ মনুষ্য শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে অবর্ণনীয় বিপর্যয় ঘটিয়েছে।

১৯১৩ সালে ইউরোপের জনসংখ্যা ছিল ৪০ কোটি ১০ লক্ষ, আর যুদ্ধ না ঘটলে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি সহকারে তা বেড়ে দাঁড়াত ৪২ কোটি ৪৫ লক্ষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল কেবল ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ। অর্থাৎ, ইউরোপ হারিয়েছিল তার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯ ভাগ বা ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ। ইউরোপীয় জনসংখ্যার হ্রাসপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রভাব টের পাওয়া যায়, প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ প্রাণহানির ক্ষেত্রে – যুদ্ধের ময়দানে আর রণক্ষেত্রের পশ্চাদ্ভূমিতে মহামারীর কারণে ; দ্বিতীয়তঃ, প্রায় সমস্ত পুরুষ মানুষকে যুদ্ধের কাজে লাগানোর দরুন জন্মহার হ্রাসের ক্ষেত্রে ; আর তৃতীয়তঃ, অধিকতর নিকৃষ্ট জীবন যাপনের (ক্ষুধা, অনাহার প্রভৃতি) কারণে মৃত্যু-হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে।

এ বিষয়টি যদি বিবেচনার মধ্যে নেয়া হয় যে, এই বিপুল লোক ক্ষয়টি হলো প্রাথমিকভাবে যুধ্যমান জাতিগুলির সবচেয়ে সেরা শ্রমশক্তি, তাহলে উৎপাদনের মানবিক কাঠামোটির (human apparatus) ধ্বংসের চিত্রখানি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এর সাথে এই বাস্তব সত্যটি যোগ করা দরকার যে, যুদ্ধের সময় অত্যন্ত দক্ষতাসম্পন্ন

শ্রমিকদের ব্যাপক অংশের স্থলে এমন সব লোকই নেয়া হয়, যাদের তেমন কোন দক্ষতাই ছিল না। এভাবে কাজে নিযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমিকদের সংখ্যার ক্ষেত্রে ঘটে এক হ্রাসপ্রাপ্তি, যা সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের জন্যে বিপুল ক্ষতিই সাধন করেছিল।

যুদ্ধ বিপুল-ব্যাপক শ্রমজীবীদের জীবনে নিয়ে এসেছিল অবর্ণনীয় নিপীড়ন। সামরিক উর্দী পরা শ্রমিক আর কৃষকরা রণাঙ্গনে কামানের খোরাকে পরিণত হয়, যেখানে মৃত্যু কিংবা অসহনীয় দুর্ভোগই তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আর যারা ছিল রণাঙ্গনের পশ্চাদ্ভূমিতে সেই শ্রমিকরাও অনাহারে থাকার মতোই পর্যায়ের মজুরীর জন্যে কল-কারখানাগুলিতে শ্রান্ত-ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত কাজ করতো। সামরিক একনায়কত্বের ব্যবস্থাধীনে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে অসন্তোষের যেকোন প্রকাশকে সর্বাপেক্ষা নির্দয় ও অমানবিক কায়দায় দমন করা হতো। রণাঙ্গনের পশ্চাদ্ভাগের শ্রমিকরা সর্বদাই এই আশঙ্কা-আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাত কখন তাদেরকে আবার রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেয়া হবে, যেখানে তাদের জন্যে অপেক্ষা করতো মৃত্যু কিংবা আহত হওয়া। যুদ্ধের সময় শ্রমজীবী জনতার ভাগ্যে ছিল অনাহার।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সকল দ্বন্দ্বকেই মহাযুদ্ধ চূড়ান্ত মাত্রায় তীব্র করে তুলেছিল। শ্রমিক আর পুঁজিপতিদের মধ্যেকার ফারাকটাও বাড়িয়ে দিয়েছিল ঐ যুদ্ধই। সে যুদ্ধই বিপুল-ব্যাপক কৃষকের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। অফিস-কর্মচারী আর পেটি-বুর্জোয়াদের দারিদ্রকে ডেকে এনে সে মহাযুদ্ধই তাদের অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছিল।

" ..... উভয় দিক থেকেই যুদ্ধটা হলো সাম্রাজ্যবাদী ..... । বিদেশের ভূমি দখল, ছোট ছোট জাতিগুলিকে গলা টিপে মারা, বিশ্বের ওপর আর্থিক আধিপত্য কায়েম, উপনিবেশসমূহের ভাগ-বন্টন ও পুনর্বন্টন, বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের সাথে প্রতারণা ও তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে পতনোন্মুখ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই জার্মান ও ইঙ্গো-ফরাসী – উভয় বুর্জোয়াশ্রেণী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।" [লেনিন, ২০শ খণ্ড, রুশ সংস্করণ, ১ম অংশ, পৃঃ ২৯]

বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম ও পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট

বিশ্বযুদ্ধ হলো সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র বিকাশের অনিবার্য পরিণতি। বিশ্বযুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে যে, পুঁজিবাদ চূড়ান্তভাবেই মানব সমাজের আরো অধিক বিকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেছে। মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়তির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ তার নিজের মধ্যে কী বিশাল বিপদ ও ভীতি বহন করছে বিশ্বযুদ্ধ তা উদ্ঘাটন করে দিয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ ছিলো পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের সূচনা। বিশ্ব ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক নতুন পাতা ওল্টান হলো। রাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টকে ভেঙে দিয়ে এগিয়ে গেলো। সবচেয়ে হীন প্রতিক্রিয়ার দুর্গ জারতান্ত্রিক রাশিয়াতে মাথা তুলে দাঁড়ালো সোভিয়েত রাষ্ট্র। দুনিয়ার এক-ষষ্ঠাংশকে পুঁজির রাজত্ব থেকে ছিনিয়ে আনা হলো আর তা হয়ে দাঁড়ালো এমন এক দেশ যেখানে গড়ে তোলা হচ্ছে সমাজতন্ত্র। অক্টোবর বিপ্লবই ঘোষণা করলো সর্বহারাশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা। এই বিপ্লব দুনিয়াটাকে ভাগ করে দিল দুই শিবিরে – পুঁজিবাদের শিবির আর নির্মীয়মান সমাজতন্ত্রের শিবির। অক্টোবর বিপ্লবই পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে প্রথম বিস্তৃত ফাটল সৃষ্টি করেছে। পূর্বতন বিশ্বজনীন পুঁজিবাদের স্থলে পরস্পরের পরিপূর্ণ বিরোধী দুটি ব্যবস্থা – পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখন লড়াই করছে।

অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে পুঁজিবাদ আর পৃথিবী শাসনকারী একমাত্র প্রচলিত

সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে বিদ্যমান নেই। তার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে এক নতুন ব্যবস্থা, এক নতুন প্রথা – তার তা হলো সমাজতন্ত্র। বর্তমান যুগ হলো পুঁজিবাদের পতন ও ধ্বংসের যুগ, সর্বহারা বিশ্ব বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের বিজয়ের যুগ।

বিশ্বযুদ্ধ দুনিয়ার মানচিত্রকে নতুন করে এঁকে দিয়েছে। বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের মধ্যেকার শক্তি-সম্পর্ককে তা আমূলভাবে বদলে দিয়েছে। সর্বহারা বিপ্লব বিজয় অর্জন করেছে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ ভূভাগে এবং পুঁজির কবল থেকে তাকে ছিনিয়ে এনেছে। কিন্তু বিশ্বের অবশিষ্ট অংশে পুঁজির ক্ষমতা এখনও বহাল রয়েছে আর সেখানে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সমূহও ঘটেছে।

বিশ্বযুদ্ধ পুরোপুরিভাবেই দুর্বল করে দিয়েছিল যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সকল দেশের জাতীয় অর্থনীতিকে। বিজয়ী দেশ সমূহ, অর্থাৎ মিত্রপক্ষ, অবশ্য, যুদ্ধ খরচের গোটা বোঝাটা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল বিজিত দেশসমূহের উপর। কিন্তু, বিজিত দেশ সমূহের মধ্যে একমাত্র জার্মানীর কাছ থেকেই সামান্য কিছু আদায় করা সম্ভব হয়েছিল, কারণ জার্মানীর মিত্ররা (অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, তুরস্ক, আর বুলগেরিয়া) ছিল অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায়। জার্মানী ছিল মিত্রপক্ষের প্রধান দুশমন। জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের যুদ্ধে নামিয়েছিল। সুতরাং বিজয়ীদের প্রথম কাজটিই ছিল জার্মানীর সাথে বোঝাপড়া করা, সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের তালিকা থেকে তাকে বাদ দেওয়া, দীর্ঘকালের জন্য তার অর্থনৈতিক বিকাশকে বন্ধ বা রুদ্ধ করে দিয়ে তার প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদের রক্ষা করা। একই সময়ে জার্মানীর কাঁধে যুদ্ধের খরচের বৃহত্তর অংশ চাপিয়ে দেয়াও দরকার ছিল। ১৯১৯ সালে ভার্সাই নগরীতে স্বাক্ষরিত শান্তি-চুক্তি জার্মানীকে সর্বসান্ত করার জন্য বেশ কটি বিধি-ব্যবস্থার সুযোগ করে দেয়। জার্মানীর কাছ থেকে বেশ কয়েকটি অঞ্চল কেড়ে নেয়া হলো, কয়লা আর লোহায় সমৃদ্ধ অঞ্চল লাভ করলো ফ্রান্স ; জার্মানীর বাণিজ্য-পোত বহরও ছেড়ে দিতে হলো মিত্রপক্ষের হাতে ; নিজ সীমানার বাইরে অবস্থিত উপনিবেশ সমূহ ও তার মালিকানাধীন সকল অঞ্চলও তাকে ছেড়ে দিতে হলো। সর্বোপরি – আর এটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ – পাওনা পরিশোধের [Payment] আকারে জার্মানীর উপর নজরানা [tributes] আরোপ করা হলো, আর তা হলো যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির জন্য মিত্রপক্ষের দেশসমূহকে ক্ষতিপূরণ দেয়া (অর্থাৎ বিজিত রাষ্ট্রসমূহের দ্বারা ক্ষতিপূরণ দান)। ভার্সাই-এ এই পাওনা-পরিশোধের পরিমাণ নির্ধারিত হয় ১৩ হাজার ২শত কোটি স্বর্ণ-মার্ক (জার্মান মুদ্রা) ; সন্ধি চুক্তি অনুযায়ী কয়েক বৎসরে কিস্তিতে সে টাকা শোধ করা হবে বলে ঠিক করা হয়েছিল।

ভার্সাই-এর দস্যুসুলভ শান্তি-চুক্তি দ্বারা জার্মানীর ওপর পরিচালিত লুণ্ঠনের ফলে যুদ্ধে লিপ্ত সমস্ত দেশসমূহের মধ্যে জার্মানীই নিজেকে দেখতে পেল সবচাইতে বেশী বিধ্বস্ত (অবশ্য ক্ষুদ্র অস্ট্রিয়া ছিল এর ব্যতিক্রম, যথার্থ অনাহারের হাত থেকে মার্কিন বদান্যতাই যাকে রক্ষা করেছিল)।

বিশ্বযুদ্ধ বিজয়ী দেশসমূহের শিবিরেও শক্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। যুদ্ধের ফলে সবচেয়ে বেশী লাভবান হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কারণ সামরিক কার্যক্রমে নিতান্ত সামান্যই সে অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু সব রকমের সামরিক সরবরাহের যোগান দিয়ে মুনাফা করেছিল সে বিপুলভাবেই। যুদ্ধের ফলে বৃটিশ পুঁজিবাদের সূর্য অস্তাচলে গেল। গ্রেট ব্রিটেন বিশ্ব বাজারে তার প্রাধান্য হারালো। তরুণ প্রতিযোগী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিজের আসন ছেড়ে দিতে সে বাধ্য হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহকে কেন্দ্রে করেই আজ গোটা যুদ্ধোত্তর কালের সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বগুলি আবর্তিত হচ্ছে।

যে বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার পুরানো প্রতিযোগীরা (প্রধানতঃ গ্রেট ব্রিটেন ও জার্মানী) পরস্পরের গলা কাটছিল, সেই যুদ্ধ থেকেই বিপুল সুবিধা আদায় করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী বলে আমেরিকা নিজেকে প্রমাণ করলো।

যুধ্যমান দেশগুলি যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান চাহিদা – পর্বতপ্রমাণ কয়লা, লোহা, ইস্পাত, রুটি, তেল ও বস্ত্র নিজেরা আর পূরণ করতে পারেনি। এই বিপুল পরিমাণ চাহিদা এলো আমেরিকার কাছে। একই সময়ে দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া প্রভৃতি কৃষি-প্রধান দেশগুলিতে তৈরী পণ্যের বাজারও মুক্ত হয়ে গেল। যুদ্ধের পূর্বে গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানী ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশই তাদের পণ্য-দ্রব্য এসব বাজারে রপ্তানী করতো। যুদ্ধের সময় এসব দেশ থেকে রপ্তানীর কোন বিষয় চিন্তাই করা যেতো না। এসবের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প ও কৃষির এক অভূতপূর্ব বিকাশ সাধিত হলো। আমেরিকা হয়ে দাঁড়ালো বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ। মহাযুদ্ধের ফলে বিশ্ব পুঁজিবাদের ভরকেন্দ্র ইউরোপ থেকে স্থানান্তরিত হলো আমেরিকায়।

যুদ্ধের পূর্বে মার্কিন অর্থনীতিতে শিল্পের স্থান প্রধান ছিল না। ১৯০৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০০ কোটি ডলারের কৃষিজাত পণ্য রপ্তানী করেছিল, আর শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল কেবল ৪৬ কোটি ডলার। যুদ্ধের সময়কালে অতুলনীয় দ্রুততার সাথে শিল্পের বিকাশ ঘটলো। ১৯১৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পগুলি সর্বমোট ২,৪২৪ কোটি ডলারের পণ্য-দ্রব্য উৎপাদন করে আর ১৯১৮ সালে এই উৎপাদন ইতোমধ্যে হয়ে ওঠে ৬,২৫৮ কোটি ডলারের।

যুদ্ধের সময়কালে বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন বেড়েছিল শতকরা ৪০ ভাগ, ইস্পাতের শতকরা ৪০ ভাগ, কয়লা ও তামার শতকরা ২০ ভাগ, দস্তার শতকরা ৮০ ভাগ, তেলের শতকরা ৪৫ ভাগ। ১৯১৩ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে সমুদ্রগামী বাষ্পীয় জাহাজের নির্মাণ বেড়েছিল দশ গুণেরও বেশী, মোটগাড়ীর উৎপাদন বেড়েছিল দ্বিগুণ। যুদ্ধের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৈরী পণ্য রপ্তানীকারী একটি শিল্প-প্রধান দেশে রূপান্তরিত হয়। ১৯১৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০৭ কোটি ডলারের তৈরী পণ্য-দ্রব্য রপ্তানী করেছিল আর ভোগ্য-দ্রব্য ও কাঁচামাল রপ্তানী করেছিল ১৪০ কোটি ডলার।

তথাপি, যুদ্ধের সময়কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিরও উন্নতি ঘটেছিল। ১৯১৩ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে ফসল উৎপাদন বেড়েছিল শতকরা ১২ ভাগ আর গবাদি পশুর সংখ্যা আরো বেশী।

মহাযুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের **সবচাইতে সমৃদ্ধ জাতিতে** পরিণত করেছে। এর আগে গ্রেট ব্রিটেন ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ ঃ পুঁজিবাদী বিশ্বের সে পালন করেছে নেতৃত্বের ভূমিকা, আমেরিকা সহ সকল দেশেই ছিল তার পুঁজি – সকলেই ছিল ব্রিটেনের কাছে ঋণী। ব্রিটিশ মুদ্রা –পাউণ্ড-স্টার্লিং – পৃথিবীর সবচেয়ে স্থিতিশীল মুদ্রা বলে বিবেচিত হতো ; ব্রিটিশ পাউণ্ডের মূল্য-হ্রাসের কথা কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু মহাযুদ্ধ এসব কিছুকেই বদলে দিল ঃ যুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেন তার সম্পদের এক বিরাট অংশ হারিয়ে ফেললো এবং নেমে আসলো দ্বিতীয় স্থানে, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠলো পর্বত-প্রমাণ সম্পদশালী।

১৯১৫ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে মার্কিন রপ্তানীর পরিমাণ তার আমদানীর চেয়ে ১৮০০ কোটি ডলার বেশী হলো, অন্য কথায়, ইউরোপের যুধ্যমান জাতিগুলির কাছ থেকে যে পরিমাণ পণ্য-দ্রব্য সে গ্রহণ করেছিল তার চেয়ে ১৮০০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য-দ্রব্য সে বেশী দিয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ পাওনা মুদ্রা কিভাবে শোধ করা হলো ? এর বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেল কি ?

প্রথমতঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেসব প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিল ইউরোপীয় পুঁজিপতিরা সেসব চলে গেল মার্কিন মালিকদের হাতে। ৩০০ থেকে ৫০০ কোটি ডলারের উল্লেখযোগ্য পাওনা এভাবে শোধ করা হলো। অধিকন্তু পৃথিবীর মোট মজুত সোনার অর্ধেকের বেশী জমা হলো আমেরিকায় ; যুধ্যমান জাতিগুলি নিজেদের সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের জন্য যে বিপুল পরিমাণ সামরিক সরবরাহ ও ভোগ্য-দ্রব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরবরাহ পেয়েছিল তার বিনিময়ে তারা নিজেদের মজুত সোনা আমেরিকাকে দিতে বাধ্য হয়। সর্বসাকুল্যে আমেরিকার নিকট মিত্রপক্ষের দেনার পরিমাণ পৌঁছায় এক বিরাট অংকে – ১০০০ কোটি ডলারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গ্রেট ব্রিটেনের দেনা দাঁড়ায় ৯০ কোটি পাউণ্ড (৩৯০ কোটি ডলার), আবার গ্রেট ব্রিটেনেরও তার খাতকদের কাছে পাওনা দাঁড়ায় ১৬০ কোটি পাউণ্ড (প্রায় ৬৯৩ কোটি ডলার)। যুদ্ধ-ঋণের বিধি-বিধান সংক্রান্ত ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত যেসব চুক্তি সম্পাদিত হয় তার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পূর্বতন মিত্রপক্ষ ও অন্যান্য দেশের দেনার পরিমাণ স্থির করা হয় (সুদ-সমেত) ২৪০ কোটি পাউণ্ড (প্রায় ১০৪০ কোটি ডলার)। গ্রেট ব্রিটেনের পূর্বতন মিত্রদের দেনা এমন পরিমাণে কমানো হলো যার ফলে তাদের দেনার পরিমাণটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গ্রেট ব্রিটেনের দেনার সমান হয়ে দাঁড়াল।

যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ জার্মানীকে যা পরিশোধ করতে হবে তা প্রথমতঃ স্থির হয়েছিল ১৩ হাজার ২০০ কোটি মার্ক (প্রায় ২৫২৬ কোটি ডলার)। এ বিষয়ে ১৯২৪ সালে যে ডয়েস পরিকল্পনা (Dawes Plan) গ্রহণ করা হয়, তাতে জার্মানী কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেবে তা অনির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বার্ষিক ২৫০ কোটি মার্ক হিসাবে বার্ষিক পরিশোধের জন্য জার্মানীকে বাধ্য করা হয়। ১৯২৯ সালে ডয়েস পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়ে গৃহীত ইয়ং পরিকল্পনা (Young Plan) অনুসারে স্থির করা হয়, ৫৯ বছর ধরে প্রতি বছর ১৯০ কোটি মার্ক হিসাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ইয়ং পরিকল্পনা কার্যকরী ছিল ১ বছর ১০ মাস। ১৯৩১ সালের ১লা জুলাই তথাকথিত বহুবার মুলতবী ব্যবস্থা (Hoover Moratorium) কার্যকরী হয়, এতে ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কিত সকল দেনা ও যুদ্ধ-ঋণ এক বছরের জন্য বন্ধ রাখা হয়।

এই গোটা সময়টা ধরে জার্মানী যুদ্ধের যে নগদ ক্ষতিপূরণ দেয় তার পরিমাণ হলো ৬৪ কোটি ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড (প্রায় ২৭৯ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার)।

জার্মানীর দেয় যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ এবং বিশ্বযুদ্ধ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মিত্রপক্ষের দেশগুলির পারস্পরিক দেনা যুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক সমস্যার, পুঁজিবাদী দেশগুলির শিবিরের খেয়োখেয়ী ও বিবাদ-বিসম্বাদের মূল বিষয়গুলির, সবচেয়ে তীব্র দ্বন্দ্বসমূহের জটিল গ্রন্থির অন্যতম একটিতে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কিত ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ না-করার নীতি অবলম্বন করছে ; তার মতে, এটা হলো ইউরোপীয়দের অভ্যন্তরীণ বিষয়, যার সাথে আমেরিকার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মিত্রপক্ষের দেশগুলির কাছে নিজের পাওনা আদায়ের জন্যে আরো জোরালোভাবে সে দাবি জানাচ্ছে।

অর্থনৈতিক সংকটের বিকাশের ফলে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় ও অন্যান্য ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বাস্তবতঃ ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এটা স্বতঃপ্রমাণিত যে, ঋণ পরিশোধের ব্যাপারটি এভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার সম্পর্ক আরো অধিক মাত্রায় তিক্ত হয়ে ওঠে।

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের তিনটি আমল

পুঁজিবাদের পতনটা ঘটতে থাকে এক গোটা ঐতিহাসিক যুগ ধরে। এই আমলটা হলো আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে বিপ্লবী সংগ্রামের আমল।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলি তিনটি আমলে বিভক্ত। ১৯১৮-২১ সালের যুদ্ধোত্তর প্রথম বছরগুলি ছিল গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তীব্র ভাঙনের এবং সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেকার হিংস্র সংগ্রামের আমল, আর বেশ কয়েকটি দেশে এই সংগ্রাম প্রকাশ্য গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। যুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংস এবং জীবন ও সম্পদের ক্ষেত্রে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির ফলশ্রুতিতে, অর্থনৈতিক সর্বনাশ ঘটেছিল অতুলনীয় মাত্রায়। পুঁজিবাদের সমস্ত দ্বন্দ্বগুলি একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। সেই একই দুর্দশার মধ্যে নিজেদেরকে অসহায় অবস্থায় দেখতে পেয়ে ব্যাপক জনসাধারণের অসন্তোষ ছিল প্রবল। মধ্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলো। ১৯১৯ সালে হাঙ্গেরীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র, তা টিকে থাকলো কয়েক মাস, আর ব্যাভেরিয়াতে আরেকটি প্রজাতন্ত্র কয়েক সপ্তাহ বেঁচে রইলো। ১৯২০-২১ সালে এক সুগভীর অর্থনৈতিক সংকট পুঁজিবাদী দেশসমূহকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরলো, এর ফলে দ্বন্দ্বগুলি হয়ে উঠলো আরো বেশী তীব্র।

এই বছরগুলিতে সোভিয়েত রাশিয়া প্রতিহত করছিল রুশ শ্বেতরক্ষী বাহিনী ও আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের সম্মিলিত শক্তির আক্রমণ। সোভিয়েত রাজশক্তির বিজয় ও সংহতকরণের মধ্য দিয়ে গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো, অজেয় সর্বহারা বিপ্লবের লৌহ-দৃঢ় শক্তির হাতে বহিরাক্রমণের সমস্ত অপচেষ্টা পরাস্ত হলো। বিশ্ব বিপ্লবের সমর-সেনামণ্ডলী – **কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক** স্থাপিত হলো। প্রথমবারের মতো বহু পুঁজিবাদী দেশেই কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠলো। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত সমাজতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকরা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের যে পতাকা ধূলায় নিক্ষেপ করেছিল ও রক্তে রঞ্জিত করেছিল এই পার্টিগুলি সেই পতাকা আবার তুলে ধরলো।

বিশ্বাসঘাতক সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট নেতাদের সহায়তায় কয়েকটি দেশে বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণীর আক্রমণকে প্রতিহত করতে ও তাদের প্রতিরোধকে চূর্ণ করতে বুর্জোয়াশ্রেণী সক্ষম হলো। ১৯২৩ সালে জার্মান বুর্জোয়াশ্রেণী পুনরায় সে দেশে বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণীর ওপর পরাজয় চাপিয়ে দিতে সমর্থ হলো। একদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়নে সোভিয়েত রাজশক্তির বিজয়, আর অন্যদিকে, পশ্চিম ইউরোপীয় সর্বহারাশ্রেণীর সাময়িক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে, **প্রথম আমলটি** এভাবে শেষ হলো।

শ্রমিকশ্রেণীর উপর পরাজয় চাপিয়ে দেয়ার পর পশ্চিম ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এখন শুরু করলো অগ্রাভিযান। এভাবে, শুরু হলো **দ্বিতীয় আমল** – পুঁজিবাদী দেশসমূহে আংশিক স্থিতিশীলতার ক্রমান্বয় আবির্ভাবের আমল। বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংসের পরিস্থিতিতে কিছুটা পরিমাণ "পুনর্গঠনের" যে আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল পুঁজিবাদী শিবিরে এখন তা সাধিত হলো। অন্যদিকে, এই আমলটা হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতিতে দ্রুত পুনর্গঠনের, আর সমাজতান্ত্রিক বিনির্মাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের আমল।

ব্যাপক শ্রমিক-সাধারণের আক্রমণকে প্রতিহত করার পর, বুর্জোয়াশ্রেণী অগ্রবর্তী হলো বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা ফেলে যাওয়া সুগভীর ক্ষতগুলিকে সারিয়ে তুলতে। এসব ক্ষতগুলিকে সারিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের পদ্ধতি ছিল সাম্রাজ্যবাদী হত্যাকাণ্ডের সমগ্র বোঝাটা শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে চাপানো। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান অবিশ্বাস্য নিম্নে নামিয়ে আনার

বিনিময়ে বুর্জোয়াশ্রেণী হাসিল করলো পুঁজিবাদের এক সাময়িক ও আংশিক স্থিতিশীলতা। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খলার ফলে যে মুদ্রা-সঞ্চলন পরিপূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল কয়েকটি দেশে তা পুনরায় স্থিতিশীল করা হলো। বুর্জোয়াশ্রেণী পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে 'র‍্যাশনালাইজেশন' পদ্ধতি চালু করতে লাগলো। 'র‍্যাশনালাইজেশনের' অর্থ হলো শ্রমিক-শোষণের হারের বিপুল বৃদ্ধি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে 'র‍্যাশনালাইজেশন'-পন্থীদের দ্বারা প্রবর্তিত নতুন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনীর সহায়তায় তা সম্পাদিত হলো। পুঁজিবাদী 'র‍্যাশনালাইজেশন' শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়ে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। শ্রমিকদের একটা অংশকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলা হয়, যাদের আর কাজ পাওয়ার কিছুমাত্র আশাও থাকে না। যেসব শ্রমিক কাজে নিযুক্ত থাকে তাদেরকে দুই বা তিনগুণ বেশী তীব্রতা সহকারে কাজ করতে বাধ্য করা হয়, পুঁজির কল্যাণ-সাধনে তাদের সমগ্র শক্তি নিঃশেষিত হয়।

পুঁজিবাদের আংশিক স্থিতিশীলতা কেবল সাময়িক, টলায়মান ও ক্ষীয়মানই হতে পারে। সেটা কেবল বাস্তবিকপক্ষে অতি অল্প সময়ের জন্য সমসাময়িক পুঁজিবাদের কিছু কিছু দ্বন্দ্বের ফলাফলকে নিস্তেজ করতে পারে, কারণ তা ঐ দ্বন্দ্বগুলিকে সমাধান করায় চূড়ান্তভাবেই অক্ষম। বিপরীত পক্ষে, ঐসব দ্বন্দ্বগুলি বৎসর বৎসর নিজেদের প্রভাব ক্রমেই আরো তীব্রভাবে প্রকট করে তুলছে।

স্থিতিশীলতার প্রক্রিয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন দেশের বিকাশের ক্ষেত্রে অসমতার বৃদ্ধি। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার পর কোন কোন দেশ কম-বেশী দ্রুততার সাথে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়, অন্যদিকে অন্য কিছু দেশ এক্ষেত্রে পেছনে পড়ে থাকে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে উৎপাদন-ব্যবস্থার সাময়িক পুনরুজ্জীবন শুরু হয়েছিল। স্থিতিশীলতার বছরগুলিতে সৃষ্ট বিকাশের অসমতাই ছিল সেইসব দ্বন্দ্বসমূহের অন্যতম উৎস, যেগুলো কিছুদিন পর খুব শীঘ্রই নিজেদের আত্মপ্রকাশ করে।

পুঁজিবাদের সাময়িক স্থিতিশীলতার সাথে সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতির পুনর্গঠন বিরাট পদক্ষেপ সহকারে এগিয়ে যাচ্ছিলো ; সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও তার পরবর্তীতে গৃহযুদ্ধের দ্বারা দেশের অর্থনীতিতে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলো নিরাময় করা হলো, আর তা হলো স্বাধীনভাবে ও কোন প্রকার বহিঃস্থ সাহায্য ছাড়াই। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজশক্তির সংহতকরণ ও বৃদ্ধি-বিকাশ পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটকে গভীরতর করে এবং তাকে আরো তীব্র করে তোলে।

সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শোষিত ঔপনিবেশিক দেশসমূহ তাদের শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জেগে উঠলো। সাময়িক বিপর্যয় সত্ত্বেও চীনের বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্রাম নিতে দিচ্ছে না। ভারতবর্ষ এবং বৃটিশ ও ফরাসী পুঁজির অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলন অব্যাহতভাবেই বেড়ে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলি বৃদ্ধি পাচ্ছে ও তীব্রতর হচ্ছে। বিশ্বের অর্থনৈতিক ভরকেন্দ্রের আমেরিকায় স্থানান্তর এবং বিশ্ব-শোষক রূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রূপান্তর, মার্কিন ও ইউরোপীয়, বিশেষ করে বৃটিশ বুর্জোয়াদের মধ্যেকার (দ্বন্দ্বমূলক) সম্পর্ককে বিপুলভাবে তীব্র করে তুলেছে। আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলিকে কেন্দ্র করে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রাম আবর্তিত হচ্ছে। পুঁজিবাদী শিল্পসমূহ যখন কোন কোন দেশে যুদ্ধ-পূর্বকালীন শক্তি-সামর্থ্যে পুনরায় উন্নীত হচ্ছে (১৯২৭-২৮) তখন বাজারের জন্য সংগ্রাম হয়ে উঠেছে অত্যন্ত তীব্র।

এখন পুঁজিবাদের যুদ্ধোত্তর সাধারণ সংকটের তৃতীয় আমলটি এসে উপস্থিত হলো। এই আমলের বিশেষত্ব হলো সমসাময়িক পুঁজিবাদের মৌলিক দ্বন্দ্বসমূহের তীব্রতা প্রাপ্তি।

১৯১০ সালের সাথে তুলনায় ১৯২৭ সালে বিশ্ব অর্থনীতি উৎপাদন করে ঃ তেল – শতকরা ৩০০ ভাগ, লোহা – শতকরা ১০২ ভাগ, ইস্পাত – শতকরা ১২৭ ভাগ, তুলা – শতকরা ১২৫ ভাগ, গম – শতকরা ১১০ ভাগ, পশুখাদ্য জাতীয় শস্য – শতকরা ৯৫ ভাগ। পরবর্তী বছর, ১৯২৮ সালে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। মহাযুদ্ধের প্রায় দশ বছর পর, পুঁজিবাদ তার যুদ্ধ-পূর্বকালীন সীমা ছাড়িয়ে গেলো। যুগপৎভাবে, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র দেশের অভ্যন্তরে আবার বিভিন্ন দেশসমূহের মধ্যে – উভয় ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদী দ্বন্দ্বসমূহের অসাধারণ বৃদ্ধি ঘটলো। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের বিকাশের তৃতীয় আমলটি হলো পুঁজিবাদের আংশিক ও সাময়িক স্থিতিশীলতার চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার যুগ। ১৯২৯ সাল থেকে যে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়েছে এবং যা পুঁজিবাদী দেশসমূহের গোটা অর্থনীতিকে খোদ ভিত্তিমূলেই নাড়িয়ে দিয়েছে, সেই সংকটজনিত পরিস্থতিতে অবশেষে উপস্থিত হয়েছে পুঁজিবাদী স্থিতিশীলতার সমাপ্তি, আর এ কথাই বলা হয়েছে ১৯৩২ সালের শরৎকালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী পরিষদের [E.C.C.I.] দ্বাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে।

পুঁজিবাদী 'র‍্যাশন্যালাইজেশন' তার সাথে নিয়ে আসে বুর্জোয়াশ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীর ওপর শোষণের নজিরবিহীন বৃদ্ধি। 'র‍্যাশন্যালাইজেশন' শ্রেণী-দ্বন্দ্বসমূহকে চূড়ান্ত মাত্রায় তীব্র করে তোলে। পুঁজিবাদী অবস্থাধীনে 'র‍্যাশন্যালাইজেশনের' ফলে বহু সাবেকী ধরনের শিল্প-প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং অবশিষ্ট কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরীসমূহে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমে যায়। দীর্ঘস্থায়ী বেকার সমস্যা দেখা দেয়। এমনকি বেশ কয়েকটি সবচেয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশেও শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমৃদ্ধতম পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র – সংস্কারবাদীরা যাকে বলে 'ভূস্বর্গ' – সেখানেও ১৯১৯ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে নিম্নোক্ত পরিবর্তনসমূহ ঘটেছিল। শিল্প, কৃষি, রেলপথে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা কমেছিল শতকরা ৭ ভাগ ; উৎপাদন বেড়েছিল ২০ ভাগ ; শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ২৯ ভাগ। এই বছরগুলিতে, এসব ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমেছিল প্রায় ২০ লক্ষ। এদের একাংশ ব্যবসা ও সার্ভিস ক্ষেত্রে কিছু চাকরি পেয়েছিল, কিন্তু বেশীর ভাগই থেকে যায় বেকার।

১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে জার্মানীতে বেকারের সংখ্যা ৩০ লক্ষের কম ছিল না। পুঁজিবাদী 'র‍্যাশন্যালাইজেশনের' শেষ কয় বছরে স্থায়ী বেকারের এক মজুদ বাহিনী গড়ে উঠেছিল, যা এমনকি শিল্প-পুনরুজ্জীবনের সময়েও সংখ্যায় ১০ থেকে ১৫ লক্ষের নীচে নামেনি। এদের মধ্যে ৫ থেকে ১০ লক্ষ ছিল স্থায়ী বেকার এবং তাদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। পুঁজিবাদী 'র‍্যাশন্যালাইজেশনের' প্রকৃত শিকার ছিল এরাই ; 'র‍্যাশন্যালাইজেশন' তাদের সমস্ত শক্তি শুষে নিয়ে তাদের নিক্ষেপ করেছে রাস্তায়।

সবচেয়ে অগ্রবর্তী পুঁজিবাদী দেশসমূহে 'র‍্যাশন্যালাইজেশন' দ্বারা বেকারত্বে নিক্ষিপ্ত সর্বমোট বেকারের সংখ্যা ছিল ১ কোটি। যথার্থভাবে মহাযুদ্ধে নিহতদের সংখ্যার সমান হলো এটা ! মহাযুদ্ধে যারা বলি হয়েছিল তাদের মতোই পুঁজিবাদের দ্বারা এরাও মৃত্যুর দণ্ডেই দণ্ডিত – একমাত্র পার্থক্য হলো এই যে, পুঁজিবাদের শান্তিকালীন 'বলি'র মৃত্যু হয় ধীরে ধীরে।

প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্য বাড়তে থাকে দ্রুতগতিতে, শ্রমিকরা সর্বহারা হতে থাকে আর একই সময়ে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ বিপুলভাবে বাড়তে থাকে। উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ বিপুলভাবে বাড়ার সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ বাজার সঙ্কোচিত হয়ে পড়ে, কারণ বাজার নির্ভর করে ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গতির ওপর। উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধিটি বিরোধের মুখে পড়ে ব্যাপক জনগণের ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে হ্রাসপ্রাপ্তির সাথে। অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্য-বিক্রয়ের বিপত্তি বৃদ্ধি পায়, আর এ ঘটনা বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিদের বাধ্য করে বহিঃস্থ বাজারের জন্যে বন্য সংগ্রামে নেমে পড়তে।

সাধারণ সংকটের এই তৃতীয় আমলে উৎপাদিকা-শক্তির বিকাশ আর বাজার সঙ্কোচনের মধ্যেকার দ্বন্দ্বটি বিশেষভাবে তীব্র হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সংকটের অবস্থাধীনে অভ্যন্তরীণ আর সাথে সাথে বহিঃস্থ দ্বন্দ্বসমূহ বৃদ্ধি পায়, পুঁজিবাদী দেশগুলিকে করে দেয় ছিন্ন ভিন্ন। এই তৃতীয় আমলটি সাথে করে নিয়ে আসে বিপর্যয়কারী সংকট এবং নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান বিপদ।

একই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার আমল থেকে পুনর্গঠনের আমলে উত্তরণ ঘটে। পুনর্গঠনের প্রথম মহান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে শুরু করে। জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন, সমাজতান্ত্রিক শিল্পের বিশাল বৃদ্ধি, যৌথ-খামার ব্যবস্থার ভিত্তিতে কৃষির মৌলিক রূপান্তর – এ সমস্ত কিছুই চিহ্নিত করছে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে বিস্তৃত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সমাজতন্ত্রের বিজয়ী অগ্রগতি। তৃতীয় আমলটি তীব্রতর করে তোলে দুই ব্যবস্থার মধ্যেকার – মুমূর্ষু পুঁজিবাদ আর দ্রুত বিকাশমান সমাজতন্ত্রের মধ্যেকার সংগ্রাম। যে অভূতপূর্ব গভীর সংকট পুঁজিবাদী দেশসমূহকে তাদের খোদ ভিত্তিমূলেই কাঁপিয়ে দিয়েছে সেই পটভূমিতে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিপুল বিকাশ সাধিত হলো তখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত নৈরাশ্যজনক অবস্থা আর সমাজতন্ত্রের সমুদয় সুবিধাবলী সবিশেষ স্পষ্টতা সহকারেই সম্মুখে উপস্থিত হয়।

আংশিক স্থিতিশীলতার বছরগুলিতে আজেবাজে বুর্জোয়া লেখকরা, পুঁজিবাদের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক অনুচরেরা সকল উপায়েই এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতকে পরিপূর্ণভাবেই নিরাময় করেছে এবং নিশ্চিত ভাবেই যুদ্ধোত্তর সংকটকে কাটিয়ে উঠেছে। তারা জোর গলায় বলতো যে, পুঁজিবাদ হলো শক্তি ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, আর তার সামনে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা দাসোচিত পন্থায় বুর্জোয়াদের সেবা করতে গিয়ে জোর দিয়েই বলতো যে, পুঁজিবাদী সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতার এক আমল উপস্থিত হয়েছে, সংগঠিত পুঁজিবাদের প্রত্যাশিত স্বর্ণযুগ সমুপস্থিত - যেখানে সংঘাত, যুদ্ধ বা সংকটের কোন ভয় নেই।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ভেতরকার সুবিধাবাদীরা বুর্জোয়াশ্রেণীর সমর্থকদের এসব প্রলাপ আরো অধিক প্রচ্ছন্নভাবে আওড়াত। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সংগঠিত পুঁজিবাদের যুক্তি-তর্ক সমূহ পুনরুল্লেখ করতো। সাধারণ সংকটের দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় আমলে উত্তরণ কালে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে, তৃতীয় আমলটা পুঁজিবাদী স্থিতিশীলতার শেষ নয়, বরং তার আরো অধিক সুরক্ষিত প্রতিষ্ঠা লাভের আমল। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা মার্কিন "অনন্য-সাধারণত্বের" [exceptionalism] তত্ত্ব উদ্ভাবন করে মার্কিন সমৃদ্ধির কল্পকাহিনীকে সমর্থন করতো এবং জোর দিয়ে বলতো যে, পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট থেকে আমেরিকা মুক্ত রয়েছে। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের মতে, পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা হলো স্থায়ী ও অটল। ট্রটস্কীপন্থীরা, বরং প্রথমতঃ চেষ্টা করেছিল দু'চারটি "বাম-পন্থী" শব্দ-সম্ভারে পুঁজিবাদী স্থিতিশীলতার আলোচনা শেষ করে এর তাৎপর্যকে অস্বীকার করতে। কিন্তু শীঘ্রই তারা পুঁজিবাদী স্থিতিশীলতার স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার যারা গুণকীর্তনকারী তাদেরই কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাল। বর্তমান বিশ্ব সংকটের আবির্ভাবকে এমনকি যখন বুর্জোয়া রাজনীতিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন তখনও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা ও ট্রটস্কীবাদীরা তা স্বীকার করতে চায়নি।

এমনকি ঐ আংশিক স্থিতিশীলতার সময়ই সোভিয়েত পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক নতুন সংকটের আবির্ভাবের অনিবার্যতা পূর্বাহ্নেই দেখতে পেয়েছিল। যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলো আধুনিক পুঁজিবাদের মধ্যে অনিবার্যভাবে বিকাশ লাভ করে, সেসবের একটা বৈপ্লবিক তথা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্লেষণের উপরই তাঁরা নিজেদের দাঁড় করিয়েছিলেন। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত পার্টির পঞ্চদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে স্তালিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, "স্থিতিশীলতা থেকেই জন্ম নিয়েছে পুঁজিবাদের বৃদ্ধিমান সংকট"। তিনি বলেছিলেন ঃ

"আগের সেই চতুর্দশ কংগ্রেসের রিপোর্টেই এটা বলা হয়েছিল যে, পুঁজিবাদ যুদ্ধ-পূর্ব পর্যায়ে ফিরে যেতে পারে, যুদ্ধ-পূর্ব পর্যায় ছাড়িয়ে যেতে পারে, তার উৎপাদন সুসংহত করতে পারে, কিন্তু তার অর্থ তথাপি এই নয় – কোন মতেই এই নয় – যে, এই কারণে পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা স্থায়ী হতে পারে, পুঁজিবাদ তার যুদ্ধ-পূর্ব কালের স্থিতিশীলতা ফিরে পেতে পারে। বিপরীত পক্ষে, পুঁজিবাদের খোদ স্থিতিশীলতা থেকে, উৎপাদন যে বাড়ছে, বাণিজ্য যে বিকাশ লাভ করছে, প্রযুক্তিগত উন্নতি ও উৎপাদন-ক্ষমতা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে – এই বাস্তব ঘটনা থেকে, অন্যদিকে, বিশ্ব বাজার, এই বাজারের সীমাবদ্ধতা এবং স্বতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলোর প্রভাবাধীন এলাকা কম-বেশী অপরিবর্তিত থাকবে – এ থেকে, বিশ্ব পুঁজিবাদের সবচেয়ে গভীর ও সবচেয়ে তীব্র সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে, নতুন মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা ভরপুর হয়ে আছে আর স্থিতিশীলতার যেকোন অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছে। আংশিক স্থিতিশীলতা থেকে উৎসারিত হয় পুঁজিবাদী সংকটের তীব্রতা, ক্রমবর্ধমান সংকট স্থিতিশীলতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে – এটাই হলো আলোচ্য ঐতিহাসিক আমলে পুঁজিবাদের বিকাশের দ্বন্দ্বতত্ত্ব।"

ঘটনাবলীর পরবর্তী বিকাশধারা স্তালিন প্রদত্ত এই মূল্য-বিচারের [estimate] চূড়ান্ত সঠিকতা প্রমাণ করেছে। ইতোমধ্যেই ১৯২৯ সালের শেষ দিকে "বিশ্ব পুঁজিবাদের সবচেয়ে গভীর ও সবচেয়ে তীব্র সংকট" শুরু হয়ে গিয়েছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর ও পুঁজিবাদের সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের সবরকমের রূপকথা, সব ধরণের সুবিধাবাদী তত্ত্বকেই এই সংকট ওলট-পালট করে দিয়েছে। সোভিয়েত পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সাধারণ সংকটের তৃতীয় আমল সম্পর্কে যে মূল্য-বিচার করেছিল বর্তমান সংকট তার পূর্ণ সঠিকতা তুলে ধরছে। বর্তমান সংকট ও তার ক্রমবিকাশ নিয়ে এসেছে পুঁজিবাদের আপেক্ষিক স্থিতিশীলতার পরিসমাপ্তির সূচনা ঃ এটাই নির্দেশ করেছিল ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরের কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের প্রস্তাব।

ফ্যাসিবাদ ও সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসী

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটজনিত পরিস্থিতিতে শ্রেণী-দ্বন্দ্বগুলি এক অসাধারণ তীব্রতা লাভ করে। নতুন পরিস্থিতিতে বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের পতন আসন্ন বুঝে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে কঠোরতম ও নিষ্ঠুরতম পদ্ধতির নিপীড়নের আশ্রয় নিয়েছে। মহাযুদ্ধ পরবর্তী খোদ প্রথম বছরগুলিতেই শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম আক্রমণকে প্রতিহত করার পর বেশ কয়েকটি দেশ বুর্জোয়াশ্রেণীর ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব কায়েম করেছে (যেমন, ইতালী, হাঙ্গেরী)। জার্মানীতে বুর্জোয়াশ্রেণী কয়েকটি অন্তবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের পরই মাত্র ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব কায়েম করেছে, যখন হিটলার সরকার ক্ষমতায় আরোহণ করে।

বুর্জোয়া একনায়কত্বের অধিকতর মুখোশাবৃত রূপ দ্বারা নিজেদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখাটা বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে ক্রমেই অধিকতর বিপত্তিজনক হয়ে উঠেছে। তাই তারা প্রকাশ্য ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের আশ্রয় নিচ্ছে। সবচেয়ে রক্তাক্ত পন্থায় তারা শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করছে। শ্রমিকশ্রেণী ও তার সংগঠনসমূহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সন্ত্রাসের পথ তারা গ্রহণ করছে। এই সবকিছুই পুঁজিবাদের অস্থায়িত্বের, ভবিষ্যৎটা কি সে সম্পর্কে বুর্জোয়াশ্রেণীর অনিশ্চয়তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

বুর্জোয়াশ্রেণীর ফ্যাসিবাদী রূপের প্রকাশ্য একনায়কত্ব হলো পুঁজিবাদের অবক্ষয় ও পতনের যুগে পুঁজিবাদের চরম বৈশিষ্ট্য। ফ্যাসিবাদ শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্য এক সুরক্ষিত দুর্গপ্রাকার সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। ফ্যাসিবাদ পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর বিপুল-ব্যাপক অংশ, কৃষক-জনতা, অফিস-কর্মচারী ও কেরাণী, ক্ষুদে ব্যবসায়ী এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে। শ্রমিকশ্রেণীর অধিকতর পশ্চাদ্‌বর্তী অংশের মধ্যে তা অনুপ্রবেশ করে। শ্রেণীচ্যুত সকল মানুষকে তা ব্যাপকভাবে সমাবেশ করে। অন্তত গোড়ার দিকে পুঁজিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের মুখোশ পরে পুঁজিবাদকে রক্ষার জন্যে তা উন্মত্ত প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর সম্পত্তিচ্যুত কিন্তু রাজনৈতিকভাবে পশ্চাদ্‌পদ অংশগুলি থেকে সমর্থক পাওয়ার জন্য পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ধোঁয়াটে বাগাড়ম্বরকে ফ্যাসিবাদ তার টোপ হিসাবে ব্যবহার করে।

"ফ্যাসিবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী অগ্রগামী বাহিনীকে অর্থাৎ, কমিউনিস্ট অংশ ও সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বদানকারী ইউনিটগুলিকে ধ্বংস করা। বৈদেশিক রাজনীতির পরিমণ্ডলে চরম সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের সাথে মিলিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক বাগাড়ম্বর, দুর্নীতি ও সক্রিয় শ্বেত সন্ত্রাসের সম্মিলন হলো ফ্যাসিবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বুর্জোয়াশ্রেণীর তীব্র সংকট কালে ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদ-বিরোধী বুলি কপচায়, কিন্তু, রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার পর ঐ পুঁজিবাদ-বিরোধী শোরগোল সে ছেড়ে দেয় এবং নিজেকে বৃহৎ পুঁজির সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্ব রূপে প্রকাশ করে।" [কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মসূচী, পৃঃ ১৯]

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটজনিত পরিস্থিতিতে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসি তাদের বিশ্বাসঘাতকতার শেষ সীমায় পৌঁছায়। এমনকি (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের আগেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলির ভেতরে সুবিধাবাদী অধঃপতনের শিকড় গভীরভাবেই অনুপ্রবেশ করেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতি আন্তর্জাতিক সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসির পরিপূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতাকে বিশ্বযুদ্ধ সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে দিয়েছে। প্রতিটি দেশের সামাজিক-দেশপ্রেমিকরা এবং সামাজিক-জাত্যাভিমানীরা (Social Patriots & Social-chauvinists) "তাদের নিজ পিতৃভূমির" বুর্জোয়াদেরকেই তাদের পররাজ্য গ্রাসের কর্মনীতির ক্ষেত্রে সমর্থন করেছিল। মহাযুদ্ধের পর, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসিই ছিল সেই শক্তি যারা শ্রমিক-অভ্যুত্থানগুলিকে দমন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ও নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছিল। সকল দেশেই সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা তাদের 'নিজেদের' পুঁজিবাদকে রক্ষা করেছিল, এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী অগ্রগামী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হীনতম কোন উপায় গ্রহণেও কুণ্ঠিত হয়নি। এইরূপ পরিস্থিতিতে বুর্জোয়াশ্রেণী অব্যাহভাবেই ফ্যাসিবাদী পদ্ধতির একনায়কত্বের আশ্রয় গ্রহণ করছে। ফ্যাসিবাদীদের মতোই, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের নিকটও সবচেয়ে বড় শত্রু হলো বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণী। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা যখন ক্ষমতায় বসে তখন সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় ফ্যাসিস্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পদ্ধতিগুলিই গ্রহণ করে থাকে। একই সময়ে, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসি ফ্যাসিস্তদের ক্ষমতায় আরোহণের পথকেও সুগম করে দেয়। জার্মানীতে এ ঘটনা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখা গেছে।

"বর্তমান সময়ে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসির প্রধান কাজ হলো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে

সর্বহারাশ্রেণীর নিতান্ত আবশ্যকীয় ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। পুঁজির বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণীর সংগ্রামের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টকে বিভক্ত ও বিনষ্ট করে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের অবলম্বন হিসাবে কাজ করে।" [ঐ, পৃঃ ১৮]

দেউলিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বাঁচানোর উৎকণ্ঠায় বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের পদ্ধতি একের পর এক বদলাতে থাকে। এই এখন সে প্রকাশ্য ফ্যাসিস্ত একনায়কত্ব দ্বারা শাসন চালায়, আবার এই তখন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসিকে সমর্থন করা পছন্দ করে, যে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসির রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীকে ঠকানোর ও তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার মতো বিপুল অভিজ্ঞতা।

"ফ্যাসিবাদ হলো বুর্জোয়াশ্রেণীর জঙ্গী সংগঠন, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসির সক্রিয় সমর্থনের উপর তা নির্ভর করে। বস্তুগতভাবে, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসি হলো ফ্যাসিবাদের এক নমনীয় শাখা। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসির সক্রিয় সমর্থন ছাড়া বুর্জোয়াশ্রেণীর জঙ্গী সংগঠন লড়াইয়ে কিংবা দেশ শাসনে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে পারে – একথা মনে করার কোন ভিত্তি নেই। বুর্জোয়াশ্রেণীর জঙ্গী সংগঠনের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া লড়াইয়ে কিংবা দেশ শাসনে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসি চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে পারে – একথা মনে করারও তেমনি কোন ভিত্তি নেই। এই দুটি সংগঠন পরস্পরের বিরোধী নয়, বরং এরা হলো পরস্পরের পরিপূরক। এরা বিপরীত মেরুর বাসিন্দা নয়, এরা হলো যমজ।" [স্তালিন, "আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে", পৃঃ ৬-৭, রুশ সংস্করণ]

নিরীক্ষামূলক প্রশ্নাবলী

১। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের (প্রথম) কারণগুলি কি ছিল ?
২। বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম) কি ধ্বংস সাধন করেছিল ?
৩। বিশ্বযুদ্ধ থেকে কোন্ দেশ বেশী ফায়দা হাসিল করেছিল ?
৪। যুদ্ধের ফলে শক্তিসমূহের মধ্যেকার শক্তি-সম্পর্কের পরিবর্তন কিভাবে ঘটেছিল ?
৫। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট কি ?
৬। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের প্রথম আমলের বৈশিষ্ট্য কি ?
৭। পুঁজিবাদের স্থিতিশীলতা কেন সাময়িক, আংশিক ও নড়বড়ে হয়েছিল ?
৮। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের তৃতীয় আমলটির পার্থক্য-সূচক বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ?
৯। ফ্যাসিবাদ ও সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাসির ভূমিকাগুলি কি ?

একাদশ অধ্যায়

পুঁজিবাদের সমসাময়িক বিশ্ব সংকট

পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের মধ্যেই অর্থনৈতিক সংকট

বর্তমান যে সংকট পুঁজিবাদী বিশ্বকে বেশ কয়েক বছর ধরে কাঁপিয়ে তুলেছে তার বৈশিষ্ট্য হলো এর অভূতপূর্ব প্রচণ্ডতা।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সাথে সাথেই পুঁজিবাদের যে সাধারণ সংকট দেখা দেয় বর্তমান সংকটটি তার মধ্যেই বিকাশ লাভ করেছে। পুঁজিবাদের অবক্ষয় ও পতনের যুগেই, যুদ্ধ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগেই তা দেখা দিয়েছে।

বর্তমান সংকটকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি পূর্বের সকল পুঁজিবাদী সংকট থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পাশাপাশি এখন এমন একটি দেশ রয়েছে যেখানে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা হচ্ছে এবং তা বিজয় অর্জন করছে – সে দেশটি হলো সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সমূহের ইউনিয়ন। বিশ্ব বর্তমানে এগিয়ে চলেছে একদিকে মুমূর্ষু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর অন্যদিকে বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা –**এই দুই ব্যবস্থার মধ্যেকার সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে**। প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন একটা সংকট যখন পুঁজিবাদী দেশসমূহকে কাঁপিয়ে তুলেছে, ঠিক তখনই সোভিয়েত ইউনিয়নে ঘটে চলছে বিপুল মাত্রায় এক নির্মাণকর্ম এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমগ্রভাবে এক অসাধারণ উত্থান। দুই ব্যবস্থার মধ্যেকার সংগ্রাম পুঁজিবাদের সংকটকে তীক্ষ্ণভাবেই তীব্র করে তুলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্ব নিয়তই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনিবার্য ধ্বংসের কথা ; সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয়গর্বিত বিনির্মাণ-কর্ম পুঁজিবাদী দেশসমূহের বঞ্চিত ও পদানত শ্রমজীবী-জনতাকে দাসত্ব ও নিপীড়ন, দারিদ্র্য ও ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি অর্জনের একমাত্র পথটিই প্রদর্শন করছে।

"প্রথমতঃ, এর অর্থ হলো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও তার পরিণাম পুঁজিবাদের অবক্ষয়কে তীব্রতর করেছে এবং তার ভারসাম্য ধ্বংস করে দিয়েছে; আমরা এখন বাস করছি যুদ্ধ ও বিপ্লবের যুগে। পুঁজিবাদ আজ আর বিশ্ব অর্থনীতির একক ও সর্বব্যাপী ব্যবস্থা নয়, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি এখন বিরাজ করছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা বিকশিত হচ্ছে, সমৃদ্ধি অর্জন করছে, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করছে, আর কেবল নিজের অস্তিত্বের দ্বারাই যা পুঁজিবাদের পচনশীলতা সপ্রমাণ করছে এবং তার ভিত্তিমূলকে কাঁপিয়ে তুলছে।" [স্তালিন, "ষষ্ঠদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট", লেনিনবাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৮]

১৯২৯ সালের শরৎকালে দুটি বিপরীত স্থানে প্রায় যুগপৎভাবেই বিশ্ব সংকট শুরু হয় ঃ পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপের পশ্চাদ্‌পদ দেশগুলিতে (পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া) আর সমসাময়িক পুঁজিবাদের সর্বাগ্রগণ্য ও সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই কেন্দ্রগুলি থেকেই সংকটটা সারা পুঁজিবাদী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

এই সংকট সর্বাধিক শক্তি নিয়ে আঘাত হেনেছে আধুনিক পুঁজিবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সর্বাগ্রগণ্য দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই। কয়েক বছর ধরে বুর্জোয়াশ্রেণীর সকল পদলেহীরা, সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক শিবিরের সকল জ্ঞানপাপী ভাড়াটে ও মোসাহেবরা মার্কিন 'সমৃদ্ধি'র কত গুণগানই না করেছে এবং জগৎকে ভরসা দিয়েছে যে, এই সমৃদ্ধির

নাকি শেষ নেই, কোন সীমা নেই। সংকট কিন্তু এইসব বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুক্তিগুলিকে ক্ষমাহীনভাবেই উদ্ঘাটিত করলো ও খণ্ডন করে দিলো।

বর্তমান সংকট দেখা দিল যুদ্ধোত্তর প্রথম **বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সংকট** রূপে। বিভিন্ন দেশে এর বিকাশ ঘটেছে **অসমভাবে** ঃ সংকটের অভিজ্ঞতা কোন কোন দেশ লাভ করলো তাড়াতাড়ি, কোন কোন দেশ বিলম্বে। সংকট বিভিন্ন দেশকে আঘাত হানলো বিভিন্ন মাত্রার শক্তিতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, গোটা পুঁজিবাদী বিশ্বকেই তা গ্রাস করলো এবং একটি একক পুঁজিবাদী দেশও তার হাত থেকে নিস্তার পেল না। বিভিন্ন দেশকে যত অসমভাবেই প্রভাবিত করুক না কেন, বর্তমান সংকট কিন্তু সকল পুঁজিবাদী দেশকেই তার লৌহ-কঠিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেছে।

পূর্ববর্তী যুগগুলিতে, পুঁজিবাদের অবক্ষয় শুরু হওয়ার পূর্বে, পুঁজিবাদী দেশসমূহে সংকট দেখা দিত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-আমল ব্যাপী সমৃদ্ধির পর এবং জাতীয় অর্থনীতির উত্থান ও বৃদ্ধির পর। এই দিক দিয়ে, বর্তমান সংকট পূর্বেকার সকল "স্বাভাবিক" সংকট থেকে মৌলিকভাবেই ভিন্ন। বর্তমান সংকটের আগে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের কেবল সাময়িক স্ফূরণ মাত্র দেখা যায়।

এইসব "হঠাৎ-সমৃদ্ধি" [booms] বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে দেখা দিয়েছিল এবং তা ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। জার্মানীতে ১৯২৭ সালটা ছিল পুনরুজ্জীবনের বৎসর। কিন্তু ১৯২৮ সালেই দেখা দেয় অবনতি। পোল্যাণ্ডে ১৯২৭-২৮ সালে, আর জাপানে ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালের শুরুতে, কিছুটা পুনরুজ্জীবন দেখা দিয়েছিল। অন্যদিকে ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও ব্রাজিলের মতো দেশে সংকটের পূর্বে আদৌ কোন পুনরুজ্জীবন দেখা দেয়নি। এইসব দেশের অর্থনীতিতে সংকট-পূর্ব কালীন আমলটা ছিল বিরাট অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্বের আমল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পুঁজিবাদী বিশ্বের অবস্থাটা বর্ণনা করতে গিয়ে কমরেড স্তালিন বলেছেন ঃ

"**অর্থনৈতিক** ক্ষেত্রে এই বৎসরগুলি ছিল অব্যাহত বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের বছর। সংকট কেবল শিল্পকেই নয়, বরং সামগ্রিকভাবে কৃষিকেও আক্রমণ করেছে। সংকট যে কেবল উৎপাদন ও ব্যবসার ক্ষেত্রেই প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে, তা নয়, বরং ঋণ ও মুদ্রা-সঞ্চলনের ক্ষেত্রেও তা দ্রুত বেগে প্রবেশ করেছে, এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার প্রচলিত ঋণ ও মুদ্রাগত সম্পর্ককেও উলট-পালট করে দিয়েছে।

"বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সংকট আছে কি না, তা নিয়ে পূর্বে এখানে-সেখানে বিতর্ক শোনা যেত, কিন্তু এ নিয়ে কেউ আর এখন তর্ক করে না, কারণ সংকটের অস্তিত্ব এবং তার ধ্বংসাত্মক প্রভাব অতিমাত্রায় সুস্পষ্ট। এখন বিতর্ক চলে অন্য প্রশ্নকে কেন্দ্র করে, যেমন সংকট থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় আছে কিনা ? আর উপায় যদি থেকেই থাকে, তাহলে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে কোথায় ?" [স্তালিন, "সোভিয়েত পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত সি-পি-এস-ইউ কেন্দ্রীয় কমিটির কাজকর্মের উপর রিপোর্ট", ২৬ জানুয়ারী, ১৯৩৪, দেখুন "লেনিনবাদের সমস্যা", পিকিং, ১৯৭৬, পৃঃ ৬৭১]

অতি-উৎপাদনের সংকট

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে সকল সংকটের মতোই, সমসাময়িক সংকটটাও হলো অতি-উৎপাদনের সংকট। বাজারে যে পরিমাণ পণ্যের কাটতি হতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশী পণ্য উৎপাদিত হয়েছে।

"এর অর্থ হলো এই যে, প্রধান ভোগ-ব্যবহারকারীরা – ব্যাপক জনগণ – যাদের আয় রয়েছে নিম্ন স্তরে – তারা নগদ দামে যা কিনতে পারে তার চেয়ে বেশী পরিমাণে কাপড়-চোপড়, জ্বালানী, তৈরী জিনিসপত্র, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদিত হয়েছে। আর পুঁজিবাদী অবস্থাধীনে ব্যাপক জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা যেহেতু নিম্নতম সম্ভব স্তরে থাকে, সেহেতু উচ্চ দর বজায় রাখার জন্য পুঁজিপতিরা 'উদ্বৃত্ত' পণ্য-সামগ্রী, কাপড়-চোপড় শস্য ইত্যাদি গুদামে ফেলে রাখে, কিংবা এমনকি বিনষ্ট পর্যন্ত করে ফেলে। তারা উৎপাদন কমিয়ে দেয়, শ্রমিকদের বরখাস্ত করে, আর ব্যাপক জনগণকে নিঃস্বতা ভোগ করতে বাধ্য করা হয়, কারণ অতি মাত্রায় পণ্য-সামগ্রী উৎপাদিত হয়ে গিয়েছে।" [স্তালিন, "ষষ্ঠদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রাজনৈতিক রিপোর্ট", **লেনিনবাদ**, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৮]

অতি-উৎপাদনের সংকটের অর্থ হলো বিক্রির কমতি, বাজারের সঙ্কোচন, কল-কারখানা ও ফ্যাক্টরীর বন্ধ হয়ে যাওয়া, উৎপাদনের হ্রাসকরণ। বিপুল পরিমাণ পণ্য-সামগ্রী **বিক্রি হতে পারে না**। এর ফলে সব ধরণের **মজুতের পুঞ্জীভবন** ঘটে। বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল, শিল্পজাত দ্রব্য ও কৃষিজাত সামগ্রীর সঞ্চয় জমে ওঠতে থাকে। এসব সঞ্চয় বাজারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। দাম বজায় রাখার জন্য এসব সঞ্চিত সামগ্রীর একটা বড় অংশ পুঁজিপতিরা বিনষ্ট করে দেয়। এই উদ্দেশ্যেও, উৎপাদন হ্রাস করা হয়। এসব ব্যবস্থাবলীর দ্বারা স্বল্প সময়ের জন্য পুঁজিপতিরা কোন কোন পণ্যের দর অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে বজায় রাখতে পারে, কিন্তু যেসব ব্যবস্থাবলী তারা গ্রহণ করে তার চেয়ে সংকটের শক্তিটাই অধিকতর প্রবল বলে প্রমাণিত হয়। বিক্রির হ্রাসপ্রাপ্তি, বাজারের সঙ্কোচন, পণ্যের মজুত সঞ্চয় অনিবার্যরূপে দরের ক্ষেত্রে অবনতি ঘটায়। সমসাময়িক একচেটে পুঁজিবাদের ব্যবস্থাধীনে, অধিক শক্তিশালী একচেটে কর্পোরেশনগুলি নিজেদের পণ্যের উচ্চ দর বজায় রাখার জন্য তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এই কারণে, দামের পড়তির ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতার বিরাট ঘাটতি দেখা দেয়। অধিক শক্তিশালী ট্রাস্ট ও কার্টেলগুলি যখন একদিকে তাদের পণ্যের বেশ পরিমাণে উচ্চ দাম বজায় রাখে, তখন অন্যদিকে অন্য সমস্ত পণ্য-সামগ্রীর দাম দ্রুত পড়তে থাকে।

বিক্রির কমতি, মজুত সঞ্চয় আর দামের পড়তির ফলে **উৎপাদন হ্রাস** পায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবনতি বেশ কয়েকটি গুরুতর ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে। **বেকার বাহিনী** ভয়াবহ রূপে বেড়ে যায়। শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপাদন **ক্ষমতার ক্রমান্বয় আংশিক ব্যবহার** ঘটতে থাকে। ফলস্বরূপ উৎপাদনের খরচ বাড়তে থাকে, অন্যদিকে পণ্যের বিক্রির দামও পড়তে থাকে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির অধিকতর দুর্বল যোগসূত্রগুলো হঠাৎ করেই ছিন্ন হয়ে যায়। দেউলিয়াত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। **ঋণ, দাম ও আর্থিক ব্যবস্থার** ক্ষেত্রে সংকট শুরু হয়।

পুঁজিপতিরা কোটি কোটি শ্রমিককে রাস্তায় নিক্ষেপ করে। বেকাররা বেঁচে থাকার সমস্ত উপায়-অবলম্বন থেকে বঞ্চিত হয়, কিংবা খুব বেশী হলে নিতান্ত ভিক্ষুকের মতো খয়রাতি পায়। কাজে যারা নিযুক্ত থাকে তারা মজুরী পায় অনেক কম। শ্রমিকদের রোজগার ক্রমাগতই কমতে থাকে। কিন্তু এর ফলে ব্যাপক শ্রমিকদের ক্রয়-ক্ষমতাই আরো অধিক কমে যায়। একই সময়ে কৃষি-সংকট কৃষিজীবী জনগণের আয় কমিয়ে দেয়। কৃষক জনতা সর্বস্বান্ত হয়।

অভ্যন্তরীণ বাজারের সঙ্কোচন পুঁজিপতিদের বাধ্য করে **বৈদেশিক বাজারের** জন্য উন্মত্ত সংগ্রাম পরিচালনা করতে। কিন্তু বিদেশী বাজার বলতে বোঝায় হয় অন্যান্য শিল্প-প্রধান পুঁজিবাদী দেশ, না-হয় ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক কৃষি-প্রধান দেশ। প্রত্যেক শিল্প-প্রধান দেশের বুর্জোয়ারাই বিদেশী প্রতিযোগীদের অনধিকার অনুপ্রবেশ থেকে

নিজেদের বাজার রক্ষার চেষ্টা চালায়। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে, উচ্চ শুল্ক, কতকগুলি নির্দিষ্ট পণ্যের আমদানীর ওপর সরাসরি বিধি-নিষেধ ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়, আর কৃষি-সংকটের সর্বনাশা পরিণাম ও ঔপনিবেশিক নিপীড়ন ও শোষণের কারণে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক কৃষি-প্রধান দেশগুলির বাজারগুলি দারুণভাবে সঙ্কোচিত হয় ও ধ্বংস হয়ে যায়। এসব কিছুর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভয়াবহ অবনতি ঘটে, বাজারের জন্যে সংগ্রাম চূড়ান্তভাবেই তীব্র হয়ে ওঠে, পুঁজিবাদী বিশ্বে **দ্বন্দ্বসমূহের বিপুল বৃদ্ধি ঘটে।**

সকল সংকটের মধ্যে সবচেয়ে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী সংকট

পুঁজিবাদের ইতিহাসে অনেক সংকটেরই দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু এমন গভীর ও তীব্র সংকট আর কখনও দেখা যায়নি। মাত্রায়, শক্তিতে ও দীর্ঘস্থায়িত্বের দিক থেকে, পুঁজিবাদী অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে যেভাবে তা প্রভাব বিস্তার করেছে তার ব্যাপকতার দিক থেকে, বর্তমান সংকট পূর্বেকার সকল সংকটকে ছাড়িয়ে গেছে।

"পুঁজিবাদী দেশসমূহের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট অনুরূপ সকল সংকট থেকে, অন্যান্য বিষয়ের কথা বাদ দিলেও, এই বাস্তব ঘটনা দ্বারা পার্থক্যপূর্ণ যে, এটা হলো সবচেয়ে দীর্ঘ ও সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়িত্বপূর্ণ সংকট। আগে, সংকট এক বা দুই বছর স্থায়ী হতো, কিন্তু বর্তমান সংকট এখন পঞ্চম বছরে পড়েছে, এবং প্রতি বছর পুঁজিবাদী দেশসমূহের অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করেছে ও পূর্বেকার বছরগুলিতে এর সঞ্চিত সম্পদ নিঃশেষ করে দিয়েছে। এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এই সংকট হলো সকল সংকটের মধ্যে তীব্রতম।" [স্তালিন, "সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট", পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭৩]

সকল মৌলিক সূচক সংখ্যাগুলিই হলো এর প্রমাণ এবং তা এই সংকটের গভীরতা ও তীব্রতাকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছে। উৎপাদনের অবনতি, বেকারত্বের মাত্রা ও মজুরী হ্রাস, পণ্যের দামের ক্ষেত্রে পড়তি, বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতি, শেয়ার বাজার দরের অবনতি, ইত্যাদি প্রদর্শনকারী মৌলিক সূচক সংখ্যাগুলি অনুসারে, বর্তমান সংকট পুঁজিবাদের ইতিহাসে সংঘটিত আগেকার সমস্ত সংকটকেই বহু দূর ছাড়িয়ে গেছে।

নিম্নোক্ত সারণী আগেকার সংকটগুলির তুলনায় বর্তমান সংকটের সূচক সংখ্যাগুলির শতকরা হারে অবনতির হিসাব তুলে ধরছে ঃ

সংকটের বছর	লৌহ পিণ্ডের বিশ্ব উৎপাদন	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইমারত নির্মাণ শিল্প	বিশ্ব বৈদেশিক বাণিজ্য	শেয়ার বাজারের দর		বিশ্ব বাজারে পণ্যের দামের হ্রাস
				যুক্তরাষ্ট্র	ফ্রান্স	
১৮৭৩-৭৪	৮.৯	–	৫	৩০	–	২০২
১৮৮৬-৮৫	১৯.০	–	৪২৯	–	২০.৪	
১৮৮০-৯২	৬.৫	–	১	–	২১	–
১৯০৭-০৮	২৩.০	২০.০	৭	৩৭	৫	০.৮
১৯২০-২১	৪৩.৫	১১.০	–	৪১	২৫	২১.০
১৯২৯-৩২	৬৬.৮	৮৫.২	৬০	৭৫	৫০	৪৭.০

বর্তমান সংকটকালে উৎপাদনের অধোগমন এমন মাত্রায় পৌঁচেছে যে পুঁজিবাদের অস্তিত্বের শুরু থেকে সংকটের ইতিহাসে এর জুড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না। আগেকার সংকটগুলিতে শতকরা ১০-১৫ ভাগ উৎপাদন হ্রাসকেই ভীষণ বলে মনে করা হতো। আর, বর্তমান সংকট কালে সমগ্রভাবে পুঁজিবাদী বিশ্বে উৎপাদনের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটেছে বিপুল পরিমাণে – এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-পঞ্চমাংশে ; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দেশে উৎপাদন প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে এইরূপ নজিরবিহীন অধোগতি পুঁজিবাদী দেশসমূহকে বেশ পরিমাণে পেছনে ঠেলে দেয়।

পুঁজিবাদী দেশসমূহের শিল্পের স্বতন্ত্র শাখাগুলির সংখ্যা-তত্ত্বগুলি এক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৩২ সালে সংকট যখন চরম বিন্দুতে পৌঁছায় তখনকার সমপরিমাণ উৎপাদন অতীতে যেসব বছরগুলিতে হয়েছিল তার হিসাব নিম্নের সারণী তুলে ধরেছে।

দেশ	কয়লা	লৌহপিণ্ড	ইস্পাত	তুলার ব্যবহার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৯০৬	১৮১৮	১৯০৫	১৮৯৩
ইংল্যান্ড	১৯০০	১৮৬০	১৮৯৭	১৮৭২
জার্মানী	১৮৯৯	১৮৯১	১৮৯৫	১৮৮৯

এভাবে পুঁজিবাদী দেশসমূহের মৌলিক শিল্পগুলি পঁচিশ থেকে চল্লিশ বছর আগের অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

উৎপাদনের এই নজিরবিহীন অবনতিটি পর্বতপ্রমাণ বেকারত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বেকারত্বের ব্যাপ্তির দিক থেকে বর্তমান সংকট পূর্বেকার সকল সংকটকেই বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে। এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, ১৯২১ সালের সংকটকালে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১ কোটি, আর বেকারত্ব এমন মাত্রায় পৌঁচেছিল যে তখন এটাকে মনে করা হতো সুবিশাল ; সেখানে বর্তমানে সংকটকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুঁজিবাদী দেশসমূহে বেকারের সংখ্যা হলো ৪ থেকে ৫ কোটি।

সংকটের এরূপ ক্লান্তিকর ও দীর্ঘস্থায়ী চরিত্র, এর অসাধারণ ব্যাপকতা ও তীব্রতার কারণগুলি কি ? সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে কমরেড স্তালিন এসব কারণকে নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

"প্রথমতঃ, এই বাস্তব ঘটনার দ্বারা এর ব্যাখ্যা করতে হবে যে, ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশকেই শিল্প-সংকট প্রভাবিত করেছিল এবং কয়েকটি দেশের পক্ষে অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আত্মরক্ষার চেষ্টা কঠিন করে তুলেছিল।

"দ্বিতীয়তঃ, এই বাস্তব ঘটনার দ্বারা এর ব্যাখ্যা করতে হবে যে, শিল্প-সংকট বিজড়িত হয়ে পড়েছে কৃষি-সংকটের সাথে যা ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল কৃষি-প্রধান ও আধা কৃষি-প্রধান দেশগুলিকে প্রভাবিত করেছে এবং তা শিল্প-সংকটকে আরো জটিল ও আরো গভীর না করে পারেনি।

"তৃতীয়তঃ, এই বাস্তব ঘটনার দ্বারা এর ব্যাখ্যা করতে হবে যে, এই সময়ে কৃষি-সংকট আরো তীব্র হয়েছে এবং পশু পালন সমেত কৃষির সমস্ত শাখাকে প্রভাবিত করেছে ; তা নিয়ে এসেছে কৃষির ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌গতি, যান্ত্রিক শ্রম থেকে কায়িক শ্রম, ট্রাক্টরের স্থলে ঘোড়ার ব্যবহার, কৃত্রিম সারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অবনতি, আর কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলির ব্যবহার পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ, যার সবগুলিই শিল্প-সংকটের আরো অধিক দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণ হয়ে ওঠে।

"চতুর্থতঃ, এই বাস্তব ঘটনা দ্বারা এর ব্যাখ্যা করতে হবে যে, যে-একচেটেবাদী কার্টেলগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করে সেই কার্টেলগুলি চেষ্টা করে পণ্যের উচ্চ দাম বজায় রাখতে, এবং এই

পরিস্থিতিটি সংকটকে বিশেষভাবে কষ্টকর করে তোলে এবং মজুত পণ্যের কাটতিকে বাধা দান করে।

"সর্বশেষে, আর এটাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই বাস্তব ঘটনার দ্বারা এর ব্যাখ্যা করতে হবে যে, শিল্প-সংকটটি দেখা দিয়েছে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের অবস্থাধীনেই, যখন বিশ্বযুদ্ধ ও অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে পুঁজিবাদের যে শক্তি ও স্থিতিশীলতা ছিল, এখন নিজ আবাসভূমিতেই হোক আর ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতেই হোক কোথাও সেই শক্তি ও স্থিতিশীলতা পুঁজিবাদের আর নেই বা থাকতে পারে না ; যখন পুঁজিবাদী দেশগুলির শিল্প সমূহ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করেছে কল-কারখানার উৎপাদন-ক্ষমতার লাগাতার স্বল্প-ব্যবহার এবং লক্ষ লক্ষ লোকের বেকার বাহিনী, যা থেকে নিষ্কৃতি পেতে সে আর সক্ষম নয়।

"এই হলো পরিস্থিতি যা বর্তমান শিল্প-সংকটের চরম দীর্ঘস্থায়ী চরিত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছে।" [সপ্তদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট, "লেনিনবাদের সমস্যাবলী", ইং সং, পিকিং, ১৯৭৬, পৃঃ ৬৭৩-৭৪]

উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবনতি

অতি-উৎপাদনের সংকটের ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রেই উৎপাদনের বিপুলায়তন অবনতি ঘটে। ১৯২৯ সালের শরৎকাল থেকেই পুঁজিবাদী দেশসমূহে উৎপাদনের ক্ষেত্রে, আজ পর্যন্ত নজীরবিহীন, **নিশ্চলতা ও সঙ্কোচন** ঘটে চলেছে।

যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতি বছর উৎপাদনের বিশেষ বৃদ্ধি ঘটছে, তখন সংকটের লৌহকঠিন সাঁড়াশিতে আটকে পড়ে পুঁজিবাদী বিশ্ব নজিরবিহীন মাত্রায় উৎপাদন সঙ্কোচন ঘটাচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পুঁজিবাদী দেশসমূহে উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কিত প্রবণতা প্রদর্শনকারী একটি সারণী দেয়া হলো, যা সরকারী তথ্যের ভিত্তিতেই নেয়া হয়েছে [সপ্তদশ পার্টি-কংগ্রেসে কমরেড স্তালিন কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টে উল্লেখিত] ঃ

শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ
(১৯২৯ সালের শতকরা হার)

	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
সোভিয়েত ইউনিয়ন	১০০	১২৯·৭	১৬১·৯	১৮৪·৭	২০১·৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১০০	৮০·৭	৬৮·১	৫৩·৮	৬৪·৯
ইংল্যান্ড	১০০	৯২·৪	৮৩·৮	৮৩·৮	৮৬·১
জার্মানী	১০০	৮৮·৩	৭১·৭	৫৯·৮	৬৬·৮
ফ্রান্স	১০০	১০০·৭	৮৯·২	৬৯·১	৭৭·৪

সারণীটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

প্রথমতঃ, এটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, সবচেয়ে বড় পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শিল্প -উৎপাদনের অসাধারণ হ্রাস ঘটেছে, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্প-উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশী হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, এটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, পুঁজিবাদী দেশসমূহে শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রে হ্রাসপ্রাপ্তি সবচেয়ে নিম্ন স্তরে পৌঁছেছিল ১৯৩২ সালে, যখন উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল পুরো এক-তৃতীয়াংশে। কেবল ১৯৩৩ সালেই পুঁজিবাদী দেশসমূহের শিল্পগুলো

কোমর তুলো দাঁড়াতে শুরু করে ; কিন্তু ১৯৩৩ সালেও উৎপাদন ছিল ১৯২৯ সালের সংকট-পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় এক-চতুর্থাংশ কম।

তৃতীয়তঃ, এটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে, সংকট সকল দেশকে সমান শক্তি নিয়ে আঘাত হানেনি এবং বিভিন্ন দেশে এর ফলাফল অনেক পার্থক্যপূর্ণ ছিল।

অবশ্য, এটা মনে রাখা উচিৎ যে, সংকটের সূচনাকালে বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতিও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। উপরের সারণী থেকে এটা মনে হতে পারে যে, ইংল্যাণ্ডই ছিল সবচেয়ে অনুকূল অবস্থানে। কিন্তু আসলে তা নয়। এসব দেশের বিশ্বযুদ্ধপূর্বকালীন স্তরের সাথে তাদের বর্তমান স্তরকে যদি আমরা তুলনা করি, তাহলে বিষয়টা খুবই স্পষ্ট হয়ে যাবে। নীচে সে ছকটি দেয়া হলো ঃ

শিল্প-উৎপাদনের পরিমাণ
(যুদ্ধ-পূর্ব যুগের শতকরা হার)

	১৯১৩	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
সোভিয়েত ইউনিয়ন	১০০	১৯৪·৩	২৫২·১	৩১৪·৭	৩৫৯·০	৩৯১·৯
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১০০	১৭০·২	১৩৭·৩	১১৫·৯	৯১·৪	১১০·২
ইংল্যাণ্ড	১০০	৯৯·১	৯১·৫	৮৩·০	৮২·৫	৮৫·২
জার্মানী	১০০	১১৩·০	৯৯·৮	৮১·০	৬৭·৬	৭৫·৪
ফ্রান্স	১০০	১৩৯·০	১৪০·০	১২৪·০	৯৬·১	১০৭·৬

এই সারণী থেকে এটা পরিষ্কার যে, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর শিল্প তাদের যুদ্ধ-পূর্বকালীন স্তরের নীচে রয়েছে। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প ১৯২৯ সালে তার যুদ্ধ-পূর্বকালীন উৎপাদনের তুলনায় শতকরা ১৭০ ভাগে পৌঁচেছিল তা এখন সেই স্তরের তুলনায় মাত্র শতকরা ১১০ ভাগ উৎপাদন করছে। একই সময়ে জারতান্ত্রিক রাশিয়ার শিল্পের যুদ্ধ-পূর্বকালীন উৎপাদনের তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পগুলি বাস্তবতঃ চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পুঁজিবাদী দেশসমূহে উৎপাদনের বিপর্যয়কর অবনতি উৎপাদিকা-শক্তির নজিরবিহীন অপচয়ের স্বাক্ষর বহন করছে।

শ্রমজীবী জনগণের রক্ত আর ঘামে সৃষ্ট উৎপাদন-যন্ত্রগুলো খুবই সামান্য পরিমাণে কাজে লাগানো হচ্ছে। ধাতব পদার্থাদি গলাবার চুল্লী [blast furnaces], খোলা চুল্লী [open hearth], খনি, যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা, বস্ত্র-কারখানা ইত্যাদির এক বিরাট অংশ কাজে লাগানো হচ্ছে না। প্রকৌশল বিদ্যার সর্বশেষ কোন পদ্ধতিতে সজ্জিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বেকার পড়ে থাকছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োজিত বিপুল পরিমাণ উপকরণাদির অপচয় ঘটছে ; ব্যবহার বা তদারকের অভাবে কল-কারখানার যন্ত্রপাতিগুলো ভেঙে পড়েছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উৎপাদন-ক্ষমতার আংশিক মাত্র কাজে লাগছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন-ক্ষমতার সবিশেষ স্বল্প-ব্যবহার হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সংকটের সবচেয়ে সুস্পষ্ট লক্ষণগুলোর অন্যতম।

উদাহরণ স্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কল-কারখানাগুলোর উৎপাদন-ক্ষমতার দীর্ঘস্থায়ী স্বল্প-ব্যবহার এই বাস্তব ঘটনার মধ্যে অভিব্যক্ত হয় যে, ১৯২৯ সালে সংকটের সূচনার আগ পর্যন্ত কয়লা খনিগুলো তাদের উৎপাদন-ক্ষমতার শতকরা ৬৮ ভাগ, তৈল-কূপগুলি শতকরা ৬৭ ভাগ, তৈল পরিশোধনাগারগুলি শতকরা ৭৬ ভাগ, লৌহ নিষ্কাশন কারখানাগুলি শতকরা ৬০-৮০ ভাগ, মোটরগাড়ীর কারখানাগুলি শতকরা ৫০ ভাগের কম, যন্ত্রপাতি তৈরীর

কারখানাগুলি শতকরা ৫৫ ভাগ, বস্ত্র-কলগুলি শতকরা ৭২ ভাগ, আর শিল্পের কোন কোন শাখায় এর চেয়েও কম – যেমন, ছাপাখানার সরঞ্জাম শিল্প শতকরা ৫০ ভাগ, ময়দা কল শিল্প শতকরা ৪০ ভাগ, এবং পশমী বস্ত্র কলগুলো শতকরা ৩৬ ভাগ কাজে লাগাত। সুতরাং, সংকটের আগেও, মৌলিক শিল্পগুলি তাদের বিপুল উৎপাদন-ক্ষমতাকে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করতে পারতো না। সংকট আর উৎপাদনের ক্ষেত্রে হ্রাস ঘটার ফলেই শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্য-ক্ষমতার স্বল্প-ব্যবহারটা বিপুলভাবে বেড়ে যায়।

১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইস্পাত কারখানাগুলোর সরঞ্জামের শতকরা মাত্র ১৩ ভাগ এবং মোটরগাড়ী তৈরীর কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির শতকরা মাত্র ১১ ভাগ চালু ছিল। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে জার্মানীর গোটা শিল্পে উৎপাদন-ক্ষমতার শতকরা ৩৬ ভাগ ব্যবহৃত হয়, ভারী শিল্পে এই হার ছিল আরও কম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪ বৎসরে ৬০টি ধাতব পদার্থাদি গলাবার চুল্লী [blast furnace] বর্জিত লৌহ স্তূপে বা 'স্ক্র্যাপ'-এ পরিণত করা হয়। ১৯৩১ সালে সর্বমোট ৭ লক্ষ ১০ হাজার টন ইস্পাত উৎপাদন-ক্ষম ১২টি ইস্পাত তৈরীর খোলা চুল্লী [open hearth] এবং ১৩টি রোলিং মিল ভেঙ্গে ফেলা হয়। জার্মানীতে ২৩টি 'ব্লাস্ট ফার্ণেস' ও ৩৮টি 'ওপেন হার্থ ফার্ণেস' নষ্ট করে ফেলা হয়।

বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিতে অজস্র যন্ত্রপাতির "কবরখানা"র বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো পুঁজিবাদী দেশগুলিতে গজিয়ে উঠেছে। সবচেয়ে সমৃদ্ধ পুঁজিবাদী দেশগুলোর শিল্পাঞ্চল গুলোতে মাইলের পর মাইল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তালা-বন্ধ কলকারখানা ও গুদাম ঘর, অবহেলায় ধুলাবালি পড়া শক্তিশালী ক্রেনগুলি, আগাছা-ঘাসে আবৃত রেলের ব্রাঞ্চ লাইনগুলো, নিশ্চল মাল ও যাত্রীবাহী জাহাজের বহরগুলি আর অচল কারখানাগুলোর চিমনীর জঙ্গল।

জাতীয় আয়ের অধোগতি ও জাতীয় সম্পদের হ্রাস

শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন কমে যাওয়া এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে হ্রাসের সাথে জড়িত রয়েছে পুঁজিবাদী দেশসমূহে বাৎসরিকভাবে উৎপাদিত সর্বমোট মূল্যের (অর্থাৎ দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবা) হ্রাসপ্রাপ্তি। এর অর্থ হলো, পুঁজিবাদী দেশসমূহে **জাতীয় আয় কমে যায়।**

কিন্তু সংকটের প্রভাবে পুঁজিবাদী দেশসমূহে জাতীয় আয়ই যে কেবল কমে যায় তা নয়। যেসব কল-কারখানা নিশ্চল পড়ে থাকে সেগুলো ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে যায়। যেসব ঘরবাড়ী মেরামত করা হয় না সেগুলো হয়ে পড়ে বসবাসের অযোগ্য। যেসব জমি পড়ে থাকে পতিত সেগুলো ভরে যায় আগাছায়। ব্যবহার ও যত্নের অভাবে যন্ত্রপাতিতে মরচে ধরে এবং সেগুলি হয়ে পড়ে ব্যবহারের অযোগ্য। যেসব বিপুল পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রী হয় না সেগুলো বিভিন্নভাবেই ধ্বংস হয়ে যায়। সবচেয়ে বিভিন্নমুখী রূপে, বছরের পর বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে পুঞ্জীভূত সম্পদরাজির নির্বিচার অপচয় ও ধ্বংস সাধিত হয়। বহু প্রজন্মের শ্রমে পুঞ্জীভূত উৎপাদিকা-শক্তিসমূহের অভূতপূর্ব অপব্যয় দেখা দেয়।

যেকোন দেশের কল-কারখানা, ফ্যাক্টরী, ইমারত, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, তৈরী দ্রব্য-সামগ্রী ও কাঁচামাল ইত্যাদির মূল্যের মোট পরিমাণকে সাধারণতঃ বলা হয় ঐ দেশের জাতীয় সম্পদ। এটা স্বতঃ-স্পষ্ট যে, পুঁজিবাদী দেশসমূহে এই সম্পদটি কোন ক্রমেই জাতির হাতে থাকে না। বিপরীতপক্ষে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে তা কেন্দ্রীভূত থাকে ক্ষুদ্র এক দল শোষক ও পরগাছাদের হাতে, ঠিক যেমন পুঁজিবাদী দেশসমূহে জাতীয় আয়ের সবচেয়ে বড় অংশ কোন ক্রমেই জাতির সাধারণ জনগণের হাতে যায় না বরং যায় সংখ্যাল্প পরশ্রমজীবীদের হাতেই।

সংকটের প্রথম দুই বছর ধরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ের অধোগতির চিত্রটি নিম্নের সারণীতে দেখানো হয়েছে (বিলিয়ন বা শত কোটি ডলার) ঃ

দেশ	জাতীয় সম্পদ		জাতীয় আয়	
	১৯২৯	১৯৩১	১৯২৯	১৯৩১
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪০০	২৪০	৯০·০	৫৪·০
ইংল্যাণ্ড	১১৫	৬৯	১১·০	১১·৪
জার্মানী	৮০	৪৮	১৫·৫	৯·৩
ফ্রান্স	৬৮	৫১	৯·০	৬·৭
ইটালী	৩০	১৮	৫·০	৩·০

এই তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সংকটের দুই বছরে পাঁচটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুঁজিবাদী দেশ তাদের জাতীয় সম্পদের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ হারিয়েছে (সংকটের শুরুতে যা ছিল ৬৯,৩০০ কোটি ডলার তার মধ্যে ২৬,৭০০ কোটি ডলার হারিয়েছে)। তাদের জাতীয় আয়ও প্রতি বছর ১৩,৭৫০ কোটি ডলার থেকে পতিত হয়েছে ৮,৪৪৯ কোটি ডলারে, এই হ্রাসটাও হলো প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ।

পুঁজিবাদী বিশ্বে সংকটের দ্বারা যে নজিরবিহীন ধ্বংসলীলা সাধিত হয়েছে তার এক সর্বজনীন চিত্র হলো উপরের ছকটি। যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অবর্ণনীয় সম্পদ-সম্ভার অন্ধভাবে ধ্বংস করে দেয়, আর সাথে সাথে কোটি কোটি লোককে নিক্ষেপ করে বুভুক্ষা আর মৃত্যুর কবলে, সে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিচার-বুদ্ধিহীনতা ও অপরাধী প্রকৃতিকে এই ছকটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরছে।

জাতীয় আয়ের হ্রাসপ্রাপ্তি আর জাতীয় সম্পদের ধ্বংস সাধনের ব্যাপ্তির দিক থেকে বর্তমান সংকটটি পূর্বের সমস্ত সংকটকে বহু দূর ছাড়িয়ে গেছে। তুলনা হিসাবে শুধু এটুকুই উল্লেখ করা যথেষ্ট যে, ১৯০১ সালের সংকটে জার্মানীর জাতীয় আয় কমেছিল শতকরা ৬ ভাগ ; ১৯০৬ সালের সংকটে জার্মানীর জাতীয় আয় হ্রাস পেয়েছিল শতকরা ৪ ভাগ, আর ইংল্যাণ্ডের জাতীয় আয় শতকরা ৫ ভাগ।

বেকারত্ব ও শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা

পুঁজিবাদী বিশ্ব সংকটের গোটা বোঝাটি পড়েছিল শ্রমিকশ্রেণীর ওপর। সংকট শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থাটা নজিরবিহীনভাবে শোচনীয় করে তুলেছিল, সর্বহারাশ্রেণীর বেকারত্ব আর শোষণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেয়েছিল।

বিশ্বযুদ্ধের সাথে সাথে পুঁজিবাদের যে সর্বজনীন সংকট শুরু হয় তা থেকে উদ্ভব ঘটে বেকারত্বের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। যুদ্ধের পর প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশে বেকারত্ব বিপুল আকার ধারণ করে। আগে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সময় যে শিল্প-মজুত-বাহিনী অদৃশ্য হয়ে যেতো তা যুদ্ধের পর থেকে বেকারদের এক স্থায়ী বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। এমনকি বর্তমান সংকটের সূচনা ঘটার পূর্বেই এই স্থায়ী বেকার বাহিনীর আকারটি বেশ বড় ছিল। যেমন, ইংল্যাণ্ডে ১৯২০ সালের পর থেকে বেকার-সংখ্যা কখনোই ১০ লক্ষের নীচে নামেনি। ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত বছরগুলিতে পুঁজিবাদী 'র‍্যাশন্যালাইজেশন'-এর যে ঢেউ

ছড়িয়ে পড়ে তার সাথে সাথেই বেকারত্ব বেড়ে যায়। শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধির কারণে পুঁজিপতিরা শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে 'ব্যয়-সংকোচ' অর্জন করে। এই কারণটির জন্য লক্ষ লক্ষ শ্রমিক 'প্রয়োজনের' অতিরিক্ত বলে সপ্রমাণিত হয়।

ইংল্যাণ্ডে ১৯২৭ সালের জুন মাসে বেকারের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮.৮ ভাগ, কিন্তু ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে তা ইতোমধ্যেই হয়ে দাঁড়ায় শতকরা ১২.২ ভাগ, জার্মানীতে একই সময়ে বেকারের সংখ্যা ছিল শতকরা ৬.৩ ভাগ ও ২২.৩ ভাগ বা ২৬,২২,০০০ জন ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৭ সালে বেকার ছিল ২১,০০,০০০ জন, আর ১৯২৮ সালের শেষে ও ১৯২৯ সালের শুরুতে তা ছিল ৩৪,০০,০০০ জন।

১৯২৯ সালে যে সংকট শুরু হয়, তা নিয়ে আসে বেকারত্বের পর্বত প্রমাণ বৃদ্ধি। উৎপাদনের হ্রাস ঘটানোর ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। সংকটের চাপে শ্রমের তীব্রতা আরো বাড়িয়ে তোলা হয় আর যেসব শ্রমিক কর্মে নিযুক্ত থাকে তাদের উপর শোষণ আরো বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান সংকট কালে বেকারত্ব এমন মাত্রায় পৌঁচেছে যা পুঁজিবাদের গোটা ইতিহাসে কখনোই দেখা যায়নি। খুব কম করে ধরলেও, প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশে বেকারদের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৫০ লক্ষ। যদি বেকারদের পরিবারগুলিকে আমরা হিসেবের মধ্যে ধরি, তাহলে তার সংখ্যাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের মোট জনসংখ্যারই সমান হবে। আংশিক সময়ের জন্যই কেবল কর্মে নিযুক্ত, অর্থাৎ, যারা সপ্তাহে এক বা দু'দিন কাজ করে, তেমন বিপুলসংখ্যক শ্রমিককেও এই সংখ্যার সাথে যোগ দিতে হবে। সবশেষে, ঔপনিবেশিক দেশ সমূহের শ্রমজীবী জনগণের সেই বিপুল সংখ্যাটিকে এই হিসেবের মধ্যে ধরা হয় নি, যাদের শেষ রুটির টুকরাটি পর্যন্ত এই সংকট কেড়ে নিয়েছে। সংকটের এই সময় কালে বিশ্বের বেকার সংখ্যা বেড়েছিল চার থেকে পাঁচ গুণ, আর কোন কোন দেশে এমনকি তার চেয়েও বেশী।

এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বেকারত্ব সম্পর্কে প্রকৃতই যথার্থ বা নির্ভরযোগ্য কোন পরিসংখ্যান নেই। সাধারণতঃ এসব পরিসংখ্যানগত উপাত্তে **প্রকৃত অবস্থার চেয়ে অনেক কম করেই** হিসাব ধরা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও বেকারত্ব সম্পর্কে কোন সরকারী তথ্য নেই। কিন্তু সংবাদপত্রগুলোও এমনকি এ সত্যকে গোপন করতে পারে না যে, সংকটের সবচেয়ে মন্দ অবস্থায়ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ। এই সংখ্যাটি হলো শিল্প-প্রধান দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ এই দেশটির মোট শ্রমিক সংখ্যার প্রায় অর্ধেক। ইংল্যাণ্ডে বেকার সংখ্যা সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় সামাজিক বীমার তালিকাগুলি থেকে। এসব তালিকা থেকে বেকারের সংখ্যা হলো প্রায় ৩০ লক্ষ। কিন্তু সংকটের বছরগুলিতে কয়েক লক্ষ শ্রমিককে সামাজিক বীমার তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কোন সামাজিক বীমার সুবিধাই পায়নি। জার্মানীতে, বিশেষ করে হিটলারের ফ্যাসিবাদী সরকার ক্ষমতায় আরোহণের পর, বেকার সম্পর্কিত সরকারী তথ্যে প্রকৃত পরিস্থিতি অত্যন্ত কম করেই দেখা হয়েছে ; তা সত্ত্বেও সরকারী তথ্যানুযায়ী, সেখানে বেকারের সংখ্যা ৫০ লক্ষের কম নয়।

বর্তমান সময়ে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এমন একটি শ্রমিক পরিবারও খুঁজে পাওয়া কঠিন যেখানে পরিবারের প্রধান ব্যক্তি কিংবা কমপক্ষে সন্তানরা বা পরিবারের কোন-না-কোন সদস্য বেকার নয়। এর অর্থ হলো, যে কাজ করছে তার নিতান্ত সামান্য মজুরীতেই সংসারের আরো অনেক প্রাণীকে প্রতিপালন করতে হচ্ছে। এর অর্থ হলো, যে কাজ করছে, আগামীকাল তার কাজ থাকবে কি না সে বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না, আপন অদৃষ্ট সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্ন হতে পারে না, কারণ কাজ হারানোর খড়্গটি সব সময় তার মাথার ওপর ঝুলছে।

পুঁজিবাদী দেশসমূহে বেকারদের যে নেহাৎ সামান্য খয়রাতি সাহায্য দেয়া হয় তার উপরও পুঁজি বেপরোয়া আক্রমণ চালায়। সরকারী খরচের "ব্যয়-সংকোচের" অজুহাতে বেকারদের প্রতি প্রদত্ত সাহায্য বিপুলভাবে হ্রাস করা হয়। ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে বেকারত্বের বিরুদ্ধে কোন সামাজিক বীমার ব্যবস্থা নেই, বেকারকে না খেয়েই মরতে হয়, নয়তো ব্যক্তিগত দয়া-দাক্ষিণ্যের কাছে হাত পাততে হয়। কিন্তু যেসব দেশে বেকার বীমার ব্যবস্থা রয়েছে সেসব দেশেও বেকারদের জন্য খয়রাতি সাহায্যের উপর বেপরোয়া আক্রমণ চলে। জার্মানী এবং ইংল্যাণ্ডে খয়রাতি সাহায্য বেশ পরিমাণে কমিয়ে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু, বেকারদের অংশ বিশেষকে সমগ্রভাবে খয়রাতি সাহায্য থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে।

সংকটের অবস্থাধীনে বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর জীবন ধারণের মানের ওপর আক্রমণ চালায়। যেসব শ্রমিক কর্মে নিযুক্ত ছিল তাদের উপর **শোষণের মাত্রা** সকল দেশেই বিপুল মাত্রায় **বৃদ্ধি করা** হয়েছিল। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রম-দিবস দীর্ঘায়িত করা হয়েছিল। শ্রমের তীব্রতা বাড়ানো হয়েছিল। যারা আংশিকভাবে কর্মে নিযুক্ত ছিল তাদের দেয়া হয়েছিল নিতান্তই কম মজুরী। সবদিক দিয়েই কাজের অবস্থা-পরিবেশ শোচনীয় হয়ে পড়েছিল।

শ্রমিকদের মজুরীর উপর সংগঠিত আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে সংকটের অবস্থাকে বুর্জোয়ারা কাজে লাগায়। সংকটের সময়কালে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে, জাতীয় অর্থনীতির প্রতিটি শাখায় মজুরী-হ্রাস ঘটান হয়।

সংকটের বছরগুলিতে সামগ্রিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে মজুরী বাবদ যে পরিমাণ টাকা দেয়া হয়েছিল তা বেশ পরিমাণেই কমে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩২ সালে মজুরী বাবদ যা পরিশোধ করা হয়েছিল তা ছিল পূর্বের মজুরীর শতকরা ৩৩ ভাগ। সংকটের তিন বছরে জার্মানীতে শ্রমিকশ্রেণীর মজুরীর কমেছিল ২,৬০০ কোটি মার্ক। অথচ ঠিক একই সময়ে সমাজতন্ত্রের আবাস-ভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নে মজুরী তহবিল বেড়েছিল ৮০০ কোটি থেকে ৩,০০০ কোটি রুবল।

বিগত দশ বৎসরে প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরীর স্তরটি কিভাবে নেমে গেছে, জনৈক জার্মান অর্থনীতিবিদ সে বিষয়ে অনুসন্ধান-কর্ম চালিয়েছেন। তাঁর অনুসন্ধানের ভিত্তিতে তিনি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হোন ঃ

"যদি আগের দশকগুলোর সাথে বর্তমান দশকের প্রকৃত মজুরীর স্তরকে আমরা তুলনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই নিম্নরূপ ঃ জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃত মজুরীর স্তর এমনভাবে নেমেছে যে বিগত অর্ধ-শতাব্দীতেও তেমনটা কখনো হয়নি ; ইংল্যাণ্ডে প্রকৃত মজুরীর স্তর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ আর বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যেমন ছিল এখনও তাই-ই আছে"।

বিভিন্ন দেশের তথ্যগুলোও সে কথাই প্রমাণ করে।

জার্মানী ঃ প্রকৃত মজুরীর স্তর সর্বশেষ আমলে ক্রমাগতই হ্রাস পায়। ১৯১৩-১৪ সালকে ১০০ হিসাবে ধরলে আমরা নিম্নোক্ত সূচক সংখ্যাগুলি পাই (১৯২৮ সালে শ্লথ গতিতে বৃদ্ধির কারণে প্রকৃত মজুরীর স্তর ১০০ হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী স্তরেই একটা অব্যাহত অধোগতি দেখা যায়) ঃ

১৯২৫	৯৮
১৯২৮	১০০
১৯৩০	৮৯
১৯৩১	৭৯
১৯৩২	৬৪

১৯৩৩ সালে জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর জীবন-ধারণের মানের আরো অধিক অবনতি ঘটে। বেকারদের অবস্থা ছিল আরো খারাপ। মূলতঃ রাজনৈতিক কারণে সরকারী সাহায্য থেকে যেসব বিপুল সংখ্যক বেকার সামগ্রিকভাবে বঞ্চিত হয়েছিল তাদের কথা বাদ দিলেও, ফ্যাসিবাদী প্রশাসন আর সকলেরও খয়রাতি সাহায্য কমিয়ে দিয়েছে।

ইংল্যাণ্ড ঃ ইংরেজ শ্রমিকদের গড়পড়তা মজুরী (১৮৯৫-১৯০৩ সালের স্তরকে ১০০ ধরলে) ছিল ১৯২৭ সালে ৯৮, ১৯২৯ সালে ৯৭ আর ১৯৩২ সালে ৯৪।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ সমগ্রভাবে শ্রমিকশ্রেণীর মজুরী ১৯২২ সাল থেকে বাড়তে বাড়তে ১৯২৯ সালে সর্বোচ্চ স্তরে ওঠে। ১৮৯৮-১৯০৮ সালের স্তরকে ১০০ ধরলে ১৯২৯ তা ছিল ১২৫। কিন্তু এই সময় থেকেই এমন এক তীব্র অধোগতি শুরু হয় যে তা জীবন-যাত্রার মানকে কয়েক বৎসর আগের স্তরে টেনে নামায়। ১৯৩০ সালে সূচক নেমে যায় ১০৫-এ, ১৯৩১ সালে ৯১-তে আর ১৯৩২ সালে ৭১-এ।

ছুড়ে-ফেলা পরিত্যক্ত টিন পাত্রে খাওয়ার মতো কিছু পাওয়ার সন্ধানে বেকারদের আস্তাকুঁড় ঘাটা, লঙ্গর খানার সামনে অন্তহীন সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা – এটাই হলো যেকোন পুঁজিবাদী নগরীতে আজকের সাধারণ চিত্র। সদর রাস্তাগুলোতে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানো লোকের দৃশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন সাধারণ ব্যাপার। প্রায়ই দেখা যায় দলে দলে মানুষ, গোটা গোটা পরিবার তাদের ছেলে-মেয়ে আর দীনহীন গৃহস্থালীর যৎসামান্য লটবহর নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় কাজের ব্যর্থ সন্ধানে ঘুরছে। একটি দাতব্য সংস্থা দ্বারা পরিচালিত তদন্তের ফলে প্রমাণিত হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ লক্ষের বেশী বেকার এভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

ক্ষুধা মানুষকে বেপরোয়া করে তোলে। সমস্ত পুঁজিবাদী বিশ্ব জুড়ে আত্মহত্যার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কেবল এক বার্লিন শহরেই ক্ষুধার জ্বালায় প্রতিদিন গড়ে ষাট জন লোক আত্মহত্যা করে।

বেকারদের জন্যে তথাকথিত সাহায্যটা হয়ে দাঁড়ায় তাদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত হতে বাধ্য করার তথা বাধ্যতামূলক শ্রমের এক উপায়ে। বহু পুঁজিবাদী দেশেই এখন বেকারদের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম বেশ পরিমাণে চালু হয়েছে। সর্বপ্রকার সাহায্য থেকে বঞ্চিত করার ভয় দেখিয়ে বেকারদের তথাকথিত "গণ-পূর্ত কর্মে" ঠেলে পাঠান হয় (এগুলো হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় বড় বড় ভূস্বামীদের অদক্ষ শ্রমের চাহিদা পূরণ কিংবা কোন ধরণের সামরিক নির্মাণ-কর্ম), বিভিন্ন শ্রম শিবির ও বসতিতেই যেগুলো কেন্দ্রীভূত, যেখানে কয়েদখানার শৃঙ্খলা-বিধানই বলবৎ রয়েছে। শিল্প ও কৃষি-শ্রমিকদের কাছে থেকে আদায় করা এই শ্রমের বেতনটাও হলো কয়েদখানার কয়েদীদের পারিশ্রমিকের মতোই। জার্মান ফ্যাসিবাদী সরকার বেকার যুবকদের জন্য এ ধরণের বাধ্যতামূলক শ্রম-শিবির তড়ি-ঘড়ি গড়ে তুলছে। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশ সমূহকে এই দৃষ্টান্তটি পরমভাবে প্রলুব্ধ করছে। কয়েক বছর আগে এই দেশগুলিই সাধু-সন্তদের মতো শোরগোল তুলেছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে নাকি "বাধ্যতামূলক শ্রম" চালু রয়েছে, অথচ যেখানে মানুষের শ্রম প্রকৃতপক্ষেই পরিণত হয়েছে "সম্মান, গৌরব, সাহস ও বীরত্বেরই এক বিষয়ে"।

শ্রমিকদের মৌলিক স্বার্থের উপর পুঁজির আক্রমণ সর্বহারাশ্রেণীর ব্যাপক অংশের মধ্যে **প্রতিরোধের** জন্ম দেয়। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ধর্মঘটের পর ধর্মঘটের ঢেউ বয়ে যায়। বর্তমান সংকটজনিত পরিস্থিতিতে এসব ধর্মঘট-সংগ্রামের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য হলো এর সবিশেষ দুর্দমনীয়তা। এই ধর্মঘটগুলি শ্রমিকদেরকে প্রকৃত পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। বর্তমান সংকটের পরিস্থিতিতে ধর্মঘটগুলো অতি দ্রুতই বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রতি চ্যালেঞ্জের চরিত্র ধারণ করে, যে-ব্যবস্থাটি লক্ষ কোটি মানুষকে শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যেই নিক্ষেপ করেছে।

শিল্প ও কৃষি সংকটের জট-পাকানো অবস্থা

শিল্প-প্রধান ও কৃষি-প্রধান – উভয় ধরণের দেশ, পুঁজিবাদী দেশ সমূহের শিল্প ও কৃষি – উভয়টিই সংকটের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে – এই বাস্তব ঘটনাই হলো এই সংকটের বিশেষ তীব্রতা ও গভীরতার কারণ। শিল্প ও কৃষির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সহ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্ত মৌলিক দ্বন্দ্বগুলোকেই বর্তমান সংকট তীক্ষ্ণ করে তুলেছে এবং উদ্ঘাটিত করেছে।

"অর্থনৈতিক সংকটের বিকাশের গতিধারায়, প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশের শিল্প-সংকট কৃষি-প্রধান দেশগুলোর কৃষি-সংকটের সাথে কেবল যে যুগপৎ ঘটেছে তাই নয়, বরং তার সাথে **জড়িয়ে জট পাকিয়ে গেছে** (interwoven), অসুবিধাগুলিকে গভীরতর করছে এবং অর্থনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে সাধারণ অবনতির অনিবার্যতা পূর্ব-নির্ধারিত করে দিয়েছে"। [স্তালিন, "ষষ্ঠদশ কংগ্রেসে প্রদত্ত রাজনৈতিক রিপোর্ট"]

শিল্প-সংকটের ফলে বেকারত্ব অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, শ্রমজীবী জনতার চরম দুর্দশা দেখা দিয়েছে। ব্যাপক জনসাধারণের দারিদ্রের অর্থ হলো কৃষিজাত দ্রব্যের **বিক্রির পরিমাণ হ্রাস**। এর সাথে সাথে উৎপাদনের ক্ষেত্রে হ্রাসের আরো অর্থ হলো কৃষিজাত কাঁচামালের ঃ তুলা, পশম ইত্যাদির চাহিদার হ্রাসপ্রাপ্তি। পালাক্রমে, কৃষি-সংকটটা আবার ব্যাপক কৃষক জনগণের সর্বনাশ ঘটিয়ে শিল্পজাত পণ্য-সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষমতা থেকে তাদের বঞ্চিত করে, আর এভাবে শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় বাজারটি সঙ্কোচিত করে ফেলে।

কৃষি-সংকট হলো উৎপাদিকা শক্তি সমূহের আধুনিক বিকাশকে ব্যবহার করায় পুঁজিবাদের অক্ষমতার এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আধুনিক প্রকৌশল বিদ্যা শ্রমের সামগ্রিকভাবে নতুন পদ্ধতির ব্যবহার সম্ভব করে তুলেছে, উৎপাদন পদ্ধতির যান্ত্রিকীকরণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যার অর্থ হলো উৎপাদন-ক্ষমতার সুবিপুল বৃদ্ধি। কিন্তু, আধুনিক প্রযুক্তিগত সাফল্যের জন্যে পুঁজিবাদের সীমারেখাটি হলো খুবই সংকীর্ণ। শহর ও গ্রামের মধ্যেকার পার্থক্যকে গভীরতর করে পুঁজিবাদ গ্রামকে বন্ধ্যাত্ব ও অধোগতির মধ্যে নিমজ্জিত করে। কৃষির আরো অধিক বিকাশের পথে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক সমূহ হলো এক বিরাট বাধা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তুলনা করলে পুঁজিবাদী দেশসমূহের কৃষির অধোগতি ও বন্ধ্যাত্বটি বিশেষ জাজ্বল্যমান ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯৩১ সালে মাত্র এক বৎসর সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন চাষাবাদযোগ্য জমির আয়তন বেড়েছিল প্রায় ১ কোটি হেক্টর, সেখানে বিগত বিশ বৎসরে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে শস্যের জন্য চাষাবাদযোগ্য জমির আয়তন বেড়েছে মাত্র ৩ কোটি হেক্টর। বিশ্বযুদ্ধ পুঁজিবাদী দেশসমূহের কৃষিতে এক গভীর সংকট ডেকে এনেছিল। ব্যাপক কৃষক জনগণের নিঃস্বকরণ ও বেশ কয়েকটি দেশে উৎপাদনের অবনতি ছিল এই সংকটেরই পরিণতি। বর্তমান যে সংকটটিতে শিল্প ও কৃষি সংকট জড়িয়ে জট পাকিয়ে গেছে সেই সংকট কোটি কোটি কৃষকের অস্তিত্বের পক্ষেই হলো এক হুমকী স্বরূপ।

সাধারণভাবে সর্বহারা শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের অভূতপূর্ব দারিদ্র্যকে বাড়িয়ে দিয়ে সংকট কৃষিজাত পণ্য-দ্রব্যের চাহিদা প্রচণ্ডভাবে কমিয়ে দেয় এবং এসব দ্রব্যের বিক্রির বাজার সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম সীমার মধ্যে সঙ্কোচিত করে আনে। বাজারের এই সঙ্কোচনের ফলে কৃষিজাত পণ্য-দ্রব্যের বিপুল **মজুত** পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে এবং ঘটে **দামের ক্ষেত্রে বিপর্যয়কর অবনতি**। মজুতের পুঞ্জীভবন, বিক্রি হ্রাস ও দর-দামের অবনতি পালাক্রমে নিয়ে আসে কৃষির ক্ষেত্রে **সীমাবদ্ধ উৎপাদন**।

পুঁজিবাদী দেশসমূহে শস্য-গুদাম ও শস্য উত্তোলক যন্ত্রগুলো কৃষিজাত পণ্য-দ্রব্যের মজুতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতারা এই প্রাচুর্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের একটিমাত্র পথই দেখতে পায় – তা হলো পুড়িয়ে, পচিয়ে, সাগরে ফেলে দিয়ে এসব মজুতকে বিনষ্ট করে দেয়া, কিন্তু, প্রধানতঃ, কৃষিকে কম পরিমাণে উৎপাদন করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে আবাদী জমির পরিমাণ কমিয়ে দেয়া। পাহাড়-প্রমাণ গম আর ভুট্টার স্তূপ পচতে দেয়া হয় কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হয়, কলসীর পর কলসী দুধ ঢেলে ফেলা হয়, জার্মানীতে শস্যের সাথে বিশেষ ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য মেশান হয় এবং মনুষ্য-ব্যবহারের অযোগ্য করা হয়, যাতে সেগুলো কেবল গবাদি পশুকেই খাওয়ানো চলে।

সংকটের সময়ে কৃষিজাত পণ্যের দাম নিদারুণভাবে কমে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ, বিশ্ব বাজারে গমের পাইকারী দাম কমে যায় শতকরা ৭০ ভাগ, তুলা, চিনি, কফি এবং পশমের দাম কমে যায় অর্ধেক। এতে মনে হতে পারে যে, শহরের ভোগ-ব্যবহারকারী অর্থাৎ ভোক্তারা, ব্যাপক জনগণ, বুঝি এর দ্বারা লাভবান হয়। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পণ্যটি পৌঁছার আগে তা ডজন ডজন ফড়িয়া, পাইকারী বিক্রেতার হাত হয়ে ঘুরে আসে, যারা আবার এমন সব একচেটে জোটে আবদ্ধ থাকে যেসব জোট পণ্য-দ্রব্যের দাম পড়তে দেয়া না। সংকটের বছরগুলিতে অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশে খুচরা দাম বেশী কমেনি এবং কোন কোন দেশে তা বরং বেড়েই গিয়েছিল (যেমন, জার্মানীতে)। কিন্তু কৃষক তথা শ্রমজীবী কৃষক সম্প্রদায়কে কারবার করতে হয় পাইকারদের সাথেই এবং এমন অত্যন্ত নিম্ন দামেই তাদের উৎপন্ন-দ্রব্য গুলি বিক্রি করতে হয় যে নিজেদের ব্যয়িত শ্রমের কথা বাদ দিলেও বীজ ও সরঞ্জাম বাবদ খরচ পর্যন্ত তাদের ওঠে না।

সরকারকে দেয় কর, জমিদারকে দেয় খাজনা, ব্যাংক-ঋণের সুদ, পূর্বের মতোই কিংবা কখনো কখনো তার চেয়ে বেশী পরিমাণেই, কৃষককে শোধ করতে হয়। গরীব ও মাঝারী কৃষক বাজারে ফসল বিক্রি করে যা পায় তার সিংহ ভাগটাই চলে যায় ঋণের সুদ আর কর পরিশোধ করতে। খামার আর গৃহস্থালীর জিনিসপত্র তার ঋণের দায়, করের দায়ে নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। কেবল ইউরোপেই নয়, বরং যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পুঁজিপতিরা সব সময় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কৃষির সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির পরমোৎকর্ষ আদর্শ বলে বর্ণনা করে সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও গরীব ও মাঝারী কৃষকরা এভাবে হাজার হাজার খামার হারিয়েছে। এরূপ নজীরবিহীন সর্বনাশ পুঁজি, ভূস্বামী আর ব্যাংকের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী কৃষকদের মধ্য থেকে ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের জন্ম দেয়। নিজেদের জিনিসপত্র নিলামে বিক্রির বিরুদ্ধে কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হতে, সংগঠিত হতে চেষ্টা করে, সেই সম্পত্তি ক্রয় করতে অস্বীকার করে। আমেরিকায় এমনও ঘটনা ঘটেছে যেখানে নিঃস্ব চাষীদের সম্পত্তি নিলামের সময় একটি জেলায় চাষীরা সংগঠিত কায়দায় এসে জমায়েত হয় এবং গোটা সম্পত্তির নিলামের ডাক এক ডলারের বেশী উঠতে দেয় নি। এইভাবে নিলাম বাতিল করতে এবং ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে ব্যাংকের প্রতিনিধিদের বাধ্য করা হয়।

ক্ষেত খামার হারিয়ে নিঃস্ব কৃষকরা ভিক্ষুকদের বাহিনী স্ফীত করে তুলে, রাস্তা ঘাটে ভীড় বাড়িয়ে দেয়। পুঁজিবাদী দেশ সমূহে ঠিকা ক্ষেত-মজুরদের অবস্থা আরোও খারাপ। ইউরোপ ও আমেরিকা উভয় স্থানেই জমিদার ও শোষক ধনী কৃষকদের পক্ষে ঠিকা ক্ষেত-মজুরদের শ্রমশক্তির জন্য নগদ মজুরী দিতে অস্বীকার করাটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এক মুঠো শস্য বা সের কয়েক আধ-পচা আলুর বিনিময়ে তারা শহর থেকে আগত কোন বেকার শ্রমিককে দিয়ে একই কাজ করিয়ে নিতে পারে। বুর্জোয়া মসিজীবীরা জমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য শোরগোল তুলেছে। বেকারদের জন্য তথাকথিত "বসতি" [settlements] গড়ে তোলার জন্য বিশেষ ধরণের সমিতিও গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এর একমাত্র অর্থ হলো, ছোট খামারের সংখ্যাই বেড়েছে যেগুলো, সাজ-সরঞ্জাম বিহীন অবস্থায়, শ্রমিকদের খাওয়ানোর মতো যতেষ্ট উৎপাদন করতে পারে না, শ্রমিকরা খামারের কাজে দিনরাত নিরাশ হয়েই খাটে। পুঁজিবাদী কৃষির সংকট পুঁজিবাদী ব্যবস্থাধীনে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিকেই স্পষ্ট করে প্রদর্শন করছে।

কৃষি-সংকটের আঘাত থেকে **গরীব ও মাঝারী** চাষীরাই সবচেয়ে বেশী দুর্দশা ভোগ করে। সংকটের ফলে চাষীদের ব্যাপক অংশ নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সংকট কৃষকদের মধ্যে **শ্রেণী-পার্থক্য দ্রুত বাড়িয়ে দেয়**, সর্বহারাশ্রেণীর সারিতে তাদের অনেকের অবস্থানান্তর ঘটায়। সংকটের প্রভাবে পুঁজিবাদী দেশসমূহে কৃষকদের যে বোঝা বহন করতে হয় তা বিশেষভাবেই অসহনীয় কর, খাজনা, ঋণের সুদ ও অন্যান্য দায় – এই সমস্তই সংকটের অবস্থায় ব্যাপক কৃষক জনগণের উপর অতি গুরুতর রূপে চেপে বসে।

কৃষি-সংকট কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবনতি ঘটায়। বেশ কয়েকটি দেশে বুর্জোয়া সরকারগুলি খোলাখুলিভাবেই উৎপাদন হ্রাসের পরামর্শ দেয় এবং ঘোষণা করে যে, তাদের মতে এটাই হলো কৃষি-সংকট উপশমের একমাত্র পথ। শিল্পের মতো কৃষিতেও উৎপাদন হ্রাসের সাথে জড়িত রয়েছে উৎপাদিকা-শক্তির বিপুল পরিমেয় ধ্বংস সাধন। গম আর ভুট্টার ক্ষেতগুলি পড়ে থাকে অযত্নে, না-হয় সেগুলোকে পরিষ্কার করে ফেলা হয়। আর এগুলো এমন এক সময়েই ঘটে যখন কোটি কোটি লোক থাকে উপোস, যখন তাদের মাথার উপর থাকে না কোন আচ্ছাদন এবং থাকে না একান্ত দরকারী পরিধেয় বস্ত্র।

কৃষি-সংকট এবং কৃষক জনতার ধ্বংস নিয়ে আসে কৃষির ক্ষেত্রে অবনতি। কৃষি-যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক সারের বিক্রি শোচনীয়ভাবে কমে যায়। প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ট্রাক্টর, ফসল বোনা ও ফসল কাটার যন্ত্রের ব্যবহার কমে গেছে। সংকট নিয়ে এসেছে পুঁজিবাদী দেশ সমূহে কৃষির অবনতি ও ধ্বংস।

সংকট ও একচেটেবাদ

সমসাময়িক সংকটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য সমূহের অন্যতমটি হলো একচেটে পুঁজিবাদের ভিত্তিতে এর বিকাশ।

"পুরানো পুঁজিবাদ থেকে বর্তমানকালীন পুঁজিবাদের পার্থক্য সূচক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এটা হলো একচেটে পুঁজিবাদ, এবং অতি উৎপাদন সত্ত্বেও এ ঘটনা পণ্যের একচেটে উচ্চ দর বজায় রাখার জন্য পুঁজিবাদী কারবারী জোটগুলির মধ্যে অনিবার্য সংগ্রামের জন্ম দেয়। স্পষ্টতঃ, এই যে পরিস্থিতিটি পণ্য-সামগ্রীর মূল ভোক্তা ব্যাপক জনগণের নিকট সংকটকে বিশেষভাবে কষ্টকর ও সর্বনাশা করে তুলে, সেই পরিস্থিতিটি সংকটকে দীর্ঘস্থায়ী না করে পারে না, সংকটের বিলীন হয়ে যাওয়ার গতিবেগ মন্থর না করে পারে না।" [স্তালিন, পূর্বোক্ত]

বহু বছর ধরেই বুর্জোয়াশ্রেণীর পদলেহীরা দাবী করে এসেছে যে, একচেটেবাদের বিকাশ 'সংগঠিত পুঁজিবাদে' উত্তরণকেই সূচিত করে। পুঁজিবাদের যারা সমর্থক তারা সংকট সম্পর্কে এই রূপকথা শোনাত যে, একচেটে পুঁজিবাদের যুগে সংকট হলো অতীতেরই ব্যাপার। বর্তমান সংকট এসব আবিষ্কারের চূড়ান্ত মিথ্যাচারকে উদ্ঘাটন করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক পুঁজিবাদের একচেটেসুলভ প্রকৃতি সংকটকে চূড়ান্তভাবেই তীব্র করে তুলেছে, তাকে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী করে তুলেছে।

এমনকি অতি-উৎপাদনের অবস্থায়ও চড়া দর বজায় রাখার প্রচেষ্টায়, একচেটে পুঁজির প্রভুরা সংকটের সমস্ত বোঝাটা প্রথমতঃ ব্যাপক ভোক্তা জনগণের কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল। আর প্রকৃতপক্ষে, অতি-উৎপাদন সত্ত্বেও, একচেটেবাদের কবলিত শিল্প-শাখাগুলোর বহু-সংখ্যক উৎপাদিত-দ্রব্যের দর অন্যান্য শিল্প-শাখার দ্বারা উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রীর দরের চেয়ে অধিকতর ধীর গতিতেই কমেছিল।

বৎসর	জার্মানী (১৯২৬ = ১০০) কার্টেল নিয়ন্ত্রিত দাম	জার্মানী (১৯২৬ = ১০০) অনিয়ন্ত্রিত দাম	অষ্ট্রিয়া (১৯২৬ = ১০০) কার্টেল নিয়ন্ত্রিত দাম	অষ্ট্রিয়া (১৯২৬ = ১০০) অনিয়ন্ত্রিত দাম	পোল্যাণ্ড (১৯২২ = ১০০) কার্টেল নিয়ন্ত্রিত দাম	পোল্যাণ্ড (১৯২২ = ১০০) অনিয়ন্ত্রিত দাম
১৯২৮	১০২.১	১০৬.৮	–	–	–	–
১৯২৯	১০৫.০	৯৭.৪	৯৯	১০০	১০৭.৭	৯৩.৬
১৯৩০	১০৩.১	৭৯.৭	৯৬	৮৭	১০৮.১	৮০.৯
১৯৩১	৯৩.৬	৬০.৪	৯১	৭৬	১০৭.৮	৬৩.৮
১৯৩২	৮৩.৯	৪৭.৫	৯৩	৭৩	১০৬.১	৫২.৫
১৯৩৩	৮৩.৯	৪৮.৩	৯৪	৭৩	৯৪.৮	৪৮.৮

বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তা সত্ত্বেও একচেটেবাদী বন্ধনের চেয়ে সংকটের চাপ অধিকতর শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয় এবং তখন দাম প্রচণ্ড গতিতে পড়তে থাকে আর একচেটে জোট ভেঙে খান খান হয়ে যায়। কাঁচামাল উৎপাদনে নিয়োজিত শাখাগুলো সম্পর্কে এ কথা বিশেষভাবে সত্য। কাঁচামালের চাহিদার দারুণ অবনতি এবং বিপুল পরিমাণ মজুত সঞ্চয় শেষ পর্যন্ত উৎপাদকদের বেশ পরিমাণে দাম কমাতে বাধ্য করে। এসব ক্ষেত্রে একচেটেবাদীরা উচ্চ স্তরে দাম ধরে রাখতে অক্ষম বলে প্রমাণিত হয়।

একচেটে পুঁজিবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমস্ত দ্বন্দ্বগুলিই সংকটের পরিস্থিতিতে বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, দরদামের উচ্চ-স্তর বজায় রাখার দিকে একচেটেবাদের ঝোঁক একদিকে মুষ্টিমেয় একচেটেবাদী, আর অন্যদিকে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের গোটা ভোগ-ব্যবহারকারী জনগণের মধ্যে তীব্রতম ধরণের সংঘাতের জন্ম দেয়। শিল্পের একচেটেবাদ-কবলিত শাখা আর একচেটেবাদ যেখানে নগণ্য সেসব শাখার মধ্যেও এই সংঘাত তীব্র হয়ে দেখা দেয়। অধিকন্তু, খোদ একচেটেবাদীদের মধ্যেকার সংঘাতও তীব্র হয়ে দেখা দেয়। যে দ্বন্দ্বগুলি এক-একটা একচেটেবাদী সংস্থাকে ভেঙে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়, সেই দ্বন্দ্বগুলি তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়, আলাদা আলাদা একচেটেবাদী সংস্থাগুলির অন্তঃস্থিত সংগ্রাম তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। বেশ কিছু সংখ্যক একচেটেবাদী সংস্থা সংকটের আঘাত সামলাতে পারে না এবং ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, সংকটের সময় নিম্নোক্ত বড় একচেটেবাদী কারবারী জোটগুলো ভেঙে গিয়েছে ঃ ইন্টারন্যাশনাল জিঙ্ক কার্টেল, ইউরোপীয়ান পিগ আয়রন কার্টেল, ইন্টারন্যাশনাল টিন কার্টেল। ক্রমাগত জোরালো চাপের মুখে, ইউরোপীয় স্টিল কার্টেল নিজের সদস্যদের পুনরায় অবাধ প্রতিযোগিতায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। জার্মানীতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতকারকদের সংস্থা ভেঙে গিয়েছিল এবং দস্তার কার্টেলের পতন ঘটেছিল ; ফ্রান্সে পিগ আয়রণ সিণ্ডিকেট ভেঙে যায় ইত্যাদি।

পুঁজিবাদী দেশসমূহের সরকারগুলো একচেটেবাদী জোটগুলোকে জোরালো ভাবেই সমর্থন করে। যেসব একচেটে সংস্থা বিপদে পড়ে তারা সরকারী কোষাগার থেকে সব ধরণের ভতুর্কি ও অন্যান্য সাহায্য পায়। এইভাবে করদাতাদের সরু পকেট থেকে কোটি কোটি মার্ক, ডলার ও ফ্রাঁ বেসরকারী পুঁজিপতিদের পকেটে চলে যায় [মার্ক – জার্মান মুদ্রা, ডলার – মার্কিন মুদ্রা, ফ্রাঁ – ফরাসী মুদ্রা]।

আধুনিক পুঁজিবাদের একচেটেবাদী প্রকৃতির ফলে সংকট দীর্ঘস্থায়ী হয়। অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে দর-দামের সাধারণ হ্রাস, দুর্বল ব্যবসায়ী সংস্থাগুলোর অসাফল্য এবং উৎপাদন হ্রাসের ফলে ধীরে ধীরে সংকটের অবসান ঘটতো এবং শিল্পের চক্রাকার গতি পুনরায় শুরু হতো। কিন্তু একচেটেবাদ প্রাধান্যপূর্ণ হয়ে ওঠার সাথে সাথে সংকটের স্বাভাবিক অবসানের এই পদ্ধতি অতি মাত্রায় কঠিন হয়ে ওঠে। একচেটেবাদের রাজত্বে সংকট তীব্র হয়ে ওঠে এবং আরো গভীর হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যে অবনতি

অতি-উৎপাদনের সংকট ও বাজার সঙ্কোচনের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবনতি ঘটে। বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতির ব্যাপারে বলতে গেলে বর্তমান সংকট পুঁজিবাদের ইতিহাসের পূর্বতন সকল সংকটকে ছাড়িয়ে গেছে।

আগেকার সংকটগুলোর সাথে তুলনা করলে ১৯২৯-৩০ সময় কালে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবনতির যে চিত্রটি নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শিত হয়েছে তা থেকে একথাটি স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাবে।

বৈদেশিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে অবনতি

সংকটের বৎসর	শতকরা হার
১৮৭৩-৭৪	৫
১৮৮৩-৮৪	৪
১৯০০-০১	১
১৯০৭-০৮	৭
১৯২৯-৩২	৬৫

যে অর্থনৈতিক বন্ধন ছাড়া পুঁজিবাদী অর্থনীতি টিকে থাকতে পারে নি, বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবনতি সে বন্ধনকে দুর্বল করে দিয়েছে। শিল্প-প্রধান দেশগুলো কাঁচামালের আমদানীর পরিমাণ বিপুলভাবেই কমিয়ে দিয়েছিল। কৃষি-প্রধান দেশগুলো শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রীর আমদানী কমিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে ব্যাপক শ্রমিক জনগণ কর্তৃক উৎপাদন ও ভোগ-ব্যবহার – উভয়টির আরো হ্রাস ঘটেছিল।

যেসব বড় বড় পুঁজিবাদী দেশ বিশ্ব বাজারে প্রাধান্যপূর্ণ অবস্থান দখল করে রেখেছে, বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্র অবনতিটা তাদেরকেই সবচেয়ে জোরালো ভাবে আঘাত হেনেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুঁজিবাদী দেশসমূহের আমদানী ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে হ্রাসপ্রাপ্তিটা নীচের সূচক সংখ্যাগুলি দ্বারা প্রদর্শিত হলো (১৯২৯ সালের হিসাবকে ১০০ ধরা হয়েছে)।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবনতি

	১৯৩০		১৯৩১		১৯৩২	
দেশ	আমদানী	রপ্তানী	আমদানী	রপ্তানী	আমদানী	রপ্তানী
যুক্তরাষ্ট্র	৭০	৭৩	৪৮	৫০	৩০·১	৩০·৮
জার্মানী	৭৭	৯০	৫০	৭৩	৩৪·৭	৪২·৬
ইংল্যাণ্ড	৮৬	৭৮	৭২	৫৩	৫৭·৬	৫০·১
ফ্রান্স	৯০	৮৫	৭২	৬১	৫১·২	৩৯·৩
ইটালী	৮০	৭৯	৫১	৬৬	৩৮·৭	৪৫·৬

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এরূপ অবনতির ফলে **বাজারের জন্য সংগ্রামের অভূতপূর্ব তীব্রতা** দেখা দেয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রাম অসাধারণ তীক্ষ্ণ রূপ ধারণ করে। প্রত্যক দেশেই পুঁজিপতিরা, প্রথমতঃ, চেষ্টা করে অভ্যন্তরীণ বাজারটা নিজেদের জন্য সুনিশ্চিত করতে এবং কোন বিদেশী প্রতিযোগীকে ঢুকতে না দিতে। অস্বাভাবিক রকমের চড়া আমদানী শুল্ক বসানো হয়। সকল পুঁজিবাদী দেশে 'সংরক্ষণবাদের' [protectionism] এই অশ্রুতপূর্ব বৃদ্ধির ফলে দেখা দেয় 'ডাম্পিং'-এর বিপুল বৃদ্ধি [dumping – ক্ষতি স্বীকার করে বিদেশের বাজারে অল্প দরে মাল বিক্রি]।

ঋণ-সংকট, মুদ্রাস্ফীতি ও বাজারের জন্য সংগ্রাম

আধুনিক পুঁজিবাদের একচেটেবাদী প্রকৃতি বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়ার উপর তার ছাপ রেখেছে। আধুনিক পুঁজিবাদের একচেটেবাদী প্রকৃতির অন্যতম পরিণাম ফল হলো এই যে ঋণ-সংকটের বিকাশের ক্ষেত্রে এক নির্দিষ্ট বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়।

পূর্বের বিভিন্ন সংকট কালে যেসব পরিমণ্ডলে সংকট প্রকাশ্যভাবে ও প্রচণ্ডতার সাথে নিজেকে প্রথমতঃ অভিব্যক্ত করতো তার মধ্যে অন্যতম ছিল **ঋণের ক্ষেত্র** [Sphere of credit]। যেসব প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে সক্ষম হতো না, পণ্য বিক্রির সমস্যার ফলে শীঘ্রই তারা বিধ্বস্ত হতো। দায় পরিশোধ করার মতো অর্থ হাতে না থাকায় নিজেদের দেউলিয়া বলে, অর্থাৎ দেনা শোধে অপরাগ বলে ঘোষণা করতে তারা বাধ্য হতো। একচেটেবাদের আবির্ভাবের যুগে কারবারী প্রতিষ্ঠান সমূহের দেউলিয়া হওয়ার অল্প কালের মধ্যে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলিও দেউলিয়া হয়ে পড়ত। একই সময়ে, এসব প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া হওয়ার পরিণামে উৎপাদনেরও ঘটতো হ্রাসপ্রাপ্তি, বাজার থেকে দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলো উঠে যেত, অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে যারা পারতো সেসব প্রতিষ্ঠানের হাতেই বাজার যেত চলে। এইভাবে, ছোট প্রতিষ্ঠান সমূহ ও মাঝারী-আকৃতির প্রতিষ্ঠান সমূহের একাংশকে ধ্বংস করে বৃহৎ পুঁজির কয়েকটি গোষ্ঠীর অবস্থানকেই সংকট আরো অধিক শক্তিশালী করে তুলেছিল।

আধুনিক পুঁজিবাদের একচেটেবাদী প্রকৃতি এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায় যেখানে ঋণ-সংকটটি প্রকাশ্যে দেখা দেয় কেবলমাত্র ১৯৩১ সালে, যখন সংকট ইতোমধ্যে পুঁজিবাদী দেশসমূহের গোটা অর্থনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে আঘাত হেনেছে।

সংকটের খোদ সূচনা থেকেই, আধুনিক পুঁজিবাদে আধিপত্যশীল একচেটেবাদ সংকটের দরুণ সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির বোঝাটা চাপিয়ে দিতে শুরু করে অ-একচেটেবাদী ক্ষেত্রগুলোর উপর, যেখানে মাঝারী আয়তনের প্রতিষ্ঠানগুলোই ছিলো প্রাধান্যপূর্ণ। একই সময়ে দ্রুত পতনশীল বাজারের উপর চড়া স্তরের দর-দাম বহাল রাখার উদ্দেশ্যে একচেটেবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো দারুণভাবে উৎপাদন কমাতে বাধ্য হয়েছিল। উৎপাদনের সীমাবদ্ধকরণ অনিবার্যভাবেই ঘটায় **মুনাফার ক্ষেত্রে কমতি**, দেখা দেয় লোকসান এবং পুঁজিপতিদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে **মুনাফা বন্টনের** ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন।

সংকটের ফলে দেখা দেয় সমস্ত ধরণের প্রতিষ্ঠানের অভূতপূর্ব সংখ্যায় দেউলিয়া হওয়া।

দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২২,৯০৯	২৯,৩৫৫	২৯,২৮৮	৩১,৮৮২	১৭,৭৩২
ইংল্যাণ্ড	৫,৯০০	৬,২৮৭	৬,৮১৮	৭,৩২১	৪,৯২৭
জার্মানী	৯,৮৪৬	১৫,৪৮৬	১৯,২৫৪	১৩,৯৬৬	৩,৭১৮
ফ্রান্স	৬,০৯২	৬,২৪৯	৭,২২০	৯,০১৪	৮,৩৬২
পোল্যাণ্ড	৫১৬	৮১৫	৭৩৮	৫৪৫	২৫৯

দীর্ঘকাল ধরেই ঋণ-সংকট পরিপক্ক হয়ে আসছিল। ব্যাংকগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের দেউলিয়াত্ব, সরকারী বাজেট বিপত্তি, মুনাফার অবনতি ও লোকসান বৃদ্ধি, শেয়ার-স্টকের দরের পড়তি – এ সমস্ত কিছুই ঋণ-সংকটের বিস্ফোরণের পথ তৈরী করছিল, যা অবশেষে ১৯৩১ সালে প্রচণ্ড বেগে বিস্ফোরিত হলো। উৎপাদন ও দামের ক্ষেত্রে অবনতির ফলে সৃষ্ট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্ব, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়পূর্বক দাম আদায়, হাতে মজুত পণ্যের মূল্য হ্রাস, ইত্যাদি অনিবার্য ভাবেই নিয়ে আসে ঋণ-দানকারী সংস্থাগুলোর দেউলিয়াত্ব, পালাক্রমে, ব্যাংকের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার ঘটনা সৃষ্টি করে শিল্পের জন্য বিপত্তি এবং তার ফলে দেখা দেয় নতুন করে পুনরায় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়াত্ব।

ঋণ-সংকট প্রথম দেখা দেয় **জার্মানী** ও **অষ্ট্রিয়ায়**। ১৯৩১ সালের সেই বসন্তকালেই অষ্ট্রিয়ার সর্ববৃহৎ ব্যাংক, দেশের সমস্ত শিল্পের শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ যার নিয়ন্ত্রণে ছিলো, ভেঙে পড়ে। এর পরপরই জার্মানীতে সর্ববৃহৎ বেশ কটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে পড়লো। ১৯৩১ সালের জুন মাসে জার্মানীর সবচেয়ে বড় ব্যাংক দ্যা ডার্মস্টাড এণ্ড ন্যাশনাল ব্যাংক এবং আরেকটি বড় ব্যাংক – দ্যা ড্রেসডেন ব্যাংক দেউলিয়া ঘোষিত হলো। মধ্য ইউরোপ থেকে ঋণ-সংকটের ঢেউ এসে গ্রাস করলো **ইংল্যাণ্ডকে**, ফলশ্রুতিতে **ফ্রান্স, আমেরিকা** ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে ঋণ-সংকট দেখা দিল।

সংকটের আঘাতে বিশ্ব একচেটে পুঁজির "গর্ব ও গৌরব" বলে খ্যাত বেশ কয়েকটি সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান ১৯৩১ সালের শেষার্ধ ও ১৯৩২ সালে দেউলিয়া হয়ে পড়ল। সুইডেনের ক্রুগার ম্যাচ (দিয়াশলাই) ট্রাস্ট ভেঙে পড়লো। মার্কিন পুঁজির সাহায্যে ক্রুগার সকল দেশের

দিয়াশলাই শিল্পে একচেটে কর্তৃত্ব দখলের চেষ্টা চালায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সে এক উন্মত্ত অভিযান চালিয়েছিল ঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দিয়াশলাইয়ের রপ্তানী ছিল তার কাছে এক অনভিপ্রেত বাঁধা। দেউলিয়া হওয়ার মুখে পড়ে ক্রুগার গুলি করে আত্মহত্যা করে। তার মৃত্যুর পর দেখা যায় যে, শেষের বছরগুলিতে বেশ কিছু জালিয়াতি ও জুয়াচুরির মাধ্যমে সে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল, যে জাল-জুয়াচুরির সাহায্যে তার দেউলিয়া হয়ে পড়াকে সে বিলম্বিত করে। আরো উদ্ঘাটিত হয় যে, বেশ কয়েকটি দেশের অত্যন্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা ছিল তার বেতনভোগী। বহু সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট নেতা তার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেত।

আমেরিকার সবচেয়ে বড় কারবারীদের অন্যতম ইনস্যুল-ও এক পাকা জুচ্চোর বলে প্রমাণিত হয়। ১৯৩২ সালের বসন্ত কালে, তার নেতৃত্বাধীন যে 'কর্পোরেশন' ছিল ষাটটি শহরের বিদ্যুৎ-শক্তি কেন্দ্র ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মালিক, পঞ্চাশ কোটি ডলারের পুঁজি সম্পন্ন সেই সংস্থাটি ভেঙে পড়ে।

"...... সংকট কেবলমাত্র উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং ঋণ-ব্যবস্থা, বৈদেশিক বিনিময়, দায়-দেনা প্রভৃতিকেও আঘাত হেনেছে, এবং তা বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার ও বিভিন্ন দেশের সামাজিক গোষ্ঠী সমূহের মধ্যেকার চিরাচরিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কগুলোকেও ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে।

"পণ্য-সামগ্রীর দর-দামের ক্ষেত্রে হ্রাসপ্রাপ্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একচেটেবাদী কার্টেলগুলির প্রতিরোধ সত্বেও, দর-দামের ক্ষেত্রে হ্রাসপ্রাপ্তি দুর্দম প্রাকৃতিক শক্তিমত্তা সহকারে ঘটতে থাকে, আর তা প্রাথমিকভাবে ও মূলত আঘাত হানে অসংগঠিত পণ্য-মালিক – কৃষক, কারিকর, ক্ষুদে পুঁজিপতিদের পণ্যকে, আর সংগঠিত পণ্য মালিক অর্থাৎ কার্টেলগুলিতে জোটবদ্ধ পুঁজিপতিদের পণ্যকে আঘাত হানে পর্যায়ক্রমে ও স্বল্পতর মাত্রায়। দরদামের ক্ষেত্রে হ্রাসপ্রাপ্তি ঋণ-গ্রহীতাদের (ক্ষুদে প্রস্তুতকারক, কারিকর, কৃষক, ইত্যাদিদের) অবস্থা অসহনীয় করে তোলে, অন্যদিকে, ঋণদাতাদের তা আসীন করে অভূতপূর্ব বিশেষ-সুবিধাজনক অবস্থানে। এরূপ এক পরিস্থিতি বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও স্বতন্ত্র পুঁজিপতিদের গণ-দেউলিয়াত্বের দিকে চালিত করতে বাধ্য, এবং প্রকৃতপক্ষে হয়েছিলও তাই। এর ফলশ্রুতিতে, বিগত তিন বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, জার্মানী, ব্রিটেন ও ফ্রান্সে হাজার হাজার যৌথ-মূলধনী মালিকানাধীন কোম্পানীগুলোর দেউলিয়াত্বের পর পর আসলো মুদ্রার মূল্য-হ্রাস, যা ঋণ-গ্রহীতাদের অবস্থাকে কিছুটা স্বস্তি দান করলো। আবার মুদ্রার মূল্য-হ্রাসের পর পরই আসলো রাষ্ট্র কর্তৃক আইনসম্মত, বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার ঋণ পরিশোধ না-করার বিষয়।" [স্তালিন, "সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট", "লেনিনবাদের সমস্যাবলী", ইং সং, পিকিং, ১৯৭৬, পৃঃ ৬৭৪-৭৫]

সংকটের বিকাশের ফলে দেখা দিল ব্যাপকতম **মুদ্রাস্ফীতি** [Inflation], অর্থাৎ, মুদ্রার মূল্য-হ্রাস। পণ্যের দাম পড়ে যাওয়ার ফলে ঋণ-গ্রহীতাদের বিপুল বিপত্তি দেখা দিল ঃ যখন সে ঋণ গ্রহণ করেছিল তখনকার তুলনায় যখন জিনিসের দাম পড়ে গেল তখন টাকার অংকে ঐ একই পরিমাণ ঋণ শোধ করতে অনেক বেশী পরিমাণ পণ্য দিতে হলো। দামের ক্ষেত্রে পড়তি ঋণ-গ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের কাঁধে বাড়তি বোঝা চাপায় এবং যেসব দেশ বেশ পরিমাণে ঋণগ্রস্ত তাদের অবস্থা অধিক শোচনীয় করে তোলে। এই বিপত্তি থেকে উদ্ধারের উপায় কি ? পুঁজিপতিরা ও তাদের সরকারগুলো এ থেকে নিষ্কৃতি লাভের পথ খোঁজে দুই দিক থেকে ঃ আইন বলে প্রাপ্ত অধিকার অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ বন্ধ রেখে [moratorium] তথা ঋণের কিস্তি শোধ করা স্থগিত রেখে এবং মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে। সংকটের বৃদ্ধি ঘটার সাথে সাথে একের পর এক পুঁজিবাদী দেশ তাদের ঋণ পরিশোধ বন্ধ করে দিল। কিন্তু এটাই যথেষ্ট ছিল না। তারা মুদ্রাস্ফীতির পথও গ্রহণ করলো। প্রথমতঃ দুর্বল দেশগুলি এই ব্যবস্থা নেয়। তার পর ১৯৩১ সালের শরৎকালে ইংল্যাণ্ড মুদ্রস্ফীতির পথ গ্রহণ করে ; বৃটিশ সরকার কাগজের টাকা সোনায় ভাঙিয়ে নেয়া বন্ধ করে দেয় এবং পাউণ্ড স্টার্লিংয়ের দাম পড়তে শুরু করে। মুদ্রার মূল্য-হ্রাস ঋণ-গ্রহীতাদের অবস্থাটা সহজতর করে – এখন সে মূল্য-হ্রাসপ্রাপ্ত, অর্থাৎ, অধিকতর সস্তা মুদ্রা দিয়ে তার ঋণ শোধ করতে পারে। কিন্তু **বৈদেশিক বাজারের জন্য সংগ্রামের** ক্ষেত্রেও মুদ্রাস্ফীতির বিপুল গুরুত্ব রয়েছে।

নিজের মুদ্রার মূল্য-হ্রাস পুঁজিবাদী দেশকে বিশ্ব বাজারে অন্যান্য দেশের উপর সুবিধা প্রদান করে। এর কারণ হলো এই যে, স্বর্ণমানের ভিত্তিতে তার পণ্যের দাম হয় কম। কাগজের মুদ্রায় জিনিসের মূল্য এমনকি বাড়তেও পারে, কিন্তু ঐ টাকা যদি সোনার সাথে বিনিময় করা হয় তাহলে দেখা যাবে যেসব দেশের পণ্য স্বর্ণ-মানের ভিত্তিতে রয়েছে তাদের তুলনায় মুদ্রাস্ফীতিযুক্ত এই নির্দিষ্ট দেশের পণ্য সস্তা। আর কম দাম সহকারে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়াও সহজতর। যেসব দেশের পণ্যের দাম এখনও পুরাতন মুদ্রায় স্থির করা হয় এবং যে মুদ্রাটি স্বর্ণমানের উপরই প্রতিষ্ঠিত, সেসব দেশ অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বের সর্ববৃহৎ পুঁজিবাদী দেশগুলির অন্যতম, সকল দেশের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ১৯৩৩ সালের মার্চে তার নিজের মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়েছিল। মার্কিন ডলার আর বৃটিশ পাউণ্ড গোটা পুঁজিবাদী বিশ্বে সবচাইতে স্থিতিশীল মুদ্রা বলে গণ্য হতো। সকলেই তাকিয়ে থাকত তাদের দিকে, সকল পুঁজিবাদী দেশের ব্যবসায়ীরা তাদের স্থিতিশীলতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো, সোনার সাথে সমাহারেই তাদের মূল্য নির্ধারিত হতো, অন্যান্য কম সম্পদশালী দেশের সঞ্চয়ও এসব মুদ্রায় রূপান্তরিত করে রাখা হতো। আর এখন এই দু'টি শক্তিশালী দুর্গও ভেঙে পড়লো, তাদের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য দেশের মুদ্রাকেও তারা ধ্বংস করলো। মহাযুদ্ধ যাদেরকে সম্পদশালী করেছিল তাদের মধ্যে তৃতীয় বড় দেশ জাপানও তার মুদ্রার পূর্বেকার স্বর্ণমানের মূল্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দিয়ে স্বীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস করেছে। অধিক শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলির মুদ্রার মূল্য-হ্রাসের এই ঢেউয়ের সাথে সাথে দেখা দেয় পুঁজিপতিদের মধ্যে এক নতুন বিবাদ, এক নতুন কাড়াকাড়ি। বিশ্ব বাজারে যেহেতু মুদ্রাস্ফীতিযুক্ত দেশ সস্তায় পণ্য বিক্রী করতে পারে সেজন্যে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে দিতে পারে। তাই বাজার দখলের সংগ্রামে ব্যবহৃত হয় এক নতুন হাতিয়ার – **মুদ্রাস্ফীতি**। আর এই হাতিয়ারের সাহায্যেই এখন শুরু হয়েছে **মুদ্রা-যুদ্ধ** (Currency war)।

১৯৩৩ সালের শেষ দিকে গোটা পুঁজিবাদী বিশ্বের মাত্র চারটি দেশে ঃ ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডে স্বর্ণমান ভিত্তিক মুদ্রা ছিল। আর অন্যান্য দেশগুলিও মুদ্রাস্ফীতির পথ ধরেছিল।

"স্বাভাবিক ভাবেই, এই যে বিষয়গুলো ঋণ-ব্যবস্থার ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, সে বিষয়গুলোই অনুসৃত হতে বাধ্য, আর প্রকৃতপক্ষে অনুসৃতও হয়েছিল – ঋণ ও বৈদেশিক দেনা পরিশোধের স্থগিতকরণ, যুদ্ধকালীন মিত্র পক্ষগুলোর পারস্পরিক দেনা পরিশোধের স্থগিতকরণ, পুঁজির রপ্তানীর স্থগিতকরণ, বৈদেশিক বাণিজ্যের আরো হ্রাসপ্রাপ্তি, পণ্যের রপ্তানীর ক্ষেত্রে আরো হ্রাসপ্রাপ্তি, বৈদেশিক বাজারের জন্য সংগ্রামের তীব্রতা, বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার বাণিজ্য-যুদ্ধ, এবং 'ডাম্পিং' দ্বারা। হ্যাঁ, কমরেডগণ, ডাম্পিং দ্বারা। আমি অবশ্য কথিত সোভিয়েত 'ডাম্পিং'-এর কথা বলছি না, যা নিয়ে অতি সম্প্রতি ইউরোপ আর আমেরিকার সম্মানিত আইন-সভাগুলোর কিছু সম্মানিত সদস্য চেঁচামেচি করে গলা ভেঙে ফেলেছিল। আমি বলছি আসল 'ডাম্পিং'-এর কথা, যা এখন প্রায় সমস্ত 'সুসভ্য' রাষ্ট্রগুলিই অনুশীলন করছে, আর যে সম্পর্কে সেসব নির্ভীক ও সম্মানিত

আইন-সভার সদস্যরা বিজ্ঞজনোচিত নীরবতাই পালন করছে।" [স্তালিন, "সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট", পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭৫-৭৬]

বর্তমান মন্দা ও তার বিশেষত্ব

পুঁজিবাদী দেশগুলোর উৎপাদন গতিবিধি সম্পর্কিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, উৎপাদনের অবনতির চরম বিন্দুটি এসেছিল ১৯৩২ সালে। পরবর্তী বৎসর, ১৯৩৩ সালে পুঁজিবাদী দেশগুলোর শিল্প কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রদর্শন শুরু করে। ১৯৩৩ সাল জুড়ে উৎপাদনের ঘন ঘন উপর-নীচ ওঠা-নামা দেখা যায়, তা সত্ত্বেও, ১৯৩২ সালের গ্রীষ্মকালে শিল্প-উৎপাদন যত নীচে নেমেছিল, তত নীচে আর তা নামেনি।

এই ঘটনাকে সম্পূর্ণভাবে কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত মুদ্রাস্ফীতি ও উন্মত্ত যুদ্ধ-প্রস্তুতির নীতি গ্রহণ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে গেলে ভুল করা হবে। কোনো কোনো দেশে, যেমন জাপানে, সমর-শিল্পগুলোর জন্য বিপুল পরিমাণ ফরমাশ প্রকৃতপক্ষেই একটা বড় ভূমিকা নিয়েছিল। যাই হোক, যেসব দেশে স্থিতিশীল মুদ্রা-ব্যবস্থা রয়েছে, সেসব দেশসহ সমস্ত দেশেই শিল্পের অবস্থাতে একটা উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলতঃ এটা স্পষ্ট যে, "যুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতি থেকে উদ্ভূত তেজী অবস্থার [boom] সাথে সাথে পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর ক্রিয়কলাপেরও একটা প্রভাব এখানে রয়েছে।" [স্তালিন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭৮]

শ্রমিকশ্রেণীর উপর শোষণের মাত্রা নিদারুণভাবে তীব্র করে, ব্যাপক কৃষক জনগণের ধ্বংস সাধন করে, ঔপনিবেশিক দেশসমূহের শ্রমজীবী জনসাধারণের ওপর লুঠতরাজ চালিয়ে, পুঁজিবাদ শিল্পের অবস্থার কিঞ্চিত উন্নতি বিধান করতে পেরেছে। বর্ধিত শোষণ, শ্রমের তীব্রতার আরোও বৃদ্ধি, মজুরীর হ্রাস – এই সমস্তই বেশ কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে চাহিদার স্বল্পতা ও পণ্যের নিম্ন দাম সত্ত্বেও উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভবপর করেছে। উপনিবেশগুলোর কৃষক ও শ্রমজীবীদের সর্বনাশের বদৌলতে কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্যের দাম হ্রাস পেয়েছে ; এর আরও অর্থ হলো পুঁজিপতিদের জন্য নিম্ন উৎপাদন খরচ। সংকট উৎপাদিকা শক্তি সমূহের একটা বিরাট অংশকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। বিপুল পরিমাণ পণ্য-সামগ্রীর ধ্বংস সাধনের ফলে অবশেষে মজুত এত হ্রাস পেয়েছে যে, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যেকার অনুপাত পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী অনুকূল হয়েছে। দুর্বল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা টিকে-থাকা বাকী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে এখানে-ওখানে বাজার দখলের পথ নিষ্কন্টক করেছে।

এভাবে প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশে শিল্প তার নিম্নতম সীমাবিন্দু কাটিয়ে ওঠেছে। এই নিম্ন বিন্দু থেকে এখন শিল্প প্রবেশ করেছে মন্দার পর্যায়ে।

"..... সাধারণ মন্দা নয়, বরং এক বিশেষ ধরণের মন্দা যা শিল্পের ক্ষেত্রে এক নতুন তেজী অবস্থা ও সমৃদ্ধির দিকে চালিত করে না, বরং অন্যদিকে যেটা আবার শিল্পকে অবনতির নিম্নতম বিন্দুতেও ঠেলে নিয়ে যায় না।" [স্তালিন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭৯]

গতানুগতিক সময়ে, যখন পুঁজিবাদ তার অবনতি ও পতনের যুগে তখনও পৌঁছায়নি, তখন সংকটের পর আসত মন্দা আবার পালাক্রমে মন্দার স্থলে আসতো সমৃদ্ধির আমল। কিন্তু বর্তমান সময়ে, পুঁজিবাদ হলো মুমূর্ষু পুঁজিবাদ। সে চলছে সাধারণ সংকটের মধ্য দিয়ে, অত্যন্ত গভীর দ্বন্দ্বগুলি তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বর্তমান

অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের মধ্যেই ; সে কারণেই এ সংকটের পার্থক্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তার এরূপ গভীরতা ও দীর্ঘস্থায়িত্ব, এরূপ ধ্বংসকারী ক্ষমতা ও তীব্রতা। মন্দার নতুন পর্যায়ও শুরু হয়েছে এই সাধারণ সংকটের মধ্যেই ; সে কারণে চিরাচরিত ধরণের মন্দা থেকে এই মন্দা মৌলিকভাবেই ভিন্ন, এবং এক নতুন তেজী অবস্থার, সমৃদ্ধির এক নতুন আমলের পূর্বসূরী তা নয়।

"..... কারণ যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনে পুঁজিবাদী দেশসমূহের শিল্পকে বাধা দান করছে সেসব অবস্থা অব্যাহতভাবেই কার্যকরী রয়েছে। আমি পুঁজিবাদের অব্যাহত সাধারণ সংকটের কথাই বলছি, যে সংকটের পরিস্থিতিতেই এগিয়ে চলেছে অর্থনৈতিক সংকট ; শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন-ক্ষমতার চেয়ে লাগাতার স্বল্প-ব্যবহার, লাগাতার গণ-বেকারত্ব, কৃষি-সংকটের সাথে শিল্প-সংকটের জড়িয়ে জট-পাকানো অবস্থা, যে স্থায়ী পুঁজি সাধারণতঃ তেজী অবস্থার আগমনকে সূচীত করে, সেই পুঁজির কম-বেশী যথার্থ পুনর্নবীকরণ [renewal] অভিমুখী ঝোঁকের অনুপস্থিতি, ইত্যাদি ইত্যাদি।" [স্তালিন, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭৯]

এক নতুন-দফা বিপ্লব ও যুদ্ধের প্রাক্কাল

১৯২৯ সাল থেকে সমগ্র পুঁজিবাদী বিশ্বে যে সংকট বয়ে চলেছে তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমস্ত অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ দ্বন্দ্বগুলিকে চরম সীমায় তীব্র করে তুলেছে। দীর্ঘস্থায়ী সংকট শ্রমজীবি জনগণের অবস্থা অতুলনীয় ভাবে শোচনীয় করে তুলেছে। সুবিপুল বেকারত্ব, নির্মম মজুরী হ্রাস, শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি – বর্তমান সংকটের অবস্থায় এই হলো শ্রমিকশ্রেণীর নিয়তি। এই সংকট ব্যাপক কৃষক জনগণকেও নজীর বিহীন ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। নিঃস্বতার সাথে সাথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের বিক্ষোভও প্রবলভাবে শাণিত হয়ে উঠেছে।

জনগণের রোষের মুখে পড়ে বুর্জোয়াশ্রেণী সেসব পুরানো পদ্ধতিগুলো ক্রমেই পরিত্যাগ করছে যেসব পদ্ধতির সাহায্যে তারা পূর্বে শ্রমিক শ্রেণীকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ রাখতো, এবং আশ্রয় নিচ্ছে প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদী, ফ্যাসিস্তসুলভ একনায়কত্বের। জার্মানীতে ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের সহায়তায় বুর্জোয়াশ্রেণী হিটলারের রক্তাক্ত একনায়কত্ব কায়েম করেছে। অন্যান্য দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যেও ফ্যাসিবাদী প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটরা শ্রমিকশ্রেণীর সারিতে ভাঙন সৃষ্টি করেছিল এবং এভাবে বুর্জোয়া একনায়কত্বের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধকে দুর্বল করে দিয়েছিল সেই সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের বিশ্বাসঘাতক ভূমিকা জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠার কেবল সাক্ষ্যই বহন করে না, বরং হিটলারের ক্ষমতারোহণ বুর্জোয়াশ্রেণীর দুর্বলতারও সাক্ষ্য বহন করছে, যে বুর্জোয়াশ্রেণী পুরানো পদ্ধতির শাসনের দ্বারা নিজেদের হাতে ক্ষমতা আর ধরে রাখতে পারছে না। বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের গণতান্ত্রিক মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রক্তাক্ত সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু এর ফলে শ্রেণী-সংগ্রাম কেবল আরো তীক্ষ্ণ হয়েই উঠছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গোটা সৌধ-কাঠামোকে ছিন্ন-ভিন্ন করার আশংকাই সৃষ্টি করছে।

দীর্ঘস্থায়ী সংকট পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সকল বৈরীতাকে চূড়ান্তভাবেই তীব্র করে তুলেছে। সংকটের পরিস্থিতিতে প্রত্যেক দেশই চেষ্টা করছে নিজের বোঝা অন্যের কাঁধে চাপাবার। বাজারের জন্য সংগ্রাম চরমভাবেই তীব্র হয়ে উঠেছে। বৈদেশিক বাজারে